গান্ধী-রচনাসম্ভার

প্রথম খণ্ড

আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

সম্পাদনা

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি

গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি
পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম শতবার্ষিকী সংস্করণ
২রা অক্টোবর ১৯৫৯

গান্ধী-রচনাসম্ভার উপসমিতি ঃ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (সভাপতি)

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র

শ্রীবটকৃষ্ণ দত্ত

শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য (সম্পাদক)

পরিবেশক ঃ
মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতির রচনাসম্ভার উপসমিতির পক্ষে
মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড হইতে শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

লোক শিক্ষার জন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁর জনসেবামূলক জীবনের উষাকাল থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার প্রায় কিছু পূর্ব পর্যন্ত অক্লান্ত ভাবে লেখনী চালনা করেছিলেন। ভারত সরকার গড়ে ৪০০ পৃষ্ঠার ৭০ খণ্ডে ইংরাজীতে তাঁর সমগ্র রচনা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছেন যার প্রায় অর্ধেক এ যাবৎ প্রকাশিত হয়ে গেছে। বাঙলা দেশের গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতির যা সঙ্গতি এবং তার হাতে যা সময় তাতে বলা বাহুল্য গান্ধীজীর সমগ্র রচনার বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। অথচ গান্ধীজীর গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর একটি সঙ্কলন এই শতবার্ষিকীর বৎসরে আমাদের সমিতির তরফ থেকে প্রকাশিত হক—এমন দাবি বহু মহল থেকেই উঠছিল। তাই আমাদের সীমাবদ্ধ সঙ্গতি ও আয়োজনের এই নিদর্শন—ছয় খণ্ডের গান্ধী-রচনাসম্ভার।

সমগ্র রচনা বাঙলায় প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও যথাসাধ্য প্রয়াস করা হয়েছে যাতে তাঁর মৌলিক এবং যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ রচনা এই রচনাসম্ভারে স্থান পায়। কেবল গান্ধী-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ও অনুবাদকদের দিয়ে বঙ্গানুবাদ করান হয় নি, এর সম্পাদনার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের উপর। তাই আশা করা যায় বর্তমান সঙ্কলন বাঙলা ভাষায় গান্ধী সাহিত্যের এক প্রামাণ্য সঙ্কলন বলে বিবেচিত হবে।

অনুবাদক ও সম্পাদকবর্গ ছাড়া আমরা এই রচনাসম্ভার প্রকাশ করার ব্যাপারে প্রভূত সহায়তা পেয়েছি আমাদের প্রকাশন উপসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে। বাঙলা গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিখ্যাত চারটি প্রকাশন প্রতিষ্ঠান—মিত্র ও ঘোষ, অমর সাহিত্য প্রকাশন, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী এবং দাসগুপ্ত প্রকাশনের কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহায়তা না পেলে এত অল্প সময়ে আমাদের পক্ষে এই বিরাট কাজ করা সম্ভবপর হত না। গান্ধীজীর প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার জন্যই তাঁরা এই গুরুদায়িত্ব বহনে সম্মত হয়েছেন—এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে এক রকম নামমাত্র মূল্যে গান্ধী-রচনাসম্ভার বাঙালী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভবপর হল। এঁদের সকলকে আমরা গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি ও তার রচনাসম্ভার উপসমিতির তরফ থেকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর অদ্বিতীয় চরিত্র ও কর্মের দ্বারা মুমূর্ষু এক জাতির মধ্যে নবীন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করেছিলেন এবং যুদ্ধ ও হিংসা জর্জর পৃথিবী নূতন করে বাঁচার মন্ত্র পাবার জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তাই তাঁর এই রচনাসম্ভার পাঠে দেশের তরুণ সমাজের ভিতর দীনতমের কল্যাণ সাধনের গঠনমূলক মানসিকতার শুভ উদ্বোধন হক—মহাত্মা গান্ধীর জন্ম শতবার্ষিকীর পুণ্য লগ্নে এই আমাদের কামনা।

শ্যামাদাস ভট্টাচার্য
সাধারণ সম্পাদক

শঙ্করপ্রসাদ মিত্র
চেয়ারম্যান

গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ
মহাজাতি সদন
১৬৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭

সম্পাদকের নিবেদন

মহৎ মানুষদের জীবনী সমগ্র মানবজাতির সম্পদ। সে সম্পদ আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, যখন তা শুধু জীবনীর পরিবর্তে আত্মজীবন হয়। কিন্তু মহত্ত্ব সব সময়ই স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত। এই স্বাতন্ত্র্য সাধারণতঃ মহত্ত্বের উপলব্ধির ক্ষেত্রে আবরণ সৃষ্টি করে থাকে। মহৎ মানুষকে বুঝতে তাই কষ্ট হয়, কখনও কখনও অসম্ভব হয়। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, পৃথিবীতে এই ধরনের স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত মহৎ মানুষকে চিনতে প্রায় প্রতিবারই ভুল হয়েছে। অথচ এই আবরণ অপসারণ করেই তাঁদের জীবনের আলো ছড়ায়। আমরা তাঁকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করি, অথচ দূরে সরিয়ে রাখার ক্ষমতাও আমাদের থাকে না। এই পটভূমিকায় তাঁদের আত্মজীবনী সেই স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত মহত্ত্বকে উপলব্ধি করার পক্ষে অপরিহার্য পরিচয়পত্র।

গান্ধীজী আমাদের কালের মধ্যে সব চেয়ে বিতর্কিত মহৎ মানুষ। বিতর্কিত এইজন্য যে, গান্ধীজীর সমর্থকের বা অনুসরণকারীর সংখ্যা, যে কোন কারণেই হোক্, বিরোধীর সংখ্যার চেয়ে বহুলাংশে অল্প। গান্ধীজীকে না বুঝে সমর্থন করেছেন, এমন সংখ্যক মানুষের হিসেবের অঙ্কও কম নয়। অর্থাৎ গান্ধীজীকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করে তাঁর পথে চলেছেন—এমন পথিকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এর প্রধান কারণ, গান্ধীজীকে বোঝা কিছু কঠিন এবং তাঁকে বোঝার অনিচ্ছাও আমাদের মধ্যে সহজাত। এই অবস্থায় গান্ধীজীকে অস্বীকার করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁকে অস্বীকার করার ক্ষমতা বিরোধীদের সর্বপ্রকার অস্ত্রসজ্জা সত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এ যেন দু চোখ বন্ধ করে, সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মত একটা হাস্যকর প্রয়াস মাত্র। বস্তুতঃ মহৎ মানুষের অপার্থিব মহত্ত্বের এইটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাদান। অবিশ্বাস, অহংকার, অজ্ঞতা এবং অপপ্রচারের বিস্তীর্ণ ধূসরতা ছাপিয়েও তার আলো এসে পড়ে। সমকালের ও ভাবীকালের মানুষ শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে তার কাছে নত হয়। গান্ধীজীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং ঘটবে না। ভুল ত্রুটি এবং দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও তিনি এই শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ। অনেকের মতে মানবজাতির ইতিহাসে তিনি যীশুখৃষ্ট ও বুদ্ধের সমগোত্রীয়।

কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে দেবত্ব মানেই দূরত্ব। গান্ধীজীকে এই দেবত্বসুলভ দূরত্বের অস্পষ্টতায় রাখা উচিত নয়। তাঁকে উপলব্ধি করার পক্ষে এই দেবত্বের মৃত পরিবেশ গড়ে তোলাও অযৌক্তিক। তাঁকে মনুষ্যরূপেই দেখা উচিত এবং সেই রক্তমাংসের মানুষ, যিনি বার বার ভুল

করেন, বার বার ব্যর্থ হন, দুঃখে যন্ত্রণায় যাঁর জীবন ভেঙে পড়ে! এই ঘরোয়া, এই পরিচিত মানুষের প্রতীক হিসেবে গান্ধীজীকে দেখলে, তবেই তাঁকে সবচেয়ে স্বাভাবিক আলোয় দেখা যায়। চেনা যায়, কী করে কী ভাবে একজন সাধারণ মানুষ জীবনের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে মহত্ত্বের শেষ শিখরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। বার বার অবসন্ন হয়ে পড়েছেন, ব্যর্থতার ও বেদনার ক্ষতচিহ্ন পায়ে পায়ে জেগে উঠছে, তবু তিনি চলেছেন সেই দুর্গম পথে—যে পথ মনুষ্যত্বের পরম প্রকাশের দিকে চলেছে, যে পথ চলেছে মানবতার শেষ তীর্থের দিকে। গান্ধীজীর সমগ্র জীবন এই পথ চলার কাহিনী।

তাঁর আত্মজীবনীর মধ্যে এই পথ চলার সত্য ও অনাবৃত কাহিনীর যে সমাবেশ ঘটেছে, মানবেতিহাসে তার স্থান সন্দেহাতীত। এমনি এক-একজন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়েই মানবসমাজ অগ্রসর হয়, পথ চলার জন্য সঞ্চয় খুঁজে পায়।

"আত্মকথা" সম্পাদনাকালে এই কথাই মনে হয়েছে। আরো মনে হয়েছে, একটি শীর্ণ মানুষের চলার সঙ্গে সঙ্গে, সারা ভারতবর্ষও তার সঙ্গে চলেছে, চলেছে ইতিহাস, চলেছে মানবসমাজ। গান্ধীজীর আত্মকথা সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে এক অপরিমেয় সম্পদ। ধর্ম রাজনীতি ও সাহিত্যের সকল উপাদান এখানে বর্তমান। যাঁর যা পেশা—এক কথায় সর্বস্তরের মানুষ এই "আত্মকথা" পাঠ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করার মত পুষ্টিকর ঐশ্বর্য খুঁজে পাবেন। কারণ "আত্মকথা" যার কথা বলেছে, তার অপর নাম "জীবন"। এই দৃষ্টি দিয়ে বইটি পাঠ করার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানাবো।

"গান্ধীজীর আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ" বইটির অনুবাদক বিখ্যাত গান্ধীবাদী শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত। তিনি মূল গুজরাটি থেকে বহু বছর আগে এই অনুবাদ করেন। তাঁর চেষ্টা সন্দেহাতীত ভাবে বাংলা দেশের রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে, গান্ধীজীকে চেনার, জানার পথ সহজ ও সুগম করেছে। শ্রী দাসগুপ্তের কাছে তাই দেশ বিশেষভাবে ঋণী।

শতবার্ষিকী সমিতি আমার ওপর বইটি সম্পাদনার ভার দেবার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, যদিও এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করার মত যোগ্যতা আছে কিনা, তা আমার জানা নেই!

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক
সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ

প্রস্তাবনা

চার-পাঁচ বৎসর পূর্বে কয়েকজন নিকটতম সহকর্মীর আগ্রহে আমি আমার আত্মকথা লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম এবং লিখিতেও আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক পাতা লেখা শেষ হইতে না হইতেই বোম্বাইয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামার আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং আমার এই কার্যও অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। তারপর আমি পর পর বিভিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়া অবশেষে য়েরোড়া জেলে আসিলাম। ভাই জেরাম দাসও আমার সঙ্গে সেই জেলে ছিলেন। আমার অন্য সব কাজ ফেলিয়া রাখিয়া, তিনি আমাকে এই আত্মকথা লিখিবার কাজ শেষ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি তখন তাঁহাকে বলি,—আমি পড়াশোনা করিবার একটা কার্যক্রম স্থির করিয়া ফেলিয়াছি। ঐ কার্যক্রম শেষ না করিয়া আত্মকথা লেখার কাজ আরম্ভ করিতে পারিব না। যদি আমি আমার সম্পূর্ণ দণ্ডকাল ঐ জেলে অতিবাহিত করিবার সুযোগ পাইতাম, তবে আমি অবশ্যই সেখানে আত্মকথা লেখার কাজও শেষ করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন আমার কারামুক্তি ঘটিল, তখনও আমার আরব্ধ পাঠ শেষ করিয়া আত্মকথা আরম্ভ করিতে এক বৎসর দেরি ছিল। তাহার পূর্বে আত্মকথা লেখার কাজ শুরু করা চলিতে পারে না।

এখন আবার স্বামী আনন্দ আমাকে ঐ একই অনুরোধ করিয়াছেন। আমি দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস লেখা শেষ করিয়াছি। তাই নবজীবন-এর জন্য আত্মকথা লেখার কাজে হাত দিবার লোভও কিছুটা হইতেছে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল আমি বইটি পৃথকাকারে লিখিয়া ফেলি এবং তিনি তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। কিন্তু একসঙ্গে এই কাজের জন্য এত সময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি শুধু প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু করিয়া লিখিতে পারি। তাছাড়া আমাকে 'নবজীবন'-এর জন্য কিছু ত লিখিতেই হইবে। তবে আত্মকথাই বা নয় কেন? স্বামীজীও এই ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন। আমিও এই কঠিন কাজে হাত দিলাম।

কিন্তু এইরূপ যখন স্থির করিয়াছি তখন আমার একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী বন্ধু আমার মৌনব্রত পালনের সময় আসিয়া ধীরে ধীরে এই কথাগুলি বলিলেন—

"আত্মকথা লেখার মত দুঃসাহসিক কাজে আপনার কি প্রয়োজন? ইহা ত পশ্চিমদেশের একটি বিশেষ ধরনের প্রথা। প্রাচ্যদেশের কেহ আত্মচরিত লিখিয়াছেন বলিয়া জানি না। আর, কেনই বা আপনি লিখিবেন? মনে করুন, আজ নীতি ও আদর্শ বলিয়া যাহা মানিতেছেন, কাল তাহা মানিতে হয়ত বাধা হইতে পারে। অথবা এই নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে আজ যে কাজ করিতেছেন, পরে আবার তাহা অগ্রাহ্য করিতে হইতে পারে। আপনার লেখাকে অনেক লোক প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহারা আপনার লেখা অনুযায়ী নিজেদের স্বভাব ও আচরণ গড়িয়া তোলেন। এর ফলে তাঁহারা ভুল পথে যাইবেন না কি? সেইজন্য আত্মকথার মত কিছু না লেখা ভাল।"

এই যুক্তি আমার উপর অল্পাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে একটি আত্মকথা লেখার চেষ্টা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার জীবন সত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমন্বয় মাত্র। আমি তাহারই কাহিনী বলিতে চাই। তবে একথা সত্য, সেই সব কাহিনী আত্মকথার মত হইয়া উঠিবে। কিন্তু যদি তাহাতে প্রতি পাতায় সত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা থাকে, তবে আমি কিছু মনে করিব না। আমার জীবনে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা পাঠকদের কাছে প্রকাশিত হইলে তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণকর হইবে বলিয়াই আমি মনে করি—অন্ততঃ আমার মনে এই রকমের একটা আত্মতৃপ্তির ভাব আছে। রাজনীতিক্ষেত্রে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভারতবর্ষ জানিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষ কেন, সভ্যজগতের কতক অংশও জানিয়াছে। অবশ্য আমার কাছে ইহার মূল্য একান্ত অকিঞ্চিৎকর। আর এইসব হইতে যে 'মহাত্মা' নামটা পাওয়া গিয়াছে তাহার মূল্য আরও অকিঞ্চিৎকর। কখনও কখনও এই বিশেষণ আমাকে গভীর ভাবে পীড়া দেয়। ইহাতে আমি কখনও মুহূর্তের জন্য অহঙ্কৃত হইয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি যাহা কেবল একান্তভাবে আমিই জানি এবং যাহার দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আমি শক্তি সংগ্রহ করিয়াছি, সেই সকল নিশ্চয়ই আমি বলিব। যদি সত্যসত্যই এই সাধনা আধ্যাত্মিক হয়, তবে আমার আত্ম-প্রশংসার অবকাশ অল্পই। ইহা দ্বারা কেবল নম্রতাই বৃদ্ধি পাইতে পারে। যতই আমি আমার নিজের বিচার করিতে থাকি, এবং যতই আমার অতীত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকি, ততই আমার বহু অসম্পূর্ণতার ছবি স্পষ্ট হইয়া আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

আমি যাহা পাইতে চাই, যাহা আমি গত দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরিয়া খুঁজিয়া আসিতেছি, সাধনা করিতেছি, সে ত আত্মদর্শন বা আত্মোপলব্ধি। সেই ত ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখার সাধনা, অথবা মোক্ষলাভ। আমার সকল জীবন, আমার সকল কাজ এই লক্ষ্যভূমির দিকেই প্রসারিত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার দুঃসাহসিক ব্রতগুলিও এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আমি গোড়া হইতেই এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিয়াছি, যাহা একের পক্ষে সম্ভব তাহা অপর সকলের পক্ষেও সম্ভব। আর সেই জন্যই আমার কোনও সাধনাই—কোনও পরীক্ষাই, আমি গোপনে করি নাই। বস্তুতঃ আমার কার্য সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছে বলিয়া, উহার আধ্যাত্মিক মূল্য কিছু কমে নাই। এমন কতকগুলি বস্তু অবশ্য আছে যাহা আত্মাই জানে, আর জানে তাহার স্রষ্টা। এই বস্তুকে বাহিরের আলোকে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে যে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা আমি লিখিতে যাইতেছি সেগুলি সেই পর্যায়ের নহে—সেগুলি আধ্যাত্মিক অথবা নৈতিক। কারণ ধর্মের মূল কথা বা নির্যাস হইল নীতিশিক্ষা।

শুধু যে সকল বিষয় বালক, যুবক অথবা বৃদ্ধ বুঝিতে পারে ও বুঝিয়া থাকে, কেবল তাহাই এই আত্মকথায় সন্নিবেশিত হইবে। এ কথা যদি আমি নির্লিপ্তভাবে, নিরভিমানে লিখিতে পারি, তবে তাহাতে এই পথের অন্যান্য গবেষকগণ নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মত উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবেন। আমার এই কাজ সম্বন্ধে কিছু পরিমাণ চূড়ান্ত সাফল্যের দাবী আমি করিতেছি না। আমার দাবী ততটুকু, কোনো বৈজ্ঞানিক যতদূর সম্ভব নির্ভুলভাবে, নিখুঁতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইবার পরও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে তিনি শেষ কথা বলেন না। যে ফলাফল পাওয়া গিয়াছে তাহাই যে সত্য—এ সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকিলেও, তিনি সে বিষয়ে নির্বিকার থাকেন, এবং মন খোলা রাখেন। আমার পরীক্ষাসমূহ সম্বন্ধেও আমি সেই মনোভাবই পোষণ করি। আমি গভীরভাবে আত্ম-নিরীক্ষণ ও বিচার করিয়াছি, প্রত্যেকটি ভাবকে খুঁজিয়া দেখিয়াছি, মনের প্রতিটি অবস্থাকে বিশ্লেষণ করিয়াছি। তথাপি আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিয়াছি, অথবা আমার সিদ্ধান্ত নির্ভুল, একথা আমি বলিতে পারি না। তবে এ দাবী আমি অবশ্যই করিব যে, আমার কাছে আমার পরিলক্ষিত পরিণামই সত্য, এখনকার পক্ষে অন্ততঃ তাহা হইয়াছে এবং উহাই আমার অন্তিম পরিণাম ফল। কারণ তাহা যদি না হইত, তবে আমার পক্ষে তাহার উপর

নির্ভর করিয়া কোনও কার্য করাও সম্ভবপর হইতে না। আমি যে বস্তু দেখিয়াছি তাহার প্রত্যেকটিকেই গ্রহণযোগ্য অথবা গ্রহণযোগ্য নয়—এই দুই ভাগে আমি ভাগ করিয়া লইয়াছি এবং যাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বুঝিয়াছি সেই অনুযায়ী কাজ করিয়াছি। যতদিন এই সব কাজ আমার বুদ্ধিকে এবং হৃদয়কে সন্তুষ্ট রাখিবে, ততক্ষণ আমি আমার অনুশীলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিব, তাহাই সত্য বলিয়া অবিচলিতভাবে বিশ্বাস করিব।

যদি আমাকে কেবল তত্ত্বের বা পুঁথিগত নীতির বর্ণনা করিতে হইত, তাহা হইলে অবশ্যই আমি আমার আত্মকথা লিখিবার চেষ্টা করিতাম না। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য, ঐ নীতিগুলি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস বর্ণনা করা এবং সেই জন্যই আমি এই প্রচেষ্টাকে সত্যের প্রয়োগ এই নাম দিয়াছি। ইহাতে অহিংসা ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি নিয়মের প্রয়োগও আসিবে। এগুলিকে লোকে সত্য হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে করে। কিন্তু আমার কাছে একমাত্র সত্যই সকলের উপরের জিনিস। সে সার্বভৌম এবং তাহার ভিতরেই আমি অন্য সমস্ত নীতির সমাবেশ দেখিতে পাইয়াছি। এই সত্য কেবল সত্যবাদিতা নহে। ইহা যেমন বাক্যে তেমনি চিন্তায়ও। ইহা কেবল আমাদের উপলক্ষিত আপেক্ষিক সত্য নহে, পরন্তু তাহা চিরন্তন সত্য, শাশ্বত সত্য, পরম সত্য। অর্থাৎ তাহা পরমেশ্বর।

পরমেশ্বরের অগণিত নাম। তাঁহার সংজ্ঞাও অগণিত। কারণ তাঁহার প্রকাশও অনন্তরূপে। এই পরম প্রকাশ আমাকে আশ্চর্য ও স্তম্ভিত করে, ক্ষণেকের জন্য মুগ্ধ করে। কিন্তু আমি সত্যরূপেই তাঁহাকে পূজা করি। আমি আজও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি নাই। কিন্তু তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি। সেই অন্বেষণের জন্য যে বস্তু আমার প্রিয় হইতেও প্রিয়, তাহাও আমি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। এই অন্বেষণের সাধনায়, প্রয়োজন হইলে, আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি এবং সে শক্তি আমার আছে বলিয়াও আমি বিশ্বাস করি। এই পরিপূর্ণ সত্যকে আমি যতক্ষণ না লাভ করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার অন্তরাত্মা যাহাকে আপেক্ষিক সত্য বলিয়া জানিয়াছে তাহাই আমার আশ্রয়। তাহাকেই আমার পথপ্রদর্শক প্রদীপ জানিয়া, তাহারই আশ্রয়ে আমি আমার জীবন যাপন করিতেছি।

এই পথ যদিও ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম ও কঠিন, তবুও আমার পক্ষে উহা অনুসরণ করা সহজতম বলিয়া মনে হয়। এই পথে চলিয়াছি বলিয়া,

আমার হিমালয় পরিমাণ বিরাট ভুলও আমার কাছে অনুল্লেখ্য ও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইয়াছে। কেননা এই পথের জন্যই, ভুল করিয়াও আমি দুঃখের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছি এবং আমার বুদ্ধিমত আমি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। এই পথ চলার সময়ে এই চরম সত্যের—অর্থাৎ ঈশ্বরের দর্শনও আমি অস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কেবল সত্যই আছে, উহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনও বস্তু পৃথিবীতে নাই—এই বিশ্বাস দিনের পর দিন আমার অন্তরে দৃঢ় হইতেছে। কেমন করিয়া এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে, তাহা যাঁহারা 'নবজীবন' প্রভৃতির পাঠক, তাঁহারা জানুন এবং যদি ইচ্ছা হয় তবে আমার প্রয়োগের অংশীদার হইয়া আমার সহিত উহা উপলব্ধি করুন। আমার আরও দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, যাহা আমার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, তাহা একটি বালকের পক্ষেও সম্ভব। এ কথা বলার যথেষ্ট যুক্তিও আমার আছে। সত্যের অনুসন্ধানের উপায় বা সাধন যেমন কঠিন, তেমনই সহজ। উহা কোনো উদ্ধত ও আত্মাভিমানীর নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও কোনো নিষ্পাপ বালকের পক্ষেও সম্ভব। সত্যের অনুসন্ধান যে করিতে চায়, তাহাকে ধূলিকণা অপেক্ষা নিচু ও নম্র হইতে হয়। জগৎ ধূলিকণাকে পায়ের নিচে পিষিয়া ফেলে, কিন্তু সত্যের পূজারী এমন নম্র হইবেন যে, এই নিষ্পেষিত ধূলিকণাও তাঁহাকে যেন পিষিয়া ফেলিতে পারে। তবেই তাঁহার পক্ষে সত্যের দর্শন সম্ভব। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানে ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম ও ইস্‌লামও এই কথা বলে।

যদি আমার এই লেখার মধ্যে পাঠকের কাছে আমার অহঙ্কারের সূক্ষ্মতম সুরের আভাসও ধরা পড়ে, তবে তাঁহারা অবশ্য জানিবেন যে, আমার সাধনার মধ্যে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, এবং আমার কাছে যে দৃশ্যপট চকিতের জন্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা মরীচিকার ন্যায় অবাস্তব। আমার মত শত শত লোকের ক্ষয় হোক্, তবুও সত্যের যেন জয় হয়। আমার মত ভ্রান্ত মানুষের বিচারের জন্য সত্যের মাপকাঠি যেন ছোট করা না হয়।

আমি যাহা লিখিতেছি তাহাই প্রামাণ্য, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। ইহাতে যে সকল প্রয়োগ দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তি ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে অগ্রসর হইবেন, —ইহাই আমার ইচ্ছা। আমার এই দৃষ্টান্ত, তাঁহাদের সাধনার সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করি। কেন না আমি প্রকাশযোগ্য একটা কথাও গোপন করি

নাই। আমার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সকল জ্ঞাতব্য কথাই আমি পাঠকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছি। সত্যাগ্রহের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য, আমি কেমন ভালো মানুষ তাহা বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। নিজেকে বিচার করার ক্ষেত্রে আমি সত্যের মত কঠিন ও কঠোর হইতে চেষ্টা করিয়াছি। সুরদাসের কথায় বলা যায়

"মো সম কৌন কুটিল খল কামী
জিন তনু দিয়া তাহি বিসরায়ো
ঐসী নিমকহারামী"

অর্থাৎ, যাঁহাকে আমি অন্তরাত্মা দিয়া পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত জীবনস্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, যিনি আমার জীবনের নিয়ন্তা তাঁহার নিকট হইতে আমি আজ পর্যন্তও এত দূরে আছি—এই বেদনা প্রতিমুহূর্তে শেলের ন্যায় বিদ্ধ করে। আমি জানি, এর কারণ আমার নানান বিকার ও ব্যর্থতা। তবুও সেগুলিকে দূর করিতে আমি পারিতেছি না।

কিন্তু এই ভূমিকাকে আর দীর্ঘ করিব না। প্রস্তাবনার মধ্যে আর প্রয়োগের কথা আনিব না। পরবর্তী অধ্যায়ে জীবনকথা আরম্ভ হইতেছে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

প্রথম ভাগ

১

জন্ম ও বংশ পরিচয়

গান্ধী পরিবার প্রথমে গান্ধীর ব্যবসা (গুজরাটীতে গান্ধী শব্দের অর্থ মুদী) করিত—এইরূপ জানা আছে। কিন্তু আমার পিতামহ হইতে তিনপুরুষ কয়েকটি কাথিয়াওয়াড় রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। উত্তমচন্দ গান্ধী অথবা উতা গান্ধী নীতিপরায়ণ লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। রাজ্যসংক্রান্ত নানান ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফলে তাঁহাকে পোরবন্দর ত্যাগ করিতে হয়। তিনি জুনাগড় রাজ্যে আশ্রয় লন। সেখানে নবাবকে তিনি বাম হাতে সেলাম করিতেন। এই অসৌজন্য লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ এর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—"ডান হাত ত পোরবন্দরকে দিয়া ফেলিয়াছি।"

উতা গান্ধী দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রী হইতে চার পুত্র ও দ্বিতীয়া স্ত্রী হইতে দুই পুত্র হয়। আমি বাল্যকালে জানিতে পারি নাই যে, এই ভাইয়েরা এক মায়ের পেটের সন্তান নন। ইঁহাদের মধ্যে পঞ্চম জন ছিলেন করমচাঁদ অথবা কাবা গান্ধী ও ষষ্ঠ ছিলেন তুলসীদাস গান্ধী। এই দুই ভাই-ই একজনের পর আর একজন পোরবন্দরের দেওয়ান হন। কাবা গান্ধী আমার পিতাঠাকুর। পোরবন্দরের দেওয়ানি ত্যাগ করার পর, রাজস্থানিক কোর্টে তিনি সভাসদ্ হইয়াছিলেন। আজ উহা নাই। তারপর কিছুদিন তিনি রাজকোটে এবং তাহার পর ভাঁকানারেও দেওয়ান ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি রাজকোট দরবার হইতে পেন্‌সন পাইতেছিলেন।

কাবা গান্ধী পর পর চারিটি সংসার করেন। প্রথম দুই স্ত্রী হইতে দুই কন্যা হয়। তাঁহার শেষ পত্নী পুতলী বাঈয়ের এক কন্যা ও তিন পুত্র হয়। আমি ইহাদের সকলের ছোট।

আমার পিতা স্ব-বংশ প্রিয়, সত্যানুরাগী, সাহসী ও উদার কিন্তু ক্রোধপরায়ণ মানুষ ছিলেন। ইন্দ্রিয়-ভোগ-বিষয়ে তিনি কতকটা আসক্ত ছিলেন, কারণ চল্লিশ বৎসর বয়স পার হইয়া গেলেও তিনি চতুর্থ বিবাহ করেন। কিন্তু তিনি

কখনও দুর্নীতি এবং ঘুষের ছায়াও মাড়াইতেন না। তাঁহার কাছে যে ন্যায়-বিচার পাওয়া যায় এ কথা তাঁহার পরিবারের সকলে ত জানিতই, বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রতি তাঁহার আনুগত্য সুবিদিত ছিল। একবার সহকারী পলিটিক্যাল এজেণ্ট কোনও এক সাহেব রাজকোটের ঠাকুর সাহেবকে অপমান করেন। তিনি তখনই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সাহেব তাহাতে রাগ করেন ও কাবা গান্ধীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। কিন্তু তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অস্বীকার করায় কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁহাকে হাজতে রাখা হয়। তাহাতেও তিনি দমিলেন না। অবশেষে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

ধন-সঞ্চয় করার লোভ পিতাঠাকুরের কখনও ছিল না। সেই জন্য তিনি আমাদের জন্য খুব কম ধন-সম্পত্তিই রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতার শিক্ষা যাহা কিছু, তাহা জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই হইয়াছিল। আজকাল গুজরাটে যাহাকে 'পঞ্চম পাঠ' বলে তাহার লেখাপড়া ততটুকু মাত্র ছিল। ইতিহাস ভূগোলের জ্ঞান তিনি আদৌ পান নাই। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারিক জ্ঞান এত উচ্চ শ্রেণীর ছিল যে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম প্রশ্নের সমাধান করিতে ও হাজার হাজার লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে তাঁহার মুশকিল হইত না। ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষাও না থাকার মতই ছিল, তবে মন্দিরাদিতে যাওয়া, কথকতাদি শ্রবণ দ্বারা যে ধর্মজ্ঞান অসংখ্য হিন্দু সহজেই পাইয়া থাকে তাহা তাঁহার ছিল। শেষ বয়সে আমাদের পরিবারের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন এক ব্রাহ্মণের পরামর্শে তিনি গীতাপাঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন কতকগুলি শ্লোক পূজার সময় জোরে জোরে পাঠ করিতেন।

মা যে সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন সেই স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল ও গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া আছে। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন। পূজাপাঠ না করিয়া কখনও তিনি খাদ্য স্পর্শ করিতেন না। প্রতিদিন তিনি বৈষ্ণব মন্দিরে (হাবেলী) যাইতেন। আমার জ্ঞান হওয়ার পরে, তিনি কখনও চাতুর্মাস্য ব্রত ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি খুব কঠোর ব্রতগুলিও পালন করিতে আরম্ভ করিতেন ও নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপন করিতেন। যে ব্রত লইতেন পীড়িত হইয়া পড়িলেও তাহা ত্যাগ করিতেন না। আমার একবারকার কথা মনে আছে। তিনি চান্দ্রায়ণ ব্রত লইয়াছিলেন, তারপর অসুস্থ হন, তবুও ব্রত ভঙ্গ করেন নাই। চাতুর্মাস্য ব্রতের একবেলা আহার তিনি সহজেই পালন করিতেন। তাহাতেও

সন্তুষ্ট না হইয়া একবার তিনি একদিন অন্তর একদিন ঐ ব্রতে উপবাস করিয়াছিলেন। পর পর দুই তিনটা উপবাস করা ত তাঁহার কাছে কিছুই ছিল না। একবার চাতুর্মাস্যের সময় তিনি সঙ্কল্প লইয়াছিলেন যে, সূর্যনারায়ণ দর্শন না করিয়া আহার করিবেন না। এই চার মাস আমরা (ছেলেরা) আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম যে, কখন সূর্য দেখা দিবে আর কখন মা আহার করিবেন। এ চার মাস অনেক সময়েই সূর্যের দেখা পাওয়া যে দুর্ঘট ইহা সকলেই জানেন। একদিন আমার মনে আছে যে, সূর্য দেখিয়া আমি "মা, মা, সূর্য দেখা দিয়াছে" বলিয়া উঠিলাম, আর মা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেই সূর্য মেঘের নিচে পলাইয়া গেল। "উহাতে কি হইয়াছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, আজ আমি খাই" বলিয়া তিনি ফিরিয়া গিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন।

মায়ের ব্যবহারিক জ্ঞান খুব ছিল। দরবারের সকল খবরই তিনি রাখিতেন এবং রাণীরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসাও করিতেন। আমি বালক বলিয়া মা আমাকে কখনও কখনও রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেন। ঠাকুর সাহেবের বিধবা মাতার সহিত কথোপকথনের কিছু কিছু কথা এখনও আমার স্মরণ আছে।

এই মাতাপিতার ঘরে আমি পোরবন্দর অথবা সুদামাপুরীতে ১৯২৫ সংবৎ, ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষে, ১২ই তারিখে, ইং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর তারিখে জন্মিয়াছিলাম।

বাল্যকাল পোরবন্দরেই কাটে। কোনও স্কুলে পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে নাই। কষ্ট করিয়া কতকটা নামতা শিখিয়াছিলাম। সেই সময় অন্য ছেলেদের সঙ্গে মাস্টার মহাশয়কে আমি গালি দিতে শিখিয়াছিলাম—এটুকু মনে আছে। আর কিছুই স্মরণ নাই বলিয়া অনুমান করি যে, আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল না এবং স্মরণশক্তিও ছিল কাঁচা। পাঁপরের যে ছড়া গাহিতাম তাহার মতই কাঁচা। এই ছড়ার এক লাইন তুলিয়া দিতেছি—

এক রে এক, পাঁপর সেঁক্
পাঁপর কাঁচা—আমার—।

২

বাল্যকাল

পোরবন্দর হইতে পিতাঠাকুর রাজস্থানিক কোর্টের সভ্য হইয়া যখন রাজকোটে গেলেন, তখন আমার বয়স বছর সাতেক হইবে। রাজকোটের প্রাথমিক পাঠশালায় আমাকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই পাঠশালার কথা আমার ভাল রকম মনে আছে। পোরবন্দরের মত এখানেও, কি যে পড়িয়াছিলাম সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নাই। প্রাইমারী হইতে মধ্যস্কুলে ও সেখান হইতে হাইস্কুলে গেলাম। এই পর্যন্ত পঁহুছিতে আমার বয়স বারো বৎসর হইল। সে সময় পর্যন্ত আমি কোনও শিক্ষককে বা কোনও বন্ধুকে ঠকাইয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। আমি অতিশয় লাজুক প্রকৃতির ছিলাম। কাহারও সহিত মিশিতাম না। স্কুলে গিয়া লেখাপড়া ব্যতীত অন্য কাজ ছিল না। বইপত্তর ও লেখাপড়াই আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল। ঘণ্টা বাজার সময়ে পঁহুছিতাম, আবার স্কুল ছুটি হইলেই ঘরে পালাইতাম। 'পালানো' শব্দটি ভাবিয়া চিন্তিয়াই ব্যবহার করিতেছি। কেন না কাহারও সহিত কথাবার্তা বা গল্প করিতে আমার ভাল লাগিত না। কেহ যদি আমাকে ঠাট্টা করে—এই ভয় হইত।

হাইস্কুলের প্রথম বৎসরেই পরীক্ষার সময় একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা উল্লেখ করার যোগ্য। শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জাইলস্‌ সাহেব স্কুল পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে আমাদিগকে পাঁচটি শব্দের বানান লিখিতে দিলেন। এই শব্দগুলির মধ্যে একটা শব্দ ছিল কেট্‌ল্‌ (Kettle)। তাহার বানান আমি ভুল লিখি। মাস্টার মহাশয় জুতার ডগা দিয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু আমি সে সাবধানতার ইঙ্গিত বুঝিলে ত! আমি ইহা ধরিতেই পারি নাই যে, মাস্টার আমাকে সামনের ছেলেটির শ্লেট দেখিয়া বানান শুদ্ধ করিতে বলিতেছিলেন। আমি মনে করিলাম—আমরা চুরি করিয়া না দেখি সেই জন্যই মাস্টার মহাশয় পাহারা দিতেছেন। পাঁচটা শব্দই সমস্ত ছেলে ঠিক ঠিক বানান করিল, আমি একাই কেবল বোকা বনিয়া গেলাম। আমার বোকামির কথা মাস্টার মহাশয় পরে আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। আমি অপর ছেলেদের নিকট হইতে নকল করিয়া লিখিতে কখনও শিখি নাই।

তাহা হইলেও এ ঘটনায় মাস্টারের প্রতি আমার শ্রদ্ধার ভাব নষ্ট হয় নাই। গুরুজনের দোষ না ধরার গুণ ছিল আমার ভিতর সহজ, স্বাভাবিক। এই মাস্টারের আরও অনেক দোষ পরে আমি জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা সমানই ছিল। গুরুজনের আজ্ঞা পালন করিব, এতটুকুই আমি বুঝিতাম। জানিতাম—তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই করিতে হইবে। তাঁহাদের কাজের বিচার করা চলিবে না।

এই সময়েই আরও দুইটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহা আমার সর্বদা স্মরণে আছে। সাধারণ স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাড়া আর কিছু পড়ার জন্য আমার ইচ্ছা হইত না। দৈনিক যে পড়া করিতে হইত, তাহারও কারণ মাস্টারের তিরস্কার সহ্য করিতে পারিতাম না বলিয়া। আমি মাস্টারকে ঠকাইতে প্রস্তুত ছিলাম না। সেই জন্যই পড়িতাম, কিন্তু মন তাহাতে থাকিত না। ফলে পড়াও অনেক সময় কাঁচা থাকিত। এইরূপ যেখানকার অবস্থা সেখানে আবার বেশী পড়ার প্রশ্ন কোথায়? কিন্তু পিতাঠাকুর একখানা বই কিনিয়াছিলেন তাহার উপর আমার নজর পড়িল। সেখানা "শ্রবণের পিতৃভক্তি" নামক নাটক। বইখানা পড়ার জন্য আমার ঝোঁক গেল। উহা গভীর আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। এই সময় ছবি দেখাইয়া যাহারা বেড়ায় তাহাদেরই একজন আমাদের বাটিতে আসিল লণ্ঠনছবি দেখাইবার জন্য। তাহার প্রদর্শিত ছবিতে দেখিলাম, কাঁধে ঝোলনার ভিতর করিয়া পিতামাতাকে লইয়া শ্রবণ তীর্থস্থানে চলিয়াছে। এই উভয় বস্তুর ছাপ আমার মনের উপর দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল। শ্রবণের মত হওয়ার জন্য আমার ইচ্ছা হইল। শ্রবণের মৃত্যুসময়ে তাহার পিতামাতার বিলাপ আজিও আমার স্মরণ আছে। সেই ললিত ছন্দ আমার নিজের বাজাইয়া বাজাইয়া শুনিতে ও বাজনা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হওয়ায়, বাবা বাজনা কিনিয়া দিয়াছিলেন।

সেই সময়ে একটা নাটক কোম্পানীও আসে। সেখানে গিয়া নাটক দেখার অনুমতি পাইলাম। নাটকের বিষয় ছিল হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান। এই নাটক দেখিয়া আমার আশা মিটিত না। পুনঃপুনঃ ঐ নাটক দেখার ইচ্ছা হইত। কিন্তু বারম্বার দেখিতে যাইতে দেয় কে? মনে মনে আমি এই নাটক শতবার অভিনয় করিয়াছি। হরিশ্চন্দ্রকে স্বপ্ন দেখিতাম। "হরিশ্চন্দ্রের মত সত্যবাদী সকলে কেন হয় না?" এই প্রশ্নের ধ্বনি মনের ভিতর চলিতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বিপদে পড়িয়া তাঁহারই ন্যায় সত্যপালন করিব—

ইহাই আমার নিকট সত্য হইয়া উঠিল। নাটকে যেরূপ লেখা হইয়াছিল সে সমস্ত বিপদই হরিশ্চন্দ্রের হইয়াছিল, ইহা আমি সত্য বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিলাম। হরিশ্চন্দ্রের দুঃখ দেখিয়া, উহা স্মরণ করিয়া আমি খুব কাঁদিতাম। আজ আমার বুদ্ধি বলিতেছে যে, হরিশ্চন্দ্র কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। তাহা হইলেও আমার মনে শ্রবণ ও হরিশ্চন্দ্র আজও জীবিত আছেন। আজও যদি ঐ নাটক পড়ি, তবে চোখে জল আসিবে বলিয়াই মনে হয়।

৩

বাল্যবিবাহ

এই অধ্যায়টি না লিখিতে হইলে বাঁচিয়া যাইতাম। কিন্তু আত্মকথা লিখিতে বসিয়া আমাকে এইরূপ কত তিক্ত স্বাদই না লইতে হইবে! যদি নিজেকে আমি সত্যের পূজারী বলিয়া দাবী করি, তবে এসব ঘটনা এড়াইবার কোন উপায় নাই।

বেদনার সঙ্গে জানাই, মাত্র তেরো বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল—আজ আমার সামনে যে সকল বারো-তেরো বছরের ছেলে রহিয়াছে তাহাদিগকে যখন দেখি ও আমার বিবাহের কথা স্মরণ করি, তখন নিজের উপর দয়া হয় এবং এই ছেলেরা আমার অবস্থায় পড়ে নাই বলিয়া উহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতে ইচ্ছা হয়। এইরূপ অল্প বয়সে বিবাহ করার সমর্থনে একটা নৈতিক যুক্তিও ত আমি খুঁজিয়া পাই না।

পাঠকেরা যেন ভুল না করেন। আমার বিবাহ হইয়াছিল, বাগদান নহে। কাথিয়াওয়াড়ে বিবাহ মানে বিবাহ, বাক্‌দান নয়। এদেশে দুই বালক-বালিকাকে পরিণয়বদ্ধ করার জন্য পিতামাতার মধ্যে যে প্রতিশ্রুতির বিনিময় হয় তাহাকেই 'সগাই' বলে। 'সগাই' ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়; 'সগাই' হওয়ার পর যদি বর মারা যায় তবে কন্যা বিধবা হয় না। 'সগাই'তে বর-কন্যার কোনও সম্বন্ধ হয় না। দুইজনে জানেও না। আমার একে একে তিনবার সগাই হইয়াছিল, যদিও কখন হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না। তবে একে একে দুই কন্যা মরিয়া গিয়াছিল, এ কথা আমি শুনিয়াছিলাম। আর আমি জানিতাম যে, আমার তিন 'সগাই' হইয়াছে। তৃতীয় 'সগাই' প্রায় সাত

বৎসর বয়সে হইয়াছিল—এই রকম কিছুটা স্মরণ আছে। তবে যখন সগাই হইয়াছিল তখন আমাকে কিছু বলা হইয়াছিল কিনা, সেকথা আমার মনে নাই। কিন্তু বিবাহে বর-কন্যার আবশ্যক হয় ; তাহাতে বিবাহ-কর্ম যথারীতি সম্পাদন করিতে হয়। আমি এই প্রকার বিবাহের কথাই বলিতেছি। বিবাহের কথা আমার সমস্ত মনে আছে।

আমরা তিন ভাই ছিলাম, ইহা পাঠকেরা জানেন। আমাদের মধ্যে সব চেয়ে যিনি বড় তাঁহার তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। মধ্যম ভাই আমার অপেক্ষা দুই-তিন বৎসরের বড়। তাঁহার এবং আমার কাকার এক ছোট ছেলে, তাহার বয়স আমার অপেক্ষা এক-আধ বৎসর বেশী হইতে পারে, এবং আমার—এই তিনজনের বিবাহ একসঙ্গে দেওয়ার জন্য কর্তারা স্থির করিলেন। ইহাতে আমাদের ভাল-মন্দ সম্পর্কে কোনও কথাই নাই, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ত ওঠেই না। এসব ক্ষেত্রে গুরুজনের সুবিধা ও খরচের কথাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

হিন্দুসংসারে বিবাহ যেমন তেমন ঘটনা নয়। বর-কন্যার মা-বাবা অনেক সময় বিবাহের জন্য উৎসন্নে যায়, অর্থ নষ্ট করে, সময় নষ্ট করে। কয় মাস পূর্ব হইতেই যোগাড়যন্ত্র চলিতে থাকে, কাপড়জামা তৈরী করা হয়, গহনা গড়ানো হয়, নিমন্ত্রণ খাওয়ানোর ফর্দ তৈরী হয়, কে কত ভাল, বেশি পদ খাওয়াইতে পারে, তাহা লইয়া প্রতিযোগিতা হয়। গানের গলা থাকুক আর নাই থাকুক, স্ত্রীলোকেরা গান করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলে, কখনও কখনও অসুখে পড়ে, প্রতিবেশীর শান্তি নষ্ট করে। প্রতিবেশীরাও, নিজেদের বেলাতেও ঐ রকম করিতে হইবে বলিয়া, এই হাঙ্গামা, হট্টগোল ও উৎসবশেষের ময়লা-আবর্জনা—সমস্তই নীরবে সহ্য করেন।

অভিভাবকেরা মনে করিলেন—এই হাঙ্গামা তিনবার পোহাইবার পরিবর্তে একবারেই সারিয়া ফেলা ভাল। তাহাতে একদিকে খরচ যেমন কম হয়, অন্য-দিকে বিবাহের আড়ম্বর আবার তেমনি বেশী হয়। তাহা ছাড়া তিনবারের ব্যয় একবারে সারিতে পারিলে টাকাও বেশী খরচ করা যায়। পিতাঠাকুর ও খুড়ামহাশয় বুড়া হইয়াছিলেন। আমরাই তাঁহাদের শেষ সন্তান। আমাদের বিবাহ দিয়া শেষবারের মত ঘটা করার একটা ইচ্ছাও হয়ত তাঁহাদের ছিল। এই সব কারণে তিন বিবাহ একসঙ্গেই দেওয়া ঠিক হইয়াছিল, আর সেইজন্য কয়েক মাস পূর্ব হইতেই জিনিসপত্র তৈরী করা ও তাহার

সাজ-সজ্জা, প্রস্তুতি চলিতেছিল।

এই প্রস্তুত হওয়ার ব্যাপার হইতেই আমরা ভাইয়েরা বিবাহের কথা জানিতে পারি। এই সময় ভাল কাপড় পরা, বাজনা বাজানো, শোনা, শোভাযাত্রা দেখা, পাঁচরকম ভাল খাদ্য খাওয়া, আর এক অচেনা বালিকার সহিত খেলা করার ইচ্ছা ছাড়া, আমার মনের ভিতর অন্য কোনও ইচ্ছা ছিল বলিয়া স্মরণ হয় না। শারীরিক ভোগের প্রবৃত্তি ত পরে আসিয়াছিল। তাহা কেমন করিয়া আসিল তাহাও বর্ণনা করিতে পারি, কিন্তু সে কথা পাঠকেরাই জিজ্ঞাসা করিবেন না। তাই আমার সে লজ্জার কাহিনী পরদা ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিতেছি। জানাইবার যাহা আছে তাহা অবশ্য পরে আসিতেছে। কিন্তু আমি যে লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই আত্মকথা লিখিতেছি, তাহার সহিত সে বিষয়ের সম্পর্ক খুব অল্পই আছে।

আমাদের দুই ভাই রাজকোট হইতে পোরবন্দরে গেলাম। সেখানে গায়ে-হলুদ ইত্যাদি যে সকল অনুষ্ঠান হইল তাহা আমোদজনক হইলেও লেখার যোগ্য নয়।

পিতাঠাকুর দেওয়ান হইলেও ভৃত্য, আবার রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া আরও পরাধীন। ঠাকুর সাহেব শেষ মুহূর্তের পূর্বে তাঁহাকে ছুটি দিলেন না। অবশেষে যখন ছুটি দিলেন তখন আবার বিশেষ যানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই দ্রুত যাওয়ার ব্যবস্থা দ্বারা দুই দিনের পথ কমিয়া গেল। রাজকোট হইতে পোর-বন্দর একশ কুড়ি মাইল। গরুর গাড়ীতে পাঁচ দিন লাগে। পিতাঠাকুর তিন দিনে আসিলেন। কিন্তু পথে একটি দৈবদুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। শেষ ঘাটে টোঙ্গা উল্টাইয়া যায়। পিতাঠাকুর খুব আহত হইয়াছিলেন। তাঁহার হাতে বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। ইহাতে বিবাহের অর্ধেক আনন্দ তাঁহার এবং আমাদের নষ্ট হইয়া গেল। বিবাহ অবশ্য হইলই। যাহা লেখা আছে তাহা কে ফেরাইতে পারে ? আমি বিবাহের বাল-সুলভ আনন্দে পিতৃদেবের দুঃখের কথা ভুলিয়া গেলাম।

আমি পিতামাতার ভক্ত ছিলাম, কিন্তু বিষয়-ভক্তই কি কম ছিলাম ? এই বিষয় অর্থে একমাত্র ইন্দ্রিয়-ভোগের কথাই বলিতেছি না। সব রকম ভোগের কথাই বলিতেছি। মাতা-পিতার ভক্তির কাছে নিজের সমস্ত সুখ ত্যাগ করিতে হয়, সে জ্ঞান পরে হইয়াছিল। ভোগেচ্ছার জন্য আমাকে যে শাস্তি পাইতে হইয়াছিল তাহার মূল কোথায় ? কে জানিত যে, সেজন্য আমার জীবনে এত

বড় একটা দুঃখদায়ক ঘটনা ঘটিবে—যাহার স্মৃতি আজও হৃদয়ে শূলের মত বিঁধে। যখনই নিষ্কুলানন্দের এই বাণী

"ত্যাগ ন টকেরে বৈরাগ বিনা, করিয়ে কোটি উপায় জী"

গান করি অথবা শুনি, তখনই এই দুঃখদায়ক ও তিক্তপ্রসঙ্গ মনে হয় এবং নিজেই লজ্জা পাই।

আহত হওয়া সত্ত্বেও বাবা জোর করিয়াই বিবাহের উৎসবে যোগ দিলেন। তিনি এই সময় কোথায় বসিয়া কখন কি করিয়াছিলেন তাহা ঠিক ঠিক আজও মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত। বাল্যবিবাহের বিচার করিতে গিয়া আজ পিতার কার্যের যে সমালোচনা করিতেছি, তখন কি তাহা এতটুকুও মনে হইত? তখন ত সমস্তই সঙ্গত বলিয়া মনে হইত ও ভাল লাগিত। বিবাহের শখ ছিল এবং পিতৃদেব যাহা করিতেছেন তাহা সবই ঠিক হইতেছে বলিয়া মনে হইত এবং সেই জন্যই সে সময়কার স্মৃতি এত উজ্জ্বল রহিয়াছে।

বিবাহমঞ্চে বসিলাম, সপ্তপদী হইল, মিষ্টান্নের অংশ স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে গ্রহণ করিলাম, তার পর বর-বধূ একসঙ্গেই থাকিতে লাগিলাম। সেই প্রথম রাত্রি! হঠাৎ দু'টি নির্দোষ বালক-বালিকা কিছু না জানিয়া সংসারের অন্তহীন সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। বৌদি শিখাইয়া দিয়াছিলেন, প্রথম রাত্রে কেমন আচরণ করিতে হইবে। আমার স্ত্রীকে কে শিখাইয়া দিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। আজ আর কি জিজ্ঞাসা করিব? পাঠকগণকে নিশ্চিতভাবে কেবল এইমাত্রই বলিতে পারি যে, আমরা উভয়েই একে অপরকে কিছুটা ভয় করিতেছি —এই ধরনের একটা মনোভাবই তখন আমাদের ভিতর ছিল। একে অন্যকে লজ্জা করিতাম ত বটেই। কিভাবে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিব, এবং কি বলিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। সে কথা কেহ শিখাইয়া দিলেও কাজে আসিতেছিল না। কিন্তু সত্যই এ ব্যাপারে শিখাইবার কিছু নাই। যেখানে সংস্কার বলবান সেখানে শিখাইয়া দেওয়া একেবারেই অর্থহীন হইয়া পড়ে। ধীরে ধীরে একে অন্যের পরিচয় লইতে লাগিলাম, কথা বলিতে লাগিলাম। সংকোচের বাধা দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। আমরা উভয়েই এক বয়সের ছিলাম। তথাপি স্বামীর প্রভুত্ব আরম্ভ করিতে আমার বিলম্ব হইল না।

৪

স্বামিত্ব

যখন বিবাহ হইয়াছিল সেই সময়ে উপদেশমূলক ছোট ছোট বহি বাহির হইত। উহার মূল্য এক পয়সা বা এক পাই—কি ছিল মনে নাই। উহাতে দাম্পত্য-প্রেম, মিতব্যয়িতা, বাল্যবিবাহ, এই সব বিষয়ের আলোচনা থাকিত। এই ধরনের কোনও বই আমার হাতে আসিলেই আমি আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিতাম। আমার অভ্যাস ছিল, যে অংশ বা বিষয় ভাল লাগিত না তাহা ভুলিয়া যাইতাম, আর যাহা ভাল লাগিত তাহা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতাম। একপত্নী-ব্রত পালন করা, পত্নীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা যে পতির ধর্ম একথা হৃদয়ে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিল। সত্যের প্রতি আমার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। সেই জন্যেই পত্নীকে প্রতারিত করার কথা মনেও উঠিত না। তাহা ছাড়া সেই অল্প বয়সে একপত্নী-ব্রত ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনাও অল্প ছিল।

এই সৎ বিচারের পরিণাম একদিক দিয়া আবার খারাপ হইল। যদি আমার একপত্নী-ব্রত পালন করিতে হয়, তবে পত্নীরও ত একপতি-ব্রত পালন করা উচিত। এই ভাবনা হইতে আমি প্রেম-সংশয়ী বা ঈর্ষাকাতর স্বামী হইয়া পড়িলাম। 'পালন করা চাই' এই বিচার হইতে 'পালন করানো চাই' এই বিচার আসিয়া পড়িল। আর যদি 'পালন করানো চাই' এই বিচার আসিয়া পড়িল, তবে আমার পাহারাও দিতে হয়। পত্নীর পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ার কোনও কারণই ছিল না। কিন্তু সংশয়ও ত কারণ খোঁজে না। স্ত্রীর চলা-ফেরার দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার, তাই আমার অনুমতি ছাড়া তাহার কোথাও যাওয়াও চলিতে পারে না। তাহাকে চোখে চোখে রাখাও দরকার। এই ঘটনা আমাদের মধ্যে এক দুঃখদায়ক কলহের কারণ হইয়া পড়িল। অনুমতি ভিন্ন কোথাও যাইতে না পারা মানে—এক রকম কয়েদী হইয়া থাকা। কিন্তু কস্তুর-বাঈ এই প্রকার কয়েদ সহ্য করার পাত্রী ছিলেন না। যখন ইচ্ছা হইত, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই যেখানে খুশী যাইতেন। যেমন আমি চাপ দিতে লাগিলাম, তিনিও তেমনি অবরোধ ভাঙ্গিতে লাগিলেন এবং আমিও বেশী করিয়া রাগ করিতে লাগিলাম। এইরূপে আমাদের এই দুই বালক-বালিকার মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হওয়া একটা সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইল। কস্তুরবাঈ যে আমার বিনা অনুমতিতেই বাহিরে চলা-ফেরা করিতেন, তাহা আমি একান্ত

নির্দোষ বলিয়াই মনে করি। যে বালিকার মনে পাপ নাই সে দেবমন্দিরে যাইতে বা কাহারও সহিত দেখা করিতে যাইতে অকারণ শাসনের চাপ কেন সহ্য করিবে? আমি যদি তাঁহার উপর শাসন চালাইতে পারি, তবে তিনি বা আমার উপর শাসন চালাইতে কেন পারিবেন না? এ কথা এখন বুঝিতেছি, কিন্তু তখন ত আমি আমার স্বামীর প্রভুত্ববোধ লইয়াই ব্যস্ত ছিলাম।

পাঠকগণ ইহা হইতে যেন মনে না করেন যে, আমাদের এই সংসার-ধর্মের মধ্যে কোনও সুখের সুর ছিল না। আমার এই পীড়নমূলক আচরণের মূলেও ছিল প্রেম। স্ত্রীকে আমার আদর্শ পত্নী করিতে হইবে। আমি চাহিতাম— তিনি পবিত্র জীবন যাপন করিবেন, আমি যাহা শিখাইব তাহাই শিখিবেন, যাহা পড়াইব তাহাই পড়িবেন। এমনি করিয়া আমরা, একে অন্যের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যাইব।

কস্তুরবাঈয়েরও মনে এ ধরনের ইচ্ছা হইত কিনা তাহা আমি জানি না। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। স্বভাবতঃই তিনি সরল, স্বাধীনচিত্ত ও দৃঢ়সংকল্পের রমণী ছিলেন এবং কম কথা—অন্ততঃ আমার সহিত কম কথা বলিতেন। নিজের অজ্ঞতার জন্য তাঁহার মনে কোনোও অসন্তোষ ছিল না। আমি লেখাপড়া শিখিতেছি অতএব তিনি শিখিবেন, এই রকমের ইচ্ছা, বাল্যকালে আমি কখনো তাঁহার ভিতর লক্ষ্য করি নাই। ইহা হইতে মনে হয়, আমার আকাঙ্ক্ষা একতরফা ছিল। আমার ভোগ-বাসনা এক স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত ছিল। আমিও অনুরূপ প্রতিদান প্রত্যাশা করিতাম। যেখানে প্রেম একদিক হইতেও থাকে, সেখানে সর্বাংশে দুঃখ হইতেই পারে না।

এ কথা আমি স্বীকার করিতেছি, আমি স্ত্রীর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিলাম। স্কুলে গিয়াও তাঁহার কথাই মনে হইত, কখন রাত্রি হইবে, কখন তাঁহার সহিত দেখা হইবে—এই ছিল আমার ভাবনা। বিচ্ছেদ অসহ্য বোধ হইত। আমি নানা বাজে কথা বলিয়া কস্তুরবাঈকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগাইয়া রাখিতাম। আমার মনে হয়, যদি এই তীব্র আসক্তির সহিত আমার ভিতর কর্তব্যপরায়ণতা না থাকিত তবে হয়ত রুগ্ন হইয়া মারা যাইতাম, নয়ত অকর্মণ্য হইয়া জগতে বৃথা জীবন যাপন করিতাম। সকাল হইলে নিত্যকর্ম করিতেই হইবে, তারপর আবার কাহাকেও মিথ্যা বলিব না, ফাঁকি দিব না, আমার এই ভাব হইতেই আমি অনেক সঙ্কটে বাঁচিয়া গিয়াছি।

পূর্বেই জানাইয়াছি যে, কস্তুরবাঈ লেখাপড়া জানিতেন না। তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য আমার বড় ইচ্ছা হইত। কিন্তু ভোগ-বাসনায় লিপ্ত যাহার মন, সে শিখাইবে কেমন করিয়া? সময় কোথায়? একে ত জোর করিয়া পড়াইতে হইবে, তাহার উপর আবার পড়াইতে হইবে রাত্রিতে। গুরুজনের সম্মুখে স্ত্রীকে পড়ানো দূরে থাকুক, কথাই বলা যায় না। কাথিয়াওয়াড়ে পর্দাপ্রথা ছিল। এবং এই অনাবশ্যক ও বাজে প্রথা এখনো অনেকটা আছে। এই জন্য তাঁহাকে পড়ানোর ব্যবস্থা আমার পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাই যৌবনে তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে যত চেষ্টা করিয়াছি সে সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছে। তারপর ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আসিয়া দেখা দিল জনসাধারণের সেবার কাজ। তখন এজন্য সময় দিতে পারি, সে অবস্থা আর আমার ছিল না। শিক্ষকের সাহায্যে তাঁহাকে পড়াইবার চেষ্টাও নিষ্ফল হইয়াছে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, আজ কস্তুরবাঈ সাধারণ চিঠি-পত্র কষ্টে লিখিতে পারেন ও সহজ গুজরাটী বুঝিতে পারেন। যদি আমার প্রেম কাম দ্বারা দূষিত না হইত, তবে আমার বিশ্বাস তিনি আজ বিদুষী স্ত্রী হইতেন। পড়ার সম্বন্ধে তাঁহার আলস্যকেও আমি জয় করিতে পারিতাম। বিশুদ্ধ প্রেমের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, তাহা আমি জানিয়াছি।

নিজের স্ত্রীর প্রতি বাসনাসক্ত হইয়াও আমি কেমন করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছি তাহার একটা কারণ পূর্বে বলিয়াছি। আরও একটা উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। শত অভিজ্ঞতা হইতে আমি এ কথা বলিতে পারি যে, যেখানে অভিপ্রায় শুদ্ধ, উদ্দেশ্য মহৎ, সেখানে ঈশ্বর রক্ষা করেন। হিন্দু-সমাজে বাল্যবিবাহ এক সর্বনাশা প্রথা। এই প্রকার অপকার হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত থাকা যায় এমন ব্যবস্থাও অবশ্য আছে। অল্পবয়স্ক বর-বধূকে বাপ-মা সব সময় একত্র থাকিতে দেন না। বালিকা স্ত্রীদিগের অর্ধেকের অধিক সময় বাপের বাড়ীতে কাটে। আমার বেলাও তাহাই হইয়াছিল। এই জন্য ১৩ হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত, মাঝে মাঝে যে সময়টা আমরা একসঙ্গে থাকিতাম, তাহা যোগ করিলে তিন বৎসরের বেশী হইবে না। ছয়-সাত মাস একত্র থাকার পরেই পত্নীর বাপ-মার নিকট যাওয়ার ডাক আসিত। তখন উহা বড়ই খারাপ লাগিত; কিন্তু তাহাতেই আমরা দুই জনে বাঁচিয়া গিয়াছি। ১৮ বৎসরে ত বিলাতেই যাই। তখন এক সুন্দর ও দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবকাশ আসে। বিলাত হইতে

আসিয়া মাস ছয়েক একত্র ছিলাম। আমাকে এই সময় রাজকোট ও বোম্বাইয়ে যাতায়াত করিতে হইত। এই সময়েই দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ডাক আসিল। ইতিমধ্যেই আমি ইন্দ্রিয়াসক্তি হইতে নিজেকে অনেকটা মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছি।

৫
হাইস্কুল

যখন বিবাহ হইল তখন যে আমি হাইস্কুলে পড়িতেছিলাম তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। সেই সময় আমরা তিন ভাই একই স্কুলে পড়িতাম। বড় ভাই অনেক উপরে পড়িতেন, আর আমার যে ভাইয়ের বিবাহের সময় আমারও বিবাহ হয়, তিনি এক ক্লাস উপরে পড়িতেন। বিবাহের ফল এই হইল যে, আমাদের দুই ভাইয়েরই এক বৎসর নষ্ট হইল। আমার ভাইয়ের পক্ষে ফল আরও খারাপ হইয়াছিল। কেননা বিবাহ হওয়ার পর তিনি আর স্কুলে যাইতে পারিলেন না। ঈশ্বর জানেন, এই রকম পরিণাম কত যুবকের হইয়া থাকে। পড়াশুনা ও বিবাহ—শুধু হিন্দু পরিবারেই এই দুইটা জিনিস একসঙ্গেই চলিয়া থাকে।

আমার পড়াশুনা চলিতে লাগিল। হাইস্কুলে আমি অবশ্য নিরেট ছাত্র বলিয়া গণ্য হই নাই। শিক্ষকদিগের ভালবাসা সব সময়েই পাইয়াছি। প্রতি বৎসরেই অভিভাবকের নিকট বিদ্যার্থীর পড়া ও চরিত্র বিষয়ে সার্টিফিকেট আসিত। উহাতে আমার পাঠাভ্যাস বা চরিত্র মন্দ বলিয়া মন্তব্য কোনও দিন আসে নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পুরস্কারও পাইয়াছিলাম। চতুর্থ শ্রেণীতে ৪.০০ টাকার, পঞ্চম শ্রেণীতে ১০.০০ টাকার বৃত্তিও পাইয়াছিলাম। এই বৃত্তি পাওয়ার পিছনে আমার কৃতিত্ব অপেক্ষা ভাগ্যের হাতই বেশী ছিল। এই বৃত্তি সকল বিদ্যার্থীর জন্য ছিল না। যাহারা "সোরট" অঞ্চল হইতে পড়িতে আসে কেবল তাহাদেরই জন্য নির্দিষ্ট ছিল। চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের ক্লাসে সোরটের আর কয়জন ছেলে থাকিতে পারে?

আমার স্মরণ আছে, ভাল ছাত্ররূপে আমার কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোনও অভিমান আমার ছিল না। পুরস্কার বা বৃত্তি পাইলে আমি আশ্চর্য হইতাম। কিন্তু আমার ব্যবহার ও আচরণ সম্পর্কে আমি বিশেষ সচেতন ও সতর্ক ছিলাম।

আচরণে দোষ-ত্রুটি ঘটিলে আমার চোখে জল আসিত। শিক্ষক মহাশয় তিরস্কার করিতে পারেন এমন কোনও কাজ করিলে, অথবা সেইরূপ কোনও কাজ আমি করিয়াছি বলিয়া শিক্ষক মহাশয় মনে করিলে আমার দুঃখের সীমা থাকিত না। মনে আছে, একবার মার খাইতে হইয়াছিল। মার খাওয়ার জন্য দুঃখ হয় নাই, কিন্তু আমি যে মার খাওয়ার যোগ্য দোষী বলিয়া গণ্য হইয়াছি, তাহাতেই গভীর দুঃখ পাইয়াছিলাম। দ্বিতীয় ঘটনা হয় যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। তখন দোরাবাজী এতুলজী গীমী হেড-মাস্টার ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। তিনি নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন ও শৃঙ্খলাপরায়ণ ছাত্রদের কাছ হইতে কাজ আদায় করিতেন, পড়াইতেনও ভাল। উপরের ক্লাসের ছাত্রদিগের ব্যায়াম করা তিনি বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যায়াম করা আমার ভাল লাগিত না। নিয়ম হওয়ার পূর্বে আমি কখনও ব্যায়াম করি নাই, বা ফুটবল কি ক্রিকেট খেলি নাই। আমার লাজুক স্বভাবও না খেলিতে যাওয়ার একটি কারণ ছিল। ব্যায়ামের সহিত শিক্ষার কোনও সম্বন্ধ নাই, আমার তখন এই প্রকার ভুল বিশ্বাস ছিল। এখন বুঝিতেছি, বিদ্যাভ্যাসের মধ্যে শারীরিক শিক্ষাকে মানসিক শিক্ষার মতই স্থান দেওয়া উচিত।

তাহা হইলেও ব্যায়াম না করায় আমার যে ক্ষতি হয় নাই—এ কথাও আমি জানাইতে ইচ্ছা করি। একখানি বইতে আমি খোলা হাওয়ায় বেড়ানোর উপকারিতার কথা পড়িয়াছিলাম। কথাটা আমার ভাল লাগে এবং তারপর হাইস্কুলের উপর শ্রেণী হইতেই আমি বেড়াইতে যাওয়ার অভ্যাস করি। ঐ অভ্যাস এখনো আছে। বেড়ানো ব্যায়ামই বটে, আর সেই জন্যই আমার শরীর সুগঠিত ও মজবুত হইতে পারিয়াছিল।

পিতার সেবা করার গভীর ইচ্ছাও ব্যায়ামকে অপছন্দ করার আমার অন্যতম কারণ। স্কুল বন্ধ হইলেই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া পিতার সেবায় লাগিয়া যাইতাম। যখন সকলের উপরেই ব্যায়াম করার আদেশ হইল, তখন এই সেবায় বিঘ্ন পড়িল। পিতাঠাকুরের সেবার জন্য ব্যায়ামের ক্লাসে হাজিরা দেওয়া মাফ্ চাই বলিয়া অনুনয় করিয়াছিলাম। কিন্তু গীমী সাহেব কি আর মাফ্ করেন? এক শনিবারে প্রাতঃকালে স্কুল বসিয়াছিল। বিকালে চারটায় ব্যায়াম করিতে যাওয়ার কথা। আকাশ মেঘলা ছিল বলিয়া বেলা টের পাওয়া যায় নাই। এই মেঘলা আকাশ আমাকে ঠকাইল। যখন ব্যায়ামস্থানে পঁহুছিলাম তখন সকলে ফিরিতেছে। পরের দিন গীমী সাহেব হাজিরা

পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিলাম, কিন্তু তিনি তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। আমার স্মরণ নাই ঠিক কত, কিন্তু তিনি আমাকে এক আনা কি দুই আনা জরিমানা করিয়াছিলেন। এ জরিমানার অর্থ—আমাকে মিথ্যুক মনে করা। আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। 'আমি মিথ্যা কথা বলি না'—ইহা কেমন করিয়া প্রমাণ করিব ? কোনও উপায় ছিল না। মনের যন্ত্রণা মনেই রহিয়া গেল। বুঝিলাম যে, সত্য যে বলিতে চায়, সত্য যে পালন করিতে চায়, তাহার অসাবধান হওয়াও চলে না। আমার পাঠাভ্যাসের সময় অসাবধানতা এই প্রথম ও এই শেষ। আমার অস্পষ্ট স্মরণ আছে যে, শেষে এই দণ্ড মাফ্ করাইতে আমি সক্ষম হইয়াছিলাম।

ব্যায়াম করা হইতে অবশ্য মুক্তি পাইয়াছিলাম। স্কুলের পর আমাকে যেন বাড়ী আসিতে দেওয়া হয়—পিতার এইরূপ পত্র হেড-মাস্টারকে দেওয়ায় তিনি আমাকে ব্যায়াম হইতে অব্যাহতি দেন।

ব্যায়ামের পরিবর্তে বেড়াইতাম বলিয়া, ব্যায়াম না করার ভুলের দণ্ড আমাকে কখনো ভুগিতে হয় নাই। কিন্তু আর একটা ভুলের সাজা আমি এখনো পাইতেছি। কোথা হইতে আমার মধ্যে এই মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল জানি না, যে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের লেখা ভাল হওয়ার আবশ্যক নাই। এই মনোভাব বিলাত যাওয়া পর্যন্ত আমার মধ্যে ছিল। পরে বিশেষ ভাবে যখন দক্ষিণ আফ্রিকার উকীলদের এবং ঐ স্থানেই জন্মিয়াছে ও শিক্ষালাভ করিয়াছে—এইরূপ যুবকদের মুক্তার মত হস্তাক্ষর আমার চোখে পড়িল, তখন এই অবহেলার জন্য আমার লজ্জা ও অনুতাপ হইতে থাকে। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, খারাপ হস্তাক্ষর অসম্পূর্ণ শিক্ষার চিহ্ন বলিয়া গণ্য করা উচিত। আমি তারপর হস্তাক্ষর ভাল করার চেষ্টাও করিয়াছিলাম। কিন্তু তখন দেরি হইয়া গিয়াছে। যৌবনে যাহা অগ্রাহ্য করিয়াছি, এখনো তাহা আর দুরস্ত করিতে পারি নাই। প্রত্যেক যুবক ও যুবতী আমার এই উদাহরণ হইতে এ কথা জানিয়া রাখিবেন যে, ভাল হস্তাক্ষর বিদ্যাশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। ভাল হাতের লেখা শিখিতে হইলে ভাল অক্ষর গঠন করার কৌশল শিক্ষা করা চাই। আমি ত এই সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছি যে, অক্ষর শেখার আগে আঁকা শেখা দরকার। যেমন পাখী বা অন্য বস্তু দেখিয়া বালক-বালিকারা তাহা স্মরণে রাখে ও তাহা আঁকিতে শেখে, তেমনি প্রথমে অক্ষর পরিচয় করিয়া তাহার পর শিশুদের ছবি

আঁকার ন্যায় আঁকিতে শিক্ষা করা সঙ্গত। তাহা হইলে হাতের লেখা ছাপার লেখার মত হইতে পারে।

এই সময়কার ছাত্রজীবনের দুইটি স্মৃতি উল্লেখযোগ্য। বিবাহের জন্য যে এক বৎসর নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহা সারিয়া লওয়ার ব্যবস্থা মাস্টার মহাশয় করিলেন। পরিশ্রমী ছাত্রদিগকে তখন এইপ্রকার সুযোগ দেওয়া হইত। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ছয় মাস মাত্র পড়িয়া, গ্রীষ্মাবকাশের পরের পরীক্ষা শেষ হইলে, চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিবার আদেশ পাইলাম। এই ক্লাস হইতে কোনো কোনো বিষয় ইংরাজীতে পড়ানো আরম্ভ হয়। আমি এই পড়ানোর কিছুই বুঝিতাম না। জ্যামিতি চতুর্থ শ্রেণীতে আরম্ভ হয়। আমি তাহাতেও পিছনে পড়িয়া থাকিতাম, বিশেষতঃ ইংরাজীতে পড়ানো হয় বলিয়া মোটেই বুঝিতাম না। জ্যামিতির মাস্টার মহাশয় ভাল পড়াইতেন। কিন্তু আমার মাথায় ঢুকিত না। অনেক সময় নিরাশ হইতাম। কখনো কখনো এমনও মনে হইত যে, দুই ক্লাস এক বৎসরে শেষ না করিয়া পুনরায় তৃতীয় শ্রেণীতেই ফিরিয়া যাই। কিন্তু ইহাতে আমার যেমন লজ্জার কথা, তেমনি যে শিক্ষক, আমি শ্রম করিব—এই বিশ্বাসে প্রমোশন দিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাঁহাকেও লজ্জায় ফেলা হয়। এই ভয়ে নীচের ক্লাসে নামার কথা ছাড়িয়া দিলাম। চেষ্টা করিতে করিতে যখন ইউক্লিডের ত্রয়োদশ প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত আসিলাম তখন হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, জ্যামিতি সর্বাপেক্ষা সহজ বিষয়। যেখানে কেবল বুদ্ধিরই সহজ ও সরল প্রয়োগ, সেখানে আবার মুশকিল কোথায়? তারপর হইতে জ্যামিতি আমার নিকট সহজ ও সরল বিষয় হইয়া পড়িল।

জ্যামিতি অপেক্ষাও বেশী মুশকিল হইয়াছিল সংস্কৃতে। জ্যামিতিতে মুখস্থ করার কিছু ছিল না, কিন্তু সংস্কৃত তখন আমার কাছে মুখস্থ করারই বিষয় হইয়াছিল। সংস্কৃতও চতুর্থ শ্রেণীতেই পড়ানো আরম্ভ করা হয়। ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমি উঠিলাম। সংস্কৃত শিক্ষক বড় শক্ত ছিলেন। ছাত্রদিগকে খুব শিখাইবেন—এই ছিল তাঁহার লোভ। সংস্কৃত ও ফারসী ক্লাসে এক রকম প্রতিযোগিতা ছিল। ছাত্রেরা ভিতরে ভিতরে বলাবলি করিত যে, ফারসী বড় সহজ ও ফারসী শিক্ষক বড় ভাল। ছাত্রেরা যতটুকু করে তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। সহজ শুনিয়া আমিও লোভে পড়িলাম ও একদিন ফারসী ক্লাসেও গিয়া বসিলাম। সংস্কৃতের শিক্ষক ইহাতে ভারী ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া কহিলেন—"তুমি কাহাদের ছেলে তাহা বুঝিয়া দেখ, তোমার নিজের ধর্মের ভাষা তুমি শিখিবে না?

তোমার যাহা কঠিন লাগে আমার কাছে লইয়া আসিও। আমার ত ইচ্ছা করে সকল ছাত্রকেই ভাল করিয়া সংস্কৃত শিখাইয়া দিই। আরও বেশী শিখিলে ইহাতে খুব রস পাইবে। এরকম হার মানা তোমার উচিত নয়। তুমি আবার আমার ক্লাসে ফিরিয়া এস।" তাঁহার কথা শুনিয়া আমার লজ্জা হইল। শিক্ষকের প্রেমের অপমান করিতে পারিলাম না। আজও আমার আত্মা কৃষ্ণশঙ্কর মাস্টারের উপকার স্বীকার করিতেছে। তখন যতটুকু সংস্কৃত শিখিয়াছিলাম তাহাও যদি না শিখিতাম, তাহা হইলে আজ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে যেটুকু রস গ্রহণ করিতে পারিতেছি, তাহাও পারিতাম না। আমার এই অনুতাপ রহিয়া গিয়াছে যে, ভাল সংস্কৃত শিখিতে পারি নাই। কেন না পরে আমি বুঝিয়াছিলাম হিন্দু বালকের সংস্কৃত বেশ ভাল না জানিলে চলে না।

আমার বর্তমান মত এই যে, ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থায় নিজের ভাষা ছাড়াও রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দী, সংস্কৃত, ফারসী, আরবী ও ইংরাজীর স্থান দেওয়া দরকার। এতগুলি ভাষার সংখ্যা দেখিয়া কাহারও ভয় পাওয়ার কারণ নাই। ভাষা যদি উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং অন্য সকল বিষয় ইংরাজীর সাহায্যে পড়িবার বোঝা যদি না চাপানো হয়, তবে ঐ ভাষাগুলি শিক্ষা করা আর 'বোঝা' বলিয়া বোধ হইবে না, বরঞ্চ উহাতে যথেষ্ট রস পাওয়া যাইবে। আর, যে ব্যক্তি একটা ভাষা শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা করে, তাহার পক্ষে অন্য ভাষার জ্ঞানলাভও সহজ হইয়া পড়ে। সত্য করিয়া দেখিতে গেলে হিন্দী, গুজরাটী, সংস্কৃত একই ভাষা বলিয়া গণ্য করা যায়। ফারসী যদিও সংস্কৃতের সহিত ও আরবী হিব্রুর সহিত সম্পর্ক-যুক্ত, তথাপি উভয়েই ইসলাম অবলম্বনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া উভয়ের নিকট-সম্বন্ধ আছে।

উর্দুকে আমি ভিন্ন ভাষা বলিয়া মনে করি না, কেন না তাহার ব্যাকরণ হিন্দী অনুযায়ী। উহার শব্দগুলি ফারসী এবং আরবী। উচ্চাঙ্গের গুজরাটী, হিন্দী, বাংলা, মারাঠী জানিতে হইলে সংস্কৃত জানার আবশ্যক আছে।

৬

দুঃখের ঘটনা—(এক)

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, হাইস্কুলে আমার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তবু যাহাকে ঠিক বন্ধু বলা যায়, এইরূপ মিত্র স্কুলে ও বিভিন্ন সময়ে আমার জুটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইজনকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুই বলা যায়। একজনের সহিত সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, কিন্তু আমি তাঁহাকে ত্যাগ করি নাই। দ্বিতীয় বন্ধুর সঙ্গ করিতেছি বলিয়া প্রথম বন্ধু আমাকে ত্যাগ করেন। এই দ্বিতীয় বন্ধুর সঙ্গ আমার জীবনের দুঃখদায়ক প্রসঙ্গ। এই সঙ্গ কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। তাহার সহিত এই বন্ধুত্ব, আমি সংশোধনের ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই করিয়াছিলাম। আমার মধ্যম ভাইয়ের সহিতই তাহার প্রথম বন্ধুত্ব হয়। সে তাহার সঙ্গেই পড়িত। এই বন্ধুর যে কতকগুলি দোষ ছিল তাহা আমি জানিতাম। আমার মা, দাদা ও আমার স্ত্রী—এই তিনজনের নিকটেই এই সঙ্গ তিক্ত লাগিত। পত্নীর সাবধান-বাণী গর্বান্ধ স্বামী হিসাবে গ্রাহ্য করার আবশ্যক আছে বলিয়া মনে করিতাম না। কিন্তু মায়ের কথা লঙ্ঘন করা যায় না, দাদার কথাও শুনিতে হয়। তাঁহাদিগকে আমি এই কথা বলিয়া শান্ত করিলাম— "তাহার যে দোষের কথা তোমরা বলিতেছ, আমার তাহা জানা আছে। কিন্তু তাহার গুণ কি তাহাও তোমরা জান না। আমাকে সে বিপথে লইয়া যাইতে পারিবে না, কেন না তাহাকে ভাল করার জন্যই আমার সহিত তাহার সম্পর্ক। সে যদি শোধরায় তবে খুব ভাল লোক হইবে। তোমরা আমার সম্পর্কে নির্ভয়ে থাক।" আমার কথায় তাঁহারা যে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। তবে তাঁহারা আমাকে বিশ্বাস করিতেন। তাই আমাকে ইচ্ছামত চলিতেও দিলেন।

আমার সিদ্ধান্ত যে ঠিক হয় নাই তাহা আমি পরে টের পাইয়াছিলাম। কাহাকেও সংশোধন করিতে গিয়াও গভীর জলে নামিতে নাই। যাহাকে সংশোধন করিতে যাওয়া যায়, তাহার সহিত বন্ধুত্ব হইতে পারে না। প্রকৃত বন্ধুত্বের ভিতর আত্মার সহিত আত্মার মিলনের ভাব আছে। এই প্রকার বন্ধুত্ব জগতে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সমান গুণসম্পন্ন লোকের মধ্যেই বন্ধুত্ব শোভা পায় ও স্থায়ী হয়। বন্ধু একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেই। এইজন্য বন্ধুত্বের মধ্যে সংশোধন করার অবকাশ অল্পই। আমার

বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গীভাবে বন্ধুত্ব অনিষ্টকর, কেন না মানুষ খুব সহজে দোষ গ্রহণ করে। গুণ গ্রহণ করিতে অনেক প্রয়াস করিতে হয়। যাহাকে আত্মার সহিত অথবা ঈশ্বরের সহিত বন্ধুত্ব করিতে হয় তাহাকে একাকী থাকিতে হয়, অথবা সারা জগতের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে হয়। একাত্মতা গড়িয়া তুলিতে হয়। ভুল হোক্ বা নির্ভুল হোক্, আমার জীবনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে।

যখন আমি এই বন্ধুর সঙ্গে মিশিতে লাগিলাম, তখন রাজকোটে "সংস্কারপন্থী"দের যুগ। অনেক হিন্দু শিক্ষক লুকাইয়া মাংসাহার ও মদ্যপান করিতেন—এ সংবাদ এই বন্ধুর নিকট হইতেই পাইলাম। রাজকোটের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকের নামও সে করিল। হাইস্কুলের কয়েকজন ছাত্রের নামও বলিল। আমি আশ্চর্য হইলাম এবং দুঃখিতও হইলাম। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে আমাকে যে যুক্তি দেখাইল তাহা এই—"আমরা মাংস খাই না বলিয়াই দুর্বল হইয়া আছি। ইংরাজেরা মাংস খায় বলিয়াই আমাদের উপর রাজত্ব করিতে পারে। আমার শরীর কত মজবুত, আমি কত দৌড়াইতে পারি তাহা ত তুমি জান। আমি মাংস খাই বলিয়াই এমন হইয়াছি। যাহারা মাংস খায় তাহাদের ফোড়া পাঁচড়া ইত্যাদি হয় না, যদি হয় তবে শীঘ্রই সারিয়া যায়। আমাদের শিক্ষকেরা খান, এত নামজাদা লোক খান তাঁহারা কি না বুঝিয়াই খান? তোমারও খাওয়া উচিত, খাইয়া দেখ, দেখিবে তোমারও আমার মত গায়ে জোর হইবে।"

এ সমস্ত কথা, পরামর্শ সে যে একদিনেই দিয়াছিল তাহা নয়। এই সকল কথা অনেকবার অনেক যুক্তিতর্ক দ্বারা আমাকে শুনাইয়াছিল। আমার মেজ ভাই তখন তাহার খপ্পরে পড়িয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনি এই সকল যুক্তিতে সহজেই সম্মতি দিলেন। আমার ভাইয়ের তুলনায় ও এই বন্ধুর তুলনায় আমি একেবারে রুগ্ন ছিলাম। তাহাদের শরীর খুব পেশীবদ্ধ ছিল, তাহাদের শরীরে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী বলও ছিল। তাহারা ঢের বেশী সাহসী ছিল। এই বন্ধুটির পরাক্রম আমাকে মুগ্ধ করিত। সে যতদূর ইচ্ছা দৌড়াইতে পারিত। হাইজাম্প লংজাম্প—এই দুই কসরতেও সে ওস্তাদ ছিল। মার খাওয়ার শক্তিও তাহার যথেষ্ট ছিল। সে সময় সময় আমাকে এই সকল শক্তি প্রদর্শন করিত। নিজের মধ্যে যে শক্তি নাই, অপরের মধ্যে তাহা দেখিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায়। আমারও তাহাই হইয়াছিল। আমার দৌড়ঝাঁপের শক্তি ছিল না

বলিলেই চলে। সুতরাং ভাবিতাম—আমি যদি এই বন্ধুটির মত বলবান হই তবে কি মজা হয়! তাহা ছাড়া আমি আবার ভারি ভীরুও ছিলাম। চোরের ভয়, ভূতের ভয়, সাপের ভয়, আমাকে পাইয়া বসিত। এই ভয়ের জন্য আমি খুব কষ্টও পাইতাম। রাত্রে কোথাও একলা যাওয়ার সাহস আমার ছিল না। অন্ধকারে ত কোথাও যাইতাম না। বাতি না জ্বালিয়া শোওয়াও প্রায় অসম্ভব ছিল। এখানে ভূত, ওখানে চোর, সেখানে সাপ! সুতরাং প্রদীপ জ্বালাইয়া শোওয়া ছিল আমার পক্ষে অনিবার্য। পাশে শুইয়া আছেন যে স্ত্রী তিনি এখন কতকটা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কাছে এ ভয়ের কথা কি করিয়া বলি! আমার অপেক্ষা তিনি অনেক সাহসী বলিয়াই আরও লজ্জা হইত। সাপ-খোপের ভয় কি তাহা তিনি কোনও দিন জানিতেন না। অন্ধকারে একা চলিয়া বেড়াইতেন। আমার এই দুর্বলতার কথা কেবল সেই বন্ধুই জানিত। আমাকে বলিত যে, সে জীবন্ত সাপ হাতে করিয়া ধরিতে পারে। চোরকে সে ভয় করে না। ভূতও সে মানে না। সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, এ সকলই তাহার মাংস খাওয়ার সুফল!

এই সময় প্রসিদ্ধ গুজরাটী কবি নর্মদ-এর লেখা নিচের গানটি স্কুলের ছেলেদের মুখে মুখে শোনা যাইত—

ইংরাজ রাজত্ব করে
দেশীকে রাখে দাবিয়া,
লম্বায় সে পাঁচ হাত পুরা
মাংসাহারী বলিয়া।

এই সকলের প্রভাব আমার মনের উপর পড়িল। আমি পরাজিত হইলাম। মাংসাহার করা ভাল, তাহাতে আমি বলবান ও সাহসী হইব, আর সমস্ত দেশের লোক যদি মাংসাহার করে তবেই ইংরাজদিগকে হারাইতে পারে—এই প্রকার কথা আমি মনে করিতে লাগিলাম। মাংসাহার করার দিনও স্থির হইল।

এই মাংসাহারের সঙ্কল্প করা—ইহার যে কী অর্থ সকল পাঠক বুঝিতে পারিবেন না। গান্ধী পরিবার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত। আমার বাপ-মা গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। হামেশাই তাঁহারা হাবেলীতে (মন্দির) যাইতেন। কতকগুলি মন্দির এই পরিবারেরই ছিল—একথাও বলা যায়। এ ছাড়া গুজরাটে জৈন-সম্প্রদায় খুব শক্তিশালী। তাহাদের প্রভাব প্রত্যেক স্থলে প্রত্যেক কার্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই হেতু গুজরাটে জৈন ও বৈষ্ণবদিগের ভিতর মাংসাহারের

প্রতি যে বিরুদ্ধ ভাব, যে ঘৃণা দেখিতে পাওয়া যায়, সে প্রকার ভারতবর্ষে অথবা সারা জগতে আর কোথাও দেখা যায় না—ইহাই আমার সংস্কার।

আমি পিতামাতার ভক্ত। তাঁহাদের ভালবাসি। তাঁহারা যদি আমার মাংস খাওয়ার কথা শুনেন তবে নিঃসংশয়ে তখনই দেহত্যাগ করিবেন, ইহা আমি জানিতাম। জানিয়াই হোক্ আর না জানিয়াই হোক্ আমি সত্যের সেবক ছিলাম। মাংসাহার করায় যে মাতাপিতাকে প্রতারণা করা হইতেছে, এ জ্ঞান আমার তখন ছিল না—এ কথাও আমি বলিতে পারি না। এ অবস্থায় আমার পক্ষে মাংসাহার করার সংকল্প বাস্তবিকই অত্যন্ত সংকটজনক ও ভয়ানক ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমাকে ত "সংস্কার" করিতে হইবে। মাংসাহারের শখ আমার ছিল না। মাংসের স্বাদের জন্য আমার মাংসাহারের ইচ্ছা ছিল না। আমাকে যে বলবান ও সাহসী হইতে হইবে, অপরকেও সেইপ্রকার করিতে হইবে। তাহার পর ইংরাজকে বিতাড়িত করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন করিতে হইবে। স্বরাজ্য শব্দ তখন শুনি নাই। কিন্তু এই সংস্কারের মোহই আমাকে সেদিন অন্ধ করিয়াছিল।

৭
দুঃখের ঘটনা—(দুই)

অবশেষে মাংস খাওয়ার সেই নিদিষ্ট দিনটি আসিল। আমার অবস্থার সম্পূর্ণ বর্ণনা করা কঠিন। একদিকে সংস্কার করার আগ্রহ, জীবনের পরিবর্তন করার নূতনত্বের মাদকতা, অপর দিকে চোরের মত সৎকার্য করার লজ্জা—ইহাদের মধ্যে কোন্ ভাবটা প্রধান ছিল, তাহা আজ আর মনে নাই। আমরা নদীর ধারে নির্জন স্থান খুঁজিতে গেলাম। দূরে গিয়া, কেহ না দেখিতে পারে এমন কোণে প্রবেশ করিয়া, যাহা জীবনে কখনও দেখি নাই সেই বস্তু—মাংস দেখিলাম। সঙ্গে পাঁউরুটি ছিল। দুইয়ের এক বস্তুও রুচিল না। মাংস চামড়ার মত লাগে। খাওয়া অসম্ভব হইল। আমার বমি আসিতে লাগিল। খাওয়া বন্ধ করিলাম।

সে রাত্রি বড় বেদনার মধ্যে কাটিল। ঘুম আসে না। স্বপ্নে দেখি, যেন জ্যান্ত অবস্থায় ছাগলটি পেটের ভিতর গিয়াছে ও করুণস্বরে ডাকিতেছে। ভয় পাইয়া উঠি—অত্যন্ত অনুতাপ হয়। আবার বিচার করি যে, আমার মাংসাহার ত করাই চাই, সাহস যেন না হারাই। বন্ধুটিও হার মানার পাত্র

ছিল না। মাংস নানা রকমে রান্না করিয়া সুন্দর রূপে সাজাইয়া দিত। নদীর তীরে না গিয়া কোনও বাবুর্চির সহিত ব্যবস্থা করিয়া ডাক-বাংলোয় সুসজ্জিত টেবিল চেয়ারের প্রলোভনের মধ্যে সে আমাকে আনিয়া ফেলিল। ইহার ফলও ফলিল। রুটির উপর আমার বিতৃষ্ণা কমিল, ছাগলের জন্য মায়া অন্তর্হিত হইল এবং মাংস নয়—মাংসযুক্ত খাদ্যের স্বাদ পাইতে লাগিলাম। এই প্রকারে এক বৎসরে পাঁচ-ছয়বার মাংস খাওয়া হইয়াছিল। সব সময় বাংলো-বাড়ী পাওয়া যাইত না। সব সময় মাংসের সুস্বাদু ভাল খাদ্যও প্রস্তুত করা যাইত না। এই প্রকার খাওয়ার জন্য পয়সাও লাগে। আমার কাছে কানাকড়িও ছিল না। এই জন্য আমাকে দিয়া কোনও সুবিধা হওয়ার উপায়ও ছিল না। এই খরচা সেই বন্ধুকেই যোগাইতে হইত। সে কোথা হইতে যে পয়সা সংগ্রহ করিত তাহা আজ পর্যন্তও জানিতে পারি নাই। তাহার আশা ছিল, আমাকে মাংসখোর করিয়া ফেলিবে। সেজন্য যাহা খরচা করা দরকার তাহা সে-ই করিত। তবে তাহার কাছে কিছু অফুরন্ত অর্থ ছিল না। সুতরাং এরূপে ভোজের ব্যবস্থা আয়োজন ক্বচিৎ কখনও হইত।

যেদিন এই খানা খাওয়া হইত সেদিন বাড়ী গিয়া আর খাইতাম না। মা খাইতে ডাকিতেন। তাঁহাকে বলিতাম—'আজ ক্ষুধা নাই'—'আজ হজম হয় নাই'। এই ধরনের নানা মিথ্যা কথা বলিতে হইত। এসব কথা বলিবার সময় প্রতিবারেই মনে আঘাত লাগিত। একে ত মিথ্যা, তাহাও আবার মায়ের সামনে! আর যদি বাপ-মা জানেন যে, ছেলে মাংসাহার করিতেছে, তবে তাঁহাদের মাথায় বজ্র পড়িবে। এই চিন্তা আমার হৃদয়কে যেন দগ্ধ করিত। আমি স্থির করিলাম যে, মাংস খাওয়ার হয়ত আবশ্যকতা আছে, মাংসাহার প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের সংস্কারও হয়ত করা দরকার, কিন্তু পিতামাতাকে ঠকানো ও তাঁহাদের কাছে মিথ্যা কথা বলা, মাংস না খাওয়া অপেক্ষাও খারাপ। সুতরাং পিতামাতা জীবিত থাকিতে আর মাংস খাইব না। তাঁহাদের মৃত্যুর পর খোলাখুলি ভাবে মাংস খাইব ও সে সময় না আসা পর্যন্ত মাংসাহার ত্যাগ করিব। এই প্রতিজ্ঞার কথা আমি বন্ধুকেও জানাইয়া দিলাম। সেই যে মাংস খাওয়া ছাড়িয়াছি আর কখনও জীবনে মাংস খাই নাই। পিতামাতা কখনো জানেন নাই যে, তাঁহাদের দুই পুত্র মাংসও আহার করিয়াছে।

পিতামাতার কাছে মিথ্যা ব্যবহার করিব না বলিয়া মাংসাহার ছাড়িলাম, কিন্তু বন্ধুকে ছাড়িলাম না। তাহাকে সংশোধন করিতে গিয়া আমি নিজেই

কলুষিত হইলাম, আর এই কলুষের জ্ঞানও আমার হৃদয়ের কাছে অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

তাহার সঙ্গ আমাকে ব্যভিচারীও করিত। কিন্তু ঈশ্বর যদি বাঁচাইতে চান, তবে পতনের ইচ্ছা থাকিলেও, লোক পবিত্র থাকিয়া যায়। বন্ধু আমাকে একদিন এক বেশ্যা-গৃহে লইয়া গেল। সমস্ত ব্যবস্থাই পূর্ব হইতে ঠিক করা ছিল। টাকাও দেওয়া হইয়া গিয়াছিল। আমি একেবারে পাপের মুখের ভিতর গিয়া পড়িলাম। কিন্তু ভগবানের অপার করুণা আমাকে রক্ষা করিল। সেই গৃহে গিয়া আমি যেন অন্ধের মত হইয়া গেলাম। আমার কথা বলার মত শক্তিও ছিল না। লজ্জায় স্তব্ধ হইয়া সেই স্ত্রীলোকের পাশে খাটিয়ায় বসিয়া ছিলাম। স্ত্রীলোকটি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে আমাকে দুই-চার কথা শুনাইল, তারপর আমাকে দরজা দিয়া বাহির করিয়া দিল।

তখন আমার পুরুষত্ব লাঞ্ছিত হইল বলিয়া মনে হইয়াছিল, পৃথিবী দ্বিধা হোক্ আমি তাহাতে প্রবেশ করি, লজ্জায় এমনি মনে হইতেছিল। কিন্তু আজ সেদিনকার উদ্ধার, ঈশ্বরের অপার কৃপা বলিয়া মনে করিতেছি। এই ধরনের ঘটনা আমার জীবনে আরও দুই-চারবার হইয়াছে। তাহাতেও বিনা চেষ্টায়, কেবল ঘটনার যোগাযোগবশতঃ আমি বাঁচিয়া গিয়াছি। কিন্তু বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে ত এই ঘটনায় আমি পতিত হইয়াছি বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। মনে মনে ভোগের ইচ্ছাই আমার ছিল। সুতরাং তাহা কার্য করারই অনুরূপ। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে, ইচ্ছা থাকিলেও প্রত্যক্ষ ভাবে পাপের কাজ না করিলে তাহাকে বাঁচিয়া যাওয়া বলে। আমি এই অর্থেই বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। এমন অনেক কার্য আছে যাহা নিষ্পন্ন না করিলেও, সেই ব্যক্তির ও তাহার সহবাসে যাহারা আসে, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর হয় এবং যাহার বিচারবুদ্ধি আছে, সে তখন সেই কার্য হইতে বাঁচিয়া যাওয়াটা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়াই মনে করে। কেহ পতিত না হওয়ার জন্য চেষ্টা সত্ত্বেও পতিত হয়, আবার কেহ পতিত হওয়ার ইচ্ছা করিয়াও ঘটনা-সংযোগ বশতঃ বাঁচিয়া যায়—ইহা আমরা দেখিয়াছি। ইহার মধ্যে কতটা পুরুষার্থ আর কতটাই বা দৈব, কোন্ নিয়মের বশবর্তী হইয়া মানুষ অবশেষে এই জালে পতিত হয়, অথবা বাঁচিয়া যায়,—এ সকল গূঢ় প্রশ্ন। তাহার সমাধান আজ পর্যন্ত হয় নাই এবং কোনও দিন হইবে কিনা তাহাও বলা কঠিন। কিন্তু এখন আমার বক্তব্য বিষয়েই ফিরিয়া আসি।

বন্ধুটির সাহচর্য যে অনিষ্টকর, সে কথা উক্ত ঘটনাতেও আমার বুদ্ধিতে আসিল না। সুতরাং আরও কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাকে সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল। তারপর তাহাতে যে দোষ থাকার কথা জানিতাম না তাহাও যখন প্রত্যক্ষ করিলাম, তখনই আমার চোখ খুলিল। যতটা পারি সময়ের অনুক্রম অনুসারেই আমার অভিজ্ঞতা লিখিয়া যাইতেছি। তাই এই দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার বিষয়টি পরে আসিবে।

এই সময়ের আর একটা কথাও বলা দরকার। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইত—যে কলহ হইত তাহার কারণও আমার এই বন্ধুটি। পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি সংশয়পরায়ণ হইলেও প্রেম-প্রবণ পতি ছিলাম। এই বন্ধুই আমার সংশয় বাড়াইয়া দিয়াছিল। কারণ তাহার কথার সত্যতার উপর আমার অবিশ্বাস হইত না। তাহার কথা শুনিয়া আমার ধর্মপত্নীকে আমি কত দুঃখই না দিয়াছি! এই অত্যাচারের জন্য আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করিতে পারি নাই। হিন্দু-স্ত্রীরা এই লাঞ্ছনা সহ্য করে। সেই জন্যই আমি সর্বদা স্ত্রীদিগকেই সহনশীলতার প্রতিমূর্তিরূপে কল্পনা করিয়া থাকি। চাকরের উপর যদি মিথ্যা সন্দেহ হয় তবে চাকর চাকরি ছাড়িয়া দিতে পারে, যদি পুত্রের উপর সন্দেহ পড়ে, তবে পুত্র পিতার সঙ্গে ঘর করা ছাড়িয়া দেয়, মিত্রে মিত্রে সন্দেহ হইলে মিত্রতা ভাঙ্গিয়া যায়, স্ত্রী যদি স্বামীর উপর সন্দেহ করে তবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আর স্বামীর যদি স্ত্রীর উপর সন্দেহ হয় তবে স্ত্রী বেচারীর দুর্ভোগের অন্তই থাকে না। সে যায় কোথায়? হিন্দু-সমাজে যেসব সম্প্রদায় উচ্চ বলিয়া গণ্য, সেই সব সম্প্রদায়ের রমণীরা আদালতে গিয়া বিবাহের বন্ধন কাটাইতে পারে না। তাহাদের জন্য এমনি একদেশদর্শী বিচারব্যবস্থা রহিয়াছে। এই ভ্রান্ত বিচারের বলে আমি আমার স্ত্রীকে যে দুঃখ দিয়াছি, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। অহিংসা সম্বন্ধে সূক্ষ্মজ্ঞান লাভের পর আমার এই সন্দেহ দূর হয়। অর্থাৎ যখন আমি ব্রহ্মচর্যের মহিমা বুঝিলাম, যখন বুঝিলাম পত্নী পতির দাসী নহে—সহচারিণী, সহধর্মিণী, তখনই বুঝিলাম পতি-পত্নী একে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগী এবং পরস্পর স্বাধীন বলিয়া, অগ্রাহ্য করার অধিকার পতির যেমন আছে, পত্নীরও তেমনি আছে। ঐ সময়ের দাম্পত্য-জীবনের কথা যখন স্মরণ করি, তখন আমার মূর্খতা ও কামনাসক্ত নিষ্ঠুরতার জন্য নিজেরই উপর ক্রোধ হয়, এবং বন্ধুটির উপর মোহের জন্য নিজের উপর দয়া উপস্থিত হয়।

চুরি ও প্রায়শ্চিত্ত

যখন মাংসাহার করিয়াছিলাম সেই সময়ের ও তাহার পূর্বের কয়েকটি দোষের বর্ণনা করা এখনও বাকী আছে। এগুলি বিবাহের পূর্বের অথবা তাহার অল্পকাল পরের কথা।

এক আত্মীয় ও আমার বিড়ি খাওয়ার শখ হয়। বিড়ি খাওয়ায় যে কিছু লাভ আছে, অথবা বিড়ির গন্ধ যে ভাল লাগে, এমন বোধ আমাদের দুজনের কাহারও ছিল না। মুখ হইতে ধোঁয়া ছাড়ার মধ্যে কী একটা মজা আছে, রস আছে—এইরূপ বোধ হইত। আমার কাকা বিড়ি খাইতেন। তাঁহাকে ও অন্যান্যদের বিড়ির ধোঁয়া বাহির করিতে দেখিয়া আমারও ঐরূপ করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু পয়সা কাছে ছিল না। সেজন্য কাকা বিড়ি খাওয়ার শেষে যেটুকু অংশ ফেলিয়া দিতেন তাহাই খাইতে আরম্ভ করিলাম।

কিন্তু ঐ রকম বিড়ির টুক্‌রা সব সময় পাওয়া যায় না, আর তাহা হইতে বেশী ধোঁয়াও বাহির হয় না। চাকরের কাছে দু'চারটা পয়সা থাকিত, তাহা হইতেই মধ্যে মধ্যে এক-আধটা চুরি করার অভ্যাস হইল ও সেই পয়সায় বিড়ি খরিদ করিতে লাগিলাম। প্রশ্ন হইল—বিড়ি রাখিব কোথায়? গুরুজনের সম্মুখে বিড়ি খাওয়া? সে ত একেবারেই অসম্ভব। যেমন তেমন করিয়া দুই-চার পয়সা চুরি করিয়া কয়েক সপ্তাহ চালাইলাম। ইতিমধ্যে শুনিলাম যে, একরকম লতা আছে (তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি) যাহার পাতা বিড়ির মত করিয়া টানা যায়। আমরা তাহাই যোগাড় করিয়া ধূমপানের শখ মিটাইতে লাগিলাম।

কিন্তু উহাতে আদৌ তৃপ্তি হইতেছিল না। নিজেদের পরাধীনতায় আমরা ক্লান্ত হইয়া উঠিতেছিলাম। বড়দের অনুমতি ছাড়া কিছুই করার জো নাই—এই দুঃখ অসহ্য মনে হইতে লাগিল। অবশেষে অতিষ্ঠ হইয়া আমরা আত্মহত্যা করাই স্থির করিলাম।

কিন্তু আমরা আত্মহত্যা করিব কি ভাবে? কোথা হইতে বিষ পাইব? আমরা শুনিলাম যে ধুতুরার বীজ খাইলে মৃত্যু হয়। জঙ্গলে গিয়া বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। সময় স্থির হইল—সন্ধ্যাবেলা। এইটাই ঠিক সময়। কেদারজীর মন্দিরে গিয়া আত্মহত্যার পূর্বে প্রদীপে ঘি দিলাম। দেবতা দর্শন

করিয়া এক নির্জন কোণও বাছিয়া লওয়া গেল। কিন্তু হায়, বিষ খাওয়ার সাহস হইল না। মনে হইল, যদি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু না হয়? তারপর ভাবিলাম, আচ্ছা, আত্মহত্যা করিয়া লাভ কি? তার চেয়ে না হয় পরাধীনতা মানিয়া লওয়া যাক। কিন্তু এইপ্রকার ভাবিতে ভাবিতেও দুই-চারটা বীজ মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। এর বেশী খাওয়ার সাহস হয় নাই। দুই জনেরই মরিতে ভয় হইয়াছিল। তাই স্থির করিলাম, রামজীর মন্দিরে দেবতার দর্শন করিয়া শান্ত হইব এবং আত্মহত্যার কথা ভুলিয়া যাইব।

আমি উপলব্ধি করিয়াছিলাম, আত্মহত্যার কথাটা বলা যত সহজ, আত্মহত্যা করা তত সহজ নয়। সেজন্য যখন কেহ আত্মহত্যার ধমক দেখায়, তখন তাহা আমার উপর খুব অল্পই প্রভাব বিস্তার করে, অথবা মোটেই প্রভাব বিস্তার করে না।

এই আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের ফল শেষ পর্যন্ত এই হইল যে, আমরা বিড়ি খাওয়ার ও চাকরের পয়সা চুরি করিয়া বিড়ি কেনার অভ্যাস ভুলিয়া গেলাম। বড় হইয়া আর বিড়ি খাওয়ার কথা মনে হয় নাই। এই অভ্যাস অত্যন্ত অশোভন, বিশ্রী ও ক্ষতিকর বলিয়াই সর্বদা মনে করি। পৃথিবী জুড়িয়া ধূম-পানের এমন প্রচণ্ড নেশা কেন যে আছে, তাহাই আমি বুঝিতে পারি না। যে রেলের কামরায় বিড়ি সিগারেট খাওয়া চলিতে থাকে, সেখানে বসা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক হয়, উহার ধোঁয়ায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে।

বিড়ির টুক্‌রা চুরি করা এবং সেজন্য চাকরের পয়সা চুরি করা অপেক্ষাও আর এক চুরির দোষ গুরুতর বলিয়া মনে করি। বিড়ির জন্য যখন চুরি করিয়াছিলাম, আমার বয়স তখন বারো-তেরো বৎসর হইবে, কি তাহা অপেক্ষা কমও হইতে পারে। কিন্তু এই শেষোক্ত চুরির বেলায় আমার বয়স পনের বৎসর। ব্যাপারটা ছিল—আমার সেই মাংসাহারী ভাইয়ের সোনার তাগার টুক্‌রা কাটিয়া লওয়া। সে টাকা-পঁচিশের মত ছোটখাটো ধার করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহা কেমন করিয়া শোধ দেওয়া যায় তাহাই আমরা দুইজনে যুক্তি করিতেছিলাম। আমার ভাইয়ের হাতে সোনার নিরেট তাগা ছিল। তাগা হইতে এক তোলা সোনা কাটিয়া লওয়া কিছু কঠিন হইল না।

তাগা কাটিলাম। কর্জও শোধ হইল। কিন্তু আমার পক্ষে এই কাজ অসহ্য হইয়া পড়িল। অশান্তিতে অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহার পর আর চুরি না করা স্থির করিলাম। বাবার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া ফেলা

পিতা কাবা গান্ধী
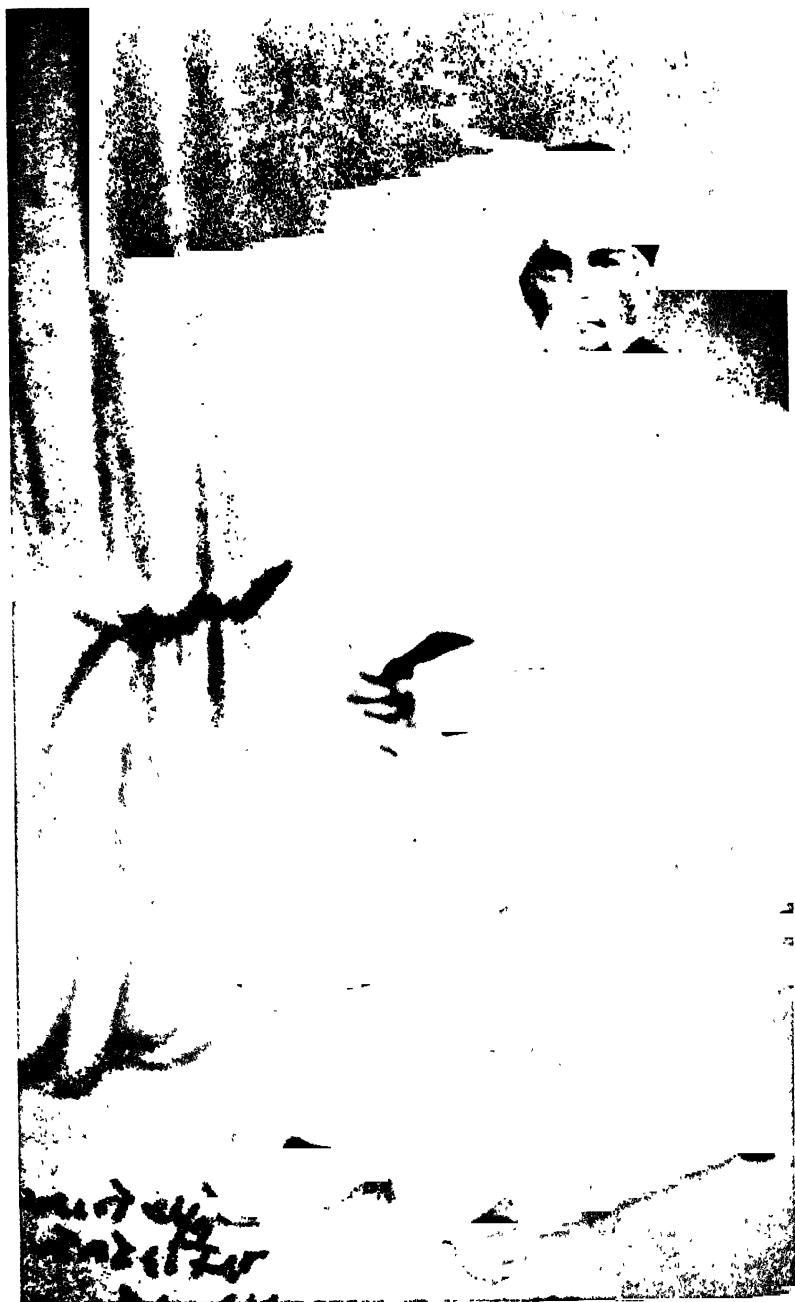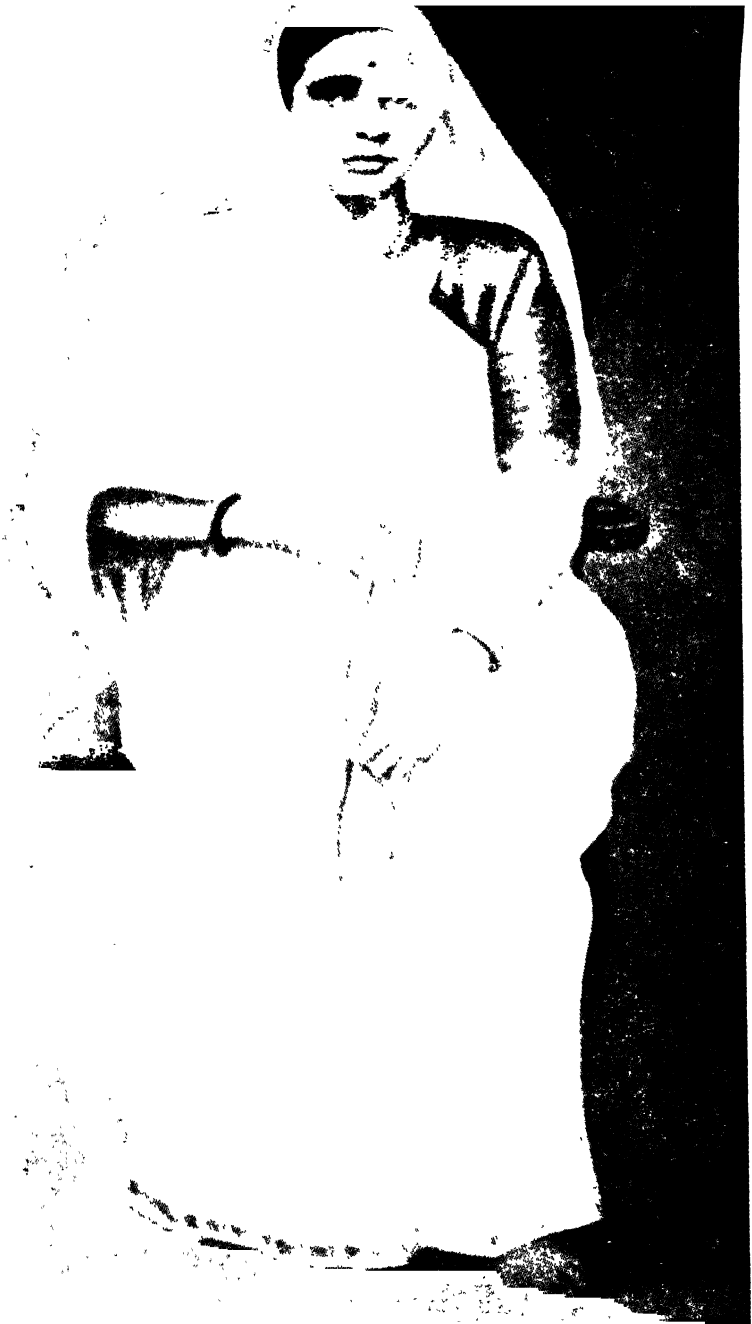
মাতা পুতলী বাঈ

দরকার—এইরূপ মনে হইতে লাগিল। কিন্তু জিভ সরে না। বাবার কাছে যে মার খাইব, সে রকম ভয় ছিল না। তিনি কোনো দিন আমাদের কোনো ভাইকে প্রহার করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু তিনি খুব দুঃখ পাইবেন ও হয়ত বা মাথা কুটিবেন। এই বিপদের ভয় রাখিয়াও দোষ স্বীকার করা চাই। তাহা না হইলে শুদ্ধি হইবে না বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

অবশেষে চিঠি লিখিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিব ও ক্ষমা চাহিব স্থির করিলাম। আমি চিঠিটি লিখিয়া হাতে হাতে দিলাম। চিঠিতে সকল দোষই স্বীকার করিয়াছিলাম ও সাজা চাহিয়াছিলাম। আমার দোষের জন্য তিনি নিজেকে যেন কোনও প্রকারে সাজা না দেন, সে মিনতিও করিয়াছিলাম এবং ভবিষ্যতে আর চুরি করার মত দোষ করিব না বলিয়াও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

আমি কাঁপিতে কাঁপিতে বাবার হাতে এই চিঠি দিলাম ও তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িলাম। এই সময় তাঁহার ভগন্দরের ব্যথা চলিতেছিল। সেইজন্য তিনি শুইয়া ছিলেন। খাটের বদলে তিনি তক্তার পাট ব্যবহার করিতেন।

বাবা চিঠি পড়িলেন। তাঁহার চোখ হইতে মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রুতে চিঠিটি ভিজিয়া উঠিল। তিনি ক্ষণেকের জন্য চোখ বুঝিয়া রহিলেন। তারপর চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। চিঠি পড়ার জন্য তিনি উঠিয়া বসিয়াছিলেন—এখন শুইয়া পড়িলেন।

আমি সেইখানেই ছিলাম। বাবার গভীর দুঃখ বুঝিতে পারিলাম। আমিও কাঁদিলাম। যদি চিত্রকর হইতাম, তবে আজও এই চিত্র আমি নিখুঁত আঁকিতে পারিতাম—আজও এই ছবি আমার চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

তাঁহার চক্ষের জলের মুক্তাবিন্দু আমাকে বিঁধিল। আমি শুদ্ধ হইলাম, পবিত্র হইলাম। এই প্রেম যে অনুভব করিয়াছে সে-ই জানে—

"প্রেমের বাণে বিদ্ধ যে হয়
সেই জানে তার পরিচয়।"

আমার কাছে এই ঘটনা অহিংসা-তত্ত্বের এক সুস্পষ্ট ব্যবহারিক উদাহরণ হইল। অহিংসায় আমার এই প্রথম হাতে-খড়ি। তখন অবশ্য আমি ইহাতে পিতার প্রেম ভিন্ন আর কিছু দেখি নাই। কিন্তু আজ আমি ইহাতে শুদ্ধ অহিংসারই পরিচয় পাইতেছি। এইরূপ অহিংসা যখন আলোর মত বিস্তৃত হইয়া উঠে তখন যে অন্তরে তার স্পর্শ লাগে সে অন্তর দ্রবীভূত হয়। এইরূপ ব্যাপক অহিংসার শক্তির পরিমাপ করা অসম্ভব।

এই প্রকার প্রশান্ত ক্ষমা বাবার স্বভাবে ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই। আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, তিনি ক্রোধ করিবেন, গালাগালি দিবেন, মাথা কুটিবেন। কিন্তু তিনি দেখাইলেন অপার শান্ত ভাব। আমার দোষ-স্খলনকারী স্বীকারোক্তিই ইহার কারণ বলিয়া আমি মনে করি। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় গুরুজনের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করে এবং আর দোষ না করার প্রতিজ্ঞা করে, সে শুদ্ধতম প্রায়শ্চিত্ত করে। আমি জানিয়াছি, আমার স্বীকারোক্তিতে পিতৃদেব আমার সম্বন্ধে নির্ভয় হইয়াছিলেন এবং আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ, ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

৯

পিতার মৃত্যু ও আমার দ্বিগুণ লজ্জা

তখন আমার বয়স ষোল বৎসর। পিতৃদেব ভগন্দরের জন্য যে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হইয়াছেন সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার সেবার জন্য আমার মা, বাড়ীর একজন চাকর ও আমিই বেশীর ভাগ সময় থাকিতাম। আমার কাজ ছিল নার্সের মত। তাঁহার ঘা ধোয়ানো ও তাহাতে ঔষধ দেওয়া, যদি মলম লাগাইতে হয় তবে তাহা লাগানো, তাঁহাকে ঔষধ খাওয়ানো এবং যদি বাড়ীতেই ঔষধ তৈরী করিতে হয় তবে তাহা করা—এই সকলই ছিল আমার বিশেষ কাজ। রাত্রিতে সাধারণতঃ আমি তাঁহার পা টিপিয়া দিতাম, তিনি শুইতে বলিলে অথবা তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে আমি ঘুমাইতাম। এই সেবা করা আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একদিনও এই কাজ আমি বাদ দিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই সময়ে স্কুলেও যাইতাম। সেই জন্য আমার খাওয়া-দাওয়ার সময় ব্যতীত বাকী সময়টা স্কুলে ও বাবার সেবাতেই অতিবাহিত হইত। তিনি যদি অনুমতি দিতেন অথবা তাঁহার শরীর যদি ভাল থাকিত, তবেই সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে যাইতাম।

এই বৎসরে আমার স্ত্রী গর্ভবতী হ'ন। আজ দেখিতেছি যে, ইহা দুই প্রকারে লজ্জার বিষয় ছিল। প্রথমতঃ, বিদ্যাভ্যাসের সময় যে সংযম পালন করা আমার কর্তব্য ছিল তাহা আমি করি নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই সময় আমি স্কুলে পাঠ করা যেমন ধর্ম বলিয়া জানিতাম, তেমনি তদপেক্ষা অধিক ধর্ম বলিয়া জানিতাম পিতামাতার প্রতি ভক্তিকে, আর সেইজন্য বাল্যকাল

হইতেই আমার আদর্শ ছিল 'শ্রবণ'। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-ভোগের বাসনা আমার এই কর্তব্য-বুদ্ধিকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। তাই প্রতি রাত্রিতে যদিও আমি বাবার পা টিপিয়া দিতাম, তবু আমার মন শোওয়ার ঘরেই পড়িয়া থাকিত। আর তাহাও এমন বয়সে, যখন স্ত্রী-সংসর্গ ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও ব্যবহারিকশাস্ত্র অনুযায়ী পরিত্যজ্য। যখন আমি সেবা হইতে ছুটি পাইতাম, তখনই বাবাকে প্রণাম করিয়া প্রসন্ন মনে শয়নকক্ষে চলিয়া যাইতাম।

বাবার শরীরের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছিল। কবিরাজ প্রলেপ দিলেন, হাকিমেরা মলমপট্টি দিলেন, ঘরোয়া চিকিৎসাও কিছু হইল। ইংরাজ ডাক্তারও নিজের যথাশক্তি করিলেন। ইংরাজ ডাক্তার বলিলেন যে, অস্ত্রোপচারই ইহার চিকিৎসা। কিন্তু পারিবারিক চিকিৎসক তাহাতে বাধা দিলেন। এই বয়সে অস্ত্রোপচার তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি প্রবীণ ও বিচক্ষণ ছিলেন। অস্ত্রোপচারের জন্য অনেক প্রকারের ঔষধ-পত্র আনা হইয়াছিল, তাহা কাজে লাগিল না। আমার বিশ্বাস, যদি অস্ত্রোপচার করিতে দেওয়া হইত তবে ঘা শুকাইতে বেগ পাইতে হইত না। বোম্বাইয়ের তখনকার খ্যাতনামা সার্জন দ্বারাই অস্ত্রোপচার করার কথা স্থির হইয়াছিল। কিন্তু সময় শেষ হইয়া থাকিলে ভাল চিকিৎসাই বা কেন করিতে দেওয়া হইবে? অস্ত্রোপচারের জন্য যত কিছু সামগ্রী কেনা হইয়াছিল সে সকল লইয়া অস্ত্রোপচার না করিয়াই বাবা বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি জীবনের সকল আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। দুর্বলতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মল-মূত্রাদি শয্যায় থাকিয়া ত্যাগ করিতে হয়—এমন অবস্থা হইল। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্তও তাহা করিতে স্বীকার করেন নাই এবং কষ্ট করিয়াও শয্যাত্যাগ করিতেন। বৈষ্ণব ধর্মের কঠিন বাহ্যশুচিতা এমনই অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে, মলত্যাগাদি ও স্নানাদি সমস্ত ক্রিয়াই শয্যায় পড়িয়া থাকিয়াও সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নতার সহিত করা যায়। রোগীকে কষ্ট দিয়া উঠাইতে হয় না, অথচ যখনই দেখ, বিছানা পরিষ্কার রহিয়াছে। এই প্রকার সত্যকার পরিচ্ছন্নতাই আমি বৈষ্ণব ধর্ম বলিতে বুঝি। কিন্তু এই সময় পিতৃদেবের স্নানাদির জন্য শয্যাত্যাগ করার আগ্রহ দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইতাম ও মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিতাম।

মৃত্যুর সেই ভীষণ রাত্রি আসিল। এই সময় আমার কাকা রাজকোটে থাকিতেন। আমার কতকটা মনে পড়ে যে, বাবার অসুখ বাড়িতেছে, এই

সংবাদ পাইয়াই তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা ছিল। কাকা সারাদিন বাবার বিছানার পাশে বসিয়া থাকিতেন এবং রাত্রিতে সকলকে শুইতে পাঠাইয়া বিছানার পাশেই শুইয়া পড়িতেন। সেই রাত্রিই যে শেষ রাত্রি হইবে—একথা সেদিন কেহ মনে করে নাই। তবে ভয় সব সময়েই ছিল। রাত্রি সাড়ে দশ কি এগারটা হইয়াছে। আমি পা টিপিতেছি। কাকা বলিলেন—"তুই যা, আমি বসিব।" আমি প্রসন্ন মনে সোজা শয়নকক্ষে গেলাম। স্ত্রী বেচারী ঘুমে বিভোর ছিল। কিন্তু আমি কেন ঘুমাইতে দিব ? আমি তাহাকে জাগাইলাম। পাঁচ-সাত মিনিট পরেই যে চাকরের কথা পূর্বে বলিয়াছি সে দরজায় ধাক্কা দিল। এই ডাক অশুভসূচক বলিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। চাকর বলিল "ওঠ, বাবুর অসুখ খুব বাড়িয়াছে।" 'খুব বাড়িয়াছে' বলার মানে যে কি তাহা বুঝিলাম—"কি হইয়াছে, ঠিক বল ?"

জবাব আসিল—"বাবু চলিয়া গিয়াছেন।"

এখন অনুশোচনা করিলে আর কি ফল হইবে। আমি বড় লজ্জা পাইলাম, বড় দুঃখিত হইলাম। বাবার কামরায় দৌড়াইয়া গেলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, যদি আমি বাসনায় অন্ধ না হইতাম তবে বাবার শেষ সময়ে দূরে থাকিতে হইত না, অন্তিম সময়েও তাঁহার পদসেবা করিতে পারিতাম। এখন কাকার মুখ হইতে কেবল শুনিতে লাগিলাম—"বাপু ত আমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।" বড় ভাইয়ের পরম ভক্ত কাকাই তাঁহাকে শেষ সেবা করার গৌরব অর্জন করিলেন। জীবন যে শেষ হইতেছে পিতৃদেব ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ইশারা করিয়া লেখার জন্য কাগজ-কলম চাহিলেন। কাগজে লিখিলেন—"তৈরী কর।" ইহা লিখিয়া, হাতে যে মাদুলি বাঁধা থাকিত তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সোনার কণ্ঠী ছিল তাহাও ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এক মুহূর্তে আত্মা চলিয়া গেল।

আমি পূর্বের অধ্যায়ে যে লজ্জার কথার ইঙ্গিত করিয়াছি তাহা এই লজ্জা, তাহা সেবার সময় ভোগেচ্ছা। এই কালো দাগ আজ পর্যন্তও ধুইয়া ফেলিতে পারি নাই—তুলিতে পারি নাই। যদিও আমার পিতামাতার প্রতি ভক্তি অপার ছিল, তাঁহাদের জন্য আমি সমস্তই ত্যাগ করিতে পারিতাম, তবুও সেবার সময় পর্যন্ত আমার মন ভোগের ইচ্ছা ছাড়িতে পারে নাই। ইহাতে সেই সেবায় অমার্জনীয় ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে বলিয়াই আমি সর্বদা মনে

করি। আর সেই জন্যই আমি একপত্নীব্রত পালন করিয়াও নিজেকে বাসনান্ধ বলিয়া মনে করি। ইহা হইতে মুক্তি পাইতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছিল এবং মুক্তি পাওয়ার পূর্বে অনেক ধর্ম-সংকটে পড়িতে হইয়াছিল।

আমার এই দ্বিগুণ লজ্জার কথা শেষ করিবার পূর্বে ইহাও বলিয়া রাখি যে, আমার পত্নীর যে পুত্র হইয়াছিল তাহা দুই-চার দিন নিশ্বাস লইয়াই চলিয়া গিয়াছিল। অন্য আর কি পরিণামই বা হইতে পারে? যে বাপ-মার অথবা বাল-দম্পতির সাবধান হওয়া আবশ্যক, তাঁহারা এই দৃষ্টান্ত হইতে সাবধান হইবেন।

১০

ধর্মদর্শন

ছয়-সাত বৎসর বয়স হইতে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে লেখাপড়া করিয়াছি, কিন্তু ইহার মধ্যে ধর্মশিক্ষা পাই নাই। তাহা হইলেও চারিদিকের পরিবেশ হইতে কিছু না কিছু শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এইস্থানে ধর্মের উদার অর্থ লইতে হইবে। ধর্ম অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি—আত্মজ্ঞান।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আমার জন্ম বলিয়া সময় সময় হাবেলীতে যাইতে হইত। কিন্তু উহাতে শ্রদ্ধা ছিল না। মনের কাছে ইহার আবেদন অল্পই ছিল। হাবেলীর জাঁকজমক আমার ভাল লাগিত না। হাবেলীতে প্রচলিত দুর্নীতির যে সব কথা শুনিতাম, তাহাতেই আমার মন উহার প্রতি উদাসীন হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য সেখান হইতে কিছুই পাই নাই।

যাহা হাবেলীতে পাই নাই, তাহা আমার পরিবারের পুরানো পরিচারিকা দাইয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। তাহার ভালবাসার কথা আজিও মনে আছে। আমি পূর্বে জানাইয়াছি যে, আমি ভূত-প্রেতের ভয় পাইতাম। এই পরিচারিকা রম্ভা আমাকে বুঝাইত যে, রামনামই উহার ঔষধ। আমার কিন্তু রামনাম অপেক্ষা রম্ভার উপরে বেশী শ্রদ্ধা ছিল, সেইজন্য বাল্যকালে ভূত-প্রেতের ভয় হইতে বাঁচার জন্য রামনাম জপ আরম্ভ করি। উহা বেশী দিন টিকে নাই, কিন্তু যে বীজ বাল্যকালে রোপিত হইয়াছিল তাহা বৃথা যায় নাই। রামনাম আজ আমার কাছে অমোঘ শক্তি। রম্ভা বাঈয়ের রোপিত বীজই তাহার কারণ বলিয়া মনে করি।

আমার এক খুড়তুত ভাই রামভক্ত ছিলেন। কাকা এই সময় আমাদের দুই ভাইয়ের জন্য রাম-রক্ষা পাঠ শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। আমরা উহা মুখস্থ করিয়া সাধারণতঃ প্রাতঃকালে স্নানের পর পড়িয়া যাওয়ার নিয়ম করিয়াছিলাম। পোরবন্দরে যতদিন ছিলাম ততদিন উহা চলিয়াছিল। রাজকোটের পরিবেশে আসিয়া উহা ভুলিয়া গেলাম। এই পঠন কার্যে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। দাদার কথা মান্য করার জন্য এবং শুদ্ধ উচ্চারণে রাম-রক্ষা আবৃত্তি করিতে হয় এই অভিমানে পাঠ করিতাম।

কিন্তু যে জিনিস আমার মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করিয়াছিল, তাহা রামায়ণ পাঠ। পিতৃদেব অসুখের সময় দিনকতক পোরবন্দরে ছিলেন। এইস্থানে তাঁহারা প্রতিদিন রাত্রিতে রামজীর মন্দিরে গিয়া রামায়ণ শুনিতেন। রামচন্দ্রজীর এক পরম ভক্ত বিল্বেশ্বরের লাধা মহারাজ রামায়ণ পাঠ করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে লোকে বলিত যে, তাঁহার কুষ্ঠ রোগ হইলে তিনি ঔষধ না দিয়া বিল্বেশ্বরের মন্দিরের মহাদেবকে দেওয়া বেলের পাতা ঘায়ের উপরে বাঁধিতেন এবং কেবল রামনাম জপ করিতেন। ইহাতেই তাঁহার কুষ্ঠ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। এ কথা মূলত সত্য হোক্ আর নাই হোক্, আমরা, যাহারা শুনিতে যাইতাম ইহা বিশ্বাস করিতাম। ইহা অন্ততঃ সত্য যে, যে সময় তাঁহাকে আমরা রামায়ণ পাঠ করিতে দেখিয়াছি তখন তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ নীরোগ ছিল। লাধা মহাশয়ের কণ্ঠ সুমিষ্ট ছিল। তিনি দোঁহা এবং চৌপাই গাহিতেন ও অর্থ করিতেন। তিনি নিজে রসে লীন হইয়া যাইতেন ও শ্রোতাদিগকে লীন করিয়া ফেলিতেন। আমার বয়স তখন তের বৎসর। তাঁহার রামায়ণ পাঠে খুব আনন্দ পাইতাম, একথা স্মরণ আছে। এই রামায়ণ পাঠ হইতেই আমার রামায়ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভিত্তি। আজও আমি তুলসীদাসের রামায়ণকে ভক্তি-মার্গের সর্বোত্তম গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করি।

কয়েক মাস পরে আমি রাজকোটে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে এমন রামায়ণ পাঠ হইত না। একাদশীর দিনে ভাগবত পাঠ হইত। সেখানে আমি কখনও কখনও বসিতাম, কিন্তু কথক রস জমাইতে পারিতেন না। আমি ত গুজরাটীতে উহা অত্যন্ত রসের সহিত পাঠ করিয়াছি। আমার একুশ দিনের উপবাসের সময় ভারত-ভূষণ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের শ্রীমুখ হইতে মূল সংস্কৃত আবৃত্তির কতক অংশ শুনিয়া আমার মনে হইত যে, যদি বাল্যকালে তাঁহার মত ভগবদ্ভক্তের মুখ হইতে উহা শুনিতাম তবে

বাল্যকালেই উহার প্রতি আমার গভীর প্রীতি জাগ্রত হইত। বাল্যকালের সংস্কার—তাহা শুভই হোক্ আর অশুভই হোক্, মনের ভিতর খুব গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়। সেইজন্য এমন অমূল্য গ্রন্থপাঠ তখন শুনি নাই বলিয়া মনে খেদ রহিয়া গিয়াছে।

রাজকোটে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতি সমান ভাব রাখার শিক্ষা পাই। হিন্দুধর্মের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিই সম্মানের ভাব রাখিতে শিখিয়াছিলাম। কেন না বাবা ও মা হাবেলীতে (বিষ্ণুমন্দিরে) যাইতেন, শিবালয়ে যাইতেন, রামমন্দিরে যাইতেন। আমাদের কয় ভাইকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন অথবা পাঠাইয়া দিতেন।

বাবার কাছে জৈন ধর্মাচার্যের মধ্যে কেহ না কেহ হামেশাই আসিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেন। তাঁহারাও বাবার সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে ও সাংসারিক বিষয়ে কথাবার্তা বলিতেন। ইহা ভিন্ন বাবার মুসলমান ও পারসী বন্ধুও ছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ ধর্মের আলোচনা তাঁহার সহিত করিতেন। তিনিও সম্মানের সহিত এবং অনেক সময় রসের সহিত তাহা শুনিতেন। এই সব কথাবার্তার সময় আমি সেবা-শুশ্রূষার কাজ করিতাম বলিয়া উপস্থিত থাকিতাম। এই সকল পরিবেশের প্রভাব আমার উপর পড়ে। ফল এই হইল যে, সকল ধর্মের প্রতিই আমার মধ্যে সমান ভাব দেখা দিল।

কেবল খ্রীষ্টধর্মই বাদ ছিল। উহার প্রতি আমার বিরূপ মনোভাব ছিল। সেই সময় হাইস্কুলের এক কোণে দাঁড়াইয়া পাদরীরা কখনও কখনও খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। এই বক্তৃতায় হিন্দু-দেবতা ও হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদিগকে গালি দেওয়া হইত। ইহা আমার কাছে অসহ্য লাগিত। মাত্র একদিনই আমি বক্তৃতা শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম। কিন্তু সেই একদিনই যথেষ্ট। তারপর আর দাঁড়াইবার প্রয়োজন হয় নাই। এই সময় শোনা গেল এক নামজাদা হিন্দু খ্রীষ্টান হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও রটিয়া গেল যে, তাঁহাকে খ্রীষ্টান হওয়ার সময় গোমাংস খাইতে হইয়াছে, মদ খাইতে হইয়াছে ও তাঁহার পোশাকও বদলানো হইয়াছে। এখন তিনি খ্রীষ্টান হইয়া কোট, পাত্‌লুন ও হ্যাট পরিতেছেন। এই কথা শুনিয়া আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া যায়। বাস্তবিক আমি ভাবিতাম—যে ধর্মের জন্য গোমাংস খাইতে হয়, মদ খাইতে হয়, পোশাক বদলাইতে হয়, সে আবার কেমন ধর্ম ? আরও শুনিলাম যিনি খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের ধর্মের, আচার-নিয়মের ও দেশের

নিন্দা আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল হইতেই খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আমার মনে বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল।

এই প্রকারে, অন্য সকল ধর্মের প্রতি যদিও একটা সমভাব জাগিয়াছিল, তথাপি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল—একথা বলা যায় না। এই সময় একদিন বাবার বই দেখিতে দেখিতে মনুসংহিতার অনুবাদ হাতে পড়িল। উহাতে জগতের উৎপত্তি ইত্যাদির কথা পড়িলাম। পড়িয়া উহার উপর শ্রদ্ধা ত জন্মিলই না বরং কতকটা নাস্তিক ভাব আসিল। আমার ছোট কাকার এক ছেলে, তিনি এখনও জীবিত আছেন, তাঁহার বুদ্ধির উপর আমার খুব বিশ্বাস ছিল। তাঁহার কাছে আমার সংশয়ের বিষয় বলিলাম। তিনিও তাহার কিছু সমাধান করিয়া দিতে পারিলেন না। তিনি উত্তর দিলেন—"বয়স হইলে এই সকল প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে পারিবে, এই সকল প্রশ্ন ছেলেদের করিতে নাই।" আমি চুপ করিয়া গেলাম। কিন্তু মনে শান্তি আসিল না। মনুসংহিতার খাদ্যাখাদ্য প্রকরণে ও অন্য প্রকরণেও প্রচলিত প্রথার সহিত বিরোধ দেখিতে পাইলাম। আমি মনে মনে ঠিক করিলাম—"কোনও দিন বুদ্ধি খুলিবে, তখন পড়িব ও বুঝিতে পারিব।"

এই সময় মনু-স্মৃতি পড়িয়া আমি অন্ততঃ অহিংসার শিক্ষা পাই নাই। আমার মাংসাহারের কথা ত পূর্বেই বলিয়াছি। মনু-স্মৃতিতে উহার সমর্থন পাইলাম। সর্পাদি ও পোকামাকড় মারা নীতি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। এই সময় ধর্মকার্য মনে করিয়া পোকামাকড় ইত্যাদি যে মারিয়াছি সে কথা আমার মনে আছে।

কিন্তু একটা বিষয়ের ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইল—এই জগৎ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আবার নীতিমাত্রই সত্যভিত্তিক। সত্যই নীতির আশ্রয়। সেই সত্যেরই অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। দিনে দিনে সত্যের মহিমা আমার কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল—সত্যের সংজ্ঞার পরিধিও বিস্তৃত হইতে লাগিল, আজও সেই বিস্তৃতি ক্রমবর্ধমান।

একটা গুজরাটী নীতিকথার কবিতাও এইরূপে আমার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায়। ইহার উপদেশ—অপকারের বদলে অপকার নহে, উপকারই দিতে পারা যায়—আমার জীবনের আদর্শ হইয়া গেল। উহা আমার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। অপকারীর ভাল করার ইচ্ছার প্রতি ক্রমে ক্রমে অনুরাগ জন্মিল। আমি তাহার বহু পরীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সেই চমৎকার লাইন কয়টি এইরূপ :--

পান করিবার জল যদি পাও, অন্ন করিও দান,
মিষ্টি কথাটি ভাগ্যে জুটিলে, মাটিতে নোয়ায়ো শির,
কড়ির বদলে দান করে যেয়ো তুমি মোহরের থান,
পরাণ বাঁচালে—জীবন দিবার দুঃখ বরিও বীর।
জ্ঞানী যারা—করে কথা ও কাজের এমনি ক'রেই মিল,
যে কোনো ক্ষুদ্র সেবার তাহারা দশগুণ দেয় ফিরে,
সকল মানুষে এক বলে জানে মহৎ জনের দিল,
অপকার যারা করেছে তাদেরও উপকারে রাখে ঘিরে।

১১

বিলাত যাত্রার উদ্যোগ

আমি ১৮৮৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করি। দেশের সাধারণ মানুষের ও গান্ধী পরিবারের তখন এমনই গরীবী চাল ছিল যে, বোম্বাই ও আহ্‌মেদাবাদ এই দুই স্থানের যে কোনও স্থানে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিলেও কাথিয়াওয়াড়ের লোকেরা বোম্বাই না গিয়া নিকটবর্তী বলিয়া ও কম খরচের জন্য আহ্‌মেদাবাদে যাওয়াই পছন্দ করিত। আমার ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। রাজকোট হইতে আহ্‌মেদাবাদ, এই আমার প্রথম এবং একক যাত্রা।

গুরুজনদের ইচ্ছা ছিল ম্যাট্রিক পাস করার পর কলেজে গিয়া আরও পড়ি। কলেজ বোম্বাইতে ও ভবনগরে ছিল। ভবনগরের খরচ কম বলিয়া সেইখানে শামলদাস কলেজে পড়িতে যাওয়া ঠিক হইল। সেখানে গিয়া আমি কিছুই বুঝি না, সব মুশকিল বোধ হয়। অধ্যাপকেরা যাহা পড়ান তাহাতে না পাই আনন্দ, না পারি বুঝিতে। ইহাতে অধ্যাপকদের দোষ ছিল না। তখনকার দিনে শামলদাস কলেজে যাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক বলিয়া গণ্য ছিলেন। আমি-ই কাঁচা ছিলাম। প্রথম পর্ব বা টার্ম শেষ হওয়ার শেষে বাড়ী আসিলাম।

মাভজী দাভে নামে আমাদের পরিবারের পরিচিত ও পরামর্শদাতা এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বিদ্বান, ব্যবহার-অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। বাবার মৃত্যুর পরেও তিনি আমাদের পরিবারের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন

এবং আমার এই ছুটির সময় আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। মা ও দাদার সঙ্গে কথাবার্তার সময় আমার পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি শামলদাস কলেজে পড়ি শুনিয়া বলিলেন—"সময় বদলাইয়াছে। এই ভাইদের মধ্যে কাহাকেও দিয়া যদি কাবা গান্ধীর স্থান লওয়াইতে চাও, তবে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত না করিলে হইবে না। এই ছেলে এখনও পড়িতেছে, কাবা গান্ধীর গদি লওয়ার ভার ইহাকেই লইতে হইবে। এখনও ত ইহার বি-এ পাস করিতেই ৪।৫ বৎসর লাগিবে। আর তাহা হইলেও মাত্র পঞ্চাশ-ষাট টাকার চাকরি মিলিবে, দেওয়ানী পাওয়া যাইবে না। যদি আমার ছেলের মত আইন পড়িতে যায়, তাহা হইলে আরও সময় লাগিবে এবং ততদিন দেওয়ানী পাওয়ার জন্য অনেকে ওকালতী পাস করিয়া আসিয়া জুটিবে। আমি বলি, তোমাদের উহাকে বিলাত পাঠানো দরকার। কেবলরাম (মাভজী দাভের পুত্রের নাম) বলে—সেখান হইতে সহজেই ব্যারিস্টার হইয়া আসা যায়। তিন বৎসর পড়িয়া ফিরিয়া আসিতে পারে। খরচ চার-পাঁচ হাজার টাকার বেশী হইবে না। দেখ না, সেই যে নূতন ব্যারিস্টার আসিয়াছে সে কেমন জঁাকজমকের সহিত থাকে। সে যদি দেওয়ানী চায় তবে আজই পায়। আমার মতে তোমাদের মোহনদাসকে এই বৎসরই বিলাত পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। কেবলরামের বিলাতে অনেক বন্ধু আছে, সে তাহাদের নিকট পরিচয় দিয়া দিলে সেখানে কোনও অসুবিধা হইবে না।" যোশীজী (আমরা মাভজীকে যোশীজী বলিয়া ডাকিতাম) তাঁহার পরামর্শ যে লওয়া হইবেই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ না করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল, বিলাত যাইতে ইচ্ছা হয়, না এইখানেই পড়িবে ?"

আমার কাছে আর ইহা অপেক্ষা প্রিয়তর প্রস্তাব কি হইতে পারে! কলেজে পড়া চালানো আমার পক্ষে ভয়ের বিষয় ছিল। আমি বলিলাম—"আমাকে বিলাত পাঠাইলে ত খুব ভালই হয়, কলেজে তাড়াতাড়ি পাস করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। তবে আমাকে ডাক্তারী শিখিবার জন্য পাঠান না কেন ?"

আমার দাদা বলিলেন—"ডাক্তারী পড়া বাবা পছন্দ করিতেন না। তোমার কথাতেই বলিতেন যে, আমাদের বৈষ্ণবদের মড়া-কাটা-ছেঁড়ার কাজ করিতে নাই। বাবার ইচ্ছা ছিল তোমাকে উকীল করা।"

যোশীজী যোগ দিয়া বলিলেন—"আমার কাছে ডাক্তারী ব্যবসা গান্ধীজীর

মত খারাপ লাগে না। আমাদের শাস্ত্রও ইহার বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু ডাক্তার হইলে ত দেওয়ান হওয়া যায় না। আমার মনে হয়, উহার দেওয়ানী বা তাহা অপেক্ষাও বড় কিছু কাজ পাওয়া দরকার। তাহা হইলে ও তোমাদের এত বড় পরিবারের ভার লইতে পারিবে। দিন বদলাইতেছে আর কঠিনও হইতেছে। এখন ব্যারিস্টার হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।" মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আজ তবে যাই। আমার কথাটা ভাবিয়া দেখিও। যখন আবার আসিব, আশা করি, তখন বিলাত পাঠাইবার জন্য তৈরী হইতেছ দেখিব। যদি কোনও অসুবিধা হয় তবে আমাকে জানাইও।"

যোশীজী চলিয়া গেলেন। আমি আকাশ-কুসুম রচনা করিতে লাগিলাম। বড় ভাই চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। টাকার কি করা যাইবে? তাছাড়া, আমার মত যুবককে এতদূরে কেমন করিয়া পাঠানো যায়?

মায়ের ইহা ভাল লাগিল না। আমাকে ছাড়িয়া থাকার ব্যাপারটা তাঁহার মনঃপূত হইল না। তবে প্রথমে তিনি এইরূপ বলিলেন—"আমাদের পরিবারের মধ্যে তোমার কাকাই বড়। সেইজন্য প্রথমেই তাঁহার মত লইতে হয়। তিনি যদি অনুমতি দেন তখন বুঝা যাইবে।"

দাদা অন্য কথা ভাবিতেছিলেন—"পোরবন্দর রাজ্যের উপর আমাদের একটা দাবী আছে। লেলী সাহেব সেখানকার এড্‌মিনিস্ট্রেটর। আমাদের পরিবার সম্বন্ধে তাঁহার ভাল ধারণা আছে। কাকাকে তিনি সুনজরে দেখেন। যদি তিনি ঐ রাজ্য হইতে এই পড়ার খরচের কিছু সাহায্য করেন!"

প্রস্তাবটা আমার কাছে মন্দ লাগিল না। আমি পোরবন্দর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তখন রেল ছিল না, গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত। পাঁচ দিনের রাস্তা ছিল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি—আমি স্বভাবতঃই ভীরু ছিলাম। কিন্তু এখন আমার ভয় চলিয়া গেল। বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা আমাকে চাপিয়া বসিয়াছিল। আমি ধোরাজী পর্যন্ত গাড়ী করিলাম। একদিন আগে পৌঁছিবার জন্য ধোরাজী হইতে উট ভাড়া করিলাম। এই প্রথম আমার উটে চড়ার

পোরবন্দর পৌঁছিয়া কাকাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। বিলাত যাওয়া সম্পর্কে সমস্ত কথাও তাঁহাকে বলিলাম। তিনি চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন—"বিলাত যাওয়া আমাদের ধর্ম-সঙ্গত কিনা তাহা আমি জানি না। ওখানকার যে সকল কথা শুনিয়া থাকি, তাহাতে আমার মনে ভয় হয়। বড় বড়

ব্যারিস্টারের সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তাঁহাদের চাল-চলন ও সাহেবদের চাল-চলনে আমি কোনও ভেদ দেখি না। তাহাদের পানাহারে কোন বাছবিচার নাই। চুরুট ত মুখে লাগিয়াই আছে সর্বদা। পোশাক-পরিচ্ছদও ইংরেজের পোশাকের মত অশিষ্ট। এ সকল আমাদের পরিবারের সঙ্গে খাপ খায় না। আমি অল্প দিনের মধ্যেই তীর্থ যাত্রা করিতেছি। পৃথিবীতে আর কয় দিনই বা আমার মেয়াদ আছে। এই সময় আমি তোমাকে বিলাত যাওয়ার—সমুদ্র পার হওয়ার আজ্ঞা কেমন করিয়া দিই? কিন্তু তোমার আকাঙ্ক্ষায় আমি বাধা দিতে চাই না। বিঘ্নও হইতে চাই না। কিন্তু সত্যকার অনুমতি দেওয়ার কর্তা তোমার মা। যদি তিনি তোমাকে অনুমতি দেন, তবে তুমি খুশি-মনে যাও। আমি তোমাকে বাধা দিব না—এইটুকু বলিতেছি। আমার আশীর্বাদ ত তোমার উপরে আছেই।"

আমি বলিলাম—"আপনার নিকট হইতে ইহার বেশী আশা করি না। এখন মাকে রাজী করাইতে হইবে। তবে লেলী সাহেবের নিকট পরিচয়-পত্র দিবেন ত?"

কাকা বলিলেন—"সে আমি কেমন করিয়া দিব? তবে সাহেব ভাল লোক। তুমি চিঠি লেখ। পরিবারের পরিচয় পাইলে তোমার সহিত তিনি অবশ্যই দেখা করিবেন, এবং যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় তবে সাহায্যও করিবেন।"

জানি না কাকা সাহেবের নিকট পত্র কেন দিলেন না। তবে আমার অস্পষ্ট মনে হয় যে, বিলাত যাওয়া অধর্ম কার্য মনে করিয়া তাহাতে এই সহজ সাহায্য দিতেও তাঁহার সঙ্কোচ হইতেছিল।

আমি লেলী সাহেবকে লিখিলাম। তিনি তাঁহার বাসভবনে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া কাটা-কাটা ভাবে বলিলেন, "আগে তুমি বি-এ পাস কর। তাহার পর আমার সঙ্গে দেখা করিও, এখন কোনও সাহায্য করা হইবে না।"—এই কথা বলিয়াই তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। আমি বিশেষভাবে তৈরী হইয়া অনেকগুলি কথা মুখস্থ করিয়া গিয়াছিলাম, নিচে নামিতে দুই হাতে সেলামও করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সকল পরিশ্রমই বৃথায় গেল। এইবার আমার দৃষ্টি পড়িল আমার স্ত্রীর গহনার উপরে। দাদার উপর গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। তাঁহার উদারতার সীমা ছিল না। তিনি আমাকে পিতার মত স্নেহ করিতেন।

আমি পোরবন্দর হইতে রাজকোট ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত কথা বলিলাম।

যোশীজীর সঙ্গেও কথাবার্তা হইল। তিনি টাকা কর্জ করিয়াও আমাকে বিলাতে পাঠাইতে বলিলেন। আমি আমার স্ত্রীর গহনা বেচিয়া ফেলার প্রস্তাব দিলাম। উহাতে বড়জোর দুই তিন হাজার টাকা হইতে পারে। যেমন করিয়া পারেন টাকা যোগাইবার ভার দাদা-ই লইলেন।

কিন্তু মাকে কি অত সহজে বুঝানো যায়? তিনি নানারকম খোঁজখবর আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেহ বলে—যুবকেরা বিলাত গিয়া নষ্ট হইয়া যায়, কেহ বলে—সেখানে মাংসাহার করে, কেহ বলে—সেখানে মদ না খাইলে চলেই না। মা এসব কথা আমাকে শুনাইলেন। আমি বলিলাম—"তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করিতে পার না? আমি তোমাকে প্রতারণা করিব না। দিব্য লইয়া বলিতেছি যে, ঐ তিন দ্রব্য স্পর্শ করিব না। এত যদি ভয় থাকিত তবে যোশীজী কি আমাকে যাইতে দিতেন?"

মা বলিলেন—"তোমার উপরে আমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু দূর-দেশে কেমন করিয়া থাকিবে? কি যে করিব—আমার বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না। আমি বেচারজী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিব।"

বেচারজী মোঢ় বানিয়া হইতে জৈন সাধু হইয়াছেন। ইনি যোশীজীর মতই আমাদের পরিবারের পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি সাহায্য করিলেন। তিনি বলিলেন—"ছেলের কাছ হইতে ঐ তিন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা লইতে হইবে। তারপর উহাকে যাইতে দিলে আর কোনও ক্ষতি হইবে না।" তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন এবং আমি মাংস, মদ ও স্ত্রীসংসর্গ হইতে দূরে থাকার প্রতিজ্ঞা লইলাম। মা অনুমতি দিলেন।

হাইস্কুলে বিদায়-অভিনন্দন হইল। রাজকোটের এক যুবক বিলাত যাইতেছে ইহা এক আশ্চর্য ঘটনা। অভিনন্দনের জবাব দেওয়ার জন্য আমি কিছু লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু জবাব দেওয়ার কালে তাহা পড়াই হইল না। মাথা ঘুরিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল—একথা স্মরণ আছে।

গুরুজনের আশীর্বাদ লইয়া বোম্বাই যাওয়ার জন্য বাহির হইলাম। বোম্বাইয়ে এই প্রথম যাওয়া। দাদা সঙ্গে আসিলেন।

কিন্তু ভাল কাজে ত বিঘ্ন হইবেই। বোম্বাইয়ের বাধা শীঘ্র কাটার মত ছিল না।

১২

জাতিচ্যুত

মায়ের অনুমতি ও তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া, কয়েক মাসের এক খোকার সহিত স্ত্রীর কাছ হইতে বিদায় লইয়া আমি মনের আনন্দে বোম্বাই পৌঁছিলাম। পৌঁছিলাম সত্য, কিন্তু সেখানকার বন্ধু-বান্ধবেরা দাদাকে বলিলেন যে, জুন-জুলাই মাসে ভারত মহাসাগরে ঝড় হয়—আর আমার এই প্রথম সমুদ্র-যাত্রা। সুতরাং দীপান্বিতার পর অর্থাৎ নভেম্বর মাসে আমাকে পাঠানোই ভাল। আবার একজন ঝড়ে একখানা জাহাজ-ডুবির খবর দিলেন। এইরূপ বিপদের মুখে আমাকে পাঠাইতে দাদা রাজী হইলেন না। তিনি আমাকে বোম্বাইএ এক বন্ধুর কাছে রাখিয়া নিজের চাকুরিতে যোগ দেওয়ার জন্য রাজকোটে ফিরিয়া গেলেন। এক ভগ্নীপতির নিকট আমার যাওয়ার খরচ রাখিয়া গেলেন ও আমাকে সাহায্য করিতে কয়েকজন বন্ধুকেও বলিয়া গেলেন।

বোম্বাইএ আমার দিন আর কাটিতেছিল না। আমি বিলাতের স্বপ্নে মগ্ন ছিলাম।

এদিকে আমাদের স্বজাতির মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দিল। স্বজাতির লোকদের লইয়া সভা ডাকা হইল। এ পর্যন্ত কোনও মোঢ় বানিয়া বিলাত যায় নাই। আমি যদি যাইতে চাই তবে তাঁহাদের সম্মুখে আমাকে হাজির হইতে হইবে। আমার উপর জাত-ভাইদের বাড়ীতে হাজির হওয়ার আদেশ আসিল।

আমি সভায় উপস্থিত হইলাম। হঠাৎ কোথা হইতে আমার সাহস আসিল। আমার হাজির হইতে সংকোচ হইল না, ভয় হইল না। জাতির প্রধান ব্যক্তি শেঠের সহিত আমাদের দূর সম্পর্কও ছিল। পিতার সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ত বেশ ভাল রকমই ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন—"আমাদের জাতির বিচারে তোমার বিলাত যাওয়া ঠিক নয়। আমাদের ধর্মে সমুদ্র পার হওয়া নিষিদ্ধ। তা ছাড়া আরও শুনিয়াছি, বিলাতে ধর্মরক্ষা করিয়া চলা যায় না। সেখানে সাহেবদের সঙ্গেই পানাহার করিতে হয়।"

আমি জবাব দিলাম—"আমি ত বুঝি, বিলাত যাওয়ার কিছুমাত্র অধর্ম নাই। আমাকে সেখানে গিয়া পড়াশুনা করিতে হইবে। যেসব বিষয়ে আপনাদের ভয় আছে, সে সকল হইতে দূরে থাকার জন্য আমি মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। সুতরাং আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি যে, এই প্রতিজ্ঞা আমাকে

নিশ্চয়ই রক্ষা করিবে।"

শেঠ বলিলেন—"কিন্তু আমরা তোমাকে বলিতেছি, সেখানে গেলে ধর্ম থাকে না। তুমি জান, তোমার পিতার সহিত আমার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল। আমার কথা তোমার শোনা উচিত।"

আমি বলিলাম—"আপনার সহিত সম্বন্ধের কথা আমি জানি, আপনি আমার গুরুজন। কিন্তু এ বিষয়ে আমি একান্ত নিরুপায়। আমার বিলাত যাওয়ার সংকল্প আমি ত্যাগ করিতে পারিব না। আমার পিতৃদেবের বন্ধু ও পরামর্শ-দাতা এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি বলেন যে, বিলাত যাওয়ায় কোনও দোষ নাই। আমার মায়ের ও দাদার অনুমতিও আমি পাইয়াছি।"

"কিন্তু জাতের হুকুম কি ঠেলিয়া ফেলিবে?"

"আমি নিরুপায়। আমার মনে হয় জাতির ইহাতে হাত দেওয়া উচিত নয়।"

এই জবাবে শেঠের ক্রোধ হইল। আমাকে তিনি দুই-চার কথা শুনাইয়া দিলেন। আমি সহজ ভাবে বসিয়া রহিলাম। শেঠ হুকুম করিলেন—"এই ছোকরাকে আজ হইতে একঘরে বলিয়া জানিবে। যে ইহাকে সাহায্য করিবে, অথবা যে বিদায়ের সময় ইহার সঙ্গে যাইবে, তাহাকে পাঁচসিকা জরিমানা দিতে হইবে।"

এই আদেশ আমার উপরে কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। আমি শেঠের নিকট বিদায় লইলাম। কিন্তু ইহার প্রভাব আমার দাদার উপর কেমন হইবে তাহা বিচার করার বিষয়। তিনি যদি ভয় পান? সৌভাগ্যবশতঃ তিনি দৃঢ় রহিলেন এবং আমাকে জানাইলেন যে, জাতির নির্দেশ সত্ত্বেও তিনি আমার বিলাত-যাত্রা আটকাইবেন না।

এই ঘটনার পর আমি বড় অধীর হইয়া পড়িলাম। দাদার উপর চাপ দেওয়া হইবে ত! যদি আর কোনও বিঘ্ন আসে? এই প্রকার চিন্তা করিয়া যখন দিন কাটাইতেছিলাম, তখনই খবর পাইলাম যে, ৪ঠা সেপ্টেম্বরের জাহাজে জুনাগড়ের এক উকীল, ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য বিলাত যাইবেন। যে সকল বন্ধুর কথা দাদা বলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত দেখা করিলাম। এ সুবিধা ছাড়িতে নাই, একথা তাঁহারাও বলিলেন। সময় খুব অল্পই ছিল। ভাইয়ের নিকট 'তার' করিয়া অনুমতি চাহিলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি ভগ্নীপতির নিকট টাকা চাহিলাম। তিনি জাতির হুকুমের কথা

বলিলেন এবং সেই সঙ্গেই বলিলেন—তিনি জাতির বাহির হইতে পারিবেন না। পরিবারের এক কুটুম্বের নিকট গেলাম। আমার ভাড়া ইত্যাদির জন্য যাহা লাগে তাহা এখন দিয়া পরে ভাইয়ের নিকট হইতে তাহা লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, উপরন্তু আমাকে সাহসও দিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম, টাকা লইলাম ও টিকিট কিনিলাম।

বিলাতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিস কিনিবার ছিল, একজন অভিজ্ঞ বন্ধুর সাহায্যে এইবার তাহা সংগ্রহ করিলাম। এ সকল জিনিস আমার ভারি বিচিত্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কতক পছন্দ হইল—কতক হইল না। নেকটাই পরে শখ করিয়া পরিতাম, কিন্তু এখন মোটেই পছন্দ হইল না। ওয়েস্ট-কোট পরা আমার কাছে অশোভন ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু বিলাত যাওয়ার শখ সামনে থাকিলে অপছন্দ ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। সঙ্গে যথেষ্ট খাবার লইলাম।

জুনাগড়ের সেই উকীলের নাম ত্র্যম্বকরায় মজুমদার। আমার স্থান, বন্ধুরা তাঁহার কেবিনেই করিয়া দিলেন। আমাকে দেখা-শুনা করার জন্যও তাঁহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তিনি পূর্ণবয়স্ক অভিজ্ঞ গৃহস্থ আর আমি আঠারো বছরের অনভিজ্ঞ যুবক। আমার সম্বন্ধে শ্রীমজুমদার বন্ধুদের আশ্বাস দিলেন।

এইভাবে ১৮৮৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমি বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করিলাম।

১৩

অবশেষে বিলাতে

সমুদ্র-যাত্রায় কাহারও কাহারও (sea-sickness) গা-বমি বোধ হয়। আমার তাহা আদৌ হয় নাই। যতই দিন যাইতেছিল ততই আমি অস্থির হইয়া উঠিতেছিলাম। স্টুয়ার্ডের সহিত কথা বলিতেও আমার লজ্জা বোধ হইত। ইংরাজীতে কথা বলার অভ্যাস ছিল না। এক মজুমদার ছাড়া সেকেণ্ড সেলুনের আর সকল যাত্রীই ইংরেজ ছিলেন। তাঁহাদের সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিলেও, আমি তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারিতাম না। বুঝিতে পারিলেও

জবাব দিতে পারিতাম না। প্রত্যেক বাক্য বলার পূর্বে মনে মনে সাজাইয়া লইতে হইত। কাঁটা-চামচে খাইতে জানিতাম না। কোনও খাদ্যে মাংস আছে কি নাই তাহা জিজ্ঞাসা করার সাহসও ছিল না। সেই জন্য খানা খাওয়ার টেবিলে কখনো খাই নাই—নিজের কামরাতেই খাইতাম। আমার সঙ্গে যে মিঠাই ও ফল লইয়াছিলাম প্রধানতঃ তাহারই উপর নির্ভর করিতাম। শ্রীমজুমদারের কোন সংকোচ ছিল না। তিনি সকলের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ডেকের উপর স্বাধীনভাবে বেড়াইতেন, আমি সারাদিন কামরায় কাটাইতাম এবং যখন ডেকে লোক কম থাকিত কেবল তখনই অল্প সময়ের জন্য ডেকের উপর ঘুরিয়া আসিতাম। মজুমদার আমাকে সকলের সহিত মিশিতে বলিতেন, খোলাখুলিভাবে কথা বলিতে বলিতেন, আর বলিতেন যে, উকীলের মুখে খৈ ফোটা চাই। তিনি তাঁহার ওকালতীর গল্প করিতেন। ইংরাজী আমাদের ভাষা নয়, উহা বলিতে ভুল ত হইবেই, তবুও অসংকোচে বলা চাই, ইত্যাদি বলিতেন। কিন্তু আমার ভীরুতা কিছুতেই ঘুচিত না।

অবশেষে দয়া করিয়া একজন ভাল ইংরাজ আমার সহিত কথা বলিতে ও পরিচয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বেশী। আমি কি খাই, কোথায় থাকি, কোথায় যাইব, লোকের সঙ্গে কেন কথাবার্তা বলি না—এই সব কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর আমাকে খাওয়ার সময় খাওয়ার ঘরে যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে আমার মাংস না খাওয়ার কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি হাসিয়া বন্ধুভাবে বলিলেন—"এখন ত আমরা লোহিত সাগরে। কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু বিস্কে উপসাগরে পৌঁছিলে তখন বুঝিতে পারিবে। ইংলণ্ডে ত এত শীত যে মাংস ছাড়া চলেই না।"

আমি বলিলাম—"সেখানে লোক মাংসাহার না করিয়াও থাকিতে পারে শুনিয়াছি।"

তিনি বলিলেন—"জানিয়া রাখ, ও মিথ্যা কথা। আমার পরিচিত এমন কেহই নাই যিনি মাংস খান না। দেখ আমি মদ খাই, তবু তোমাকে মদ খাইতে বলিতেছি না, কিন্তু মাংস খাওয়া দরকার। ও ছাড়া চলে না।"

আমি বলিলাম—"আপনার এই সহৃদয় পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু মাংস না খাওয়ার জন্য মায়ের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি। সেই জন্য আমার দ্বারা মাংস খাওয়া হইবে না। যদি উহা ছাড়া একেবারেই না চলে, তবে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিব। তবুও মাংস কিছুতেই খাইব না।"

বিস্কে উপসাগরে আসিলাম কিন্তু সেখানেও আমি মাংস বা মদের কোনও আবশ্যকতা বোধ করিলাম না। মাংস যে খাই না সে সম্বন্ধে প্রমাণ-পত্র সংগ্রহ করার কথা কেহ কেহ বলিয়া ছিলেন। সেই ইংরাজ মিত্রটির নিকট হইতে আমি সার্টিফিকেট লইলাম। তিনি খুশী হইয়া তাহা দিলেন। উহা কিছুদিন পর্যন্ত মূল্যবান বস্তুর ন্যায় যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। পরে যখন দেখিলাম যে, মাংস খাওয়া সত্ত্বেও ওরূপ প্রমাণ-পত্র পাওয়া যায়, তখনই এই প্রমাণপত্রের উপর হইতে আমার মোহ দূর হয়। বস্তুতঃ যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে প্রমাণ-পত্র দেখাইয়া আমার কি লাভ হইবে ?

সুখে দুঃখে পথ শেষ করিয়া আমরা সাউদাম্পটন বন্দরে পঁহুছিলাম। যতদূর মনে হয়, সেদিন শনিবার ছিল। আমি স্টীমারে কালো রঙের কাপড়-চোপড় পরিতাম। আমার বন্ধু আমার জন্য একটি সাদা কোট ও পাতলুনও তৈরী করাইয়াছিলেন। আমি বিলাতে নামার সময় মনে করিলাম যে, সাদা কাপড়েই ভাল দেখাইবে। তাই আমি ফ্লানেলের পোশাক পরিয়া নামিলাম। সেপ্টেম্বরের শেষ দিক ছিল। ঐ রকম পোশাক আমি একাই পরিয়াছি দেখিলাম। আমার বাক্স ও চাবি গ্রিণ্ডলে কোম্পানীর হাতে দেওয়া হইয়াছিল। সকলেই ঐরূপ করিতেছে দেখিয়া আমারও ঐরূপ করিতে হইবে ভাবিয়া আমার জিনিসপত্র ও চাবি পর্যন্ত আমি তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।

আমার নিকট চারিখানা পরিচয়-পত্র ছিল—ডাক্তার প্রাণজীবন মেহতা, দৌলতরাম শুকুল, প্রিন্স রণজিৎ সিংহজী ও দাদাভাই নওরোজীর নামে। আমি সাউদাম্পটন হইতে ডাক্তার মেহতার নিকট তার করিলাম। স্টীমারে একজন ভিক্টোরিয়া হোটেলে উঠিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সেইজন্য শ্রীমজুদার ও আমি সেই হোটেলে গিয়াই উঠিলাম। একে ত সাদা কাপড়ের জন্য আমি লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলাম, তাহার উপর আবার হোটেলে যাইয়া যখন খবর পাইলাম যে, পরদিন রবিবার বলিয়া সোমবারের আগে জিনিসপত্র পাওয়া যাইবে না তখন অত্যন্ত বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়িলাম।

সন্ধ্যা সাতটা-আটটার সময় ডাক্তার মেহতা আসিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। আমাকে লইয়া কিছু কৌতুক করিলেন হাসিলেন। আমি খেয়াল না করিয়া তাঁহার রেশমের রোঁয়াদার টুপী নামাইয়া লইলাম এবং তাহার উপর উল্টাভাবে হাত বুলাইতে লাগিলাম। ইহাতে সেখানটায় টুপীর

রোঁয়া খাড়া হইয়া গেল। ডাক্তার মেহতা দেখিয়া ভ্রূকুটি করিলেন এবং তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ক্ষতি যাহা হওয়ার তখন তাহা হইয়া গিয়াছে। তবে ইহার ফলে আমি ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়ার শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম।

এই ঘটনা হইতেই ইউরোপের আচার-নিয়ম ও ভদ্রতা সম্বন্ধে আমার প্রথম পাঠ শুরু হইল। ডাক্তার মেহতা হাসিতে হাসিতে এ বিষয়ে নানাকথা বুঝাইতে লাগিলেন—কাহারও জিনিস ছুঁইও না, পরিচয় না থাকিলেও ভারতবর্ষে আমরা যেমন প্রশ্ন করিতে পারি, এখানে তাহা চলিবে না। জোরে কথা বলিও না। ভারতবর্ষে সাহেবের সঙ্গে কথা বলিতে 'স্যার' বলার রীতি আছে। এখানে উহা অনাবশ্যক। এখানে চাকর মনিবকে অথবা উপরের কর্মচারীকে 'স্যার' সম্বোধন করে। তাঁহার সহিত থাকা সম্বন্ধেও কথা হইল। তিনি বলিলেন যে, হোটেলে খরচ বেশী পড়িবে, কোনও গৃহস্থ পরিবারে থাকা ভাল। এ বিষয় আরও আলোচনা সোমবার পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইল। কিছু উপদেশ দিয়া ডাক্তার মেহতা বিদায় লইলেন।

হোটেলে থাকিতে আমাদের দুইজনেরই বিরক্তিকর ও কষ্টকর বোধ হইতেছিল। হোটেলের খরচও অতিরিক্ত। মাল্টা হইতে এক সিন্ধী যাত্রী উঠিয়াছিলেন। শ্রীমজুমদারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। লণ্ডন তাঁহার চেনা জায়গা। তিনি আমাদের জন্য দুইটা কামরা খুঁজিয়া দেওয়ার ভার লইলেন। আমরা সম্মত হইলাম। সোমবার জিনিস পাইলে হোটেলের বিল চুকাইয়া সিন্ধী ভাইয়ের ঠিক-করা কামরায় গিয়া উঠিলাম। আমার স্মরণ হয়, আমার ভাগে হোটেল-বিল প্রায় তিন পাউণ্ড পড়িয়াছিল। আমি স্তম্ভিত হইলাম। অত টাকা দিয়াও না খাইয়াই ছিলাম। হোটেলের খাদ্যদ্রব্য ভাল লাগিত না। একটা খাদ্য লইলাম তাহা ভাল লাগিল না, আর একটা আনাইলাম—দাম দুইটারই দিতে হইল। বস্তুত আমি বোম্বাই হইতে যে খাবার আনিয়াছিলাম তাহাই খাইয়া ছিলাম বলা চলে।

সেই কামরাতে আসিয়াও আমি মন-মরা হইয়া রহিলাম। কিছুতেই সোয়াস্তি পাইতেছিলাম না। দেশের কথা কেবল মনে হইত। মায়ের ভালবাসার কথা কেবলই মনে পড়িত। রাত হইলে চোখ হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িত। ঘরের অনেক কথা মনে হইত। ঘুম আসিত না। এই দুঃখের কথা কাহাকে বলারও মত নয়। বলিয়া লাভ কি? আমি নিজেই জানিতাম না যে, কি প্রকারে মনকে শান্ত করিব। এখানকার লোক বিচিত্র, জীবন-যাত্রা বিচিত্র, ঘরও বিচিত্র।

বাড়ীতে থাকার রীতিনীতিও অজানা। কি বলিলে, কি করিলে রীতিভঙ্গ হয় সে সম্বন্ধেও কোনও জ্ঞান ছিল না। তাহার উপর নিরামিষ আহারের ব্যাপার ছিল। যাহা খাওয়া চলিত তাহাও বিস্বাদ লাগিত। আমার অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়াছিল। বিলাতে আসিয়াছি—এখন ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, দেশে ফিরিয়া যাওয়া চলিতেই পারে না। মন বলিতেছিল, তিন বৎসর এখানে পূর্ণ করিয়া যাইতেই হইবে।

১৪
আমার পছন্দ

ডাক্তার মেহতা সোমবার ভিক্টোরিয়া হোটেলে আমার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে আমার নূতন ঠিকানা পাইয়া এইখানে দেখা করিতে আসিলেন। আমার বোকামির জন্য স্টীমারে দাদ হইয়াছিল। স্টীমারে নোনা জলে স্নান করিতে হইত। সে জলে সাবান ব্যবহার চলে না। আমি সাবান ব্যবহার করা সভ্যতা মনে করিতাম। সেইজন্য সাবান মাখায়—শরীর সাফ হওয়ার পরিবর্তে চট্‌চটে হইত। ডাক্তার মেহতাকে দেখাইলাম। তিনি আমাকে এসেটিক্ এসিড দিলেন। এই ঔষধ লাগাইয়া আমাকে কাঁদিতে হইয়াছিল। ডাক্তার মেহতা আমার কামরা দেখিয়া মাথা নাড়িলেন। বলিলেন —"এ জায়গায় তোমার থাকা চলিবে না। এদেশে আসিয়া পড়াশুনা করা অপেক্ষা অভিজ্ঞতা লাভ, এদেশের আদবকায়দা চালচলন শেখা বেশী দরকার। এইজন্য কোনও পরিবারের সঙ্গে থাকা আবশ্যক। তাহার আগে এখন দিনকতক তোমাকে অন্ততঃ শিক্ষানবিশরূপে থাকিতে হইবে, তাই—ওখানে তোমাকে রাখিব বলিয়া মনে করিয়াছি। সেখানে তোমাকে লইয়া যাইব।"

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার প্রস্তাবে রাজী হইলাম এবং তাঁহার সেই বন্ধুর নিকট গেলাম। তাঁহার ব্যবহার সদয় ছিল। আদর-আপ্যায়নে ত্রুটি ছিল না। আমাকে তিনি নিজের ভাইয়ের মত রাখিলেন, ইংরাজী রীতিনীতি শিখাইলেন ও ইংরাজীতে কথা বলার অভ্যাস করাইলেন। এইবার আমার খাওয়ার প্রশ্নটা বড় হইয়া দাঁড়াইল। নুন ও মশলা ছাড়া সবজী রান্না ভাল লাগে না। গৃহস্বামিনী আমার জন্য কি রাঁধিবে? সকালে ওট-মিলের জাউ (Porridge) দিত, উহা দিয়াই পেট ভরাইতাম। কিন্তু দুপুরে ও সন্ধ্যায় প্রায় না খাইয়াই থাকিতে হইত। বন্ধুবর রোজ মাংসাহার করার জন্য বুঝাইতেন। আমি প্রতিজ্ঞার

কথা শুনাইয়া দিতাম। তাঁহার সঙ্গে তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিতাম না। দুপুরে কেবল রুটি পালংএর ভাজি ও মোরব্বা খাইয়া থাকিতাম। রাত্রিতেও তাহাই। রুটি দুই-তিন টুক্‌রা দিতেন, তাহাতে আমার কি হইবে? কিন্তু বেশী চাহিতে লজ্জা হইত। আমার পেট ভরিয়া খাওয়ার অভ্যাস ছিল। পেট বড় ছিল—ক্ষুধাও খুব লাগিত। দুপুরে ও সন্ধ্যায় দুধ মিলিত না। আমার এই অবস্থা দেখিয়া বন্ধু চটিয়া গিয়া বলিলেন—"যদি তুমি আমার নিজের ভাই হইতে তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চিত দেশে ফেরত পাঠাইয়া দিতাম। নিরক্ষর মায়ের কাছে এখানকার অবস্থা না জানিয়া যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে—তাহার মূল্য কি? ইহাকে প্রতিজ্ঞাই বলা যায় না। সেই প্রতিজ্ঞা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা কুসংস্কার মাত্র। আমি বলিতেছি শোন, তুমি এই প্রতিজ্ঞা লইয়া থাকিলে এ দেশ হইতে কিছুই লইয়া যাইতে পারিবে না। তুমিই বলিয়াছ যে, তুমি মাংস খাইয়াছ—তোমার খাইতেও ভাল লাগিয়াছে। যেখানে খাওয়ার কোনও আবশ্যক ছিল না সেখানে খাইয়াছ, আর যেখানে খাওয়ার আবশ্যক সেখানে খাইবে না! এ কেমন উদ্ভট ব্যাপার!"

কিন্তু আমি এতটুকুও টলিলাম না। আমার সেই এক কথা।

এই ধরনের তর্ক প্রতিদিনই চলিতে লাগিল। তিনি যতই বুঝাইতেন, আমার দৃঢ়তা ততই বাড়িত। রোজ ঈশ্বরের নিকট আমাকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করিতাম। তাঁহার অনুগ্রহও পাইয়াছিলাম। ঈশ্বর কে—সে সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু সেই রম্ভার দেওয়া শ্রদ্ধা নিজের কাজ করিতেছিল।

একদিন বন্ধুটি আমার নিকট বেন্থামের উপযোগিতাবাদ (থিওরি অব ইউটিলিটি) অধ্যায়টি পড়িয়া শোনাইতে লাগিলেন। আমি বিভ্রান্তিবোধ করিতেছিলাম। ভাষা অত্যন্ত কঠিন, আমি বুঝিলাম না। তিনি উহা বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন। আমি উত্তরে বলিলাম—"আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। আমি ইহার কোনও কথাই বুঝিতেছি না। মাংস খাওয়া উচিত—একথা আমি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞার বন্ধন আমি ভাঙিতে পারিব না। এ বিষয়ে তর্ক করিতে পারিব না। যুক্তিতে আমি জিতিতে পারিব না জানি। তবুও আমাকে নির্বোধ মনে করিয়া অথবা জেদী মনে করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করা ছাড়িয়া দিন। আপনার ভালবাসা আমি বুঝিতে পারি। আপনার বলার কারণও আমি বুঝিতে পারি। আপনাকে আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া গণ্য করি। আমাকে দেখিয়া

আপনার দুঃখ হয় বলিয়াই আপনি আগ্রহ করিতেছেন তাহা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমি নিরুপায়। প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই। আমি উহা ভাঙিতে পারিব না।"

বন্ধুটি অবাক হইয়া আমার দিকে তাকাইলেন। তিনি বই বন্ধ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, এখন আর যুক্তি-তর্ক করিব না।"—এই বলিয়া চুপ করিলেন। আমি খুশী হইলাম। অতঃপর তিনি আর যুক্তি-তর্ক করেন নাই।

কিন্তু আমাকে লইয়া তাঁহার দুশ্চিন্তা গেল না। তিনি সিগারেট খাইতেন, মদও খাইতেন। এসব খাইতে আমাকে একদিনও বলেন নাই। বরং না খাইতেই বলিতেন। কিন্তু মাংস না খাইয়া আমি দুর্বল হইয়া যাইব, ইংলণ্ডে ভালভাবে থাকিতে পারিব না—এই ছিল তাঁহার দুশ্চিন্তা।

এইরূপে এক মাস ধরিয়া আমার শিক্ষানবিশীর কাজ চলিল। বন্ধুর বাড়ী ছিল রিচমণ্ডে। এখান হইতে সপ্তাহে দুই-একবারের বেশী লণ্ডনে যাওয়া চলিত না। ডাক্তার মেহতা ও শ্রীদলপৎরাম শুক্ল মনে করিলেন এখন আমার কোনও ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে থাকা দরকার। শ্রীশুক্ল ওয়েস্ট-কেন্‌সিংটনে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার খুঁজিয়া আমাকে সেখানে পাঠাইলেন। গৃহস্বামিনী বিধবা ছিলেন। তাঁহাকে আমার মাংসাহার ত্যাগের কথা বলিলাম। সেই বৃদ্ধা আমার দেখাশুনার কাজ করিতে স্বীকার করিলেন। আমি সেইখানে রহিয়া গেলাম। এখানেও প্রায় না খাইয়া দিন কাটিতে লাগিল। আমি বাড়ী হইতে মিঠাই ও অন্যান্য খাওয়ার জিনিস চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তাহা তখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। সকল খাদ্যই খারাপ লাগে। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করেন কেমন লাগে, কিন্তু তিনি কি করিবেন। আমি যেমন লাজুক ছিলাম তেমনি রহিয়া গিয়াছিলাম—সেইজন্য বেশী চাহিতে লজ্জা হইত। বৃদ্ধার দুই কন্যা ছিল। তাহারা দুই-এক টুক্‌রা রুটি আগ্রহ করিয়া আমাকে বেশী দিত। কিন্তু সে বেচারীরা কি করিয়া জানিবে যে, ঐ আস্ত রুটিখানা খাইলে তবে আমার পেট ভরিবে!

এখন অনেকটা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিয়াছি। পাঠাভ্যাস আরম্ভ করি নাই। সংবাদপত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ইহা শ্রীশুক্লের কৃপায় হইয়াছিল। ভারতবর্ষে আমি কখনো সংবাদপত্র পড়ি নাই। অনবরত পড়িতে পড়িতে পড়ায় শখ জন্মিল। ডেলি নিউজ, ডেলি টেলিগ্রাফ, পেলমেল গেজেট্ ইত্যাদি সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলাইতাম। তাহাতে প্রথমে ঘণ্টাখানেকও লাগিত না।

আমি বেড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার নিরামিষ ভোজনালয়ের স্থান খোঁজার দরকার ছিল। গৃহস্বামিনী বলিয়াছিলেন যে, লণ্ডনে এমন অনেক ভোজনালয় আছে। আমি রোজ দশ-বারো মাইল হাঁটিতাম। কখনো কখনো গরীবদের ভোজনালয়ে গিয়া পেট ভরিয়া রুটি খাইয়া লইতাম। কিন্তু তাহাতে সন্তোষ হইত না। এইরকম ঘুরিতে ঘুরিতে আমি একদিন ফেরিংডন স্ট্রীটে পঁহুছিলাম এবং ভেজিটেরিয়ান্ রেস্তরাঁ (নিরামিষ ভোজনালয়)—এই পড়িলাম। ছেলেরা মনের মত জিনিস পাইলে যেমন আনন্দ পায়, আমারও তাহাই হইল। অত্যন্ত খুশি মনে হোটেলে ঢুকিবার পূর্বে, আমি কাঁচের জানলার নীচে সাজানো বিক্রয়ের জন্য বইগুলি দেখিলাম। তাহার মধ্যে সল্ট-এর "নিরামিষ আহারের আবেদন" বইটি দেখিলাম। এক শিলিং মূল্য দিয়া উহা কিনিলামও। তারপর খাইতে বসিলাম। বিলাতে আসার পর এই প্রথম পেট ভরিয়া খাইতে পাইলাম। ঈশ্বর আমার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন।

সল্ট-এর বইটি পড়িলাম। আমার মনে এই বইটির প্রভাব মুদ্রিত হইল। পড়ার পর হইতে আমি যুক্তি দিয়া নিরামিষাহার সমর্থন করিতে লাগিলাম। মায়ের কাছে লওয়া প্রতিজ্ঞা এখন বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়া পড়িল। এতদিন পর্যন্ত মনে করিতাম যে, সকলে যদি মাংসাহারী হয় তবে ভাল হয়। কেবল সত্যপালনের জন্য—কেবল প্রতিজ্ঞাপালনের জন্যই আমি মাংসাহার ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা হইত ভবিষ্যতে কোনও দিন যদি শপথ হইতে মুক্তি পাই, তবে নিজে মাংস খাইয়া অপরকে মাংসাহারীর দলে আনিব। কিন্তু এখন নিজে নিরামিষাশী থাকিয়া অপরকে নিরামিষাশী করার লোভই মনের ভিতর জাগিয়া উঠিল।

১৫

ইংরেজ ভদ্রলোকের ভূমিকায়

নিরামিষ আহারের উপর আমার শ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সল্ট-এর পুস্তকটি আহার সম্বন্ধে আরও বেশি করিয়া আমার জানিবার ইচ্ছা জাগায়। নিরামিষ তত্ত্বের যত পুস্তক পাইলাম তাহা ক্রয় করিয়া পড়িতে লাগিলাম। এর মধ্যে হাউয়ার্ড উইলিয়ামস্-এর 'আহার-নীতি' "দি এথিক্স্ অব

ডায়েট" নামক বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে আদিযুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আহারের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। অবতার ও পয়গম্বরদিগের আহার্য ও আহার সম্বন্ধে ইহাতে বর্ণনা আছে। বলা হইয়াছে, পীথাগোরাস ও যিশু প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে কেবল নিরামিষ আহার করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। ডাক্তার কিংগ্স্ফোর্ড-এর "উত্তম আহারের রীতি" (দি পারফেক্ট ওয়ে ইন ডায়েট) বইখানাও চিত্তাকর্ষক। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তার এলিন্সনের লেখাও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিল। ঔষধের বদলে কেবল আহার্যের পরিবর্তন দ্বারাই তিনি রোগ আরোগ্য করার পদ্ধতি সমর্থন করিয়াছেন।

ডাক্তার এলিন্সন নিজে নিরামিষাহারী। তিনি রোগীদের জন্য কেবল নিরামিষ আহারের পরামর্শই দিতেন। এই সকল পুস্তক পড়ার ফল এই হইল যে, আমার জীবনে খাদ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিল। এই সকল পরীক্ষা প্রথম প্রথম কেবল স্বাস্থ্যের দিক দিয়াই করিতাম। পরে অবশ্য ধর্মই প্রধান প্রেরণা হইয়া উঠে।

আমার সেই বন্ধুটি তখনও কিন্তু আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তিনি আমাকে ভালবাসিতেন বলিয়াই মনে করিতেন যে, যদি আমি মাংসাহার না করি তবে রোগা হইয়া ত থাকিবই—সেই সঙ্গে বোকা ও আনাড়ী থাকিয়া যাইব। কেন না আমি ইংরাজ-সমাজে মিশিতে পারিব না। তিনি আমার নিরামিষাহার সম্বন্ধে পুস্তক পড়ার খবরও পাইয়াছিলেন। তিনি ধরিয়া লইলেন যে, ঐ সকল বই পড়িয়া আমার মাথায় গোলমাল হইয়া যাইবে, খাদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াই জীবনটা নষ্ট করিব এবং আমার কর্তব্য ভুলিয়া গিয়া মাথা-পাগলা হইয়া থাকিব। সুতরাং তিনি আমার সংশোধনের জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিলেন। আমাকে থিয়েটারে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখানে যাওয়ার পথে আমাকে লইয়া তিনি 'হলবর্ণ' ভোজনালয়ে উপস্থিত হইলেন। এই গৃহ আমার কাছে রাজপ্রাসাদ বলিয়া মনে হইল। ভিক্টোরিয়া হোটেলের পর আর এত বড় হোটেলে প্রবেশ করি নাই। ভিক্টোরিয়া হোটেলের অভিজ্ঞতা আমার নিকট বড় সুখদায়ক ছিল না। বস্তুতঃ সেখানে থাকার সময় আমার মাথা ঘুলাইয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বন্ধু মনে করিয়াছিলেন, শোভনতার খাতিরে এখানে কিছু জিজ্ঞাসা করিব না। শত শত লোকের মধ্যে আমরা দুইজন এক টেবিলে বসিলাম। প্রথমেই সুপ ছিল—আমি বিব্রত হইয়া পড়িলাম, কারণ উহা কিসের তৈরী জানিতাম না। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিতে

সাহস হইল না। তাই আমি পরিবেশন-কারীকে ডাকিলাম। বন্ধু বুঝিতে পারিলেন; কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে?"

আমি শান্ত ভাবে সংকোচের সহিত বলিলাম—"ইহাতে মাংস আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিব।"

"ভদ্রসমাজে এই রকম জঙ্গলী-পনা চলিবে না। যদি সৌজন্য-সম্মতভাবে ব্যবহার করিতে না পার, তবে বরঞ্চ উঠিয়া যাও এবং অন্য কোনও হোটেলে খাইয়া আমার জন্য বাহিরে অপেক্ষা কর।"

খুশি মনে আমি উঠিয়া অন্য হোটেল খুঁজিতে গেলাম। পাশেই এক নিরামিষ ভোজনালয় ছিল কিন্তু উহা তখন বন্ধ। সুতরাং আমি ঐ রাত্রে না খাইয়াই রহিলাম। আমরা নাটক দেখিতে গেলাম। বন্ধু আর খাওয়ার বিষয় কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না। আমারই বা বলার কি ছিল?

দুই বন্ধুর মধ্যে ইহাই শেষ সংকট। আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয় নাই, তিক্তও হয় নাই। আমি তাঁহার প্রত্যেক চেষ্টার পশ্চাতে আমার প্রতি ভালবাসা দেখিতে পাইতাম। সেই জন্য আচার ও বিচারের পার্থক্য থাকিলেও তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও গভীর হইয়াছিল।

মনে হইল—আমার সম্বন্ধে তাঁহার ভয় ভাঙ্গাইয়া দেওয়া দরকার। তাই আমি ঠিক করিলাম যে—ভব্যতার লক্ষণসমূহ শিখিয়া লইব এবং অন্যপ্রকারে সমাজে মেশার উপযুক্ত হইয়া আমার নিরামিষাহারের সমস্ত ত্রুটি ঢাকিয়া ফেলিব। এইজন্য আমি 'ইংরাজ ভদ্রলোক' সাজার অসম্ভব চেষ্টায় লাগিয়া গেলাম।

বোম্বাইয়ের দর্জির তৈরী কাপড়-চোপড়ের কাট্‌-ছাঁট্‌ ভাল ইংরাজ সমাজে শোভা পায় না। সেইজন্য 'আর্মি ও নেভী স্টোরস' হইতে পোশাক করাইয়া লইলাম। উনিশ শিলিং মূল্যের (এই দাম তখনকার দিনে খুব বেশী বলিয়া গণ্য হইত) চিমনী টুপী মাথায় দিলাম। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বণ্ড স্ট্রীট—যেখানে শৌখীন লোকেরাই পোশাক প্রস্তুত করায়—সেই স্থান হইতে দশ পাউণ্ড খরচ করিয়া এক সান্ধ্য-পোশাক তৈরী করিয়া লইলাম। এইবার আমার মহানহৃদয় দরিদ্র দাদার নিকট হইতে ঘড়ির জন্য সোনার ডবল-চেইন চাহিয়া পাঠাইলাম। তিনিও পাঠাইয়া দিলেন। তৈরী বাঁধা-টাই ব্যবহার করা শিষ্টাচার নয় বলিয়া টাই বাঁধা শিখিলাম। দেশে দাড়ি কামাইবার দিনেই আরশি ব্যবহার করিতে পাইতাম—এখন বড় আরশির সামনে দাঁড়াইয়া

ঠিক করিয়া টাই বাঁধিতে ও চুল পাট করিয়া সিঁথি কাটিতে প্রত্যহ মিনিট দশেক করিয়া যাইতে লাগিল। চুল মোলায়েম বা নমনীয় ছিল না আদৌ। সুতরাং উহা ঠিক-মত রাখার জন্য রোজ ব্রুশ লইয়া উহার সহিত রীতিমত যুদ্ধ চলিত। চুলের পাট নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় টুপী পরিবার ও খুলিবার সময় সিঁথি ঠিক করিবার জন্য প্রত্যেকবারই হাত মাথায় উঠিত। কেতাদুরস্ত সমাজে বসিয়াও মাঝে মাঝে সিঁথিতে হাতে বুলাইয়া চুল দুরস্ত রাখার চেষ্টা চলিত।

কিন্তু পারিপাট্যও যথেষ্ট নহে। কেবল সভ্য পোশাক পরিলেই কি সভ্য হওয়া যায়? সভ্যতার আরও কতকগুলি বাহ্য চিহ্ন জানিয়া লইতে ও শিক্ষা করিতে হইবে। কেতাদুরস্ত, সভ্য হইতে হইলে নাচিতে জানা চাই, ভাল ফ্রেঞ্চ বলিতে পারা চাই, বক্তৃতা করিতে জানা চাই। ফ্রেঞ্চ শুধু ফরাসী দেশের ভাষা নয়, সারা ইউরোপের রাষ্ট্রভাষা। আমার ইউরোপ ভ্রমণের ইচ্ছাও ছিল। আমি নাচ শিখিব স্থির করিলাম। এক নাচের ক্লাসে যোগ দিলাম। একবারকার কোর্স শিক্ষার ফী তিন পাউণ্ড জমাও দেওয়া হইল। তিন সপ্তাহে গোটা-ছয়েক পাঠ লইয়াছিলাম। তালে তালে পা পড়ে না। পিয়ানোর তাল আমি ধরিতে পারিতাম না। তাই পিয়ানোর ঘা বাজে—কিন্তু তাহার সঙ্গে চলা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। কি করা যায়? এ যেন বাবাজীর সেই বিড়ালের কাহিনী। ইঁদুরের জন্য বিড়াল, বিড়ালের জন্য গাই—এমনি করিয়া যেমন বাবাজীর পরিবার বৃদ্ধি পাইয়াছিল আমার লোভের পরিমাণও তেমনি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধ্বনি-জ্ঞান নাই, সেজন্য বেহালা শিখিয়া লইতে হইবে। ইহাতে সুর ও তাল বুঝিতে পারিব। তিন পাউণ্ড দিয়া বেহালা কিনিলাম এবং তাহা শিখিবার জন্য আরও কিছু খরচ করিলাম। বক্তৃতা করিতে শিক্ষা করার জন্য তৃতীয় এক শিক্ষকের গৃহ খুঁজিয়া লইলাম। তাঁহাকে এক গিনি দিলাম। তাঁহার নির্দেশে এক খণ্ড বেলের "স্টাণ্ডার্ড ইলোকিউশনিস্ট" কিনিলাম। পিটের বক্তৃতা লইয়া পাঠ আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এই বেল সাহেবই আমার কানে সতর্ক হইবার ঘণ্টা বাজাইলেন, আমি জাগিলাম।

আমাকে কি ইংলণ্ডে জন্ম কাটাইতে হইবে? আমি ভাল বক্তৃতা করিতে শিখিয়া কি করিব? নাচিলে আমি কেমন করিয়া সভ্য হইব? বেহালা ত দেশেই শেখা যায়। আমি বিদ্যার্থী। আমার সর্বাগ্রে বিদ্যার্জন করা দরকার। আমাকে আমার ব্যারিস্টারী শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার। আমার চরিত্রই

আমাকে ভদ্রলোক করিবে। আর তাহা যদি না করে, তবে আমার ও উচ্চাশা ত্যাগ করাই দরকার।

এই ধরনের ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমি ভাষণ-শিক্ষককে লিখিয়া জানাইলাম যে, তাঁহার নিকট আর বক্তৃতা দেওয়া শিখিতে যাইব না। মাত্র দুই-তিনটা পাঠই তাঁহার নিকট হইতে লইয়াছিলাম। নাচ-শিক্ষয়িত্রীকেও ঐ প্রকার পত্র পাঠাইলাম। বেহালা-শিক্ষয়িত্রীর নিকট বেহালা লইয়া গেলাম ও যে দামে হয় বেহালাখানা বিক্রয় করিয়া দিতে বলিলাম। তাঁহার সহিত অনেকটা মিত্রতার সম্বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহাকে আমার ভ্রান্ত ধারণার কথা শুনাইলাম। নাচ-বাজনা ইত্যাদি ত্যাগ করার সংকল্প তিনিও অনুমোদন করিলেন।

সভ্য হওয়ার ঝোঁক আমার মাস তিনেক ছিল। পোশাক সম্বন্ধে খুঁৎখুঁতে ভাব ছিল বৎসরখানেক। কিন্তু তখন হইতে আমি বিদ্যার্থী হইয়া গেলাম।

১৬
পরিবর্তন

আমি নাচ বাজনা ইত্যাদি শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলাম বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি এই সময় যা-খুশি তাই করিয়া বেড়াইতেছিলাম। পাঠকেরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন যে আমি বিচার-বুদ্ধি হারাই নাই। ইহার মধ্যেও আমার আত্ম-পরীক্ষা ও আত্ম-বিশ্লেষণ চলিতেছিল। এই মোহাচ্ছন্নতার কালেও আমি কতক পরিমাণে সাবধান ছিলাম। আমি পাই-পয়সারও হিসাব রাখিতাম। কত খরচা করিব পূর্বাহ্ণে স্থির করিয়া লইতাম। প্রতি মাসে যাহাতে পনের পাউণ্ডের বেশী খরচ না হয় তাহাও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। বাসভাড়া কি চিঠিপত্র লেখার খরচা, সমস্তই লিখিয়া রাখিতাম এবং শোবার আগে হিসাব মিলাইয়া শুইতাম। এই অভ্যাস শেষ পর্যন্ত বজায় আছে। আমি জানি যে, আমার জনসেবার জীবনে আমার হাতে লাখো লাখো টাকা আসিয়া পড়িলেও, তাহা যোগ্যভাবে সতর্কতার সহিত খরচ করিতে পারিয়াছি। যত আন্দোলন আমার হাত দিয়া হইয়াছে, তাহাতে কখনও আমি কর্জ করি নাই। বরঞ্চ দেখিয়াছি—কাজশেষে প্রত্যেকটিতে কিছু-না-কিছু জমাই আছে। প্রত্যেক যুবক নিজের খরচের টাকার হিসাব যদি যত্নপূর্বক রাখে,

তবে হিসাব রাখার জন্য আমার যেমন উপকার হইয়াছে, ভবিষ্যতে তাহাদেরও তেমনি উপকার হইবে।

নিজের চালচলনের উপর আমার তীক্ষ্ণ নজর ছিল বলিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার খরচ কমানো দরকার। খরচ একেবারে অর্ধেক কমাইয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিলাম। হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখি যে, গাড়ীভাড়ার খরচা খুব বেশী হইতেছে। গৃহস্থের সঙ্গে থাকার জন্য একটা নির্দিষ্ট টাকা প্রতি সপ্তাহেই দিতে হইত। সৌজন্যের খাতিরে ঐ পরিবারের লোকদিগকে কোনও দিন বাহিরে আহার করাইতে লইয়া যাইতে হয়। আবার কোনও দিন তাঁহারা কোথাও সঙ্গে লইয়া গেলে তখনও গাড়ীভাড়া দিতে হয়। মহিলা সঙ্গে থাকিলে তাঁহার খরচ পুরুষকেই বহন করিতে হয়। ইহাই ও দেশের রেওয়াজ। আবার বাহিরে খাইলেও ঘরে খাওয়ার খরচ তাহাতে কম হয় না, সেখানে (সাপ্তাহিক) টাকা যাহা দেওয়ার তাহা দিতেই হয়; সেইজন্য বাহিরে খাওয়ার খরচা বাড়তি লাগে। ভাবিয়া দেখিলাম—এই ব্যাপারগুলিতে খরচা কমানো যায় এবং এইরূপে লজ্জার খাতিরে যে খরচ করিতাম তাহাও বাঁচানো যায়।

এখন হইতে পরিবারের ভিতর না থাকিয়া নিজে ঘরভাড়া লইয়া থাকিব স্থির করিলাম। যখন যে পাড়ায় কাজ তখন সেই পাড়ায় ঘরভাড়া লইলে, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা পাওয়ারও সুবিধা হইবে। ঘর এমন জায়গায় যদি লওয়া যায়, যেখান হইতে আধ ঘণ্টার মধ্যে কর্মস্থানে যাওয়া যায় তবে আর গাড়ীভাড়া লাগে না। ইহার পূর্বে কোথাও যাইতে হইলেই গাড়ীভাড়া করিতাম এবং বেড়াইবার জন্য ভিন্ন সময় রাখিতে হইত। এখন কাজে যাওয়ার সময়েই বেড়ানোও হয়—এই ব্যবস্থা হইল। ইহাতে প্রতিদিন আট-দশ মাইল সহজেই বেড়ানো হইত। প্রধানতঃ এই এক অভ্যাসের জন্যই বিলাতে আমি অসুখে পড়ি নাই। শরীরও ঠিকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরিবারে বাস করা ছাড়িয়া দুই কামরা ঘর ভাড়া লইলাম। একটা শোওয়ার—একটা বসার। ইহাকে দ্বিতীয় পর্যায় বলা যায়। তৃতীয় পর্যায় ভবিষ্যতের জন্য রহিয়াছে।

এমনি করিয়া খরচ অর্ধেক কম করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সময়? আমি জানিতাম যে, ব্যারিস্টারী পরীক্ষার জন্য বেশী পড়িতে হয় না। তাই সময়ের খুব টানাটানি ছিল না। কাঁচা ইংরাজী জ্ঞানের জন্য আমার অত্যন্ত ক্ষোভ হইত। লেলী সাহেবের কথা—"তুমি আগে বি. এ. পাস কর। পরে আসিও" —এই কথাটা আমাকে বিঁধিত। ব্যারিস্টারী ছাড়া আরও কিছু পড়া

আবশ্যক। অক্‌সফোর্ড, কেম্ব্রিজে খবর লইলাম। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গেও দেখা করিলাম। দেখিলাম—সেখানে পড়িতে গেলে খরচ অনেক এবং অনেক দিন থাকিতে হয়। তিন বৎসরের বেশী থাকা হইবে না। একজন বন্ধু বলিলেন যে—যদি সত্যসত্যই কোনও কঠিন পরীক্ষায় পাস করিতে চাও, তবে লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পাস কর। তাহাতে খুব খাটিতে হইবে ও সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। খরচা ত নাই বলিলেই হয়। কথাটা আমার ভাল লাগিল। পরীক্ষার বিষয় দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। ল্যাটিন ও আর একটা ভাষা অবশ্য শিখিতে হইবে। ল্যাটিন কেমন করিয়া শিখিব? বন্ধু বলিলেন—"উকীলের ল্যাটিন শেখা খুব আবশ্যক। ল্যাটিন জানিলে আইনের পুস্তক পড়িয়া সহজে বুঝা যায়। রোমান ল-এর পরীক্ষায় এক প্রশ্ন-পত্র কেবল ল্যাটিন ভাষাতেই থাকে। ল্যাটিন জানিলে ইংরাজী ভাষার উপরেও দখল বাড়ে।

এই সমস্ত যুক্তির প্রভাব আমার উপর বেশ কাজ করিল। মুশকিল হোক আর যাহাই হোক, ল্যাটিন শিখিবই। ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষাও আরম্ভ করিয়াছিলাম, উহাও সম্পূর্ণ করিব। সেইজন্য দুই ভাষার মধ্যে দ্বিতীয়টা ফ্রেঞ্চ লইব বলিয়া স্থির করিলাম। আমি একটি প্রাইভেট ক্লাসে ভর্তি হইলাম। প্রতি ছয় মাসে পরীক্ষা হয়। সামনে প্রায় পাঁচ মাস সময় ছিল। এই সময়ের ভিতর তৈরী হওয়া আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ফলে এই হইল যে, আমি কেতাদুরস্ত হওয়ার প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়া কঠোর পরিশ্রমী ছাত্র হইয়া পড়িলাম। কার্যক্রম স্থির করিয়া দিন-চর্যার মিনিট পর্যন্ত বাঁধিয়া লইলাম। কিন্তু যথাশক্তি চেষ্টা করিলেও আমার বুদ্ধিশক্তি এমন ছিল না যে, অন্য বিষয়গুলির সহিত ল্যাটিন ও ফ্রেঞ্চ এই অল্প সময়ের ভিতর শিখিয়া লইতে পারি। পরীক্ষা দিলাম। ল্যাটিনে ফেল করিলাম। দুঃখিত হইলাম, কিন্তু নিরাশ হইলাম না। ল্যাটিন পড়িয়া রস পাইতে লাগিলাম। ফ্রেঞ্চ ভালই হইতেছিল। বিজ্ঞানে অন্য নূতন বিষয় লইব স্থির করিলাম। আমি এখন দেখিতেছি—রসায়ন শাস্ত্রে খুব রস পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাতেকলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থার অভাবে তখন আমার উহা ভাল লাগে নাই। দেশে কলেজে ইহা আবশ্যিক বিষয় ছিল, সেই জন্যই লণ্ডন-ম্যাট্রিকের প্রথমবারের পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্র লইয়াছিলাম। এইবার বিষয় লইলাম আলো ও উত্তাপ (লাইট্‌ ও হিট্‌)। উহা লোকে সহজ বলিত, আমারও সহজ লাগিল।

পরীক্ষার জন্য তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবন-যাত্রা আরও সাদাসিধা করিতে

চেষ্টা করিলাম। আমি দেখিলাম—আমাদের পরিবার যেমন গরীব, আমার চালচলন তাহার উপযুক্ত নয়। দাদার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা ও কী ভাবে তিনি আমাকে নিয়মিত টাকা পাঠাইতেছেন ভাবিয়া খুব ব্যথা অনুভব করিলাম। যেসব ছেলে মাসে আট পাউণ্ড হইতে পনের পাউণ্ড ব্যয় করিত, তাহাদের বেশীর ভাগই বৃত্তি (স্কলারশিপ) পাইত। আমার অপেক্ষা অনেক বেশী সাদাসিধা ভাবে থাকে—এমন ছাত্রও দেখিতে পাইলাম। আমি অনেক দরিদ্র ছাত্রের সংস্পর্শে আসিলাম, যাহারা নিজের অবস্থানুযায়ী থাকে। একজন লণ্ডনের দরিদ্র-পল্লীতে সপ্তাহে দুই শিলিং ভাড়া দিয়া থাকে ও লোকার্টের সস্তা কোকোর দোকানে দুই পেনী দিয়া কোকো ও রুটি খাইয়া দিন কাটায়। তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করার শক্তি আমার ছিল না। তাহা হইলেও আমি দুই কামরা না লইয়া একটা কামরাতেই চালাইতে পারি, অর্ধেক রান্না নিজেই করিয়া লইতে পারি বলিয়া মনে হইল। এই ব্যবস্থায় আমি প্রতিমাসে চার কি পাঁচ পাউণ্ড বাঁচাইতে পারি। সরল জীবন-যাত্রার বিষয়ে বইও পড়িতাম। দুই কামরা ত্যাগ করিয়া সপ্তাহে আট শিলিং ভাড়ায় এক কামরা ঘরভাড়া লইলাম। একটা স্টোভ কিনিয়া সকালে নিজেই রান্না করিতে আরম্ভ করিলাম। রান্না করিতে বিশ মিনিটও লাগিত না। ওট্‌মিলের জাউ (Porridge) তৈরী করিতে ও কোকোতে গরম জল দিতে আর কত সময় লাগে? দুপুরে বাহিরে খাওয়া আর সন্ধ্যায় কোকোর সহিত রুটি। এমনি করিয়া আমি রোজ সওয়া শিলিংএ খাওয়া শেষ করিতে শিখিলাম। এখন আমার সময়ের বেশীর ভাগ পড়াশুনাতেই কাটিয়া যাইত। জীবন-যাত্রা সরল হওয়ায় সময় খুব পাওয়া যাইতে লাগিল। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়া পাস করিলাম।

পাঠকেরা মনে করিবেন না যে, এই সরল জীবন রস-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। বরং এই সমস্ত পরিবর্তন আমার অন্তর ও বাহির জীবনকে একই সুরে বাঁধিয়াছিল। ইহাতে আমার পরিবারের জীবনযাত্রার সহিতও একটা সঙ্গতি রহিল। আমার অন্তরাত্মা অপার আনন্দ ভোগ করিতে লাগিল।

১৭

আহার্য পরীক্ষা

যেমন আমি অন্তরের ভিতরে গভীর ভাবে ডুবিতে লাগিলাম, তেমনি বাহিরের ও অন্তরের আচারের পরিবর্তন করা আবশ্যক হইয়া পড়িতে লাগিল। যে গতিতে জীবন-যাত্রার ও ব্যয়ের পরিবর্তন হইতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে তেমনি অথবা তদপেক্ষা দ্রুততর গতিতে আহার্যেরও পরিবর্তন হইতেছিল। নিরামিষ আহার সম্বন্ধে ইংরেজী পুস্তকে আমি দেখিলাম যে, লেখকেরা খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াছিলেন। নিরামিষাহারের সম্বন্ধে তাঁহারা ধার্মিক, বৈজ্ঞানিক, ব্যবহারিক ও চিকিৎসকের দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিয়াছেন। নৈতিক দৃষ্টি হইতে তাঁহারা বিচার করিয়াছেন—মানুষ পশু-পক্ষীর উপর প্রভুত্ব করিবার যে অধিকার পাইয়াছে, উহা তাহাদিগকে মারিয়া খাওয়ার জন্য নয়, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য। মানুষ যেমন একে অন্যের সহিত ব্যবহার করে, পশু-পক্ষীর সহিতও তাহাকে সেইরূপ ব্যবহারই করিতে হইবে, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ নহে। তাঁহারা ইহাও দেখিয়াছেন যে, মানুষের আহার করাটা কেবল বাঁচিয়া থাকার জন্যই আবশ্যক, ভোগের জন্য নহে। এই দৃষ্টি হইতে কেহ কেহ খাদ্যের মধ্য হইতে কেবল মাংসই নয়, ডিম ও দুধও বাদ দিতে বলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানুষের শরীরের গঠন দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মানুষের রান্না করারই আবশ্যকতা নাই। বনের পাকা ফলই তাহার স্বাভাবিক খাদ্য। দুধ কেবল মায়ের স্তন হইতে খাওয়া চলে—দাঁত উঠিলে চিবাইয়া খাওয়ার মত খোরাক লইতে হয়।

চিকিৎসকের দৃষ্টিতে তাঁহারা মশলা ত্যাগ করিতে বলেন। আবার ব্যবহারিক বা আর্থিক দৃষ্টিতে দেখিলে, তাঁহারা বলেন যে, সর্বাপেক্ষা কম খরচায় নিরামিষ আহারই হইতে পারে। এই চার রকম দিক হইতে খাদ্যকে বিচার করিয়া দেখার ফলও ফলিল। এই চার দৃষ্টি হইতে যাঁহারা খাদ্যকে দেখেন, নিরামিষ ভোজনালয়ে এমন লোকের সঙ্গেও আমি মিশিয়াছিলাম। লণ্ডনে তাহাদের একটি সমিতি ছিল এবং একটি সাপ্তাহিক পত্রও ছিল। আমি সাপ্তাহিক-পত্রের গ্রাহক হইলাম এবং মণ্ডলের সভ্য হইলাম। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের কমিটিতে লইলেন। এইস্থানে যাঁহারা নিরামিষ আহার সমর্থনের স্তম্ভের মত ছিলেন, তাঁহাদের সহিত পরিচয় হইল। আমি খাদ্য পরীক্ষায় রত হইলাম।

দেশ হইতে যে মিঠাই ও মশলা আনাইতাম তাহা খাওয়া বন্ধ করিলাম। আমার মন অন্যদিকে ফিরিল, মশলার আস্বাদের ইচ্ছা কমিয়া গেল। যে সিদ্ধ শাক 'রিচমণ্ডে' মশলা ব্যতীত বিস্বাদ লাগিত, এখন তাহা সুস্বাদু বলিয়া মনে হইল। এই প্রকার অনেক অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি যে, স্বাদের সত্য স্থান জিভ নহে, মন।

খরচার দিকে দৃষ্টি ত আমার ছিলই। তখনকার দিনে একদল লোকের মত ছিল যে, চা ও কফি অহিতকারী এবং কোকো ভাল। কেবল যে শরীর-রক্ষার্থই খাওয়া আবশ্যক সে সম্বন্ধে আমার আর সংশয় ছিল না। সুতরাং যে দ্রব্য শরীররক্ষার জন্য দরকার তাহাই খাওয়া উচিত বলিয়া চা ও কফি ত্যাগ করিয়া কোকো খাইতে লাগিলাম।

যে সব হোটেলে আমি যাইতাম তাহাদের দুইটি বিভাগ ছিল। একটিতে আবশ্যকমত যাহা খুশী চাহিয়া খাইয়া প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য দিতে হয়। ইহাতে এক শিলিং হইতে দুই শিলিং খরচা হয়। ইহাতে অবস্থাপন্ন লোকেরা আসেন। আর দ্বিতীয় বিভাগে ছয় পেনীতে তিন রকমের খাদ্য ও একটুকরা রুটি পাওয়া যায়। যখন খরচার খুব কড়াকড়ি করিতেছিলাম, তখন ছয় পেনীর বিভাগেই খাইতাম।

উপরের পরীক্ষার সঙ্গে ছোট ছোট পরীক্ষাও অনেক রকমের চলিতেছিল। কখনো স্টার্চ-যুক্ত খাদ্য ত্যাগ করিতাম, কখনো বা কেবলমাত্র রুটি ও ফল খাইতাম, আবার কখনো বা পনীর, দুধ ও ডিম লইতাম।

এই শেষোক্ত পরীক্ষা লক্ষনীয়। উহা পনের দিনও চালানো যায় নাই। স্টার্চ ছাড়া খাদ্যের সমর্থন যাঁহারা করিতেন তাঁহারা ডিমের খুব স্তুতি করিতেন এবং ডিম যে মাংস নয় ইহা প্রমাণ করিতেন। উহা খাইলে কোনও জীবিত প্রাণীকে দুঃখ দেওয়া হয় না—এই যুক্তিতে ভুলিয়া প্রথম প্রথম প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও আমি ডিম খাইতাম। কিন্তু আমার এই মোহ অতি অল্পসময়ের জন্যই ছিল। প্রতিজ্ঞার নতুন অর্থ করার অধিকার আমার ছিল না। প্রতিজ্ঞা যিনি দিয়াছেন তাঁহার কাছে উহার অর্থ যাহা ছিল, আমাকে তাহাই ত পালন করিতে হইবে। মাংস না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা যখন মা করাইয়াছিলেন তখন ডিমের কথা মায়ের খেয়াল ছিল না—একথা আমি জানিতাম। সেইজন্য আমার নিকট প্রতিজ্ঞার সত্য স্বরূপ স্পষ্ট হইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ডিম খাওয়াও ছাড়িয়া দিলাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই পরীক্ষাটাও ছাড়িয়া দিতে

হইল। কিন্তু এই রহস্য সূক্ষ্ম ও প্রণিধান করার যোগ্য। মাংসের তিন রকম ব্যাখ্যার কথা বিলাতে পড়িয়াছি। প্রথম ব্যাখা অনুসারে মাংস বলিতে পশু-পক্ষীর মাংসই বুঝাইত। নিরামিষাশীদের মধ্যে এই ব্যাখ্যা যাঁহারা গ্রহণ করিতেন তাঁহারা মাংস ত্যাগ করিতেন কিন্তু মাছ খাইতেন, ডিমের ত কথাই নাই। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে সাধারণ লোক যাহাকে জীব বলে তাহারই মাংসকে মাংস বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাতে মাছ ত্যাজ্য কিন্তু ডিম গ্রহণীয়। তৃতীয় ব্যাখ্যায় সাধারণতঃ যাহা জীব বলিয়া গণ্য হয় তাহা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন সমস্ত বস্তুই মাংস। এই ব্যাখ্যা অনুসারে ডিম ও দুধও পরিত্যাজ্য। ইহার মধ্যে যদি প্রথম ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে মাছও খাওয়া যায়। কিন্তু আমি একথা বুঝিয়াছিলাম যে, আমার কাছে মায়ের দেওয়া ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য। সুতরাং তাঁহার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা পালন করিতে হইলে ডিমও ত্যাগ করিতে হইবে। সেই জন্য ডিম ত্যাগ করিলাম। ইহাতে যথেষ্ট অসুবিধা হইল। কেননা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, এমন কি নিরামিষ আহারের হোটেলেও ডিম দিয়া অনেক জিনিস তৈরী হয়। কোন্ জিনিসটা কিসের তৈরী তাহা জানিবার জন্য পরিবেশনকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইত। কারণ অনেক পুডিং ও কেকে ডিম থাকিত। কিন্তু ইহাতে আর একদিক দিয়া একটা ঝঞ্ঝাট হইতেও রক্ষা পাইলাম। অতঃপর খুব অল্পসংখ্যক সাদাসিধা খাদ্যই আমার জন্য বাকী রহিল। যাহা খাইতে ভাল লাগে এমন অনেক জিনিস ত্যাগ করিতে হইল সত্য এবং সেজন্য কিছু বিরক্তি বোধও হইল সন্দেহ নাই। কিন্তু এ আঘাত ক্ষণিকের জন্য মাত্র। প্রতিজ্ঞাপালনের স্বাস্থ্যকর, সূক্ষ্ম ও স্থায়ী স্বাদ আমার কাছে সেই ক্ষণিক স্বাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় মনে হইল।

তবে আরও কঠিনতর পরীক্ষা ভবিষ্যতের গর্ভে জমা ছিল। অবশ্য তাহা অন্য প্রতিজ্ঞার জন্য। তবে যাহাকে রাম রাখে তাহাকে কে মারে?

এই অধ্যায় শেষ করার পূর্বে প্রতিজ্ঞার অর্থ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আমার প্রতিজ্ঞা মায়ের নিকট স্বীকার করা একটা কড়ার। দুনিয়ার অনেক বিতণ্ডা কেবল প্রতিজ্ঞার ব্যাখ্যারূপ অনর্থ হইতেই উৎপন্ন হয়। যতই স্পষ্ট ভাষায় কড়ার লেখা হোক না কেন, ভাষার ব্যাখ্যাকারী প্রয়োজনমত তাহার অর্থ বদলাইতে পারেন। ইহাতে সভ্যাসভ্যের, ধনী-দরিদ্রের, রাজকৃষকের ভেদ নাই। স্বার্থ সকলকে অন্ধের মত করিয়া ফেলে। রাজা হইতে দীন-দরিদ্র

পর্যন্ত সকলেই অঙ্গীকারের অর্থ নিজের মনোমত করিয়া দুনিয়াকে, নিজেকে ও ঈশ্বরকে প্রতারিত করার চেষ্টা করে। যে শব্দ অথবা বাক্য নিজের অনুকূলে আসে—মানুষ সেই অর্থই পক্ষপাতবশতঃ গ্রহণ করে, ইহাকে ন্যায়শাস্ত্রে দ্বি-অর্থযুক্ত মধ্যম পন্থা বলে। এ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ রীতি হইতেছে—যে প্রতিজ্ঞা করায় সে যে অর্থে করাইয়াছে তাহাই সত্য বলিয়া গণ্য করা এবং যাহা আমাদের মনোমত নহে তাহাই মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে না করা। ইহা ভিন্ন আর একটা পথ আছে। তাহা এই—যেখানে দুই রকম অর্থ করা যায়, সেখানে দুর্বল পক্ষ যাহা বলে তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া। এই দুই শুদ্ধ-রীতি বা সুবর্ণ-মার্গ ত্যাগ করার জন্যই বেশীর ভাগ ঝগড়া হয় এবং অধর্ম অনুষ্ঠিত হয়। এই অন্যায়ের মূলে আছে অসত্য। যাহাকে সত্যের পথেই চলিতে হইবে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে উক্ত সুবর্ণ-পথ বা এই দুই শুদ্ধ-রীতি। তাহাকে শাস্ত্র খুঁজিতে হয় না। 'মাংস'—বলিতে মা যাহা বুঝিয়াছিলেন এবং তখন আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই আমার কাছে সত্য। আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতা হইতে, অথবা আমার পাণ্ডিত্যের অভিমানে যে অর্থ বুঝিয়াছি—প্রতিজ্ঞার সে অর্থ সত্য নহে।

এ পর্যন্ত আমার খাদ্য সম্বন্ধীয় পরীক্ষা আর্থিক ও স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতেই করিয়াছি। ইহার ধর্মের দিকটা বিলাতে আমার নিকট ধরা পড়ে নাই। ধর্মের দিক দিয়া আমার কঠিন পরীক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকাতে হইয়াছে, সে কথা পরে আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু এ সকলেরই বীজ যে ইংলণ্ডেই রোপিত হইয়াছিল তাহা বলা যায়।

যখন কেহ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তখন সেই ধর্ম প্রচারের জন্য তাহার উত্তেজনা, যে সেই ধর্মেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার অপেক্ষা বেশী হয়। নিরামিষাহার বিলাতে তখন নতুন ধর্ম, এবং আমার পক্ষেও উহা নতুন ধর্ম বলা যায়। কেননা যখন বিলাতে গিয়াছি তাহার পূর্ব হইতে বুদ্ধিতে আমি মাংসাহারেরই পক্ষপাতী ছিলাম। বিলাতে গিয়াই আমি নিরামিষাহারের নীতি জ্ঞান-পূর্বক গ্রহণ করি। সুতরাং নিরামিষাহার তখন আমার পক্ষে নতুন ধর্মে প্রবেশ করার মতই ছিল। নতুন ধর্মের প্রাথমিক উত্তাপও আমার ভিতরে দেখা দিল। যে পাড়ায় আমি থাকিতাম সেই পাড়ায় নিরামিষাহারীদের একটা সমিতি স্থাপন করা ঠিক করিলাম। এই স্থান বেজওয়াটারে ছিল। সেই পড়াতেই স্যার এডুইন আরনল্ড বাস করিতেন।

তাঁহাকে সহকারী সভাপতি হওয়ার জন্ত নিমন্ত্রণ করায় তিনি স্বীকার করিলেন। ভেজিটেরিয়ান পত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার ওল্ডফিল্ড সভাপতি হইলেন। আমি সেক্রেটারী হইলাম। দিনকতক এই সংস্থা চলিয়াছিল, তার পরেই ভাঙ্গিয়া যায়। কারণ কিছুদিন পরেই আমার অভ্যাস অনুসারে ঐ পাড়া আমি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলাম। কিন্তু এই ছোট ও অল্পকালস্থায়ী সংস্থার ভিতর দিয়া সংস্থা-গঠন ও পরিচালনারও কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম।

১৮

লাজুক স্বভাব—আমার ঢাল

নিরামিষাহারী সমিতির কার্য-নির্বাহ সমিতিতে প্রবেশলাভ করিলাম এবং তাহার প্রত্যেক সভাতে উপস্থিতও থাকিতাম, কিন্তু কোনও কথা বলিতে জিভ সরিত না। আমাকে ডাঃ ওল্ডফিল্ড বলিলেন—"তুমি আমার সঙ্গে ত বেশ কথা বল, কিন্তু সমিতির বৈঠকে কখনও মুখ খোল না কেন? তুমি অলসের হদ্দ।" তিনি আমাকে পুং-মক্ষিকার উপমা দিয়া কৌতুক করিলেন। মধু-মক্ষিকা সর্বদাই কাজ করে, কিন্তু পুং-মক্ষিকা খাওয়াদাওয়া করিয়া আরামে বসিয়া থাকে, কোনও কাজ করে না। সমিতিতে অন্য সকলে নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, আমি বোবার মত বসিয়া থাকি—এ কেমন? আমার কথা বলিতে যে ইচ্ছা হইত না তাহা নয়,—কিন্তু কি বলিব? সকল সভ্যই আমার অপেক্ষা বেশী জানেন। তাহা ছাড়া যদি কখনও বলার ইচ্ছা হইত ও বলার সাহসও সংগ্রহ করিতাম, প্রায়ই দেখিতাম ততক্ষণ অন্য বিষয়ে আলোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে।

এই রকম অনেক দিন চলিল। ইতিমধ্যে একটা গুরুতর বিষয় সমিতিতে উপস্থিত হইল। উহাতে যোগ না দেওয়া অন্যায় বলিয়া মনে হইল এবং নিঃশব্দে কেবল ভোট দেওয়াটাও কাপুরুষতা বলিয়া বোধ হইল। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন মিঃ হিল্‌স্—"টেম্‌স্ আয়রণ ওয়ার্কসে"র সত্বাধিকারী। তিনি নীতিবাগীশ বা পিউরিটান ছিলেন। তাঁহার টাকাতেই সমিতি চলিত—একথা বলা যায়। সমিতির অনেকেই তাঁহার আশ্রিত ছিল। এই সমিতিতে বিখ্যাত নিরামিষাহারের সমর্থক ডাঃ এলিন্সনও ছিলেন। এই সময়ে কৃত্রিম উপায়ে সন্তানের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ চালু করার আন্দোলন চলিতেছিল। ডাঃ এলিন্সন্

ঐ উপায় ব্যবহারের সমর্থক ছিলেন এবং শ্রমিকদের মধ্যে উহার পদ্ধতি প্রচার করিতেন। কিন্তু মিঃ হিল্সের মত ছিল—এই উপায় অবলম্বন করিলে সমাজের নৈতিক সর্বনাশ ঘটিয়া যাইবে। তিনি মনে করিতেন—নিরামিষাহারী সমিতির আজ কেবল আহারের সংস্কার করাই নহে, উহা নীতি-বর্ধক সমিতিও বটে। সুতরাং মিঃ হিল্সের মতানুসারে ডাঃ এলিন্সনের মত সমাজের পক্ষে অহিতকর এবং সেই মতাবলম্বী ব্যক্তির স্থানও এই সমিতির মধ্যে থাকিতে পারে না। সেই জন্য ডাঃ এলিন্সন্‌কে সমিতি হইতে বাদ দেওয়ার জন্য একটা প্রস্তাব আসিল।

এই আলোচনায় আমার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। ডাঃ এলিন্সনের কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত আমার নিকট ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইত। পিউরিটান হিসাবে তাঁহার বিপক্ষে মিঃ হিল্সের দাঁড়ানো আমি ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই গণ্য করিতাম। তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও খুব বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার উদারতায় আমি মুগ্ধ ছিলাম। কিন্তু একজন নিরামিষাহার-সংশ্লিষ্ট সমিতির সভ্যকে, শুদ্ধ-নীতির নিয়ম সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করেন না বলিয়া সমিতি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া আমার নিকট অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হইল। মিঃ এলিন্সনের স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ-সম্পর্কিত বিচার তাঁহার ব্যক্তিগত—সমিতির সহিত সে সিদ্ধান্তের কোনও সম্পর্ক নাই। সমিতির উদ্দেশ্য নিরামিষাহার প্রচার করা, অন্য নীতির প্রচার করা নয়। সেইজন্য অন্য নীতির অনাদর যিনি করেন তাঁহারও মণ্ডলে স্থান হইতে পারে—ইহাই ছিল আমার বিশ্বাস। সমিতিতে আরও অনেক সভ্য ছিলেন যাঁহারা এইপ্রকার মত পোষণ করিতেন। কিন্তু আমার মনে হইল—এ সম্বন্ধে আমার মত আমার নিজেরই ব্যক্ত করা কর্তব্য। কি করিয়া এই মত প্রকাশ করা যায় তাহাই এক মহা প্রশ্ন হইয়া পড়িল। দাঁড়াইয়া বলার অতখানি সাহস আমার ছিল না। সেই জন্য আমার মন্তব্য সভাপতির নিকট পাঠানো স্থির করিলাম। মন্তব্য লিখিয়াও লইয়া গেলাম। আমার স্মরণ আছে যে, এই লেখাটা পড়ার মত সাহসও আমার হয় নাই। সভাপতি অপর সভ্যকে দিয়া উহা পড়াইয়াছিলেন। ডাঃ এলিন্সনের পক্ষ হারিয়া গেল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমার জীবনের এই ধরনের প্রথম যুদ্ধে আমি পরাজিত দলের পক্ষ লইয়াছিলাম। কিন্তু আমার পক্ষে সত্য ছিল, তাই মনে সম্পূর্ণ সন্তোষও ছিল। আমার আজ অল্প অল্প স্মরণ হয় যে, কতকটা এই ধরনের কারণেই আমি সমিতির সভ্যপদে ইস্তফা দিয়াছিলাম।

যতদিন বিলাতে ছিলাম এই লাজুক ভাব আমি দূর করিতে পারি নাই। যেখানে পাঁচ-সাতজন মানুষ একত্র হইয়াছে সেখানেই আমি মূক হইয়া গিয়াছি।

একবার ভেণ্টনর-এ যাই। সঙ্গে শ্রীমজুমদারও ছিলেন। সেখানে এক নিরামিষাশী পরিবারে আমরা উঠিয়াছিলাম। "এথিক্‌স্ অফ্ ডায়েটের" (খাদ্য সম্বন্ধীয় নীতি) লেখক মিঃ হাওয়ার্ড এই স্থানে ছিলেন। আমরা তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। এইস্থানের জনসাধারণকে নিরামিষ আহারে উৎসাহিত করিবার জন্য এক সভা আহূত হইল। সভায় আমরা দুইজনও বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হইলাম এবং সে নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণও করিলাম। লিখিত ভাষণ পড়ায় কোনো বাধা নাই, একথা আমি জানিয়া লইয়াছিলাম। নিজের বিচারসমূহ দৃঢ়ভাবে অথচ সংক্ষেপে প্রকাশ করার জন্য অনেকে লিখিয়া পাঠ করেন—আমি দেখিয়াছি। আমি আমার ভাষণ লিখিলাম, কিন্তু পড়ার সাহস হইল না। পড়িতে উঠিয়াও আমি পড়িতে পারিলাম না। চোখে দেখি না, হাত-পা কাঁপে। লেখা ফুলস্কেপের এক পৃষ্ঠার বেশী ছিল না। মজুমদার তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। মজুমদারের নিজের ভাষণ খুব সুন্দর হইয়াছিল। শ্রোতারা হাততালি দিয়া তাঁহার বক্তৃতায় সন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল। আমি লজ্জিত হইলাম। বলার শক্তি নাই বলিয়া খুব দুঃখও হইল।

বিলাতে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করার শেষ চেষ্টা করি আমার বিলাত ত্যাগ করার সময়। বিলাত ত্যাগ করার পূর্বে আমি হবর্ণ ভোজন-গৃহে নিরামিষাশী বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। ভাবিলাম নিরামিষ ভোজন-গৃহে ত নিরামিষাহার করানো যায়ই, কিন্তু আমিষ ভোজন-গৃহে নিরামিষাহারের ব্যবস্থা করিলে কিরূপ হয়? এই রকম ভাবিয়া এই গৃহের ব্যবস্থাপকের সহিত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া সেই স্থানে খাওয়ানো স্থির করিলাম। এই নতুন পরীক্ষা নিরামিষাহারীদেরও ভাল লাগিল। কিন্তু বেকুব বনিতে হইল আমাকেই। সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ আনন্দর নিমিত্তই করা হয়। কিন্তু পশ্চিম দেশ উহাকেও একপ্রকার আর্ট-এ পরিণত করিয়াছে। ভোজের সময় বিশেষ গীতবাদ্য হয়, বিশেষ আড়ম্বর হয় ও বক্তৃতা হয়। আমি যে ছোটখাটো ভোজ দিয়াছিলাম তাহাতেও খুব আড়ম্বর হইয়াছিল। অবশেষে আমার বক্তৃতা দেওয়ার সময় আসিল। আমি দাঁড়াইলাম। খুব ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলার জন্য তৈরী হইয়া গিয়াছিলাম। আমি খুব অল্প বাক্যই রচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু

প্রথম বাক্যের অধিক আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এডিসনের সম্বন্ধে তাঁহার লাজুক স্বভাবের কথা পড়িয়াছিলাম। হাউস অব কমন্স-এ তিনি 'আই কনসিভ' কথাটি তিনবার বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই কথা কথাটি উচ্চারণ করা ছাড়া তিনি আর কিছুই বলিতে পারেন নাই। ইংরেজীতে 'কনসিভ'-এর অর্থ 'গর্ভধারণ' করাও হয়। যখন এডিসন আর কিছু বলিতে পারিলেন না, তখন সেই সভাতে এক রসিক সভ্য বলিয়া উঠিলেন—"ভদ্রলোকটি তিনবার গর্ভধারণ করিলেন, কিন্তু কিছুই প্রসব করিতে পারিলেন না!" গল্পটাকে আমি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম এবং উহাকেই অবলম্বন করিয়া ছোট কৌতুকপ্রদ কিছু বলিব বলিয়াও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার ভাষণের আরম্ভ এই এডিসন-কাহিনী দিয়া করিয়াছিলাম, কিন্তু সেইখানেই আটকাইয়া গেলাম। যাহা বলিব ভাবিয়াছিলাম সমস্তই ভুলিয়া গেলাম এবং কৌতুকপূর্ণ বক্তৃতার পরিবর্তে আমিই কৌতুকের পাত্র হইয়া গেলাম। "মহোদয়গণ, আপনারা আমার আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"—কোনভাবে এইটুকু বলিয়া আমাকে বসিয়া পড়িতে হইল।

আমার এই লাজুক স্বভাব দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু একেবারে যে চলিয়া গিয়াছে একথা এখনো বলা যায় না। প্রয়োজন হইলেই তখনকার-তখন বলিতে পারার শক্তি দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ছিল না। নতুন লোকের মধ্যে বলিতে সংকোচ বোধ হইত। বলিতে বলিতে যদি আটকাইত তবে আর বলিতে পারিতাম না। কোনও গল্পের আসরে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে পারি, অথবা বলার ইচ্ছা হয়—একথা এখনো বলিতে পারি না।

কিন্তু তখনকার লাজুক স্বভাবের জন্য আমি নিজেই সময়-সময় হাস্যাস্পদ হইয়াছি, তাহা ছাড়া আর কোনও ক্ষতি হয় নাই—বরঞ্চ আজ দেখিতেছি লাভই হইয়াছে। কথা বলিতে আমার যে সংকোচ পূর্বে দুঃখদায়ক হইত, এখন তাহাই সুখদায়ক হইয়াছে। একটা বড় লাভ এই হইয়াছে যে, আমি শব্দ-প্রয়োগ সংক্ষেপে করিতে শিখিয়াছি। আমার চিন্তার ধারাও সংযত করার অভ্যাস সহজ হইয়াছে। আমি এখন নিজেকে এ সার্টিফিকেট সহজেই দিতে পারি যে, আমার জিহ্বাগ্র হইতে, বা কলমের মুখ হইতে একটা শব্দও বিনা বিচারে, ওজন না করিয়া আমি বাহির করি না। আমার কোনও কথা বা কোনও লেখার কোনও অংশের জন্য আমাকে লজ্জা অথবা অনুতাপ ভোগ করিতে হইয়াছে—এ প্রকারও আমার স্মরণ হয় না। ইহাতে আমি অনেক দুর্ভোগ

হইতে বাঁচিয়া গিয়াছি এবং অনেক সময়ও বাঁচিয়া গিয়াছে।

অভিজ্ঞতা আমাকে ইহাও শিখাইয়াছে যে, সত্যের পূজারীকে মৌন অবলম্বন করিতে হয়। ইহা এক প্রকারের আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলাবোধ। মানুষ জানিয়াই হোক আর না জানিয়াই হোক, অতিশয়োক্তি করিয়া থাকে, সত্য গোপন করে অথবা ঘুরাইয়া বলে। ইহা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা। এই সংকট হইতে বাঁচার জন্য অল্প-ভাষী হওয়া আবশ্যক। যে অল্প কথা বলিয়া থাকে সে বিনা বিচারে কথা বলে না, নিজের প্রত্যেক শব্দ ওজন করে। অনেক সময় লোক কথা বলার জন্য অধীর হয়। "আমার কিছু বলার আছে"— এমন চিঠি কোন্ সভার সভাপতি না পাইয়া থাকেন? তারপর যখন তাহাকে বলার সময় দেওয়া হয়, তখন তাহার কথা শেষ হয় না, আরো বলিতে দেওয়ার সময় প্রার্থনা করে এবং শেষ পর্যন্ত বিনা আদেশেই বলে। এই সকল বাক্য হইতে জগতের লাভ কদাচিৎ হয়। শুধু বিপুল সময় নষ্ট হয়। প্রারম্ভে যে লাজুকতা আমাকে দুঃখ দিত আজ তাহার স্মরণে আমার আনন্দ হয়। উহা হইতে আমি সুপরিণত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আমার সত্যের উপলব্ধিতে আমি উহা হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

১৯

অসত্য-রূপী গরল

চল্লিশ বৎসর পূর্বে লোকে অপেক্ষাকৃত কম বিলাতে যাইত। তাহাদের মধ্যে এই প্রথা দাঁড়াইয়াছিল যে, বিবাহিত হইয়াও তাহারা অবিবাহিত বলিয়া পরিচয় দিত। সে দেশে স্কুল-কলেজের ছাত্র কেহ বিবাহিত নয়। বিবাহিত ব্যক্তি বিদ্যার্থী-জীবন যাপন করে না। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ত বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী নামেই পরিচিত হইত। এখনকার দিনেই বাল্য-বিবাহের চলন হইয়াছে। বিলাতে বাল্য-বিবাহ বলিয়া কোন বস্তু নাই। সেইজন্য সেখানে ভারতীয় যুবকেরা নিজেরা বিবাহিত—একথা স্বীকার করিতে লজ্জা পায়। বিবাহ গোপন করার আর একটা কারণ এই যে, সেকথা প্রকাশ হইলে যে পরিবারে থাকিতে পারা যায় সে পরিবারের যুবতী কুমারীদের সহিত মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা করা চলে না। এই ঘনিষ্ঠতা বেশীর ভাগই নির্দোষ। পিতা-মাতাও ঐ প্রকার মেলামেশা প্রশ্রয় দেন। যুবক ও যুবতীর মতো এইরকম একত্র বাস

সে-সমাজে আবশ্যক বলিয়া গণ্য, কেননা সেখানে প্রত্যেক যুবককে নিজের সহধর্মিণী খুঁজিয়া লইতে হয়। সেই হেতু যে সম্বন্ধ বিলাতে স্বাভাবিক, ভারতীয় যুবক বিলাতে গিয়া যদি সেই সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা পড়ে তবে পরিণাম ভয়ঙ্কর হয়। এইরূপ পরিণাম কতবার হইয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে। এই মোহিনী মায়ার ফাঁদে আমাদের যুবকেরা পড়ে দেখিয়াছি। বিলাতে যুবকদের পক্ষে নির্দোষ হইলেও, আমাদের পক্ষে ঐরূপ মেলামেশা ত্যজ্য। ঐ সখ্যের খাতিরে তাহারা অসত্যাচরণ করিতেও দ্বিধা করে না। এই জালে আমিও জড়াইয়া-ছিলাম। আমি পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্বে পরিণীত হইলেও, এক পুত্রের পিতা হইলেও, অবিবাহিত বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে দ্বিধা করি নাই। কিন্তু এই মিথ্যাচরণের জন্য আমার সুখ কিছুমাত্র বাড়ে নাই। আমার লাজুক স্বভাব—আমার মৌনভাবই আমাকে বাঁচাইয়াছিল। আমি কথা বলিতাম না সুতরাং আমার সহিত কোন যুবতীও কথা বলিতে আসিত না। আমার সহিত বেড়াইতেও কোনো যুবতী কদাচিৎ আসিত।

আমি যেমন লাজুক তেমনি ভীরু ছিলাম। ভেণ্টনর-এ যে পরিবারে আমি থাকিতাম, সেই রকম বাড়ীতে যদি কন্যা থাকে, তবে প্রথার খাতিরে নবাগত-দিগকে তাহাদের বেড়াইতে লইয়া যাইতে হয়। এই বিচারের বশবর্তী হইয়া গৃহিণীর কন্যা আমাকে ভেণ্টনর-এর আশপাশের সুন্দর পাহাড়গুলির উপর লইয়া গেল। আমি কিছু ধীরে চলিতাম না, কিন্তু তাহার গতি আমার অপেক্ষাও দ্রুত ছিল। সে আমাকে পিছনে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। সমস্ত রাস্তা সে কেবল কথা বলিতে বলিতে চলিতেছিল আর আমার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল—কখনো 'হাঁ', আর কখনো 'না', আর খুব বেশী হয়ত 'কেমন সুন্দর!' সে পবন-বেগে চলে আর আমি ভাবি কখন ঘরে ফিরিব। তাহা হইলেও 'এখন ফিরিয়া চলুন' একথা বলার সাহস হইল না। এই সময় একটি টিলার উপর আমরা আসিয়া উঠিলাম। কেমন করিয়া নামিব? পায়ে উঁচু গোড়ালির বুট হইলেও এই বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়সের রমণীটি বিদ্যুৎ-বেগে উপর হইতে নিচে নামিয়া গেল। আমি এখন লজ্জায় কেমন করিয়া গড়াইয়া নামিব ভাবিতেছিলাম। সে নীচে নামিয়া হাসিতেছে, আমাকে সাহস দিতেছে, বলিতেছে—'উপরে আসিয়া হাত ধরিয়া নামাইব নাকি?' এরূপ অবস্থায় কেমন করিয়া ভীরু হইয়া থাকা যায়! অতিকষ্টে কোথাও বা পা ঘষড়াইয়া, কোথাও বা বসিয়া নিচে নামিয়া আসিলাম। সে

উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল—ঠাট্টা করিয়া বলিল—'সা-বা-স'! এমনি করিয়া মেয়েটি যতটা পারে আমাকে লজ্জা দিল। এইরূপ ঠাট্টা করিয়া লজ্জা দেওয়ার তাহার অধিকারও ছিল।

কিন্তু সব জায়গাতেই এমন করিয়া বাঁচা যায় না। তাই অসত্যের গরল হইতে ঈশ্বরই আমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। একবার আমি ব্রাইটনে গিয়াছিলাম। যেমন ভেণ্টনর তেমনি ব্রাইটনও সমুদ্রতীরে হাওয়া খাওয়ার একটা কেন্দ্র। আমি যে হোটেলে উঠিয়াছিলাম সেই হোটেলে একজন সাধারণ-আয়ের ধনশালিনী বিধবা মহিলাও আসিয়াছিলেন। এ আমার প্রথম বৎসরের কথা। এখানে যে যে খাদ্য দেওয়া হইত তাহার ফর্দ সমস্তই ফরাসী-ভাষায় লেখা ছিল। আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। যে টেবিলে এই বিধবা বসিয়াছিলেন আমিও সেই টেবিলেই বসিয়াছিলাম। বর্ষীয়সী মহিলা দেখিলেন যে আমি নূতন লোক—কিছু মুশকিলে পড়িয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন—"তোমাকে এখানে অপরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি যেন ঘাবড়াইয়া গিয়াছ, তুমি এখনো খাবার আনিতে বল নাই কেন?"

আমি সেই ফর্দ পড়িতেছিলাম ও পরিবেশনকারীকে জিজ্ঞাসা করিতে তৈরী হইতেছিলাম। মহিলাটির কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম—"এ ফর্দ আমি পড়িতে পারি না। আমি নিরামিষাশী, কী আমি খাইতে পারি তাহাই জানিতে চেষ্টা করিতেছিলাম।"

তিনি বলিলেন—"আচ্ছা আমি তোমাকে সাহায্য করিতেছি—তুমি যাহা খাইতে পার তাহা বলিয়া দিতেছি।"

ধন্যবাদের সহিত আমি তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিলাম। এইভাবে আমাদের পরিচয় শুরু হয় এবং যতদিন বিলাতে ছিলাম ততদিন ত তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিলই, তার পরেও বহুদিন পর্যন্ত ছিল। তিনি তাঁহার লণ্ডনের ঠিকানা দিয়া প্রতি রবিবারে আমাকে তাঁহার ওখানে খাইতে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহার ওখানে অন্য ব্যাপার উপলক্ষেও আমাকে ডাকিতেন, চেষ্টা করিয়া আমার লজ্জা ঘুচাইতেন, যুবতী মহিলাদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেন, আর তাঁহাদের সহিত কথা বলিতে প্রলুব্ধ করিতেন। একজন মহিলা সেখানে থাকিতেন, বিশেষভাবে তাঁহার সঙ্গেই কথা বলিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইত। কখনও বা আমাদিগকে একা রাখিয়া তিনি

বাহির হইয়া যাইতেন। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুব সহজসাধ্য ছিল না। ভাল করিয়া কথাই বলিতে পারিতাম না, হাস্য-পরিহাস আর কি করিব। কিন্তু তিনি আমাকে পথ দেখাইতে লাগিলেন, আমিও শিখিতে লাগিলাম। ক্রমে এমন হইল যে, আমি রবিবারের আশায় বসিয়া থাকিতাম। এই যুবতী বন্ধুটির সহিত কথা বলিতে ভাল লাগিত।

বর্ষীয়সী মহিলাটি আমাকে ক্রমাগত লোভ দেখাইয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমাদের এই সৌহার্দ্যে আনন্দ পাইতেন। সম্ভবতঃ আমাদের উভয়ের হিতই তাঁহার ঈপ্সিত ছিল।

এখন আমি কি করি? আমি ভাবিতে লাগিলাম—ভদ্রমহিলাটিকে যদি আগেই জানাইয়া দিতাম যে আমার বিবাহ হইয়াছে, তবে খুব ভাল হইত। তাহা হইলে তিনি আমাদের বিবাহবন্ধ করাইবার কথা ভাবিতেও পারিতেন না। কিন্তু এখনও ত প্রতিকারের উপায় আছে। আমি সত্য কথা বলিলেই ত সকল সংকট হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিলাম। আমার যতটা স্মরণ আছে তাহার সারমর্ম দিতেছি—

"ব্রাইটনে দেখা হওয়ার পর হইতেই আপনি আমাকে স্নেহ করিয়া আসিতেছেন। যেমন করিয়া মা নিজের পুত্রের যত্ন লন, আপনি তেমনি করিয়া আমার যত্ন লইতেছেন। আমার মনে হয়, আপনি আমাকে বিবাহিত দেখিতে ইচ্ছা করেন। তাই আমাকে যুবতীদিগের সঙ্গেও পরিচয় করাইয়া দিতেছেন। এই সব ব্যাপার আর যাহাতে বেশীদূর না গড়ায়, সেইজন্য আপনার নিকট প্রথমেই স্বীকার করিতেছি যে, আমি আপনার স্নেহের যোগ্য নহি। আপনার বাড়ীতে যখন যাতায়াত আরম্ভ করি তখনই আমার বলা উচিত ছিল যে আমি বিবাহিত। আমি জানি যে, ভারতীয় ছাত্রেরা এদেশে আসিয়া তাহারা যে বিবাহিত সে কথা গোপন করে—আমিও সেই প্রথারই অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু আমি এখন দেখিতে পাইতেছি যে, আমার বিবাহের কথা গোপন করা মোটেই সঙ্গত হয় নাই। তাহা ছাড়া আমাকে আরো স্বীকার করিতে হয় যে, আমি বাল্যকালেই বিবাহিত এবং আমার এক পুত্রও আছে। কথাটা আপনার নিকট গোপন করায় আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সত্য বলার সাহস ঈশ্বর দেওয়ায় আবার আনন্দও হইতেছে। আপনি কি আমাকে ক্ষমা করিবেন? যে ভগ্নীর সহিত আপনি আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমি

কোনও অযোগ্য আচরণ করি নাই, কতদূর যে যাওয়া যায় সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে। আপনি জানেন না যে আমি বিবাহিত। সুতরাং কাহারও সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে এ ইচ্ছা আপনার হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার মন যাহাতে আর এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর না হয় তাহা করা আবশ্যক এবং সেজন্য আপনার নিকট সত্য প্রকাশ করা দরকার।

"যদি আমার এই পত্র পাওয়ার পরে আপনার ওখানে যাওয়া আমার পক্ষে আপনি আর সঙ্গত বলিয়া মনে না করেন, তাহা আমি মোটেই অন্যায় মনে করিব না। আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহের জন্য আমি চিরদিন আপনার নিকট ঋণী হইয়া থাকিব। কিন্তু যদি আপনি আমাকে ত্যাগ না করেন তবে আমি খুশী হইব—একথাও স্বীকার করিতেছি। আমাকে আপনার ওখানে যাওয়ার যদি যোগ্য মনে করেন, তবে আপনার ভালবাসার আর এক নতুন নিদর্শন পাইব এবং সেই ভালবাসার যোগ্য হওয়ার চেষ্টা করিতে থাকিব।"

অবশ্য এইরূপ পত্র মুহূর্তেই লিখিতে পারি নাই, কতবার যে খসড়া করিয়াছি কে জানে! তবে এই পত্র পাঠাইয়া দিয়া মনে হইয়াছিল যে, আমার বুকের উপর হইতে বড় একটা বোঝা নামিয়া গিয়াছে।

প্রায় ফিরতি ডাকেই সেই বিধবা বান্ধবীর জবাব আসিল। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন :—

"তোমার খোলাখুলি ভাবে লেখা চিঠি পাইলাম। আমরা দুইজনেই সন্তুষ্ট হইয়াছি ও খুব হাসিয়াছি। তোমার অসত্য ক্ষমার যোগ্য। তবে তোমার অবস্থা জানানোও ঠিকই হইয়াছে। আমার নিমন্ত্রণ এখনও রহিল। আগামী রবিবার আমরা তোমার পথ চাহিয়া থাকিব—তোমার বাল্য-বিবাহের গল্প শুনিব ও তোমাকে ঠাট্টা করার আনন্দ পাইব। তোমার সহিত আমাদের মিত্রতা যেমন ছিল তেমনি থাকিবে—এ বিশ্বাস রাখিও।"

আমার মধ্যে অসত্যের যে গরল প্রবেশ করিয়াছিল আমি তাহা এইপ্রকারে দূর করিলাম। অতঃপর আমার বিবাহের কথা কোথাও বলিতে আর দ্বিধা করি নাই।

২০
ধর্মের সহিত পরিচয়

বিলাত-প্রবাসের এক বৎসর পরে দুইজন থিয়োসফিস্ট বন্ধুর সহিত পরিচয় হয়। তাঁহারা সহোদর ভাই এবং অবিবাহিত। তাঁহারা আমার নিকট গীতার কথা বলিলেন এবং আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে উহা সংস্কৃতে পড়িতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি লজ্জিত হইলাম, কেননা আমি সংস্কৃতে বা গুজরাটীতে গীতা পড়ি নাই। সুতরাং আমাকে বলিতে হইল -"আমি গীতা পড়ি নাই, কিন্তু আপনাদের সহিত আমি পড়িতে প্রস্তুত আছি। আমার সংস্কৃত জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। তবে আমি এইটুকু বুঝিতে পারি যে, অনুবাদে যদি ভুল অর্থ থাকে তাহা ধরিতে পারিব।" এইভাবে আমি সেই ভাইদের সঙ্গে গীতা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকগুলির মধ্যে—

ধ্যায়তোবিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংসাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩*

এই শ্লোকগুলি আমার মনের উপর একটা গভীর রেখাপাত করিয়া গেল। উহার শব্দ আমার কানে এখনো বাজিতেছে। তখন আমার মনে হইল যে, ভগবদ্গীতা অমূল্য গ্রন্থ। সেই বোধ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আজ তত্ত্ব-জ্ঞান সম্বন্ধে উহাকেই আমি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া মনে করি। আমার দুঃখ ও হতাশার সময় ঐ গ্রন্থ হইতে অমূল্য সাহায্য পাইয়া থাকি। উহার প্রায় সমস্ত ইংরেজী অনুবাদই পড়িয়া ফেলিয়াছি। এডুইন আরনল্ডের অনুবাদই আমার কাছে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। মূল গ্রন্থের ভাব সম্পূর্ণ রক্ষিত হইলেও উহা অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। এই সময়ে আমি গীতা পড়িলেও, উহা তলাইয়া বুঝার জন্য যে রকম বার বার পড়া দরকার তাহা করিয়াছি বলা যায় না। কয়েক বৎসর পরে গীতা আমার প্রতিদিনের পাঠের গ্রন্থ হইয়া উঠে।

* বিষয় চিন্তাকারী পুরুষের সেই বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে কামনা হয়—কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ হইতে মূঢ়তা উৎপন্ন হয়, মূঢ়তা হইতে ভ্রান্তি হয়, ভ্রান্তি হইতে জ্ঞানের নাশ পায়। যাহার জ্ঞানের নাশ হইয়াছে সে মৃতের তুল্য।

ঐ দুই ভাই আমাকে এড্‌উইন আরনল্ডের বুদ্ধ-চরিত পড়িতে বলেন। আমি এতদিন স্যার এড্‌উইন আরনল্ডের গীতার কথাই জানিতাম। বুদ্ধ-চরিত আমি ভগবদ্‌গীতা অপেক্ষাও অধিক আনন্দের সহিত পড়িলাম। পুস্তকখানা হাতে লইয়া শেষ না করিয়া থাকিতে পারি নাই।

এই ভ্রাতৃদ্বয় একবার আমাকে 'ব্লাভাটস্কী লজে' লইয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে আমি ম্যাডাম ব্লাভাটস্কীর ও মিসেস্ বেসাণ্টের দর্শন পাই। মিসেস্ বেসাণ্ট তখন কেবল নতুন থিয়োসফিস্ট সোসাইটিতে প্রবেশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে সংবাদপত্রে যে সব আলোচনা হইত, আমি তাহা আগ্রহের সহিত পড়িতাম। এই ভ্রাতৃদ্বয় আমাকে সোসাইটিতে প্রবেশ করিতে বলেন। আমি বিনয় সহকারে অস্বীকার করিয়া বলি—"আমার নিজের ধর্মের সম্বন্ধে জ্ঞান কিছুই নাই, সেইজন্য আমি কোন ধর্ম-পথের সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করি না।" মনে হইতেছে—সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের কথায় আমি ম্যাডাম ব্লাভাটস্কীর "কী টু থিয়োসফি" বইখানা পড়ি। উহা হইতে হিন্দুধর্ম বিষয়ক পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা হয় এবং পাদরীদের কথা শুনিয়া, হিন্দুধর্ম কুসংস্কারে পূর্ণ বলিয়া যে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা মন হইতে দূর হয়।

এই সময় এক নিরামিষ ভোজনালয়ে ম্যাঞ্চেস্টার হইতে আগত এক সৎ খ্রীষ্টানের সহিত আমার দেখা হইল। তিনি আমার সহিত খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে কথা বলিলেন। আমি তাঁহার নিকট আমার রাজকোটের স্মৃতির বর্ণনা করি। শুনিয়া তিনি দুঃখিত হন। তিনি বলিলেন—"আমি নিজে নিরামিষাহারী—মদ্যপানও করি না। অনেক খ্রীষ্টান মাংসাহার করে, মদ্যপান করে—এ কথা ঠিক। কিন্তু ঐ দুইয়ের একটাও খাওয়া—ধর্মের আদেশ নহে। আপনাকে 'বাইবেল' পাঠ করিতে বলি।" তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করি। আমার মনে হইতেছে যে, তিনি নিজেই বাইবেল বিক্রয় করিতেন এবং ম্যাপ ও অনুক্রমণিকা সহিত একখানা 'বাইবেল' আমি তাঁহার নিকট হইতেই ক্রয় করিয়াছিলাম। 'বাইবেল' পড়িতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' পড়িতেই পারিলাম না। জেনেসিস্ বা সৃষ্টি-প্রকরণ পর্যন্ত পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে। "পড়িয়াছি"—এ কথা বলার জন্যই পড়িতে রস না পাইয়াও, না বুঝিয়াও দ্বিতীয় প্রকরণ শেষ করিয়াছিলাম। 'নাম্বার্স' নামক প্রকরণ পড়িতে আমার ভাল লাগিত না। কিন্তু যখন 'নিউ টেস্টামেণ্ট' পর্যন্ত আসিয়া পঁহুছিলাম তখন মনের উপর অন্য প্রকার প্রভাব আসিয়া পড়িল। যীশুর 'সারমন্ অন্ দি মাউণ্ট' একেবারে

হৃদয়ে প্রবেশ করিল। "তোমার কোটটি যদি কেহ চায় তবে র‍্যাপারটাও দিয়া দিও," "তোমাকে যে এক গালে মারিবে অপর গালও তাহার দিকে বাড়াইয়া দিবে"—ইহা পড়িয়া মনে অপার আনন্দ হইল। শামল ভট্টের কবিতা মনে হইল। আমার তরুণ মন গীতা, আরনল্ডের বুদ্ধ-চরিত ও যীশুর বাক্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় খুঁজিয়া পাইল। ত্যাগেই ধর্ম—একথা মনে লাগিল।

এই সকল পাঠ করার পর অপর ধর্মাচার্যদিগের জীবনী পড়িতে ইচ্ছা হয়। কোনও বন্ধু কার্লাইয়ের 'বীর ও বীরপূজা'-খানা পড়িতে বলেন। উহা হইতে পয়গম্বরের সম্বন্ধে পড়িয়া মহম্মদের মহত্ত্ব, বীরত্ব ও তাঁহার তপশ্চর্যার বিষয় জানিলাম।

কিন্তু আমি এই পর্যন্ত পরিচয়ের পর তখনকার মত আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কারণ পরীক্ষার বই পাঠ করিয়া আর অপর পুস্তক পড়ার অবকাশ ছিল না। তবে আমি মনে মনে একথা ঠিক করিয়া রাখিলাম যে, আমার ধর্ম-পুস্তক পড়িতে হইবে এবং সমস্ত ধর্মের সঙ্গেই উপযুক্ত পরিচয় করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু নাস্তিকতা সম্বন্ধেও কিছু না জানিলে চলে কেমন করিয়া? "ব্রাড্‌ল"র নাম ও তাহার তথাকথিত নাস্তিকতাবাদের কথা সকল ভারতবাসীই জানিত। সেইজন্য ঐ বিষয়ে কিছু পুস্তক পড়িলাম—নাম ভুলিয়া গিয়াছি। উহাতে আমার মনে কোনও দাগ পড়ে নাই। নাস্তিকতার সাহারা মরুভূমি আমি তখনই পার হইয়া গিয়াছি। মিসেস্ বেসাণ্টের কথা তখন খুব আলোচিত হইত। তিনি নাস্তিকতা হইতে আস্তিকতায় আসিয়াছেন, এ কথাতেও আমার মন নাস্তিকতার প্রতি উদাসীন হইল। মিসেস্ বেসাণ্টের "আমি কেমন করিয়া থিয়োসফিস্ট হইলাম" নামক পুস্তকখানা পড়িয়া ফেলিলাম। এই সময় "ব্রাড্‌ল"র দেহান্ত হয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ওকিং-এ নিষ্পন্ন হইল। আমি সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমার মনে হয় লণ্ডন-প্রবাসী সমস্ত ভারতবাসীই গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য কয়েকজন পাদরীও উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফিরিবার সময় আমরা এক জায়গায় ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। সেই ভিড়ের মধ্য হইতে কোনও পালোয়ান নাস্তিক এই পাদরীদিগের মধ্যে একজনকে জেরা করিতে আরম্ভ করিল।

"কী মহাশয়, আপনি ত বলেন ঈশ্বর আছেন!"

সেই ভালমানুষটি নিম্নস্বরে জবাব দিলেন—"হাঁ, আমি সত্যই তাহা বলি।"

তিনি হাসিলেন ও পাদরী অপেক্ষা ভাল বুঝেন এই ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"আচ্ছা! পৃথিবীর পরিধি ২৮০০০ মাইল তাহা আপনি স্বীকার করেন ত?"

"অবশ্য!"

"তাহা হইলে বলুন—ঈশ্বরের শরীরটা কত বড় আর তিনি কোথায়ই বা থাকেন?"

"আমরা যতটুকু জানি,—আমাদের উভয়ের হৃদয়েই তিনি বাস করেন।"

"আমাকে ছেলে ভুলাইবেন না"—এই কথা বলিয়া তিনি বিজয়ী যোদ্ধার ন্যায় আশেপাশে দৃষ্টিপাত করিলেন।

পাদরী নম্রভাবে মৌন হইয়া রহিলেন।

এই কথোপকথন হইতে নাস্তিকতার প্রতি আমার বিরুদ্ধভাব আরও বাড়িল।

২১
"নির্বল কে বল রাম"

হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রের ও পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে কতক জ্ঞান ত হইল; কিন্তু এই জ্ঞান মানুষকে বাঁচাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিপদের সময় যে বস্তু মানুষকে বাঁচায়, সে-সময় সে সম্বন্ধে তাহার বোধ বা জ্ঞান থাকে না। যখন নাস্তিক বাঁচিয়া যায় তখন সে বলে—ভাগ্যের জোরে বাঁচিয়া গেলাম.। আস্তিক সেই অবস্থায় বলে—ঈশ্বর বাঁচাইলেন। ধর্মপুস্তক পাঠের অভ্যাস হইতে, সংযম হইতে—ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে প্রকট আছেন এই প্রকার সিদ্ধান্ত সে পরে করিয়া লয়। এই প্রকার অনুমান করার তাহার অধিকার আছে। কিন্তু যখন বাঁচে তখন কে বাঁচাইতেছে, উহা তাহার সংযম কি আর কিছু—সে কথা সে জানে না। যে নিজের সংযম-বলের অভিমান করে তাহার সংযম ধূলিসাৎ হয় ইহা কে না অনুভব করিয়াছে? শাস্ত্রজ্ঞানের ত এসময় কোনই মূল্য থাকে না। এই বুদ্ধিগ্রাহ্য ধর্মজ্ঞান যে মিথ্যা, তাহার অভিজ্ঞতা আমার বিলাতে হইয়াছিল। পূর্বেও যখন এইপ্রকার ভয় হইতে বাঁচিয়াছি তখন কেমন করিয়া যে বাঁচিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। তখন আমার বয়স খুব অল্প ছিল। কিন্তু এখন আমার বয়স কুড়ি বৎসর হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি।

যতদূর স্মরণ হয়, আমার বিলাত-বাসের শেষ বৎসরে অর্থাৎ ১৮৯০ সালে পোর্টস্‌মাউথে নিরামিষাহারীদের এক সম্মেলন হয়। সেখানে আমার ও আমার এক ভারতীয় বন্ধুর নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আমরা উভয়েই গিয়েছিলাম। সেখানে এক স্ত্রীলোকের বাড়ীতে আমাদের উঠিতে হইয়াছিল।

পোর্টস্‌মাউথকে খালাসীদিগের বন্দর বলা হয়। সেখানে অনেক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের বাস। এই স্ত্রীলোকেরা ঠিক বেশ্যা নয়, আবার নির্দোষও নয়। এইরকম এক বাড়ীতে আমাদিগকে উঠিতে হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতি ইচ্ছা করিয়া যে এইপ্রকার বাড়ী ঠিক করিয়াছিলেন, একথা বলা যায় না। পোর্টস্‌মাউথের মত বন্দরে কোনও যাত্রীকে রাখার জন্য কোনও ঘর ঠিক করিলে, কোন্‌টা যে ভাল আর কোন্‌টা যে খারাপ বাড়ী তাহা নির্ণয় করা শক্ত।

রাত্রি হইল। আমরা সভা হইতে বাড়ী ফিরিলাম। খাওয়ার পর তাস খেলা আরম্ভ হইল। বিলাতে ভাল ঘরেও অভ্যাগতের সহিত গৃহিণী তাস খেলিতে বসিয়া থাকেন। এই তাস খেলা নির্দোষ আমোদের সহিতই হয়। এখানে কিন্তু বীভৎস আমোদ আরম্ভ হইল। আমার সঙ্গী যে উহাতে নিপুণ তাহা জানিতাম না। আমি এই কৌতুকে রস অনুভব করিলাম। আমি ফাঁদে পড়িয়াছিলাম। আমি কু-বাক্য হইতে কু-কার্যে অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছিলাম। তাস ফেলিয়া উঠিতে উদ্যত হইয়াছি এমন সময় আমার হিতকারী সাথীর মধ্যে যে রামচন্দ্র বাস করিতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ রে ছোক্‌রা! তোমার মধ্যেও শয়তান আছে দেখিতেছি—কিন্তু একাজ ত তোমার নয়! তুমি পালাও—শীঘ্র পালাও।"

আমি লজ্জিত হইলাম—সাবধান হইলাম। হৃদয়ের ভিতরে বন্ধুর এই উপকার অনুভব করিলাম। মায়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ হইল। আমি পলাইলাম। কাঁপিতে কাঁপিতে নিজের কামরায় আসিয়া পঁহুছিলাম। বুক ধড়ফড় করিতেছিল। ব্যাধের হাত হইতে পলাইতে পারিলে শিকারের যে অবস্থা হয়, আমারও তাহাই হইয়াছিল।

পরস্ত্রী দেখিয়া বিকারগ্রস্ত হওয়া ও তাহার সহিত বাসনা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা এই আমার প্রথম বলিয়া মনে হয়। বিনা নিদ্রায় সে রাত্রি কাটিল। অনেক প্রকারের চিন্তা আমার মনের ভিতর আসিয়া জুটিল। এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইব? পলাইব? আমি কোথায় আছি? আমি যদি সাবধান

না হই তবে আমার অবস্থা কি হইবে?—এই সব চিন্তা। অবশেষে স্থির করিলাম—আমি সাবধান হইয়া চলিব, এ বাড়ী ছাড়িব না, তবে যেমন করিয়া হউক পোর্টস্‌মাউথ তাড়াতাড়ি ত্যাগ করিব। সম্মেলন দুই দিনের বেশী ছিল না। আমার স্মরণ আছে দ্বিতীয় দিনেই আমি পোর্টস্‌মাউথ ত্যাগ করি। আমার সাথী আরও কিছুদিন পোর্টস্‌মাউথে রহিয়া গেলেন।

ধর্ম কি, ঈশ্বর কি, তিনি কিভাবে আমাদের মধ্যে কার্য করেন তাহা তখন কিছুই জানিতাম না। ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইলেন—লৌকিক রীতিতে আমি এইটুকু বুঝিলাম। কিন্তু বিবিধ ক্ষেত্রে আমার এই অভিজ্ঞতাই হইয়াছে। "ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন"—এই বাক্যের মধ্যে যে একটা গভীর অর্থ আছে তাহা আজ বুঝিতেছি, আর তাহার সঙ্গে ইহাও বুঝিতেছি যে, এই বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ এখনও আমার কাছে ধড়া পড়ে নাই। অভিজ্ঞতা দ্বারাই ইহা বোধগম্য হয়। ওকালতী করার সময়, সংস্থা চালাইবার কাজে, রাজনৈতিক ব্যাপারে—যখনই কোন বিপদ বা পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, "ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়াছেন"। যখন সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়া বসিয়াছি, কোথাও কোন সান্ত্বনা মেলে নাই, তখন কোথাও না কোথাও হইতে সাহায্য আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাই আমার অভিজ্ঞতা। স্তুতি, উপাসনা, প্রার্থনা,—এ সকল কুসংস্কার নহে; আমাদের খাওয়া-দাওয়া, চলা, বসা—এগুলি যেমন সত্য তাহা অপেক্ষা উহা অধিক সত্য বস্তু। ইহাই সত্য আর সকলই মিথ্যা—একথা বলা অতিশয়োক্তি নহে।

এই উপাসনা, এই প্রার্থনা ইহা কিছু বাক্যের আড়ম্বর নহে। উহার মূল কণ্ঠে নয়—হৃদয়ে। সেই হেতু যদি আমাদের হৃদয় নির্মল করি, যদি হৃদয়ের তার ঠিকভাবে বাঁধিয়া লই, তবে হৃদয় হইতে যে সুর উৎপন্ন হয় তাহা ঊর্ধ্বগামী হয়। সে সুরের জন্য বাক্যের আবশ্যকতা নাই। উহা স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু। মন হইতে বিকার-রূপী মলিনতা দূর করার জন্য উপাসনা যে ঔষধ—এ বিষয়ে আমার সংশয় নাই। কিন্তু সে উপাসনার সহিত নম্রতা যুক্ত হওয়া চাই।

২২

নারায়ণ হেমচন্দ্র

ইতিমধ্যে নারায়ণ হেমচন্দ্র বিলাতে আসিলেন। লেখক বলিয়া তাঁহার নাম আমি শুনিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মিস্ ম্যানিং-এর ওখানে দেখিলাম। মিস্ ম্যানিং জানিতেন যে, আমি লোকের সাথে মিশিতে জানি না। আমি তাঁহার ওখানে যাইতাম, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, কেহ কিছু বলিলে তবে কথা বলিতাম।

তিনি নারায়ণ হেমচন্দ্রের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার পোশাক ছিল বিচিত্র। পরনে একটা বে-ঢপ পাতলুন, গায়ে একটা কোঁচকানো ময়লা ব্রাউন রংএর কোট। নেকটাই, কলার ছিল না। কোটটা পার্শী কোটের মত কিন্তু তাহার গড়ন ঠিক ছিল না। মাথায় থোপা দেওয়া উলের টুপী ছিল। তিনি লম্বা দাড়ি রাখিতেন।

তাঁহার আকৃতি ছিল পাতলা, বেঁটে ধরনের। মুখে বসন্তের দাগ। মুখ গোলপানা, নাক না ছুঁচলো, না মোটা। দাড়ির উপর হাত বুলাইতেন।

সকল সম্ভ্রান্ত সমাজেই নারায়ণ হেমচন্দ্রকে অদ্ভুত বেমানান লাগিত এবং তাঁহার উপর চোখ পড়িতই।

"আপনার নাম আমি খুব শুনিয়াছি; আপনার কিছু লেখাও পড়িয়াছি। আপনি কি আমাদের ওখানে যাইবেন ?"

নারায়ণ হেমচন্দ্রের স্বর একটু কর্কশ ছিল। তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন—"আপনি কোথায় থাকেন।"

"স্টোর স্ট্রীটে।"

"তাহা হইলে ত আমি আপনাদের পাড়াতেই থাকি। আমায় ইংরাজী শিখিতে হইবে। আপনি কি আমাকে শিখাইতে পারিবেন ?"

আমি জবাব দিলাম—"আপনাকে যদি কোনও সাহায্য করিতে পারি তবে সুখী হইব। আমার দ্বারা যতটুকু পরিশ্রম হইতে পারে তাহা করিব। আপনি বলেন ত আপনার ওখানেই যাইব।"

"না, না, আমিই আপনার কাছে যাইব। আমার একখানা অনুবাদ-পাঠমালা আছে তাহাও সঙ্গে লইব।"

আমরা সময় স্থির করিলাম। শীঘ্রই আমাদের মধ্যে খুব সৌহার্দ্য জন্মিল।

নারায়ণ হেমচন্দ্র আদৌ ব্যাকরণ জানিতেন না। 'ঘোড়া'কে বলেন ক্রিয়াপদ, আর 'দৌড়ানো'কে বলেন বিশেষ্য। এই প্রকার কৌতুকাবহ ব্যাপার আমার কত মনে আছে। কিন্তু নারায়ণ হেমচন্দ্র দমিবার লোক ছিলেন না। আমার অল্প ব্যাকরণ জ্ঞান তাঁহার বিশেষ কিছু কাজে আসিত না। ব্যাকরণ না জানার জন্য তাঁহার কোন লজ্জাও ছিল না।

"আমি ত আপনার মত স্কুলে পড়ি নাই। আমার ভাব প্রকাশ করার জন্য ব্যাকরণের আবশ্যক হয় না। দেখুন আপনি কি বাংলা জানেন? আমি বাংলা জানি। আমি বাংলায় ঘুরিয়াছি। আমিই গুজরাটবাসীকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুস্তকসমূহের অনুবাদ উপহার দিয়াছি। আমাকে এখনও অনেক ভাষা হইতে তরজমা করিয়া গুজরাটকে দিতে হইবে। তরজমায় আমি শব্দার্থ গ্রাহ্যই করি না। ভাবার্থ দিই—তাহাতেই আমার সন্তোষ। আরও বেশী যদি দিতে হয়, তবে পরে যিনি বেশী জ্ঞান লইয়া আসিবেন তিনিই না হয় দিবেন। আমি ব্যাকরণ না শিখিয়াই মারাঠী জানি, হিন্দী জানি, এখন ইংরাজী জানিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমার চাই শব্দ-সম্ভার। আপনি জানেন না, কেবল ইংরাজী শিখিয়াই আমার সন্তোষ নাই। আমাকে ফ্রান্সেও যাইতে হইবে এবং ফরাসী ভাষাও শিখিতে হইবে। আমি শুনিয়াছি ফরাসী ভাষায় বিস্তীর্ণ সাহিত্য আছে। যদি সম্ভব হয় তবে জার্মাণীতেও যাইব এবং জার্মাণ ভাষাও শিখিয়া লইব।"

এইভাবে নারায়ণ হেমচন্দ্রের বাক্য-প্রবাহ চলিতে লাগিল। ভাষা জানিতে আর তেমনি ভ্রমণ করিতে তাঁহার লোভের অন্ত ছিল না।

"তাহা হইলে আপনি ত আমেরিকাতেও যাইবেন?"

"নিশ্চয়, নূতন দুনিয়া না দেখিয়া কি আমি ফিরিব নাকি?"

"কিন্তু আপনার কাছে এত বেশী পয়সা কোথায়?"

"আমার পয়সার দরকারটা কি? আমার কি আপনার মত ফিটফাট থাকিতে হয়? অতি সামান্য আহার আর নিতান্ত প্রয়োজনমতো পোশাক হইলেই আমার চলিয়া যায়। আমার পুস্তক হইতে কিছু পাই, বন্ধু-বান্ধবেরাও কিছু দেয়। তাহাতেই যথেষ্ট হইয়া যায়। আমি সকল সময় তৃতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করি। আমেরিকাতেও ডেকে যাইব।"

নারায়ণ হেমচন্দ্রের সাদাসিধা ধরন তাঁহার নিজস্ব ছিল। তাঁহার সরলতাও উহার অনুরূপ ছিল। মনের ভিতর অভিমানের নামগন্ধও ছিল না। কেবল

লেখক হিসাবে নিজের শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার একটা বড় রকমের ধারণা ছিল।

আমাদের রোজ সাক্ষাৎ হইত। আমাদের মধ্যে বিচার ও আচারের সাদৃশ্য ছিল। উভয়েই নিরামিষাহারী ছিলাম। দুপুরে অনেক সময় একত্র যাইতাম। এ সেই সময়ের কথা—যখন আমি সতের শিলিং-এ সপ্তাহ চালাইতাম এবং নিজে রান্না করিয়া খাইতাম। কখনো বা আমি তাঁহার কামরায় যাইতাম। কখনো বা তিনি আমার কামরায় আসিতেন। আমি ইংরাজী ঢং-এ রান্না করিতাম। তাঁহার দেশী ঢং-এর রান্না ছাড়া তৃপ্তি হইত না। ডাল ত চাই-ই। আমি গাজর ইত্যাদি দিয়া সুপ রাঁধিতাম, তাহাতে আমার প্রতি তাঁহার দয়া হইত। কোথা হইতে তিনি যেন মুগ যোগাড় করিয়া আনিলেন। একদিন আমার জন্য মুগের ডাল রাঁধিয়া আনিয়াছিলেন, আমি অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত তাহা খাইয়াছিলাম। এইভাবে একে অপরকে রাঁধিয়া দেওয়ার পালা চলিল। আমার তৈরী খাদ্য আমি তাঁহাকে দিতাম, তিনি আমাকে দিতেন তাঁহার তৈরী আহার্য।

এই সময় কার্ডিনাল ম্যানিং-এর নাম সকলের মুখেই ছিল। ডকের মজুরদের যে হরতাল (strike) হইয়াছিল, জন বার্ণস ও কার্ডিনাল ম্যানিং-এর চেষ্টায় তাহা শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। কার্ডিনাল ম্যানিং-এর সাদাসিধা ধরন সম্বন্ধে ডিজ্‌রেলি খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই প্রশংসা আমি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন—"তাহা হইলে ত আমার এই সাধুপুরুষের সহিত দেখা করা চাই।

"তিনি ত মস্ত বড় লোক, আপনি কেমন করিয়া দেখা করিবেন ?"

"কেমন করিয়া দেখা করিতে হইবে, তাহা আমি জানি। আপনাকে আমার নাম দিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া দিতে হইবে। আমি যে লেখক এ পরিচয়ও দিতে হইবে। লিখিতে হইবে—তাঁহার জনহিতকর কার্যের জন্য ধন্যবাদ নিজে গিয়া দিয়া আসার জন্য দেখা করিতে চাই। আর ইহাও লিখিবেন—আমি ইংরাজী জানি না বলিয়া আপনাকে আমার সহিত দোভাষী করিয়া লইয়া যাইব।"

ঐরূপ পত্র আমি লিখিয়া দিলাম। দুই-তিনদিনের মধ্যেই কার্ডিনাল ম্যানিং-এর জবাব আসিল। তিনি দেখা করার সময় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

আমরা দুইজনে গেলাম। আমি দস্তুরমাফিক দেখা করার পোশাক পরিলাম। আর নারায়ণ হেমচন্দ্র চলিলেন যেমন ছিলেন তেমনি ভাবে—সেই

কোট আর সেই পাতলুন। আমি পরিহাস করিলাম। তিনি আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"তোমরা সভ্যরা বড় ভীরু। মহাপুরুষেরা কাহারও পোশাকের দিকে তাকান না। তাঁহারা হৃদয়ের দিকটাই দেখেন।"

আমরা কার্ডিনালের মহলে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীটা রাজবাড়ীর মত। আমরা বসামাত্রই এক দীর্ঘদেহী শীর্ণ বৃদ্ধ প্রবেশ করিলেন। আমাদের দুইজনের সঙ্গেই করমর্দন করিলেন। নারায়ণ হেমচন্দ্র তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন—

"আপনার বেশী সময় আমি লইব না। আমি আপনার কথা বহু শুনিয়াছি। আপনি ধর্মঘটীদের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা আমি আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি। দুনিয়ার সাধুপুরুষ দর্শন করা আমার একটি ব্রত এবং আমি আপনাকে দেখিতে আসিয়া সেই ব্রতই পালন করিয়াছি। আর সেই জন্য আপনাকে আমি এই কষ্ট দিলাম।"

এ কথাগুলি আমার তরজমা। নারায়ণ হেমচন্দ্র উহা গুজরাটী ভাষায় বলিয়াছিলেন।

"আপনি আসাতে সন্তুষ্ট হইলাম। আমি আশা করি এখানে (বিলাতে) থাকা আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক হইবে না এবং আপনি এখানকার লোকের সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিবেন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"—এই কথা কয়টি বলিয়া কার্ডিনাল আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

একবার নারায়ণ হেমচন্দ্র ধুতি ও শার্ট পরিয়া আমার ওখানে আসেন। আমাদের গৃহকর্ত্রী দরজা খুলিয়াই ভীত হইয়া দৌড়াইয়া আমার কাছে আসিলেন। (আমি যে বাড়ী বদলাইয়া থাকি তাহা ত পাঠক জানেন, এই গৃহস্বামিনীটি নারায়ণ হেমচন্দ্রকে পূর্বে দেখেন নাই) তিনি বলিলেন—"একটা পাগলের মত লোক তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়।" আমি দরজার কাছে গিয়া নারায়ণ হেমচন্দ্রকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার মুখে-চোখে সেই পরিচিত হাস্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

"রাস্তার ছোক্‌রারা আপনার পিছু লাগে নাই ?"

তিনি জবাব দিলেন—"আমার পিছনে ছুটিতেছিল। কিন্তু আমি গ্রাহ্য না করায় শান্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।"

নারায়ণ হেমচন্দ্র কয়েক মাস বিলাতে থাকিয়া প্যারিসে যান। সেখানে

ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন ও ফরাসী পুস্তকের তর্জমা করেন। তাঁহার তর্জমা দেখিয়া দেওয়ার মত ফরাসী ভাষা আমি জানিতাম। সেইজন্য আমাকে তিনি উহা দেখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা তর্জমা বলা যায় না—ভাবার্থ মাত্র।

অবশেষে তিনি তাঁহার আমেরিকা যাওয়ার সংকল্পও পূর্ণ করেন। বহু কষ্টে তিনি ডেক অথবা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিতে পারিয়াছিলেন। আমেরিকাতে ধুতি-শার্ট পরিয়া বাহির হওয়ার জন্য "অশোভন পোশাক পরিধান" অপরাধে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমার যতদূর স্মরণ হয়—পরে তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন।

২৩
বিরাট প্রদর্শনী

সন ১৮৯০ সালে প্যারিসে এক বিরাট প্রদর্শনী হয়। উহার জন্য যে আয়োজন হইতেছিল তাহার বিবরণ সংবাদপত্রে পড়িয়া প্যারিসে যাওয়ারও খুব ইচ্ছা হইল। তাহা ছাড়া প্রদর্শনী দেখিতে গেলে প্রদর্শনী ও প্যারিস দুই-ই দেখা হয়। প্রদর্শনীতে বিশেষ আকর্ষণ ছিল—'এফিল টাওয়ার'। এই 'টাওয়ার' আগাগোড়া লোহার তৈরী। উহা এক হাজার ফুট উচ্চ। এক হাজার ফুট উঁচু বাড়ী খাড়া করিয়া রাখাই যায় না বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। ইহা ছাড়াও প্রদর্শনীতে দেখিবার জিনিস আরো অনেক কিছু ছিল।

প্যারিসের এক নিরামিষ ভোজনালয়ের কথা পড়িয়াছিলাম। সেইখানে একটা কামরা স্থির করা গেল। গরীবের মত কষ্ট করিয়া প্যারিসে পঁহুছিলাম। সেখানে সাতদিন ছিলাম। পায়ে হাঁটিয়াই যাহা কিছু দ্রষ্টব্য দেখিয়া লইয়াছিলাম। সঙ্গে প্যারিসের ও প্রদর্শনীর গাইড্ ও নক্সা ছিল। তাহাই অবলম্বন করিয়া রাস্তা চিনিয়া প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখি।

প্রদর্শনীর বিশাল রচনা ও নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভারের বাহুল্যের কথা ছাড়া আর কিছু মনে নাই। এফিল-টাওয়ারের উপর দুই-তিনবার চড়িয়াছিলাম, সেকথা স্মরণ আছে। প্রথম তলায় খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এত উঁচুতে বসিয়া ভোজন করিয়াছি বলিতে পারার জন্য, সেখানে সাত শিলিং জলে ফেলিয়া দিয়াও

কিছু খাইয়াছিলাম। প্যারিসের প্রাচীন গীর্জাগুলির কথা আজও মনে আছে। সেখানকার মহিমা ও তাহার ভিতরের শান্তির কথা ভুলিতে পারা যায় না। নোতর্‌দামের অপূর্ব কারিগরী ও ভিতরের চিত্রকার্যের কথাও স্মরণ আছে। যাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই স্বর্গীয় দেবালয় গড়াইয়াছিলেন তাঁহাদের ভিতরে অবশ্যই গভীর ঈশ্বর-প্রেম ছিল তাহা আমি অনুভব করিলাম।

প্যারিসের ফ্যাশন, প্যারিসের স্বেচ্ছাচার, সেখানকার ভোগবিলাসের কথা অনেক পড়িয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহা সেখানের পথেঘাটে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছড়ানো। কিন্তু প্যারিসের গীর্জাগুলি সেসব হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেই গীর্জায় প্রবেশ করিলেই বাহিরের অশান্তির কথা আর মনে থাকে না—লোকের ব্যবহার বদলাইয়া যায়, লোকের ধরন বদলাইয়া যায়, মনের ভিতর একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠে। ভার্জিন মেরীর মূর্তির সম্মুখে কেহ না কেহ প্রার্থনা করিতেছেন। ইহা যে কুসংস্কার নয়, ইহা যে ভক্তি—সে বিশ্বাস আমার সেই সময়েই হইয়াছিল এবং তাহা এখনও বৃদ্ধি পাইতেছে। মাতা মেরীর মূর্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা-রত উপাসকেরা মার্বেল পাথরের পূজা করেন না, উহার অন্তরস্থ ভাবধারারই পূজা করেন। উহাতে ঈশ্বরের মহিমা কম হয় না, বরঞ্চ বাড়িয়া যায়—এই প্রকারের একটা ভাব যে তখন আমার মনে উদয় হইয়াছিল, তাহার অস্পষ্ট স্মৃতি আজও রহিয়াছে।

এফিল-টাওয়ার সম্বন্ধে কিছু বলার আবশ্যক আছে। এফিল-টাওয়ারের দ্বারা আজ কি প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয় তাহা জানি না। প্রদর্শনীতে যাওয়ার পর উহার সম্বন্ধে কতই বর্ণনা পড়িয়াছি। টাওয়ারের স্তুতি ও নিন্দা উভয়ই শুনিয়াছি। যাঁহারা নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে টলস্টয়ই ছিলেন প্রধান। তিনি লিখেন যে, এফিল-টাওয়ার মনুষ্যের মূর্খতার নিদর্শন—উহা জ্ঞানের ফল নয়। তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে যত প্রচলিত নেশা আছে তাহার মধ্যে তামাকের ব্যসন একদিক দিয়া দেখিলে সর্বাপেক্ষা খারাপ। মদ খাইয়া যে কুকর্ম করার সাহস হয় না, চুরোট খাইয়া তাহা হয়। মদ খাইয়া মানুষ মাতাল হয়। কিন্তু যে ধূমপান করে তাহার বুদ্ধিই ধোঁয়াচ্ছন্ন হয় এবং সেইজন্য সে হাওয়ার কেল্লা রচনা করে। এফিল-টাওয়ার এইপ্রকার ব্যসনের পরিণাম। টলস্টয় এমনিভাবে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করেন।

এফিল-টাওয়ারে ত কোনই সৌন্দর্য নাই। প্রদর্শনীকে উহা যে কোনও সৌষ্ঠব দিয়াছিল—এ কথাও বলা যায় না। একটা নতুন জিনিস, একটা

বৃহদাকার জিনিস বলিয়াই উহা দেখার জন্ম হাজার হাজার লোক ছুটিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এফিল-টাওয়ার প্রদর্শনীর একটা খেলনা মাত্র ছিল। যতক্ষণ আমরা মোহের বশীভূত থাকি ততক্ষণ আমরা বালকের ন্যায় থাকি, টাওয়ার এই কথাই ভাল করিয়া প্রমাণ করিতেছে—ইহাই উহার সার্থকতা বলিয়া গণ্য করা যায়।

২৪

ব্যারিষ্টার ত হইলাম—তারপর ?

যে কাজের জন্ম বিলাত আসিয়াছিলাম সেই কার্য অর্থাৎ ব্যারিস্টার হওয়া সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কিছুই বলি নাই। এখন সে বিষয়ে কিছু লিখিবার সময় আসিয়াছে।

ব্যারিস্টার হওয়ার জন্ম দুইটি জিনিস দরকার। প্রথম, টার্ম অর্থাৎ মিয়াদ কাল রক্ষা করা। বছরে চারটি টার্ম আছে—তিন বছরে মোট বারোটা টার্ম। দ্বিতীয় হইতেছে—আইনের পরীক্ষা দেওয়া। 'টার্ম রক্ষা' করার অর্থ 'খানা খাওয়া'। প্রত্যেক টার্মে প্রায় চব্বিশটি করিয়া ভোজের আয়োজন হয়—তাহার মধ্যে অন্ততঃ ছয়টায় অংশগ্রহণ করা চাই। খানা খাওয়া মানে খাইতেই যে হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। কেবল নির্দিষ্ট সময় হাজিরা দিয়া খানা খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকা দরকার। সাধারণতঃ সকলেই খাওয়াদাওয়া করেন। খানায় সারি সারি প্লেট আসে ও ভাল মদ আসে। তাহার দাম অবশ্য দিতে হয়। এই দাম আড়াই হইতে সাড়ে তিন শিলিং পর্যন্ত হয় অর্থাৎ দুই-তিন টাকার মত। এই দাম খুবই কম, কেন না বাইরের হোটেলে কেবল মদের খরচই ঐরূপ পড়িয়া থাকে। খাওয়ার খরচা হইতে মদ খাওয়ার খরচা অধিক —একথা ভারতবর্ষে যাঁহারা 'রিফর্মড্' বা 'সংস্কৃত' হন নাই, তাঁদের কাছে আশ্চর্য মনে হইবে। বিলাতে গিয়া একথা জানিয়া আমি খুব ব্যথিত হই ও ভাবি যে, মদ খাওয়ার জন্ম মানুষ এত টাকা কেমন করিয়া নষ্ট করে! প্রথম দিকে এই সব আহার্যের আমি কিছুই খাইতাম না। আমার খাওয়ার মধ্যে থাকিত কেবল রুটি, আলুসিদ্ধ ও কপিসিদ্ধ। তখন উহা ভাল লাগিত না বলিয়াই খাইতাম না। কিন্তু পরে যখন উহার স্বাদ লইতে শিখিয়াছিলাম তখন অন্ম প্লেট চাহিয়া লওয়ার শক্তিও আমার হইয়াছিল।

ছাত্রদিগের জন্য এক ধরনের খানা ও বেঞ্চারদিগের জন্য অন্য ধরনের ভাল খানা থাকে। আমার সঙ্গে এক পার্শী ছাত্র ছিলেন। তিনি নিরামিষাহারী। আমরা দুইজনে নিরামিষাহার প্রচারের জন্য বেঞ্চারদের খানা হইতে নিরামিষ যাহা পাওয়া যায় তাহার জন্য আবেদন করি। আবেদন মঞ্জুর হওয়ায় আমরা বেঞ্চারদের টেবিল হইতে ফল ও অন্যান্য তরকারি পাইতে লাগিলাম।

আমি মদ খাইতাম না। চারজনের মধ্যে দু বোতল মদ পাওয়া যায়। অনেকের আমাকে চতুর্থ ব্যক্তি করিয়া লওয়ার খুব আগ্রহ ছিল। আমি মদ খাই না বলিয়া বাকী তিনজনে দুই বোতল মদ উড়াইতে পারে—আমার সম্বন্ধে আগ্রহের এই ছিল কারণ। আবার প্রতি টার্মে একটা করিয়া মহা-ভোজ (গ্র্যাণ্ড নাইট) আসিত। সেদিন পোর্ট ও শেরী ছাড়াও পাওয়া যাইত শ্যাম্পেন। এই সব মহা-ভোজের দিন আমার মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইত, আমার উপস্থিতির জন্য নিমন্ত্রণ আসিত।

এই খাওয়াদাওয়া হইতে ব্যারিস্টারীতে কি লাভ হয় তাহা তখনও বুঝি নাই, পরেও বুঝি নাই। এমন একসময় অবশ্য ছিল, যখন এই ধরনের ভোজে ছাত্রসংখ্যা বেশী হইত না—তাহাতে ছাত্র ও বেঞ্চারের মধ্যে কথাবার্তা চলিত, বক্তৃতা হইত এবং তাহা হইতে ছাত্রেরা ব্যবহারিক জ্ঞানও অর্জন করিতে পারিত। মোটের উপর একপ্রকার আদবকায়দা শিক্ষা ও বক্তৃতা দেওয়ার শক্তি বৃদ্ধির একটা সুযোগ তখন তাহাতে ছিল। কিন্তু আমাদের সময়ে এ সমস্ত কিছুই সম্ভব ছিল না। বেঞ্চারেরা একেবারে পৃথক স্থানে হইয়া বসিয়া থাকিতেন। সুতরাং পুরানো রীতির এখন আর কোনই অর্থ নাই। তবুও প্রাচীনতার পূজারী ঢিমেচালের ইংলণ্ড সেই প্রথা এখনো বজায় রাখিয়াছে।

পাঠ্যসূচী খুবই সহজ। তাই ব্যারিস্টারদিগকে পরিহাস করিয়া ডিনার- (খানাপিনা) ব্যারিস্টার বলা হয়। সকলেই জানে এ পরীক্ষার মূল্য না থাকারই মত। আমাদের সময়ে দুটি বিষয়ে পরীক্ষা হইত। রোমান-ল ও ইংলণ্ডের আইন। উভয় পরীক্ষার জন্যই পুস্তক নির্দিষ্ট থাকিত। কিন্তু তাহা কেহ পড়িত না। রোমান-লএর উপর ছোট নোট আছে। উহা পড়িয়া পনের দিনেও পাস করিতে আমি দেখিয়াছি। ইংলণ্ডের আইন সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। আমি জানি নোট হইতে পড়িয়া দুই-তিন মাসেই অনেকে উহাতে পাস হইয়াছেন। পরীক্ষার প্রশ্ন সহজ, পরীক্ষকেরা উদার। রোমান-ল'তে শতকরা ৯৫ হইতে ৯৯ জন পাস হয়। শেষ পরীক্ষায় শতকরা ৭৫ জন পাস হয়। আবার

পরীক্ষা বৎসরে একবার নয়—চারবার হয়। এত সুবিধার পরীক্ষা কাহারও নিকট শক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে না।

কিন্তু আমি উহাকে শক্ত করিয়া তুলিয়াছিলাম। আমার মনে হইল যে, আমার আসল পুস্তকগুলিই পড়িয়া লওয়া দরকার। না পড়া আমার কাছে ফাঁকিবাজি বলিয়া মনে হইল। সেইজন্য মূল বইগুলি কিনিতে আমি অনেক ব্যয় করিলাম। আমি ল্যাটিন ভাষায় রোমান আইন পড়া স্থির করিলাম। বিলাতে ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় যে ল্যাটিন শিখিয়াছিলাম এখন তাহা কাজে লাগিল। এই পাঠ ব্যর্থ হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় রোমান ও ডাচ ল প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য। উহা বুঝিতে জাস্টিনিয়ান পাঠ আমার খুব সহায়ক হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের আইন পড়িতে আমার নয় মাস কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ব্রুমের 'কমন ল' বইটা বড় কিন্তু সুখপাঠ্য। বইটা পড়িতে অনেক সময় গেল। স্নেলের 'ইকুইটি' পড়িতে ভাল লাগিত কিন্তু বুঝিতে দম বাহির হইত। হোয়াইট ও ট্যুডরের 'প্রধান কেসসমূহ হইতে' যাহা পড়িতে হইত তাহাও পড়িতে ভাল লাগিত। উইলিয়ামস্ ও এড্ওয়ার্ডের স্থাবর সম্পত্তির উপর পুস্তক ও গুডিভের অস্থাবর সম্পত্তির উপর পুস্তক, আমি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম। উইলিয়ামসের পুস্তক ত আমার কাছে উপন্যাসের মত লাগিয়াছিল। এই বই পড়িতে ক্লান্তি আসিত না। ভারতবর্ষে আসিয়া ঐ ধরনের আনন্দের সঙ্গে আমি শুধু মেইনের 'হিন্দু ল' পড়িতে পারিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষের আইনের কথা এখানে নয়।

পরীক্ষাগুলিতে পাস করিলাম। ১৮৯১ সালের ১০ই জুন আমাকে ব্যারিস্টার করা হয়। আড়াই শিলিং দিয়া ইংলণ্ডের হাইকোর্টের তালিকায় আমি নাম উঠাইলাম। ১২ই জুন ভারত অভিমুখে ফিরিলাম।

কিন্তু আমার নিরাশা ও ভীতির শেষ ছিল না। আইন পড়িয়াছি সত্য কিন্তু ওকালতী করিতে পারি এমন জ্ঞান অর্জন করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হইল না।

এই ব্যর্থতার বর্ণনার জন্য অন্য আর একটি অধ্যায় আবশ্যক।

২৫
আমার সহায়হীনতা

ব্যারিস্টার হওয়া সহজ, ব্যারিস্টারী করা কঠিন। আইন পড়িয়াছি কিন্তু ওকালতী করিতে শিখি নাই। আইনের ভিতর আমি কতকগুলি আইনের তত্ত্ব পড়িয়াছি ও তাহা ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু ব্যবসার মধ্যে কেমন করিয়া তাহার প্রয়োগ করা যায় ইহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। "তোমার সম্পত্তি এমন ভাবে ব্যবহার কর যেন অন্যের সম্পত্তির লোকসান না হয়"—ইহা ত ধর্ম্ম-বচন। কিন্তু ওকালতী করিতে গিয়া মক্কেলের মোকদ্দমায় কেমন করিয়া উহার ব্যবহার করা যাইবে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। যাহাতে এই সিদ্ধান্ত ব্যবহার করা হইয়াছে এমন মোকদ্দমার উদাহরণ পড়িয়াছি, কিন্তু তাহা হইতে ঐ সিদ্ধান্ত কাজে লাগাইবার যুক্তি খুঁজিয়া পাই নাই।

তারপর ভারতবর্ষের আইনের নাম পর্যন্তও আমাদের পাঠ্যসূচীর ভিতর ছিল না। হিন্দুশাস্ত্র, ইস্‌লামী আইন কেমন জিনিস তাহাও জানি না। একখানা আরজি লিখিতেও শিখি নাই। আমি খুবই অসহায় বোধ করিতে লাগিলাম। ফিরোজশা মেহতার নাম শুনিয়াছিলাম। তিনি আদালতে যেমন করিয়া সিংহের মত গর্জন করেন, তাহা বিলাতে কি করিয়া শিখিয়াছিলেন বুঝি না? তাঁহার মত জ্ঞান জন্মেও পাইব না। কিন্তু উকীল হিসাবে জীবিকা উপার্জনের শক্তি অর্জন সম্বন্ধেও আমার মনে গভীর আশঙ্কা উপস্থিত হইল।

যখন আইন পড়িতেছিলাম তখনই এই ধরনের চিন্তা মনের ভিতর চলিতে-ছিল। আমার এই অসুবিধার কথা দুই-একজন বন্ধুর কাছে জানাইলাম। তাঁহারা দাদাভাইয়ের পরামর্শ লইতে বলিলেন। দাদাভাইয়ের নামে আমার নিকট চিঠি ছিল তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। বহুদিন পরে আমি এই চিঠির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। এইরূপ একজন বিরাট পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার কি অধিকার আছে? তাঁহার যখন কোনও বক্তৃতা থাকে তখন শুনিতে যাই। এক কোণে বসিয়া কান তৃপ্ত করিয়া উঠিয়া আসি। তিনি বিদ্যার্থীদের সহিত মেলামেশার জন্য একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে আমি উপস্থিত থাকিতাম। বিদ্যার্থীদিগের জন্য দাদাভাইয়ের হৃদয়ে যেমন স্নেহ ছিল, তেমনি বিদ্যার্থীদিগেরও দাদাভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। এসব দেখিয়া আমি আনন্দ পাইতাম। অবশেষে একদিন তাঁহাকে সেই পরিচয়-পত্র দেওয়ার

সাহস সঞ্চয় করিলাম। তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন—তোমার দেখা করিবার যদি প্রয়োজন হয়, অথবা কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক হয় তবে অবশ্য আসিও। কিন্তু আমি তাঁহাকে কখনো কষ্ট দিই নাই। বিশেষ দরকার না হইলে তাঁহার সময় লওয়া আমার অন্যায় বলিয়া মনে হইত। সেজন্য বন্ধুটির পরামর্শ সত্ত্বেও দাদাভাইয়ের কাছে অসুবিধার কথা বলার জন্য যাওয়ার সাহস আমার হয় নাই।

এখন মনে নাই—এই বন্ধুটিই বা অন্য কেউ মিঃ ফ্রেডরিক পিঙ্কাট-এর সঙ্গেও আমাকে দেখা করিতে বলেন। মিঃ পিঙ্কাট কন্‌জারভেটিভ (রক্ষণশীল) দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি তাঁহার ভালবাসা নির্মল ও নিঃস্বার্থ ছিল। অনেক বিদ্যার্থী তাঁহার পরামর্শ লইত। সেই জন্য চিঠি লিখিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার সময় চাহিলাম। তিনি সময় দিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। এই সাক্ষাৎকার আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। যেন বন্ধু বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন—এমনি ভাবেই তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। আমার নিরাশা তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন—"তুমি কি মনে কর সকলেরই ফিরোজশা মেহতা হওয়ার দরকার আছে? ফিরোজশা কি বদরুদ্দীন একজন কি দুইজন হয়। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, সাধারণ উকীল হইতে বিশেষ বুদ্ধির দরকার নাই। সাধারণ সততা ও পরিশ্রম দ্বারাই লোক ওকালতী ব্যবসা সুখে চালাইতে পারে। সকল মোকদ্দমাই কিছু গোলমালের নহে। আচ্ছা, তোমার সাধারণ জ্ঞান কেমন?

যা পড়িয়াছি তা যখন তাঁহাকে জানাইলাম—মনে হইল তিনি যেন কিছুটা নিরাশ হইলেন। কিন্তু সে নিরাশা ক্ষণিকের, আবার তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন: "তোমার ব্যাধি আমি বুঝিয়াছি। তোমার সাধারণ পড়া খুব কম। তোমার সাংসারিক জ্ঞান নাই। আর উকীলের এই সাংসারিক জ্ঞান না হইলে চলে না। তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাসও পড়.নাই। উকীলকে মানুষের স্বভাবের খবর লইতে হয়। চেহারা দেখিয়াই মানুষের চরিত্র তাহার বুঝিতে পারা চাই। তাছাড়া প্রত্যেক ভারতবাসীরই ভারতবর্ষের ইতিহাস জানা আবশ্যক। ইহার সহিত ওকালতীর সম্বন্ধ নাই, তবুও তোমার ঐ জ্ঞান থাকা দরকার। আমি দেখিতেছি যে তুমি কে ও ম্যালেসনের ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইতিহাসও পড় নাই। বইটি শীঘ্রই পড়িয়া ফেলিও। আরও দুইখানা বইর নাম দিতেছি—তুমি মানুষের স্বভাবের পরিচয় পাওয়ার জন্য এগুলি পড়িও।"

এই বলিয়া লভেটর ও শেমেলপেনিকের শারীরিক গঠন দেখিয়া মানসিক গঠন নির্ণয় সম্পর্কীয় দুখানা বইর নাম লিখিয়া দিলেন।

এই শ্রদ্ধেয় বন্ধুর কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাঁহার সামনে আমার ভয় ক্ষণমাত্রেই দূর হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে আসার পরেই আবার আমার ভয় ফিরিয়া আসিল। "মুখ দেখিয়াই লোক চিনিয়া ফেলিব"—এই কথা এবং ঐ বই দুখানার কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলাম। পরদিন লভেটরের পুস্তক খরিদ করিলাম। শেমেলপেনিকের পুস্তক দোকানে পাওয়া গেল না। লভেটরের পুস্তক পড়িলাম, উহা স্নেল হইতেও কঠিন বোধ হইল। সেক্‌সপীয়রের চেহারা-সম্পর্কীয় পুস্তকও পড়িলাম। কিন্তু লণ্ডনের রাস্তায় চলিতে চলিতে সেক্‌সপীয়রের লোক-পরিচয়-শক্তি অর্জন করিতে পারি নাই।

লভেটর হইতেও আমি কোনো জ্ঞান পাইলাম না। মিঃ পিঙ্কাটের উপদেশ সোজাসুজি কোনও কাজে লাগিল না বটে—কিন্তু তাঁহার স্নেহের ব্যবহারের ফল খুব ভালই হইয়াছিল। তাঁহার হাসিমুখ, উদার চেহারা স্মরণে রহিয়া গেল। তাঁহার কথার উপর শ্রদ্ধা রাখিলাম যে, ওকালতী করিতে ফিরোজশা মেহতার বুদ্ধি, স্মরণশক্তি ইত্যাদির কোন দরকার নাই—সততা ও পরিশ্রম দ্বারাই কাজ চালানো যায়। এই দুটি জিনিস আমার ভাণ্ডারে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সুতরাং কিছু আশাও আসিল।

কে ও ম্যালেসনের ইতিহাস আমি বিলাতে পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু প্রথম সুযোগেই পড়িয়া লওয়া স্থির করিয়াছিলাম। সেই অবকাশ দক্ষিণ আফ্রিকাতে পাইয়াছিলাম।

এই নিরাশার মধ্যে সামান্য মাত্র আশা সম্বল করিয়া আমি কম্পিতপদে বোম্বাই বন্দরে 'আসাম' স্টীমার হইতে নামিলাম। বন্দরে সমুদ্র উত্তাল ছিল। লঞ্চে করিয়া নামিতে হইল।

——::*::——

দ্বিতীয় ভাগ

১

রায়চন্দ্‌ ভাই

শেষ অধ্যায়ে আমি লিখিয়াছি যে, বোম্বাই বন্দরে সমুদ্র অশান্ত ছিল। জুন-জুলাই মাসে ভারত মহাসাগরে ইহা কিছু নূতন নয়। সমুদ্র এডেন হইতেই ঐ রকম ছিল। সকলেই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, একলা আমিই সুস্থ ছিলাম। তুফান দেখার জন্য ডেকের উপর থাকিতাম—আর শিকরকণায় খুব ভিজিয়া যাইতাম। আমি ছাড়া সকালবেলায় প্রাতরাশের সময় আর দুই-একজন মাত্র উপস্থিত থাকিতেন। কোলে ডিস্‌ রাখিয়া খাইতে হইত, নতুবা ডিস্‌ সমেত জাউ কোলেই পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা—ঝড়ের অবস্থা এমনি ছিল।

বাহিরের এই তুফান যেন আমার অন্তরের তুফানেরই প্রতিধ্বনি। বাহিরের তুফান সত্ত্বেও আমি যেমন শান্ত ছিলাম, অন্তরের তুফান সত্ত্বেও তেমনি শান্ত রহিলাম, একথা বলা বলা যায়। জাতি হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার প্রশ্ন মনে আসিত। ব্যবসার চিন্তার কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। তারপর আমি সংস্কারক হইয়াছি, মনে অনেক সংস্কারের কল্পনা করিয়া রাখিয়াছি—সেজন্যও চিন্তা আসিত। কিন্তু ইহা হইতেও গুরুতর দুঃখ আমার জন্য সঞ্চিত ছিল।

বন্দরে পৌঁছিয়া দেখিলাম দাদা আসিয়াছেন। তিনি ডাক্তার মেহতা ও তাঁহার বড় ভাইয়ের সহিত পরিচয় করিয়া লইয়াছিলেন। ডাক্তার মেহতার আগ্রহে আমাকে তাঁহার ওখানেই উঠিতে হইল। যে সম্বন্ধ বিলাতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা দেশেও এইভাবে স্থায়ী রহিয়া গেল এবং আরও দৃঢ় হইয়া দুই পরিবারে বিস্তৃত হইল।

মাকে দেখার জন্য আমি অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। মা যে আর রক্ত-মাংসের শরীরে আমাকে স্বাগত জানাইবার জন্য ইহলোকে নাই—সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানিতাম না। বাড়ী পৌঁছিলে আমাকে সেই সংবাদ দিয়া স্নান করাইলেন। আমি এ সংবাদ বিলাতেই পাইতে পারিতাম। কিন্তু আঘাত যাহাতে কম পাই সেজন্য যতদিন না বোম্বাই পৌঁছিতেছি ততদিন খবর না দেওয়ার কথাই দাদা ভাল মনে করিয়াছিলেন। আমার দুঃখ লইয়া আমি বেশী আলোচনা করিতে চাই না। কেবল এইমাত্র বলিতে চাই যে, পিতার মৃত্যুতে

যত আঘাত পাইয়াছিলাম এই মৃত্যুতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আঘাত পাইলাম। আমার সকল আশা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কিন্তু আমার স্মরণ আছে যে, আমি মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া সোরগোল করিয়া কান্নাকাটি করি নাই। চোখের জলও অনেকটা আটকাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলাম।

ডাক্তার মেহতা তাঁহার বাড়ীতে যাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু না লিখিলে চলে না। তাঁহার বড় ভাই রেবাশঙ্কর জগজীবনের সঙ্গে জন্মের মত সৌহার্দ্যের গাঁটছড়া বাঁধা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহার কথা বলিতে চাহিতেছি, তিনি হইতেছেন কবি রায়চাঁদ বা রাজচন্দ্র। ডাক্তারের বড় ভাইয়ের ইনি জামাতা ছিলেন ও রেবাশঙ্কর জগজীবনের কারবারের অংশীদার ও হর্তাকর্তা ছিলেন। সে-সময় তাঁহার বয়স পঁচিশ বছরের বেশী নয়। তাহা হইলেও তিনি যে চরিত্রবান ও জ্ঞানী ছিলেন তাহা প্রথম সাক্ষাতেই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহাকে শতাবধানী বলা হইত। অর্থাৎ যিনি একই সঙ্গে একশত প্রসঙ্গ মনে রাখিতে বা কাজ করিতে পারেন। সে শতাবধান শক্তি ডাঃ মেহতা আমাকে যাচাই করিয়া দেখিতে' বলিলেন। আমি আমার বিদেশী ভাষাজ্ঞানের ভাণ্ডার খালি করিয়া নানা শব্দ বলিয়া গেলাম। প্রথম হইতে শব্দগুলি যে অনুক্রমে আমি বলিয়া গিয়াছি ঠিক সেই অনুক্রমেই তিনি তাহাদের পুনরাবৃত্তি করিলেন। এই শক্তি দেখিয়া আমার হিংসা হইয়াছিল, কিন্তু মুগ্ধ হই নাই। তাঁহার যে গুণ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহার পরিচয় পরে পাইয়াছিলাম। তাহা হইতেছে তাঁহার বহুবিস্তৃত শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার শুদ্ধ চরিত্র ও তাঁহার আত্মদর্শন করার তীব্র ইচ্ছা। আমি পরে দেখিয়াছিলাম যে, তিনি আত্মদর্শনের জন্যই জীবনধারণ করিতেছেন :—

"হাসিতে খেলিতে প্রকট করি দেখি রে
আমার জীবন সফল তবে লেখি রে ;
মুক্তানন্দ নাথ বিহারী রে—
রাখে জীবন ভোর আমারি রে।"

মুক্তানন্দের এই বচন তাঁহার মুখে ত ছিলই, তাঁহার হৃদয়-মধ্যেও আঁকা ছিল।

নিজে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করিতেন, হীরা-মোতির তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া গণ্য ছিলেন। ব্যবসায়ের বহু জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতেন! কিন্তু ইহা তাঁহার নিজস্ব বিষয় ছিল না। তাঁহার নিজের বিষয় ছিল তাঁহার

পুরুষার্থ, তাঁহার আত্মদর্শন বা হরিদর্শন। তাঁহার টেবিলের উপর আর কোনও দ্রব্য থাকুক আর নাই থাকুক, কোন না কোন ধর্মপুস্তক অথবা তাঁহার ডায়েরী থাকিবেই। যখন ব্যবসার কথা শেষ হয় তখনই ধর্মপুস্তক খোলেন, অথবা সেই লেখার খাতা খোলেন। তাঁহার লেখার যে সংগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে তাহার অধিকাংশই এই নোটবই হইতে লওয়া। যে ব্যক্তি লক্ষ টাকার কেনা-বেচার কথা বলিয়া তখনই আত্মজ্ঞানের গূঢ় বাক্য লিখিতে বসিয়া যায়, সে ব্যক্তি ব্যবসাদারের জাতের নহে, সে ব্যক্তি শুদ্ধ-জ্ঞানীর জাতের। তিনি যে এই জাতের মানুষ সে অনুভব আমার একবার নহে, অনেকবার হইয়াছে। আমি কখনও তাঁহাকে সমাহিত হইতে বিচ্যুত অবস্থায় দেখি নাই। আমার সহিত তাঁহার কোনও স্বার্থের সম্বন্ধ ছিল না। তবুও আমি তাঁহার সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলাম। তখন আমি ভিখারী ব্যারিস্টার। কিন্তু যখনই আমি তাঁহার দোকানে গিয়াছি, তখনই আমার সহিত ধর্ম-কথা আলোচনা করিয়াছেন। তখনও আমার চোখ খোলে নাই, এবং সাধারণতঃ ধর্ম-কথায় যে আনন্দ হইত এমনও বলা যায় না। তথাপি রায়চন্দ্ ভাইয়ের ধর্ম-কথায় আনন্দ পাইতাম। অনেক ধর্মাচার্যের সংস্পর্শে আমি তাহার পর আসিয়াছি। প্রত্যেক ধর্মের আচার্যদিগের সহিত মিশিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু রায়চন্দ্ ভাই আমার উপর যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন, আর কেউ সে ছাপ রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার কথা আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিত। তাঁহার বুদ্ধিকে আমি যেমন সম্মান করিতাম, তাঁহার নৈতিক চরিত্রের উপরেও আমার তেমনি বিশ্বাস ছিল। আমি জানিতাম যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া-শুনিয়া আমাকে কখনো বিপথে চলিতে দিবেন না। নিজের মনের গোপন কথাও তিনি আমার কাছে ব্যক্ত করিতেন। এইজন্য আমার আধ্যাত্মিক অশান্তি উপস্থিত হইলেই আমি তাঁহার আশ্রয় লইতাম।

রায়চন্দ্ ভাই সম্বন্ধে আমার এত গভীর শ্রদ্ধা থাকিলেও তাঁহাকে আমি আমার ধর্মগুরু বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিতে পারি নাই। আমার সেই স্থান পূরণের সন্ধান আজও চলিতেছে।

হিন্দুধর্মে 'গুরু'র স্থান মহৎ। এই মহত্ত্বের প্রতি আমার আস্থা আছে। গুরুর সাহায্য ছাড়া জ্ঞান হয় না—একথা আমি বহুলাংশে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। অপূর্ণ শিক্ষককে দিয়া পুঁথিগত জ্ঞান পাওয়ার কাজ চালাইয়া লওয়া যায়। কিন্তু যে আত্মদর্শন করিতে চায়, তাহার সে কাজ অপূর্ণ শিক্ষকের দ্বারা

পোরবন্দরের যে বাড়ীতে গান্ধীজী জন্মগ্রহণ করেন

গান্ধীজী—বাল্যকালে

হয় না। গুরুর পদ কেবল পূর্ণ জ্ঞানীকেই দেওয়া যায়। সুতরাং পূর্ণতার জন্য অবিরাম সাধনা প্রয়োজন। কেন না শিষ্যের যোগ্যতা অনুযায়ীই গুরু মিলে। প্রত্যেক সাধকেরই পরিপূর্ণ হওয়ার সাধনায় অধিকার আছে। উহার মধ্যেই তাহার পুরস্কার। বাকীটা ঈশ্বরের হাতে।

যদিও আমি রায়চন্দ্ ভাইকে হৃদয়ের সিংহাসনে গুরুর পদে অভিষিক্ত করিতে পারি নাই, তবুও তাঁহার সাহায্য বহু ক্ষেত্রে আমি গ্রহণ করিয়াছি। এই সব উপকারের পরিচয় পরে দিব। এখানে এই পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, আধুনিক জগতের তিনজন লোক আমার জীবনের উপর গভীর ছাপ অঙ্কিত করিয়াছেন। রায়চন্দ্ ভাই তাঁহার জীবন্ত সংসর্গ দ্বারা, টলষ্টয় তাঁহার "বৈকুণ্ঠ তোমার হৃদয়" (Kingdom of God is within you) নামক পুস্তকের দ্বারা এবং রাস্কিন "আনটু দিস্ লাস্ট" নামে পুস্তক দ্বারা আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছেন। এই সব প্রসঙ্গ উপযুক্ত স্থানে আলোচিত হইবে।

২

সংসার-প্রবেশ

বড় ভাই আমার উপর অনেক আশা পোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধন, মান ও পদের প্রতি খুব লোভ ছিল। তাঁহার উদারতাও এত বেশী ছিল যে, তাহা যেন তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া যাইত। এইজন্য এবং তাঁহার সরল মনের জন্য কাহারও সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব করিতে বাধিত না। তিনি মনে করিতেন—এই বন্ধুবর্গের সাহায্যেই তিনি আমার জন্য মোকদ্দমা যোগাড় করিয়া দিবেন। আমি যে খুব রোজগার করিব তাহা তিনি পূর্বেই ধরিয়া লইয়াছিলেন এবং সেইজন্য বাড়ীর খরচও খুব বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আমার জন্য ওকালতীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে তিনি আর কিছু বাকী রাখেন নাই।

জাতিচ্যুত করার ব্যাপারে জ্ঞাতিদিগের ঝগড়া উদ্যত হইয়াই ছিল। তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। এক পক্ষ আমাকে তৎক্ষণাৎ সমাজে গ্রহণ করিলেন; অপর পক্ষ না লওয়ার দিকে দৃঢ় রহিলেন। যাঁহারা জাতিতে লওয়ার পক্ষে ছিলেন তাঁহাদের সন্তোষের জন্য দাদা আমাকে প্রথমেই নাসিকে লইয়া

যান। সেইখানে আমি তীর্থ-স্নান করি। তাহার পর রাজকোটে পঁহুছিয়া তাঁহাদিগকে এক স্বজাতিভোজে নিমন্ত্রণ করা হয়।

এই কাজে আমি আনন্দ পাই নাই। আমার প্রতি দাদার অগাধ স্নেহ ছিল। দাদার প্রতি আমার ভক্তিও তদনুরূপ ছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছাই আমার কাছে তাঁহার হুকুম ছিল। সেই হুকুম মানিয়া আমি যন্ত্রের মত, বিচার বিবেচনা না করিয়াই, তাঁহার ইচ্ছার অনুকূলে কাজ করিয়াছিলাম। জাতের ব্যাপার ইহাতে মিটিল। যে তরফ হইতে আমি জাতিচ্যুত ছিলাম তাহাতে প্রবেশ করিতেও আমি কখনো চেষ্টা করি নাই, বা সেই দলের কোনও প্রধান ব্যক্তির প্রতি মনে মনে ক্রোধ পোষণ করি নাই। যাঁহাবা আমাকে দেখিতে পারিতেন না, তাঁহাদের সহিতও আমি নম্র ব্যবহার করিতাম। জাতি হইতে বহিষ্কার করার নিয়মকে আমি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর বাড়ীতে, কি আমার ভগ্নীর ওখানে, জল পর্যন্তও গ্রহণ করিতাম না। তাঁহারা লুকাইয়া আমার সহিত খাইতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু যে কাজ প্রকাশ্যভাবে করা যায় না তাহা লুকাইয়া করিতে আমার মন স্বীকার করিত না।

আমার এই প্রকার আচরণের পরিণাম হইয়াছিল এই যে, আমাকে জাতির দিক হইতে কোনও উপদ্রব কখনো সহ্য করিতে হয় নাই। কেবল তাহাই নয়, যদিচ আজও জাতির এক অংশ আমাকে জাতিচ্যুত বলিয়াই মনে করেন, তবুও তাঁহাদের দিক হইতে স্নেহ ও দাক্ষিণ্য ছাড়া কিছু পাই নাই। জাতির জন্য আমি কিছু করিব, আমার নিকট এরূপ কিছুই প্রত্যাশা না করিয়াও তাঁহারা আমার কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাকে আমার অবিরোধ (Non-resistance) নীতির শুভফল বলিয়াই আমি মনে করি। যদি আমি জাতিতে প্রবেশ করার জন্য হাঙ্গামা করিতাম, যদি আরও দলাদলি বাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম, যদি আমি তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিতাম, তাহা হইলে তাঁহারাও নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধতা করিতেন এবং আমি বিলাত হইতে আসার পর উদাসীন ও নির্লিপ্ত থাকার পরিবর্তে জাতির গোলমালের মধ্যে পড়িয়া কেবল মিথ্যাচারের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতাম।

স্ত্রীর সঙ্গে আমার আশানুরূপ সম্পর্ক তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিলাত যাওয়াতেও তাঁহার প্রতি আমার সন্দেহের ভাব দূর হইল না। সকল কাজেই খুঁতখুঁতে ভাব ও সংশয়ের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলাম। সুতরাং আমার

মনের ইচ্ছাও পূরণ করিতে পারিলাম না। পত্নীর লেখাপড়া জানা চাই এবং তাহা নিজে শিখাইব বলিয়া স্থির করিলাম। কিন্তু আমার ভোগ-লিপ্সা আমাকে সেকাজে বাধা দিল। পড়াইতে না পারার জন্য যে দোষ তাহা আমার—অথচ সে দোষের দায়িত্ব চাপাইলাম আমি স্ত্রীর উপরেই। এক সময় এমনও হইয়াছিল—আমি তাঁহাকে তাঁহার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলাম এবং দুঃখ একেবারে চরমে না পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দিই নাই। এই সকলই যে আমার দোষ, পরে তাহা আমার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যবস্থারও সংস্কার করিতে মনস্থ করি। বড় দাদার এক ছেলে ছিল। আমার যে ছেলেটিকে রাখিয়া আমি বিলাতে গিয়াছিলাম সে এখন প্রায় চার বছরের হইয়াছে। স্থির করিলাম—এই ছেলেদিগকে দিয়া ব্যায়াম করাইব, তাহাদের শরীর শক্ত করিব ও তাহাদিগকে আমার সঙ্গ দান করিব। ইহাতে আমার ভাইএর সমর্থন ছিল। আমার আশা অল্প-বিস্তর সফলও করিতে পারিয়াছিলাম। ছেলেদের সঙ্গ আমার কাছে ভারি ভাল লাগিত এবং তাহাদের সহিত খেলা করার অভ্যাস আজও রহিয়া গিয়াছে। তখন হইতেই আমি জানিয়াছি যে, ছেলেদের শিক্ষকের কাজ আমি ভালই করিতে পারি।

খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে পরিবর্তন আনাও একান্ত দরকার। কিন্তু ইহাতে সংকট ছিল। বাড়ীতে চা, কফি ঢুকিয়াছিল। বিলাত-ফেরত হইয়া আসার পূর্বেই বাড়ীতে কতকটা বিলাতী হাওয়া প্রবেশ করানো দরকার বলিয়া দাদা স্থির করিয়াছিলেন। সেইজন্য চীনামাটির বাসন, চা ইত্যাদি যা কেবল ঔষধাদির প্রয়োজনে অথবা কেতাদুরস্ত অতিথির জন্য রাখা হইত, তাহা সকলের জন্য ব্যবহার হইতেছিল। এই আবেষ্টনের মধ্যে আমি আমার 'সংস্কার' লইয়া আসিলাম। খাদ্যতালিকায় ওট্-মিল পরিজ (জাউ) প্রবেশ করানো হইল, চা কফির সহিত কোকো যোগ দিল। জুতা মোজা ত ঘরে ছিলই, আমি তাহার উপর কোট পাত্‌লুন চালু করিলাম। বাড়ীর পরিবেশ পরিবর্তিত হইল।

ইহাতে খরচ বাড়িল। নিত্য নূতন অভ্যাস যোগ হইতে লাগিল। ঘরে শ্বেত হস্তী বাঁধা হইল। কিন্তু খরচ আসে কোথা হইতে? রাজকোটে ব্যবসা (প্র্যাক্‌টিস) আরম্ভ করার কথায় ত হাসি পায়। রাজকোটের পাস করা উকীলের সমান জ্ঞান ছিল না, কিন্তু ফী তাহার দশগুণ চাই! কোন্ মূর্খ মক্কেল

আমাকে নিযুক্ত করিবে? আর যদিবা এই প্রকারের মূর্খও জোটে, তবে আমিই কি আমার অজ্ঞতার সহিত ঔদ্ধত্য ও প্রতারণা যোগ করিয়া, জগতের নিকট আমার ঋণ আরও বাড়াইব?

বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, আমার কিছুদিন বোম্বাই গিয়া হাইকোর্টের অভিজ্ঞতা অর্জন করা দরকার। সেখানে গেলে ভারতবর্ষের আইনের জ্ঞানও পাওয়া যাইবে, আর মোকদ্দমা পাওয়ার চেষ্টাও করা চলিবে। সেই পরামর্শ-মত আমি বোম্বাই রওনা হইলাম।

ঘর বাঁধিলাম। রাঁধুনি রাখিলাম—সেও আমারই মত পারদর্শী। জাতিতে সে ব্রাহ্মণ ছিল। আমি তাহাকে চাকরের মত না রাখিয়া বাড়ীর পরিজনের মতই রাখিয়াছিলাম। এই বামুন স্নান করিতে জল ঢালিত কিন্তু শরীর পরিষ্কার করিত না—ধুতিগুলি ময়লা, পৈতা ময়লা, শাস্ত্রের জ্ঞান ছিল না। আর ইহা অপেক্ষা ভাল পাচকই বা পাইব কোথায়?

"আচ্ছা, রবিশঙ্কর (নাম ছিল রবিশঙ্কর), রাঁধতে না হয় নাই জানিলে কিন্তু সন্ধ্যা-আহ্নিক জানো তো?"

"সন্ধ্যা? ভাই সাহেব! আমার সন্ধ্যা তর্পণ হইল ক্ষেতী চাষ, কোদাল আমার নিত্যকর্ম।—আমি এই রকম বামুন। আপনাদের কৃপায় বাঁচিয়া আছি। আর তা না হয়ত চাষ ত আছেই।"

আমি বুঝিলাম, আমাকে রবিশঙ্করের শিক্ষক হইতে হইবে। অর্ধেক রবিশঙ্কর রাঁধে অর্ধেক আমি। বিলাতের নিরামিষ আহারের পরীক্ষা এইখানে চালাইতে লাগিলাম। একটা স্টোভ খরিদ করিলাম। আমি নিজে পংক্তি-ভেদ মানিতাম না, রবিশঙ্করেরও সেদিন আগ্রহ ছিল না। এই জন্য আমাদের বনিবনা বেশ হইল। কেবল একটা মুশকিল ছিল, রবিশঙ্কর নিজে ময়লা থাকিত এবং খাদ্যদ্রব্যও ময়লা রাখিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল!

আমার চার পাঁচ মাসের বেশী বোম্বাই থাকা হয় নাই, কেন না খরচা বাড়িতেছিল কিন্তু আয় ছিল না।

এইরূপে আমার সংসার-প্রবেশ শুরু হইল। ব্যারিস্টারী আমার কাছে খারাপ লাগিল—বহু আড়ম্বর, অল্প জ্ঞান। দায়িত্বজ্ঞান আমাকে পীড়া দিতে লাগিল।

৩

প্রথম মোকদ্দমা

বোম্বাইয়ে এক দিক দিয়া যেমন আইন অভ্যাস করিতে লাগিলাম, অন্য দিক দিয়া তেমনি আহারের উপর পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। একাজে আমার সঙ্গে বীরচন্দ গান্ধী যোগ দিলেন। অপর দিকে, আমার জন্য দাদা মামলা যোগাড় করিয়া দেওয়ার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

আইন পড়ার কাজ শ্লথগতিতে চলিতেছিল। "সিভিল প্রসিডিওর কোড" আমার ভাল লাগিত না। এভিডেন্স অ্যাক্ট্ আমার কাছে ভাল লাগিত। বীরচন্দ গান্ধী সলিসিটর হওয়ার জন্য তৈরী হইতেছিল। সে উকীলদের অনেক গল্প করিত। স্যার ফিরোজশার শক্তির মূলে ছিল তাঁহার আইন সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান। তাঁহার 'এভিডেন্স অ্যাক্ট্' ত মুখস্থ। বত্রিশ-ধারার সমস্ত কেস্ তাঁহার জানা আছে। বদরুদ্দীনের সওয়াল এমন যে, জজও ভয় পান। যতই এই মহারথীদের কথা শুনিতাম ততই আমার ভয় হইত।

তিনি বলিতেন,—"পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া হাইকোর্টে ভেরেণ্ডা ভাজা নূতন কিছু নয়। সেইজন্যই ত আমি সলিসিটর হওয়া ঠিক করিয়াছি। বৎসর তিনেক পরেও যদি আপনি খরচ চালাইবার মত উপার্জন করিতে পারেন তবেই ঢের বলা যায়।"

প্রতি মাসেই খরচ বাড়িতে লাগিল। বাড়ীর বাহিরে ব্যারিস্টারের নামের বিজ্ঞাপন প্লেট আঁটিয়া রাখা, আর ভিতরে ব্যারিস্টারীর জন্য তৈরী হওয়া—এ আমি বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলাম না। সেইজন্য আমার পড়াশুনাও অশান্ত চিত্তে চলিতেছিল। 'সাক্ষ্য-আইন'এ আমি কিছু রসবোধ করিতেছিলাম বলিয়াছি। মেইনের 'হিন্দু ল' খুব আগ্রহের সহিত পড়িলাম। কিন্তু কেস্ চালাইবার সাহস আসিল না। আমার দুঃখের কথা কাহাকে বলিব? শ্বশুর-বাড়ীর নূতন বধূর মত আমার অবস্থা হইয়াছিল।

এই সময় এক মমীবাঈ-এর মামলা আমার হাতে আসিল। স্মলকজ কোর্টের মামলা, আমাকে বলা হইল—"দালালকে কমিশন দিতে হইবে।" আমি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিলাম।

"কিন্তু ফৌজদারী কোর্টের পুরোনো উকীল······মাসে তিন চার হাজার টাকা রোজগার করেন, তিনিও কমিশন দেন।"

"আমার তাঁহাকে অনুসরণ করার দরকার নাই। আমার মাসে ৩০০ টাকা পাইলেই যথেষ্ট। বাবা কি আর বেশী রোজগার করিতেন?"

"সে দিন আর নাই। বোম্বাইয়ের খরচ অনেক, সে কথা বুঝিয়া চলা চাই।"

আমি টলিলাম না। কমিশন দিলাম না। তবু মমীবাঈ-এর কেস্ পাওয়া গেল। কেস্ সোজা ছিল। আমি ৩০'০০ ব্রীফ্ পাইলাম। এক দিনের বেশী কেস্ চলার কথা নয়।

'স্মলকজ কোর্টে' সেই আমার প্রথম প্রবেশ। আমি প্রতিবাদীর তরফ হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। সেইজন্য আমাকে জেরা করিতে হইল। আমি ত উঠিলাম, কিন্তু গা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল যেন কোর্ট ঘুরিতেছে! প্রশ্ন করার মত বোধ-শক্তি রহিল না। জজ হাসিয়া থাকিবেন, উকীলেরা অবশ্যই হাসিয়া লুটাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি কি কিছু চোখে দেখিতেছিলাম?

আমি বসিয়া পড়িলাম, দালালকে বলিলাম যে, "আমি এ মামলা চালাইতে পারিব না, পাটেলকে নিযুক্ত কর—আমাকে যে ফী দিয়াছ তাহা ফেরত লও।" পাটেলকে সে দিনের জন্য একান্ন টাকায় নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার কাছে এ মামলা খেলার সামিল।

আমি ফিরিলাম। মক্কেল জিতিল কি হারিল তাহা জানি নাই। আমার লজ্জা হইল। পুরা সাহস না আসা পর্যন্ত কেস্ না লওয়া স্থির করিলাম এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় না যাওয়া পর্যন্ত আর কেস্ লই নাই। ইহা স্থির করায় আমার কোন বাহাদুরি ছিল না। পরাজিত হইবার জন্য কে আমাকে কেস্ দেওয়ার মত বোকামি করিবে? আমি স্থির না করিলেও, কোর্টে যাওয়ার কষ্ট কেহ আমাকে দিত না।

তবে আর একটা কেস্ বোম্বাইতে পাইয়াছিলাম বটে। এই কেস্ ছিল দরখাস্ত করার। এক গরীব মুসলমানের জমি পোরবন্দরে সরকার খাস করিয়া লইয়াছিল। আমার বাবার নাম শুনিয়া এই দরিদ্র লোকটি তাঁহার ব্যারিস্টার ছেলের কাছে আসিয়াছে। তাহার কেস্ আমার নিকট কম-জোরী বলিয়া মনে হইল। কিন্তু আরজী লিখিয়া দিতে স্বীকার করিলাম। বন্ধুদের শুনাইলাম। সে আরজী তাঁহারা পছন্দ করিলেন। আমার মনে বিশ্বাস হইল যে, আরজী লেখার মত যোগ্যতা আমার আছে,—আর সত্যই তাহা আছেও!

বিনা পয়সায় আরজী লেখার ব্যবসা করিলে সেদিন অনেক কাজ পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহাতে ত দিন চলে না।

আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমি শিক্ষকের কাজ করিতে পারি। ইংরাজী ভালই জানা আছে। যদি কোনও স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে ইংরাজী পড়াইতে হয় তবে তাহা করিব। কিছু খরচ ত উঠিবে।

আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পড়িলাম, "ইংরাজী শিক্ষক চাই। প্রতিদিন এক ঘণ্টা, বেতন ৭৫'০০ টাকা।" বিজ্ঞাপনটি একটি খ্যাতনামা হাইস্কুলের দেওয়া। আমি আবেদন করিলাম। দেখা করিতে আহ্বান আসিল। আমি অনেক আশা লইয়াই দেখা করিতে গেলাম। কিন্তু যখন অধ্যক্ষ জানিলেন যে, আমি গ্র্যাজুয়েট নই, তখন দুঃখিত হইয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

"কিন্তু আমি লণ্ডনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছি। আমার দ্বিতীয় ভাষা ল্যাটিন।"

"তাহা সত্য, কিন্তু আমাদের যে গ্রাজুয়েটই চাই।"

আমি নিরুপায়। নিরাশায় হাত কচলাইতে লাগিলাম। দাদাও চিন্তায় পড়িলেন। আমরা দুইজনেই ঠিক করিলাম যে, বোম্বাইতে আর কালযাপন করা নিরর্থক। আমার রাজকোট যাওয়াই স্থির হইল। তিনি নিজে ছোট উকীল ছিলেন। আমাকে কিছু কিছু ছোট আরজী তৈরী করার কাজ ত দিতে পারিবেন। রাজকোটের বাড়ীর খরচা ছিলই। সুতরাং বোম্বাইয়ের খরচ বন্ধ হইলে ভারও অনেকটা লাঘব হইবে। এ প্রস্তাব আমার ভাল লাগিল। মাস ছয় বাস করার পর বোম্বাইয়ের বাসা উঠাইয়া দিলাম।

বোম্বাই থাকা কালে রোজ হাইকোর্টে যাইতাম। সেখানে কিছু শিখিয়াছিলাম এ কথা বলিতে পারি না। শিখিবার জন্য যেটুকু জ্ঞান আবশ্যক তাহাও আমার ছিল না। কত সময় ত কেস্ না পারিতাম বুঝিতে—না ইচ্ছা হইত শুনিতে। সেখানে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতাম। আমার মত অপরকেও ঝিমাইতে দেখিয়া আমার লজ্জার বোঝা কমিত। অবশেষে এরূপও মনে হইত যে, হাইকোর্টে বসিয়া বসিয়া ঝিমানোও একটা ফ্যাশন। উহাতে যে লজ্জা আছে সে বোধও চলিয়া গিয়াছিল।

আজও যদি আমার মত বেকার ব্যারিস্টার বোম্বাই কোর্টে কেহ থাকেন তবে তাঁহাদের উপকারের জন্য ছোটখাটো একটা অভিজ্ঞতার কথা এখানে লিখিব।

বাসা ছিল গীরগামে। তবুও আমি কখনো গাড়ীভাড়া খরচ করি নাই।

ট্রামেও কদাচিৎ উঠিয়াছি। গীরগাম হইতে অধিকাংশ সময়েই নিয়মমত হাঁটিয়া যাইতাম। তাহাতে পুরা ৪৫ মিনিট লাগিত। হাঁটিয়াই বাসায় ফিরিতাম। রোদের তাপ সহ্য করার শক্তি লাভ করিয়াছিলাম। ইহাতে অনেক পয়সা বাঁচাইয়াছি। বোম্বাইতে আমাদের সঙ্গীদের অসুখ হইলেও আমি কখনো অসুস্থ হইয়াছি বলিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পরে যখন রোজগার করিতে-ছিলাম তখনও এই অফিসে হাঁটিয়া যাওয়ার অভ্যাস শেষ পর্যন্ত ঠিক রাখিয়া-ছিলাম। তাহার সুফল আজও ভোগ করিতেছি।

৪
প্রথম আঘাত

বোম্বাই-এ নিরাশ হইয়া রাজকোটে গেলাম। নিজস্ব অফিসও খুলিলাম। কোনও রকমে চলিতে লাগিল। আরজী লেখার কাজ পাইতে লাগিলাম এবং মাসে গড়ে তিনশত টাকা আসিতে লাগিল। এই আরজীর কাজ আমার শক্তি-বশতঃ পাই নাই—উহার মূলে ছিল খাতির। উকীল-ভাইএর অংশীদারের ওকালতী জমিয়া গিয়াছিল। যে সব বড় রকমের আরজী তাঁহার কাছে তৈরী হইতে আসিত, অথবা যে সকল আরজী তিনি গুরুতর মনে করিতেন, সেগুলি তিনি কোনও বড় ব্যারিস্টারকে পাঠাইয়া দিতেন। কেবল তাঁহার গরীব মক্কেলের আরজী লেখার কাজই আমি পাইতাম।

কমিশন না দেওয়ার যে সংকল্প বোম্বাই-এ পালন করিয়াছি এখানে তাহা ভাঙ্গিয়াছি বলা যায়। ব্যাপারটা ছিল এই রকমের—বোম্বাইতে আমার কেবল দালালকে পয়সা দেওয়ার কথা হইয়াছিল,—এখানে দিতে হইত উকীলকে। বোম্বাইয়ের মত এখানেও সকল ব্যারিস্টারই প্রকাশ্যে এই প্রকার দালালির টাকা উকীলকে দিয়া থাকেন বলিয়া আমাকে জানানো হইল। আমার দাদার যুক্তির বিরুদ্ধে অন্য কোন যুক্তি দেখাইবার শক্তি আমার ছিল না। তিনি বলিলেন—"তুমি দেখিতেছ আমি অন্য এক উকীলের অংশীদার। আমার কাছে যে মামলা আসে তাহার যেগুলি তোমাকে দিই তাহার মধ্যে আমার ভাগ ত থাকিয়াই যায়, কিন্তু যদি তুমি আমার ভাগীদারের অংশ তাহাকে না দাও তবে তাহা আমার অবস্থাকেই সঙ্কটাপন্ন করিয়া তোলে। একসঙ্গে থাকি বলিয়া তোমার ফীর অংশ তোমার আমার

মুক্ত-ভাণ্ডারেই যায়। অর্থাৎ তাহা আমারও পাওয়া হয়। কিন্তু আমার অংশীদারের কথা একবার ভাবিয়া দেখ। তিনি যদি কেস্ অন্যত্র দিতেন তবে তাঁহার কমিশনের ভাগ ত তিনি পাইতেনই।" এই যুক্তিতে আমি ভুলিলাম। মনে হইল যে, যদি আমাকে ব্যারিস্টারী করিতে হয় তবে এই সকল কেসে কমিশন না দেওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিতে হইবে। এই যুক্তিতে মনকে বুঝাইলাম, অথবা স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয়—মনকে ঠকাইলাম! ইহা ছাড়া অন্য কোনও কেসে আমি কমিশন দিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না।

যদিও আমার আর্থিক অভাব একরকম মিটিয়া যাইতেছিল, তবুও জীবনের প্রথম আঘাত এই সময়েই পাই। ব্রিটিশ-অফিসার কি পদার্থ তাহা কানে শুনিয়াছি। সাম্‌না-সামনি এইবার দেখা হইল।

পোরবন্দরের রাণা-সাহেবের গদি পাওয়ার পূর্বে আমার দাদা তাঁহার মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। সেই সময় তিনি রাণাসাহেবকে অসৎ পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর অভিযোগ আনা হয়। এই সংবাদ পলিটিকাল এজেন্টের কাছে গিয়াছিল ও তিনি দাদার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। এই কর্মচারীটিকে আমি বিলাতে জানিতাম। তাঁহার সহিত খানিকটা বন্ধুত্বও হইয়াছিল—একথা বলা যায়। ভাই ভাবিলেন যে, এই পরিচয়ের সুবিধা লইয়া আমি পলিটিকাল এজেন্টকে যদি দু'কথা বলি, তবে হয়ত তাঁহার উপর হইতে এজেন্টের বিরুদ্ধভাব চলিয়া যায়। কথাটা আমার এতটুকুও পছন্দ হয় নাই। বিলাতের এই পরিচয়টুকুর সুবিধা লওয়াও উচিত নয় বলিয়াই মনে হইয়াছিল। যদি দাদা কোন দোষের কাজ করিয়া থাকেন তবে তাঁহার পক্ষে বলিতে গিয়া লাভ কি? আর যদি অন্যায় না করিয়া থাকেন, তবে নিয়মমত আরজী করিবেন অথবা নিজের নির্দোষিতার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবেন। এই যুক্তি ভাইএর পছন্দ হইল না। তিনি বলিলেন—"তুমি কাথিয়াওয়াড়ের ব্যাপার জান না, পৃথিবীকে চিনিতে এখনও তোমার দেরি আছে। এখানে খাতিরই সব চেয়ে বড় জিনিস। তোমার একটা কথায় যদি কাজ হয় তবে ভাই হইয়া তাহা অস্বীকার করা বা কর্তব্য এড়াইয়া যাওয়া ঠিক নয়।

দাদার কথা আমি ফেলিতে পারিলাম না। সুতরাং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে কাজ করিতে হইল। কর্মচারীটির নিকট যাওয়ার আমার কোনও অধিকার ছিল না। যাওয়াতে যে আমার আত্মসম্মান নষ্ট করা হয়

তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম। তথাপি আমি দেখা করার জন্য সময় চাহিলাম এবং তিনি সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিলে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহাকে পুরাতন পরিচয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে, বিলাতে ও কাথিয়া-ওয়াড়ে অনেক প্রভেদ। সরকারী আমলা যখন নিজের আসনে বসিয়া থাকেন, আর যখন তিনি ছুটিতে দেশে যান—এ দুইয়ের মধ্যে ঢের তফাৎ। আমলাটি পরিচয় স্বীকার করিলেন, কিন্তু এই পরিচয় স্বীকারের সঙ্গেই তিনি খুব কঠিন হইয়াও উঠিলেন। তাঁহার কাঠিন্য, তাঁহার চোখের দৃষ্টি যেন আমাকে এই কথা বলিল—"সেই পরিচয়ের সুবিধা লইতে আসিয়াছ—তাই কি ?" এ কথা বুঝিয়াও আমার কথা তুলিলাম। সাহেব অধীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"আপনার ভাই চক্রান্তকারী। আপনার কাছে বেশী কথা শুনিতে চাই না। সে সময় আমার নাই। আপনার ভাইএর যাহা বলার আছে তাহা যেন নিয়মমত আর্জীতে লিখিয়া জানান।" এই উত্তরই যথেষ্ট ছিল—যথার্থ ছিল। কিন্তু গরজ থাকিলে কি জ্ঞান থাকে ? আমি নিজের কথাই চালাইতে লাগিলাম। সাহেব উঠিয়া বলিলেন—"আপনি এখন আসুন।"

আমি বলিলাম—দয়া করিয়া আমার কথাটা পুরাপুরি শুনুন।"

সাহেব জ্বলিয়া উঠিলেন—"চাপরাসী ! ইহাকে দরজা দেখাও।"

'হুজুর'—বলিয়া চাপরাসী দৌড়াইয়া আসিল। আমি তখনও কতক অনিশ্চিত-ভাবে ছিলাম। চাপরাসীটি আমার হাত ধরিল ও দরজার বাহির করিয়া দিল।

সাহেব গেল, চাপরাসী গেল। আমি ক্ষুব্ধ হইয়া ক্রোধে আগুন হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়াই চিঠি দিলাম—"আপনি আমাকে অপমান করিয়াছেন, চাপরাসী দিয়া আমার উপর জবরদস্তি করিয়াছেন। আপনি মাফ না চাহিলে, আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করিব।"

অল্পক্ষণ পরেই সাহেবের সওয়ার জবাব দিয়া গেল।

"আপনি আমার সহিত অসভ্য আচরণ করিয়াছেন। আপনাকে চলিয়া যাইতে বলিলেও যান নাই, সেইজন্য আমি আপনাকে দরজা দেখাইতে চাপরাসীকে বলি, তাহার পরেও আপনি অফিস ত্যাগ না করাতে সে আপনাকে বাহির করার জন্য যতটুকু বলপ্রয়োগ দরকার তাহাই করিয়াছে। আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।"

জবাবের মর্ম এই রকম ছিল

এই জবাব পকেটে লইয়া মাথা নীচু করিয়া বাড়ী আসিলাম। দাদাকে সকল কথা বলিলাম। তিনি দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তিনি আমাকে কি সান্ত্বনা দিবেন বুঝিয়া পাইলেন না। তাঁহার উকীল-বন্ধুদের সহিত কথা বলিলেন। কিভাবে সাহেবের সহিত লড়া যায় তাহা আমিও বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এই সময় স্যার ফিরোজশা মেহ্‌তা কোনও মোকদ্দমা উপলক্ষে রাজকোটে আসিয়াছিলেন। আমার মত নূতন ব্যারিস্টার তাঁহার সহিত কেমন করিয়া দেখা করিবে? তবে যে উকীল তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার হাত দিয়া একটি পত্র পাঠাইয়া দিই ও তাঁহার পরামর্শ চাই। তিনি বলিলেন—"গান্ধীকে বলিবেন, এ প্রকার ঘটনা সকল উকীল ব্যারিস্টারের অভিজ্ঞতাতেই আসে। তাহার রক্ত গরম, সে বিলাত হইতে নূতন আসিয়াছে। সে ব্রিটিশ কর্মচারীকে চিনে না। যদি সুখে বাস করিতে চায় ও দু'পয়সা রোজগার করিতে চায়, তবে সে চিঠি সে যেন ছিঁড়িয়া ফেলে ও অপমান হজম করে। নালিশ করিলে ফল কিছুই হইবে না—বরং আরও ক্ষতি হইবে। দুনিয়াটাকে তাহার চিনিতে এখনও বাকী আছে।

এই উপদেশ আমার কাছে বিষের ন্যায় তিক্ত লাগিল। তবু সেই তিক্ত ঔষধই গিলিতে হইল, এই অপমান হজম করিতে হইল। তবে তাহার সদ্ব্যবহার করিলাম। স্থির করিলাম—এরূপ অবস্থায় আর কখনো পড়িব না, এমন ভাবে বন্ধুত্বের সুযোগ লইব না। এই নিয়ম কখনো ভঙ্গ করি নাই। এই আঘাত আমার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিল।

৫
দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য প্রস্তুত

সরকারী আমলার নিকট আমার যাওয়া যে অন্যায় হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমলার অধীরতা, তাঁহার রোষ, তাঁহার ঔদ্ধত্যের সম্মুখে আমার দোষ ছোট হইয়া যায়। আমার দোষের সাজা ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া নয়। আমি তাঁহার নিকট পাঁচ মিনিটও বসি নাই। আমার কথাই তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইয়াছিল—তিনি আমাকে ভদ্রতার সঙ্গেও যাইতে বলিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার নেশায় তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। পরে জানিয়াছিলাম যে, এই আমলাটির ধৈর্য বলিয়া কোন

বস্তু নাই। তাঁহার নিকট যে যায় তাহাকে অপমান করা তাঁহার পক্ষে সাধারণ ঘটনা। তাঁহার ভাল লাগে না—এমন কথা যদি কেহ বলে, তবেই সাহেবের মেজাজ বিগড়াইয়া যায়।

অথচ স্বভাবতই আমার কাজ তাঁহার কোর্টে বেশী। খোশামোদ করা আমার দ্বারা অসম্ভব। তাঁহাকে অযোগ্য উপায়ে খুশী করিবার প্রবৃত্তিও আমার নাই। তাঁহার উপর নালিশের হুমকি দিয়া নালিশ না করা এবং তাঁহাকে কিছু না বলাও আমার ভাল লাগিল না।

ইতিমধ্যে আমার কাথিয়াওয়াড়ের ছোট ছোট রাজনীতিতে চক্রান্ত সম্বন্ধেও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হইল। কাথিয়াওয়াড় অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া গঠিত। এখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রও প্রশস্ত। রাজ্যে রাজ্যে যেমন বিসম্বাদ তেমনি ছোটখাটো পদ পাওয়ার জন্য চক্রান্ত। রাজাদের কান অত্যন্ত পাত্‌লা—মোসাহেবদের উপর অগাধ বিশ্বাস। কতকটা পরবশও। এখানে সাহেবের চাপরাসীরও খোসামোদ করিতে হয়। সেরেস্তাদার এখানে সাহেবেরও বাড়া, কেন না তাহারাই সাহেবের চোখ, তাহারা কান, তাহারা দোভাষী। সেরেস্তাদারের ইচ্ছাই আইন, তাহাদের আয় সাহেবের আয় অপেক্ষা বেশী। ইহাতে অতিশয়োক্তি থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু সেরেস্তাদারের অল্প বেতনের তুলনায় তাহারা অনেক বেশী ব্যয় করিত।

এই আবহাওয়া আমার নিকট বিষের মত লাগিল। আমি কি করিয়া এই বিষ হইতে বাঁচিব—তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

আমি একেবারে মন-মরা হইয়া গেলাম। দাদা আমার উদাসীনতা লক্ষ্য করিলেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বুঝিলেন—কোথাও চাকুরি লইয়া বসিয়া যাইতে পারিলেই আমার এই সব চক্রান্ত হইতে মুক্তিলাভ হয়—কিন্তু চক্রান্তে যোগ না নিলে মন্ত্রীর কাজ কি জজের কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। ওকালতী ব্যবসায়ে ত সাহেবের সহিত ঝগড়াই একটা অন্তরায়-স্বরূপ হইল।

পোরবন্দর এড্‌মিনিস্ট্রেটরের অধীন ছিল। সেইখানে রাজা সাহেবের জন্য কতকগুলি অধিকার পাওয়ার কার্য হাতে লইয়াছিলাম। ওখানকার 'মের' জাতের লোকদের নিকট হইতে বড় বেশী খাজনা লওয়া হইত। সেজন্যও সেখানে আমার এড্‌মিনিস্ট্রেটরের সহিত দেখা করিতে হইয়াছিল। এড্‌মিনিস্ট্রেটর দেশী লোক হইলেও তাঁহার ব্যবহার সাহেবের অপেক্ষা বেশী রূঢ়। তাঁহার কার্যদক্ষতা ছিল। কিন্তু তাঁহার দক্ষতায় রায়ত্‌দের বিশেষ কোনই সুবিধা

হইল না। রাণা-সাহেব সামান্য বেশী অধিকার পাইলেন কিন্তু 'মের' লোকেরা কিছুই পাইল না বলা যায়। তাহাদের কেস্ ভাল করিয়া খোঁজ করা হইয়াছে বলিয়াও আমার মনে হইল না।

অর্থাৎ এই কাজেও আমি নিরাশ হইলাম। আমার বোধ হইল যে, আমার মক্কেলের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়া গেল না। ন্যায়বিচার পাওয়ার কোন উপায়ও ছিল না। বড় জোর বড় সাহেবের নিকট আপিল করা যাইত কিন্তু এ সব ব্যাপারে তিনি সাধারণতঃ এই জবাবই দিতেন—"আমি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অপারগ।" এই প্রকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও আইন-কানুনের প্রয়োগের সুযোগ থাকিলে তবু কিছু আশা করা যায়। কিন্তু এখানে সাহেবের মর্জিই আইন।

মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে দাদার কাছে পোরবন্দরের এক শেঠের এই প্রস্তাবটি আসিল—"আমাদের কারবার দক্ষিণ আফ্রিকায়। কারবার খুব বড়। কোর্টে আমাদের এক বড় মামলা চলিতেছে। দাবী চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের। কেস্ অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। আমরা বড় উকীল ব্যারিস্টার নিযুক্ত করিয়াছি। আপনার ভাইকে যদি পাঠাইয়া দেন তবে তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন, তাঁহারও সাহায্য হইবে। তিনি আমাদের কেস্ আমাদের উকীলকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিবেন। তাহা ছাড়া তিনি নূতন দেশ ও নূতন লোকের সঙ্গেও পরিচয় করিতে পারিবেন।"

প্রস্তাবটি লইয়া দাদা আমার সহিত আলোচনা করিলেন। উহার অর্থ পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম না। আমার কেবল উকীলকে বুঝাইতে হইবে, না কোর্টের কাজও করিতে হইবে তাহা জানা গেল না। কিন্তু আমার লোভ হইল।

দাদা আবদুল্লা কোম্পানীর অংশীদার স্বর্গগত শেঠ আবদুল করিম ঝভেরীর সহিত দাদা আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। শেঠ বলিলেন—"আপনার বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না। আমাদের বড় বড় সাহেবদের সহিত মিত্রতা আছে। তাহাদের সহিত আপনি পরিচয় করিবেন। আমাদের দোকানেও আপনি কাজে লাগিতে পারিবেন। আমাদের ইংরাজীতে বহু চিঠিপত্র লিখিতে হয় ইহাতেও আপনি সাহায্য করিতে পারিবেন। আমাদের ওখানেই আপনি থাকিবেন। সুতরাং সেজন্যও আপনার কোনও খরচা নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কতদিনের জন্য আমাকে চাকুরিতে রাখিতে চাহেন? আপনারা আমাকে কি বেতন দিবেন?"

"আপনার কাজ এক বৎসরের বেশী লাগিবে না। আপনাকে ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াতের ভাড়া ও থাকার সমস্ত খরচ ছাড়া ১০৫ পাউণ্ড দিব।"

ইহাকে ওকালতী বলে না। ইহা চাকুরি মাত্র। কিন্তু যেমন করিয়া হোক্ আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে চাই। নূতন দেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে ও অভিজ্ঞতা লাভ হইবে—ইহাও লোভনীয়। ১০৫ পাউণ্ড দাদাকে পাঠাইব, তাহাতে বাড়ীর খরচার কিছু সাহায্য হইবে। এই প্রকার বিচার করিয়া বেতন সম্বন্ধে দর-কষাকষি না করিয়া শেঠ আবদুল করিমের অভিপ্রায়-মত দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবার জন্য তৈরী হইলাম।

৬

নাতাল পৌঁছিলাম

বিলাত যাওয়ার সময় বিচ্ছেদের যে দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, দক্ষিণ আফ্রিকা যাইতে তাহা অনুভব করিলাম না। মা ত চলিয়াই গিয়াছেন।—পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইবার অভিজ্ঞতাও হইয়াছিল। রাজকোট ও বোম্বাই-এর মধ্যে যাতায়াত হইতেছিল। এইবার পত্নীর সহিত বিচ্ছেদের জন্যই যাহা কিছু দুঃখ। বিলাত হইতে আসার পর আর একটি পুত্র হইয়াছে। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে ভোগের স্থান অবশ্যই ছিল, তাহা হইলেও তাহাতে নির্মলতা আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিলাত হইতে আসার পর আমরা খুব কমই একত্র থাকিয়াছি; যতটা পারি তাঁহার শিক্ষকতা করিয়াছি এবং তাঁহার কতকগুলি অভ্যাসেরও সংস্কার করিয়াছি। আরও সেই সংস্কারের জন্যই আমাদের একত্র থাকার আবশ্যকতা বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু আফ্রিকার আকর্ষণ খুব বেশী। তাই তাঁহার বিচ্ছেদও অসহ্য বলিয়া মনে হয় নাই। 'এক বৎসর পরে ত দেখা হইবেই'—এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া আমি রাজকোট ত্যাগ করিয়া বোম্বাই পৌঁছিলাম।

কথা ছিল দাদা আবদুল্লার বোম্বাই-এজেণ্ট আমার টিকিট কিনিয়া দিবেন। কিন্তু স্টীমারে কেবিন খালি পাওয়া গেল না। যদি এখন না যাইতে পারি তবে এক মাস আমাকে বোম্বাই-এ বৃথা বসিয়া থাকিতে হয়। এজেণ্ট বলিলেন—"আমি ত অনেক চেষ্টা করিয়াও ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনিতে পারিলাম না।

ডেকে যান ত টিকিট পাওয়া যায়। খাওয়ার ব্যবস্থা সেলুনে (ভোজন-গৃহে) হইতে পারিবে।" এই সময় আমি ফার্স্ট ক্লাসে চড়িতাম। ডেক-প্যাসেঞ্জার হইয়া কোনও ব্যারিস্টার কি যায় ? আমি ডেকে যাইতে অস্বীকার করিলাম। আমার এজেন্টের উপর সন্দেহ হইল। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট পাওয়া যায় না— ইহা আমার মনে লাগিল না। এজেণ্টকে বলিয়া আমিই টিকিট কেনার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমি স্টীমারে গেলাম। স্টীমারের প্রধান কর্মচারীর সহিত দেখা করিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি আমাকে খোলসা করিয়া বলিলেন—"আমাদের জাহাজে সাধারণতঃ এত ভিড় হয় না। কিন্তু মোজাম্বিকের গভর্নর জেনারেল এই স্টীমারে যাইতেছেন, সেইজন্য সমস্ত জায়গা ভর্তি হইয়া গিয়াছে।"

"আপনি কি কোনও রকম করিয়া আমার জন্য একটা জায়গা করিয়া দিতে পারেন না ?"

প্রধান কর্মচারী একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"একটা উপায় আছে। আমার ক্যাবিনে একটা বার্থ খালি আছে। সেখানে আমরা যাত্রী লই না—কিন্তু আপনাকে আমি জায়গা দিতে প্রস্তুত আছি।" আমি প্রধান কর্মচারীকে ধন্যবাদ দিয়া এজেণ্টকে বলিয়া টিকিট কাটাইলাম। ১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে আমি পরম উৎসাহে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যাত্রা করিলাম।

প্রথম বন্দর ছিল লামু। সেখানে পৌছিতে প্রায় তেরো দিন লাগিল। রাস্তায় কাপ্তেনের সহিত খুব বন্ধুত্ব হয়। কাপ্তেনের দাবা খেলার শখ ছিল। তিনি নূতন শিখিতেছিলেন। তাঁহার চাইতেও নূতন লোকের সহিত খেলিতে তাঁহার শখ গেল। তিনি আমাকে খেলিতে ডাকিলেন। আমি দাবা কখনো খেলি নাই। যাঁহারা খেলেন তাঁহারা বলেন যে, এই খেলায় বুদ্ধির ব্যবহার খুব হয়। কাপ্তেন নিজেই আমাকে শিখাইয়া লইবেন বলিলেন। তিনি আমাকে ভাল ছাত্রই পাইলেন, কেন না আমার অসীম ধৈর্য ছিল। আমিই হারিতাম আর তাহাতেই তিনি আমাকে শিখাইবার জন্য আরও উৎসাহিত হইতেন। আমার দাবা খেলা ভাল লাগিল। কিন্তু এই শখ স্টীমারে থাকা পর্যন্তই ছিল। খেলার জ্ঞানও গুটিগুলির চাল শেখার উপরে উঠে নাই।

লামু বন্দরে আসিলাম। সেখানে স্টীমার তিন-চার ঘণ্টা থামে। আমি বন্দর দেখিতে নিচে নামিলাম। কাপ্তেনও নামিয়াছিলেন। তিনি আমাকে

সাবধান করিয়া বলিলেন যে—"এখানকার বন্দরের অবস্থার উপর নির্ভর করা যায় না, শীঘ্রই ফিরিবেন।"

জায়গাটা একেবারেই ছোট। পোস্টাফিসে গেলাম—সেখানে ভারতবাসী কেরানী দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া আনন্দ হইল। তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বলিলাম। হাব্‌সীদের সাক্ষাৎ পাইলাম। তাহাদের চালচলন দেখিয়া ভাল লাগিল—সেখানে কতকটা সময় গেল। কতকগুলি ডেকের যাত্রী আমার পরিচিত ছিল,—তাহারা রান্না করিয়া খাওয়ার জন্য নিচে নামিয়াছিল। আমি তাহাদের নৌকাতেই উঠিলাম। একে জোয়ারের সময় তার নৌকা খুব ভরা ছিল। জলের টানও এত বেশী ছিল যে, নৌকার দড়ি স্টীমারের সিঁড়ির সঙ্গে কোনক্রমেই বাঁধা যাইতেছিল না। নৌকা স্টীমারের সিঁড়ির নিকট যায় আবার তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসে। স্টীমার ছাড়ার প্রথম সিটি বাজিয়া গেল। আমি বিচলিত হইলাম। কাপ্তেন উপর হইতে দেখিতেছিলেন। তিনি আরও পাঁচ মিনিট স্টীমার দাঁড়াইতে বলিলেন। স্টীমারের নিকট এক ডিঙ্গী ছিল। আমার এক বন্ধু দশ টাকা দিয়া উহা আমার জন্য ভাড়া করিলেন ও সেই মাঝি আমাকে নৌকা হইতে টানিয়া তুলিয়া লইল। স্টীমারের সিঁড়ি তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। দড়ি ধরিয়া আমাকে উপরে টানিয়া তুলিল ও স্টীমার চলিতে লাগিল। অন্য যাত্রীরা রহিয়া গেল। কাপ্তেন যে সাবধান করিয়াছিলেন তাহার অর্থ এখন বুঝিলাম।

লামু হইতে মোম্বাসা ও সেখান হইতে জাঞ্জীবার পঁহুছিলাম। জাঞ্জীবারে অনেক দিন বসিয়া থাকিতে হইল—আট কি দশ দিন হইবে। সেখানে স্টীমার বদলাইতে হইল।

কাপ্তেন আমাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। কিন্তু এই ভালবাসা আমার পক্ষে পরিণামে বিশেষ প্রীতিকর হয় নাই। তিনি একদিন আমাকে তাঁহার সহিত বেড়াইতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। এক ইংরাজ বন্ধুকেও তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমরা তিনজনে কাপ্তেনের ডিঙ্গীতে চড়িয়া পারে আসিলাম। এই বেড়ানোর মর্ম আমি মোটেই বুঝিতে পারি নাই। আমি এসব বিষয়ে যে কত অনভিজ্ঞ তাঁহার খবর কাপ্তেনও রাখিতেন না। এক দালাল আমাদিগকে কাফ্রি স্ত্রীলোকদের বাড়ী লইয়া গেল। প্রত্যেককে এক-একটি কামরা দেখাইয়া দিল। সেখানে ঢুকিয়া লজ্জায় আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। স্ত্রীলোক বেচারী কি যে ভাবিল তাহা সেই জানে। কাপ্তেন ডাক দিলে আমি যেমন

ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তেমনি ভাবেই বাহির হইয়া আসিলাম। কাপ্তেন আমার নির্দোষিতা বুঝিলেন। প্রথম আমার খুব লজ্জাবোধ হইয়াছিল, কিন্তু যেমন মনে হইল কাজটা কোনও ক্রমেই অনুমোদন করা যায় না, অমনি আমার লজ্জার ভাবও মিলাইয়া গেল। ঐ বহিন্‌কে দেখিয়া আমার মনে একটু বিকারও যে স্পর্শ করে নাই, সেজন্য আমি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। রমণীটির ঘরে প্রবেশ করিবার অনুরোধ যে অস্বীকার করিতে পারি নাই—সেই দুর্বলতার জন্য বরং আমার গ্লানি উপস্থিত হইল।

এই ধরনের পরীক্ষা আমার জীবনে এই তৃতীয়বার। কত যুবক প্রথমে নির্দোষ থাকিয়াও, মিথ্যা লজ্জায় দোষের ভিতরে ডুবিয়া যায়। আমার বাঁচা আমার নিজের শক্তিতে হয় নাই। যদি আমি কামরায় প্রবেশ করিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিতাম, তবে উহা আমার কৃতিত্ব বলা যাইত। আমাকে কেবল ঈশ্বরই বাঁচাইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে ঈশ্বরের উপর আমার আস্থা বাড়িল এবং মিথ্যা লজ্জা ত্যাগ করার কতকটা শিক্ষা হইল।

জাঞ্জীবারে এক সপ্তাহ কাটাইতে হইল। সেই জন্য আমি একটি ঘর ভাড়া লইয়া শহরেই থাকিলাম। শহর খুব ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। জাঞ্জীবারের নিবিড় বৃক্ষলতাদির ধারণা আমাদের দেশে এক মালাবারেই হইতে পারে। সেখানকার বিশাল গাছ ও ফলগুলির আকৃতি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম।

জাঞ্জীবার হইতে মোজাম্বিক ও সেখান হইতে নাতালে মে মাসের প্রায় শেষের দিকে পঁহুছিলাম।

৭

অভিজ্ঞতার নমুনা

নাতালের বন্দরকে ডারবান বলে, পোর্ট নাতালও বলা হয়। আবদুল্লা শেঠ আমাকে লইতে আসিয়াছিলেন। নাতালের আরও অনেকে নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের স্টীমার হইতে লইতে আসিয়াছিল। তখনই আমি লক্ষ্য করিলাম যে, এখানে ভারতবাসীদের বিশেষ সম্মান নাই। আবদুল্লা শেঠের পরিচিতেরা যেভাবে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহাতেই একটা অবজ্ঞার ভাব দেখা যাইতেছিল। উহাতে আমি ব্যথিত হইলাম। আবদুল্লা শেঠের এই

অবজ্ঞা সহ্য করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। আমাকে যাহারা দেখিতেছিল তাহাদের মধ্যে একটা কৌতূহলের ভাব ছিল। তখন আমি ফ্রক্‌-কোট ইত্যাদি পরিতাম ও মাথায় বাঙ্গালী ধরনের পাগড়ি দিতাম।

আমাকে কোম্পানীর গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। নিজের কামরার পাশেই আর একটা কামরা আবদুল্লা শেঠ আমাকে দিলেন। তিনি আমাকে বুঝিতে পারিলেন না, আমিও তাঁহাকে বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার ভাই যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া তিনি আরো বিচলিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল যে, ভাই তাঁহার জন্য একটি শ্বেত হস্তী পাঠাইয়াছেন। আমার পোশাক ও সাহেবী চালের জন্য তাঁহার মনে হইল আমাকে পুষিতে বেশ খরচা পড়িবে। আমার জন্য বিশেষ কাজ তখন কিছু ছিল না। তাঁহার মামলা চলিতেছিল ট্রান্সভালে—আমাকে সেখানে তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া কি হইবে? আমার দক্ষতা ও বিশ্বস্ততাই বা কতদূর কে জানে? তিনি নিজে আমার সহিত প্রিটোরিয়ায় থাকিতে পারিবেন না। প্রতিবাদী প্রিটোরিয়ায় আছেন, তিনি যদি আমাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করেন? আর যদি আমাকে এই মোকদ্দমার কাজ না দেওয়া যায় তবে অন্য কাজ ত তাঁহার কেরানীরাই আমার অপেক্ষা ভাল করিতে পারে। কেরানী ভুল করিলে তাহাকে শাসন করা যায়, কিন্তু আমাকে? বাকী আর কোনও কাজ ত ছিল না, সুতরাং যদি কেসের কাজ না দেওয়া হয় তাহা হইলে আমাকে বসাইয়া খাওয়াইতে হইবে।

আবদুল্লা শেঠের পুঁথিগত বিদ্যা খুবই কম থাকিলেও ব্যবহারিক জ্ঞান তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহার বুদ্ধি প্রখর ছিল এবং তিনিও তাহা জানিতেন। কোনমতে কথাবার্তা চালানোর মত ইংরাজী জ্ঞান করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই ইংরাজী দিয়াই তিনি নিজের সমস্ত কাজ সারিয়া লইতেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সহিত কথা বলিতেন, ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ীদের সহিত কাজ-কারবার করিয়া আসিতেন, উকীলকে নিজের মামলা বুঝাইতে পারিতেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তাঁহার খুব সম্মান ছিল। সে সময় তাঁহার কারবার ভারতীয়দের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ছিল—অথবা যাহারা খুব বড়, তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এতগুলি গুণ সত্ত্বেও তাঁহার একটি দোষ—স্বভাব বড় সন্দিগ্ধ ছিল।

তিনি ইসলামের গর্ব করিতেন, ঐস্লামিক তত্ত্ব-জ্ঞান বিষয়ে কথা বলিতে ভালবাসিতেন। আরবী জানিতেন না, কিন্তু কোরাণ-সরিফ ও অন্যান্য ইসলামীয় সাহিত্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ভালই ছিল। দৃষ্টান্ত ত তাঁহার মুখে লাগিয়াই

ছিল। তাঁহার সহিত বাস করিয়া আমি ইসলামীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলাম। আমাদের পরস্পরের সহিত পরিচয়ের পরে তিনি আমার সহিত খুব ধর্মালোচনা করিতেন।

পৌছানোর দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে তিনি আমাকে ডারবানের কোর্ট দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং কোর্টে তাঁহার উকীলের কাছে আমার বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট আমার দিকে তাকাইলেন, শেষে পাগড়ি খুলিতে বলিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া আদালত হইতে চলিয়া আসিলাম।

অর্থাৎ আমার ভাগ্যে এখানেও লড়াই ছিল।

কতকগুলি ভারতবাসীকে আদালতে ঢুকিতে হইলেই পাগড়ি খুলিতে হইত। কেন খুলিতে হইত তাহার কারণ আবদুল্লা শেঠ আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—যাহারা মুসলমান পোশাক পরিধান করে তাহাদিগকে পাগড়ি খুলিতে হয় না—কিন্তু অন্যান্য ভারতবাসীকে আদালতে প্রবেশ করিতে হইলেই পাগড়ি খুলিতে হয়।

এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি বুঝিতে হইলে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার। দুই-তিন দিনের ভিতরেই আমি দেখিতে পাইলাম ভারতবাসীরা সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এক ভাগ মুসলমান ব্যবসায়ীদের—তাঁহারা নিজদিগকে 'আরব' বলিতেন। অন্য এক ভাগ হিন্দুদের এবং আর এক ভাগ পারসী কেরানীদের। হিন্দু কেরানীরা মাঝামাঝি ঝুলিতেছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেউ কেউ 'আরব' বলিয়া পরিচয় দিত। পারসীরা নিজেদের পরিচয় দিত পারস্যদেশীয় বলিয়া। এই তিন ভাগের পরস্পরের ভিতর ব্যবসা ছাড়া অল্পস্বল্প সামাজিক সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় ছিল—তামিল, তেলেগু ও উত্তর ভারতের চুক্তিবদ্ধ বা চুক্তিমুক্ত ভারতবাসী। যে সকল গরীব ভারতবাসী পাঁচ বৎসরের জন্য চুক্তি বা এগ্রিমেণ্ট করিয়া নাতালে মজুরী করিতে আসিত তাহাদিগকে সেখানে 'গিরমিটিয়া' বা 'গিরমিট্' বলা হয়। গিরমিট্ ইংরাজী 'এগ্রিমেণ্ট' শব্দের অপভ্রংশ। অন্য তিন শ্রেণীর সহিত ইহাদের কাজকর্মের সম্বন্ধ ছাড়া আর কোনও সম্বন্ধ ছিল না। এই গিরমিটিয়াদিগকে ইংরাজেরা 'কুলী' বলিত এবং তাহাদের সংখ্যাই অধিক ছিল বলিয়া সকল ভারতবাসীকেই 'কুলী' বলা হইত। কুলীর বদলে তাহাদিগকে 'সামী'ও বলা হইত। 'সামী' কথা তামিল নামের সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত থাকে।

'সামী' মানে সংস্কৃতে স্বামী। স্বামীর অর্থ ত মালিক। সেইজন্য কোনও ভারতবাসী 'সামী' শব্দ ব্যবহারে রাগ করিলে এবং তাহার সাহস থাকিলে সে জবাব দিত—"তুমি আমাকে সামী বলিতেছ, কিন্তু জান সামী মানে, মনিব? আমি তোমার মনিব ত নই।" কোনও কোনও ইংরাজ ইহাতে লজ্জাবোধ করিত, আবার কেহ বা জ্বলিয়া উঠিয়া গালি দিত অথবা সুবিধা হইলে মারধোরও করিত। কেন না তাহার কাছে "সামী" শব্দটা অবজ্ঞাসূচক। তাহার অর্থ 'মনিব' করা অপমানকর বোধ হইত।

সেইজন্য আমাকে 'কুলী'-ব্যারিস্টার বলা হইত। ব্যবসায়ীদিগকে বলা হইত কুলী-ব্যবসায়ী। কুলীর মূল অর্থ যে মজুর তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ব্যবসায়ীরা ঐ শব্দ ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া বলিত—"আমি কুলী নই—আমি ত আরব।" অথবা "আমি ত বেপারী।" যদি বিনয়ী ইংরাজ হইত তবে একথা শুনিয়া সেও মাফ চাহিত।

এই অবস্থায় পাগড়ি পরার প্রশ্নটাও বড় হইয়া উঠিয়াছিল। পাগড়ি খোলা মানেই অপমান সহ্য করা। আমি ভাবিলাম—হিন্দুস্থানী পাগড়ি পরা ছাড়িয়া দিয়া যদি ইংরাজী টুপী পরি তবে পাগড়ি খোলার অপমানও হয় না এবং ঝগড়া হইতেও বাঁচিয়া যাই।

আবদুল্লা শেঠের কাছে ইহা ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, "আপনি যদি এখন এইরূপ পরিবর্তন করেন তবে তাহার খারাপ অর্থ হইবে। তাহা ছাড়া যাহারা দেশী পাগড়ি পরিতে চায় তাহাদের অবস্থা আরও কঠিন হইবে। আপনার মাথায় দেশী পাগড়িই মানায় ভাল। ইংরাজী টুপী পরিলে আপনাকে খানসামার মত মনে হইবে।"

এই উপদেশের মধ্যে সাংসারিক বিজ্ঞতা ছিল, দেশপ্রেম ছিল ও কিঞ্চিৎ সংকীর্ণতাও ছিল। সাংসারিক অভিজ্ঞতার ছাপ ত সুস্পষ্ট। দেশপ্রেম না থাকিলে পাগড়ি পরায় আগ্রহ থাকিত না। সংকীর্ণতা না থাকিলে খানসামা বা 'ওয়েটার'-এর কথা উঠিত না। গিরমিটিয়া ভারতীয়দিগের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান তিন ভাগ ছিল। এই শেষোক্ত ভাগ তাহাদেরই সন্তান, যে সকল গিরমিটিয়া ভারতবাসী খ্রীষ্টান হইয়াছিল। ১৮৯৩ সালেও ইহাদের সংখ্যা অনেক ছিল। তাহারা সকলেই ইংরাজী পোশাক পরিত ও তাহাদের অধিকাংশই হোটেলে চাকুরি করিয়া রোজগার করিত। আবদুল্লা শেঠ এই শ্রেণীর কথাই তাঁহার টুপি সম্পর্কিত মন্তব্যে উল্লেখ করিয়াছিলেন। হোটেলে ওয়েটারের কাজকে

একটা নীচবৃত্তি বলিয়া মনে করা হইত। আজও অনেকে এই রকম মনে করেন।

আবদুল্লা শেঠের কথা আমার কাছে মোটের উপর ভালই লাগিল। আমি কোর্টের এই ঘটনাটি সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দিলাম ও আমার পাগড়ি পরার সমর্থন করিলাম। আমার পাগড়ি লইয়া সংবাদপত্রে অনেক আলোচনা হইল এবং "আন্‌ওয়েলকম্ ভিজিটর" বা 'অনাদৃত আগন্তুক' বলিয়া হেডিং দিয়া আমার কথা ছাপা হইল। এইরূপে তিন-চার দিনের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনায়াসে আমার নামের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়া গেল। কেহ আমার পক্ষ লইলেন, কেহ বা আমার ঔদ্ধত্যের খুব নিন্দা করিলেন।

আমার পাগড়ি প্রায় শেষ পর্যন্ত ছিল। অবশেষে কখন তাহা গেল সে কথা পরে বলিব।

৮

প্রিটোরিয়ার পথে

অল্প দিনের মধ্যেই ডারবানে অবস্থিত ভারতীয় খ্রীষ্টানদের সংস্পর্শে আসিলাম। সেখানে কোর্টের দোভাষী মিঃ পল রোমান ক্যাথলিক ছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয় করার পর প্রোটেস্টাণ্ট মিশনের শিক্ষক পরলোকগত মিঃ সুভান গড্‌ফ্রের সঙ্গে পরিচয় করিলাম। ইঁহারই পুত্র জেম্‌স গড্‌ফ্রে ১৯১৪ সনে সাউথ আফ্রিকান ডেপুটেশনের প্রতিনিধি-মণ্ডল-ভুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এই সময়েই পরলোকগত পার্শী রোস্তমজীর এবং পরলোকগত আদমজী মিঞা খানের সহিতও পরিচয় হয়। ইঁহারা সকলেই প্রয়োজন ছাড়া পরস্পরের সহিত মিশিতেন না। কিন্তু পরে দেখা যাইবে যে ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবারও প্রয়োজন হইয়াছিল।

আমি যখন এইভাবে পরিচয় করিয়া ফিরিতেছিলাম, তখন কোম্পানীর উকীলের নিকট হইতে পত্র আসিল যে, মামলার জন্য তৈরী হইতে হইবে। সেজন্য হয় শেঠ নিজেই যেন প্রিটোরিয়ায় যান, এবং নিজে না যাইতে পারিলে আর কাহাকেও যেন সেখানে পাঠাইয়া দেন।

আমাকে শেঠ এই পত্র পড়িয়া শুনাইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি প্রিটোরিয়ায় যাইবেন?" আমি বলিলাম—"আমাকে মামলাটি বুঝাইয়া

দিলে বলিতে পারি। সেখানে যে কি করিতে হইবে তাহাই ত এখনো জানি না।" তিনি তাঁহার কেরানীদিগকে কেস বুঝাইয়া দিতে আদেশ দিলেন।

আমি দেখিলাম আমাকে একেবারে গোড়া হইতে শুরু করিতে হইবে। জাঞ্জীবারে যখন নামিয়াছিলাম তখন সেখানকার আদালতের কাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। এক পার্শী উকীল কোন সাক্ষীর জবানবন্দী লইতেছিলেন। তিনি জমা-খরচের প্রশ্ন করিতেছিলেন। আমি জমা-খরচের খবর জানি না। উহা না স্কুলে, না বিলাতে কোথাও শিখি নাই।

দেখিলাম মামলাটি হিসাবের উপরেই নির্ভর করিতেছে। হিসাবের জ্ঞান যাহার আছে সে-ই এই মামলা বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে। মুহুরী জমা আর খরচের কথা যত বলিতে লাগিল, আমি ততই গোলমালে পড়িতে লাগিলাম। পি. নোট কি পদার্থ আমি জানিতাম না। অভিধানে শব্দটা পাইলাম না। আমার অজ্ঞতা আমি কেরানীর নিকট ব্যক্ত করিলাম ও তাহার নিকট হইতে জানিলাম যে, পি. নোট মানে প্রমিসরী নোট। হিসাব শিক্ষার বহি কিনিয়া তাহা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কতকটা আত্মবিশ্বাস আসিল। মামলাটা বুঝিতে পারিলাম। আবদুল্লা শেঠ হিসাব লিখিতে না জানিলেও তাঁহার ব্যবহারিক জ্ঞান এমন ছিল যে, তিনি হিসাব সম্বন্ধীয় জটিল প্রশ্নও সমাধান করিতে পারিতেন। আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমি প্রিটোরিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।

শেঠ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথায় উঠিবেন?" আমি জবাব দিলাম—"আপনি যেখানে বলেন সেইখানে।"

"আপনাকে আমি আমার উকীলের নিকট পাঠাইয়া দিব। তিনি আপনার থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। প্রিটোরিয়াতে আমার একজন মেমন দোস্ত আছেন, তাঁহাকেও আমি লিখিব। কিন্তু সেখানে উঠা আপনার ঠিক হইবে না। সেখানে বিপক্ষের খুব খাতির। আপনার নিকট আমার গোপনীয় কাগজপত্র থাকিবে, তাহা যদি কেহ পড়ে তবে আমাদের মামলার ক্ষতি হইবে। সুতরাং তাহাদের সহিত আপনার যত কম অন্তরঙ্গতা হয় ততই ভাল।"

আমি বলিলাম—"আপনার উকীল যেখানে রাখিবেন আমি সেখানেই থাকিব, অথবা আমি নিজেও কোন ঘর খুঁজিয়া লইতে পারিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার একটা গোপনীয় কথাও বাহিরে যাইবে না। তবে

বিপক্ষের সহিতও আমাকে চেনাশুনা—মিত্রাচার করিতে হইবে। যদি সম্ভব হয়, এই মামলা যাহাতে ঘরে-ঘরেই আপসে মিটিয়া যায় আমি তাহারও চেষ্টা করিব। যতই হউক—তায়েব শেঠ আপনার আত্মীয়ই তো বটে!

প্রতিপক্ষ পরলোকগত তায়েব হাজি খান মহম্মদ, আবদুল্লা শেঠের নিকট-আত্মীয় ছিলেন।

আবদুল্লা শেঠ একটু চমকিয়া উঠিলেন দেখিলাম। কিন্তু আমি ডারবানে পঁহুছিবার ছয়-সাত দিন পরে একথা হইতেছিল। আমরা পরস্পরকে জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি যে 'শ্বেত হস্তী' সে আশঙ্কা অনেকটা দূর হইয়াছিল। তিনি বলিলেন :—

"হাঁ—তা বটে। যদি মিটমাট হয় তবে তার চেয়ে আর ভাল কিছুই হইতে পারে না। আমরা ত আত্মীয়ই, আর পরস্পর বরাবর পরিচিত। কিন্তু তায়েব শেঠ সহজে কোনও মীমাংসা মানিয়া লওয়ার লোক নয়। আপনার পেটের কথা জানিয়া লইয়া পরে আপনাকেই ফাঁসাইবে। মোদ্দ কথা—যাহা করেন সাবধান হইয়া করিবেন।"

আমি বলিলাম—"আপনি মোটেই চিন্তা করিবেন না। আমাদের মামলার কথা তায়েব শেঠকে আমি কিছুই বলিব না। আমি তাঁহাকে কেবল এইটুকুই বলিব যে—দুইজনে ঘরোয়া মিটাইয়া ফেলিলে আর উকীলের পেট ভরাইতে হয় না।"

সপ্তম কি অষ্টম দিনে আমি ডারবান হইতে রওনা হইলাম। আমার জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দেওয়া হইল। রাত্রিতে শোওয়ার বিছানা লইলে আরো পাঁচ শিলিং বেশী দিয়া টিকিট করিতে হয়। আবদুল্লা শেঠ শয্যার জন্যও টিকিট করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আমি জেদবশতঃ, অহঙ্কারবশতঃ, অথবা পাঁচ শিলিং বাঁচাইবার জন্য শয্যার টিকিট করিলাম না।

আবদুল্লা শেঠ আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন—"সাবধান থাকিবেন। এ মুলুক ভারতবর্ষ নয়। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের পয়সা আছে। আপনি পয়সার কৃপণতা করিবেন না। যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই করিবেন।"

আমি কৃতজ্ঞতা জানাইলাম ও আমার জন্য চিন্তা করিতে নিষেধ করিলাম।

নাতালের রাজধানী মরিৎজবর্গে ট্রেন প্রায় নয়টায় পঁহুছিল। এইখানেই বিছানা দিতে আসে। রেলের লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি

বিছানার আবশ্যক আছে ?"

আমি বলিলাম—"আমার কাছে আমার বিছানা আছে।" সে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে এক প্যাসেঞ্জার আসিল। সে আমাকে বেশ করিয়া দেখিল। বুঝিল আমি কালা-আদমী। সে বাহির হইয়া গেল এবং একটু পরে দুই-একজন রেল কর্মচারী লইয়া ফিরিয়া আসিল। কেহ আমাকে কিছু বলিল না। অবশেষে আর একজন কর্মচারী আসিল। সে বলিল—"নামিয়া আসুন, আপনাকে মালের গাড়ীতে যাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম—"আমার কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে।"

তিনি জবাব দিলেন—"তা হোক, আমি বলিতেছি আপনাকে মালের কামরায় যাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম—"আমি ডারবান হইতে এই কামরায় আসিয়াছি, এই কামরাতেই যাইব।"

আমলা বলিল—"সে হইবে না। আপনাকে নামিতেই হইবে, না নামিলে পুলিস সিপাহী আসিয়া নামাইয়া দিবে।"

আমি বলিলাম—"তাহা হইলে সিপাহীই নামাইয়া দিক। আমি ইচ্ছা করিয়া নামিব না।"

পুলিস সিপাহী আসিল। সে আমার হাত ধরিল ও ধাক্কা মারিয়া নিচে নামাইয়া দিল। আমার জিনিসপত্রও নামাইয়া ফেলিল। আমি অন্য কামরায় যাইতে অস্বীকার করিলাম। ট্রেন রওনা হইয়া গেল। আমি ওয়েটিং-রুমে গেলাম। আমার হ্যাণ্ডব্যাগ সঙ্গে রহিল, অন্য জিনিস সেখানেই পড়িয়া ছিল, রেলওয়ের লোক উহার জিম্মা লইয়াছিল।

তখন শীতকাল। দক্ষিণ আফ্রিকার এই অঞ্চলের উচ্চতা বেশী বলিয়া শীত বড় বিষম হয়। মরিৎজবর্গও উঁচু জায়গায় সেইজন্য খুব ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল। আমার ওভারকোটটি আমার জিনিসের সঙ্গে ছিল। জিনিস চাওয়ার সাহস হইল না, যদি আবার অপমান করে। শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। কামরায় আলো ছিল না। মধ্যরাত্রে এক প্যাসেঞ্জার আসিল ও আমার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তখন আমার কথা বলার মত মনের অবস্থা ছিল না।

আমার কর্তব্য কি তাহাই বিচার করিতে লাগিলাম। "আমার যাহা ন্যায্য অধিকার তাহার জন্য কি লড়িব, না ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইব, না অপমান সহ্য

করিয়াই প্রিটোরিয়া পঁহুছিব? তারপর মামলা শেষ করিয়া দেশে ফিরিব! মামলা আরম্ভের পর ফেলিয়া পালানো কাপুরুষের কাজ। আমার উপর যে দুঃখ নামিয়া আসিয়াছে উহা ত বাহ্য দুঃখ। একটা মহারোগ ভিতরে রহিয়াছে, ইহা তাহারই বাহ্য লক্ষণ। এই মহারোগ হইতেছে বর্ণ-বিদ্বেষ। ইহা দূর করার শক্তি থাকে ত সেই শক্তির ব্যবহার করিব। তাহাতে যদি আরও দুঃখ হয় সে সকল সহ্য করিব। তবে বর্ণ-বিদ্বেষ দূর করা পর্যন্তই এই বিরোধ সীমিত রাখিব।"

ইহা স্থির করিয়া অন্য ট্রেনে যেমন করিয়া হউক অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলাম।

সকালে আমি জেনারেল ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ করিয়া তার করিলাম। দাদা আবদুল্লাকেও খবর দিলাম। আবদুল্লা শেঠ তখনই জেনারেল ম্যানেজারের সহিত দেখা করিলেন। জেনারেল ম্যানেজার নিজের লোকের ব্যবহারই সমর্থন করিলেন। তবে জানাইলেন যে, বিনা হাঙ্গামায় যাহাতে আমি গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে পারি সেজন্য তিনি স্টেশন মাস্টারকে উপদেশ দিয়াছেন। আবদুল্লা শেঠ মরিৎজবর্গের হিন্দু ব্যবসায়ীদিগকেও আমার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য তার করিয়াছিলেন এবং অন্য স্টেশনেও সেই প্রকার তার পাঠাইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহারা নিজেরাও যে অপমান পাইয়া থাকেন, আমার নিকট তাহার বর্ণনা করিলেন, এবং আমাকে বলিলেন যে, আমার যাহা ঘটিয়াছে তাহা নূতন কিছুই নহে। প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীতে যদি ভারতবাসীরা ভ্রমণ করে তবে তাহাদের সহিত আমলারা ও গোরা প্যাসেঞ্জারেরা ঐ প্রকার ব্যবহারই করিয়া থাকে। এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে দিন কাটিয়া গেল। রাত্রি হইল, ট্রেনও আসিল। আমার জন্য স্থান তৈরী ছিল। যে বিছানার টিকিট লইতে ডারবানে চাই নাই, তাহা মরিৎজবর্গে লইলাম। ট্রেন আমাকে চার্লস টাউন লইয়া চলিল।

৯

আরও দুর্ভোগ

চার্লস টাউনে ট্রেন সকালে পৌঁছে। সেখানে হইতে জোহানেসবর্গ পর্যন্ত তখনকার দিনে কোন রেলপথ ছিল না। ঘোড়ার ডাকগাড়ী বা 'সিগরাম' ছিল ; মাঝপথে স্টেণ্ডারটনে একরাত্রি থাকিতে হইত। আমার কাছে সিগরামের টিকিট ছিল। একদিন পরে পৌঁছিলেও এই টিকিট রদ হয় না। তা ছাড়া আবদুল্লা শেঠ চার্লস টাউনে সিগরামওয়ালার নিকট তারও করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহারা ত কেবল একটা অজুহাতই খুঁজিয়া ফেরে! সেইজন্য আমাকে নূতন লোক জানিয়া বলিল—"আপনার টিকিট রদ হইয়া গিয়াছে।" আমি উহার উপযুক্ত উত্তর দিলাম। 'টিকিট রদ হইয়াছে'—একথা বলার কারণ অন্য। যাত্রীরা সকলেই সিগরামের ভিতরে বসে। আমি ত কুলী বলিয়া গণ্য, চেহারাতেই বিদেশীর মত দেখাইতেছিল। সেইজন্য আমাকে গোরা যাত্রীদের মধ্যে যদি বসাইতে না হয় তাহা হইলেই ভাল। বস্তুতঃ ইহাই ছিল সিগরাম-ওয়ালার অভিপ্রায়। কোচবাক্সের দুইদিকে দুইটা সিট ছিল। উহার একটাতে সিগরাম কোম্পানীর এক গোরা কণ্ডাক্টর বসিত। সে ভিতরে বসিল ও আমাকে ড্রাইভারের পাশে বসাইল। আমি বুঝিলাম যে ইহা অন্যায়—ইহা কেবল অপমান। কিন্তু এ অপমান হজম করাই ভাল বলিয়া মনে করিলাম। জোর করিয়া ভিতরে বসা আমার দ্বারা হইবে না এবং যদি আমি তর্ক আরম্ভ করি, তবে সিগরাম চলিয়া যাইবে এবং আমার আর একটা দিন বৃথায় যাইবে। পরদিনই বা কি হইবে একমাত্র দৈব জানে। এইজন্য আমি বুদ্ধিমানের মত বাহিরেই বসিয়া গেলাম। যদিচ মনে বড়ই ক্ষোভ হইল।

প্রায় তিনটার সময় সিগরাম পারডীকোপে পৌঁছিল। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেইখানে এখন গোরা কণ্ডাক্টরের বসার ইচ্ছা হইল। তাহার চুরুট খাওয়ার দরকার—একটু হাওয়া খাওয়াও চাই। সেইজন্য সে একটা ময়লা চট ড্রাইভারের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া পাদানের উপর বিছাইয়া দিয়া আমাকে বলিল—"স্বামী, তুমি এইখানে ব'স, আমাকে ড্রাইভারের পাশে বসিতে হইবে।"

এই অপমান আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। সেইজন্য আমি কতকটা ভয়ে-ভয়েই তাহাকে বলিলাম—"তুমিই আমাকে এইখানে বসাইয়াছ, সে অপমান

আমি সহ্য করিয়াছি। আমার স্থান ত ভিতরে বসিবার। কিন্তু তুমি ভিতরে বসিয়া আমাকে এইখানে বসাইয়াছ। এখন তোমার বাহিরে বসার ও চুরুট খাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছে, সেইজন্য তোমার পায়ের কাছে আমাকে বসিতে বলিতেছ! আমি ভিতরে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমার পায়ের কাছে বসিতে প্রস্তুত নহি।"

এই কথা কেবল বলিতেছিলাম, ইতিমধ্যেই লোকটা আসিয়া আমার কান মলিতে লাগিল ও আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া নীচে ফেলিবার চেষ্টা করিল। আমি সিটের পাশের পিতলের ডাণ্ডা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলাম। হাতের কব্জি যদি ভাঙ্গিয়া যায় তবুও ঐ পিতলের ডাণ্ডা ছাড়িব না সংকল্প করিলাম। আমার উপর এই মার প্যাসেঞ্জারেরা দেখিতেছিল। সে আমাকে গাল দিতে-ছিল, টানিতেছিল, মারিতেছিল। আর আমি চুপ করিয়া ছিলাম। সে বলবান আমি দুর্বল। প্যাসেঞ্জারদের একজনের মনে দয়া হইল। সে বলিয়া উঠিল—"ওহে, বেচারাকে ঐখানেই বসিতে দাও। মিছামিছি উহাকে মারিও না। উহার কথা ত ঠিক। ওখানে না হয় ত আমাদের কাছে ভিতরে বসিতে দাও।" লোকটা বলিয়া উঠিল—"কখনো না।" কিন্তু সে কিছুটা দমিয়া গেল, সেই জন্য আমাকে মারাও বন্ধ করিল। আমার হাত ছাড়িয়া দিল। গালি ত অজস্র শুনাইয়া দিলই। এক 'হোটেন্টট্' চাকর অপর সিটে ছিল। তাহাকে পা-দানে বসাইয়া নিজে বাহিরে বসিল। যাত্রীরা ভিতরে বসিল। সিটি দেওয়া লইল, সিগরাম চলিল। আমার বুক দপ্‌দপ্ করিতেছিল এবং আমি ভাবিতে-ছিলাম যে, আমি জীবিত অবস্থায় পঁহুছিব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সে লোকটা আমার দিকে ক্রোধভরে তাকাইতেছিল। আঙ্গুল দেখাইয়া বলিতে-ছিল—"মনে রাখিও, একবার আমাকে স্টেণ্ডারটনে পঁহুছিতে দাও তারপর টের পাইবে।" আমি মূক হইয়া রহিলাম এবং আমার প্রভুর নিকট অর্থাৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

রাত্রি হইল, স্টেণ্ডারটন পঁহুছিলাম। কয়েকজন ভারতবাসীর মুখ দেখিতে পাইয়া যেন বাঁচিলাম। নিচে নামিতেই ভারতবাসীরা বলিল—"আমরা আপনাকে ইসা শেঠের দোকানে লওয়ার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। আমাদের নিকট শেঠ আবদুল্লার তার আসিয়াছে।" আমার খুব ভাল লাগিল। তাঁহাদের সঙ্গে শেঠ ইসা হাজী সুমারের দোকানে গেলাম। আমার আশেপাশে শেঠ ও তাঁহার লোকেরা বসিলেন। আমার ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সবই বলিলাম।

এই ঘটনায় তাঁহারা দুঃখিত হইলেন এবং নিজেদের দুঃখের বর্ণনা দিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। আমার উপর যে অত্যাচার হইয়াছে তাহা সিগরাম কোম্পানীকে জানানো দরকার। আমি এজেণ্টের নিকট চিঠি লিখিলাম, সে লোক যে হুমকি দিয়াছে, তাহাও লিখিলাম। আর কাল যখন যাইতে হইবে তখন অন্য যাত্রীর সঙ্গে আমি যাহাতে ভিতরে বসিতে পারি সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিবার জন্যও তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। এজেণ্ট জবাব দিলেন—"স্টেণ্ডারটন হইতে বড় গাড়ী যায় এবং ড্রাইভার ইত্যাদি বদল হয়। যে লোকের নামে অভিযোগ করিয়াছেন সে কাল থাকিবে না। আপনি অন্য যাত্রীর সহিত সীট্ পাইবেন।" জবাব পাইয়া কতকটা স্বস্তি বোধ হইল। যে লোকটা মারিয়াছিল তাহার উপর নালিশ করার আমার কোনও ইচ্ছাই ছিল না। সুতরাং এই মার খাওয়ার অধ্যায় এইখানেই শেষ হইল। সকালে ইসা শেঠের লোকেরা আমাকে সিগরামে লইয়া গেলেন। জায়গা ঠিকমতই পাইলাম। বিনা হাঙ্গামায় সেই রাত্রিতে জোহানেসবর্গে পৌঁছিলাম।

স্টেণ্ডারটন ছোট গ্রাম। জোহানেসবর্গ বিশাল শহর। সেখানেও আবদুল্লা শেঠ তার করিয়াছেন। আমাকে মহম্মদ কাসেম কমরুদ্দীনের দোকানের নামঠিকানাও তিনি দিয়াছিলেন। তাঁহাদের লোক আমাকে লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই নাই, তাঁহারাও আমাকে চিনিতে পারেন নাই। আমি হোটেলে যাওয়া স্থির করিলাম। দুই চারিটা হোটেলের নাম জানিয়া লইয়াছিলাম। গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাকে গ্রাণ্ড-ন্যাশনাল হোটেলে লইয়া যাইতে বলিলাম। সেখানে পঁহুছিয়া ম্যানেজারের নিকট গেলাম। জায়গা চাহিলাম। তিনি আমাকে ক্ষণেকের জন্য চাহিয়া দেখিলেন তারপর ভদ্রভাবেই বলিলেন, "আমি দুঃখিত, সমস্ত কামরা ভর্তি আছে"—এই বলিয়া বিদায় করিলেন। তখন গাড়ী-ওয়ালাকে মহম্মদ কাসেম কমরুদ্দীনের দোকানে হাঁকাইয়া যাইতে বলিলাম। সেখানে আবদুল গণি শেঠ আমার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। হোটেলের ঘটনা আমি তাঁহাকে বলিলাম। তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"হোটেলে আপনাকে কে উঠিতে দিবে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন দিবে না?"

"আপনি দিনকতক এখানে থাকিলেই কারণটা বুঝিতে পারিবেন। এদেশে

আমরা থাকি, কেন না আমরা রোজগার করিতে চাই। সেই জন্যই অনেক অপমান সহ্য করিয়াও পড়িয়া আছি।"—এই বলিয়া তিনি ট্রান্সভালের দুঃখের ইতিহাস শুনাইলেন।

এই আবদুল গণি শেঠের পরিচয় পরে আমরা অনেক পাইব।

তিনি আবার বলিলেন—"এদেশ আপনাদের মত লোকের যোগ্য নয়। কালই ত আপনাকে প্রিটোরিয়ায় যাইতে হইবে। দেখিবেন—আপনি তৃতীয় শ্রেণীতেই জায়গা পাইবেন। ট্রান্সভালে নাতাল অপেক্ষাও দুঃখ বেশী। এখানে আমাদিগকে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটই দেয় না।"

আমি বলিলাম—"আপনারা ইহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন না কেন?"

আবদুল গণি শেঠ বলিলেন—"আমরা চিঠি-পত্র লেখালেখি করিতেছি। কিন্তু আমাদের লোকেরাই কি প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতে চাহেন?"

আমি রেলের আইন আনাইলাম। উহা দেখিলাম। তাহাতে ফাঁক ছিল। ট্রান্সভালের সাধারণ আইনও কম ছিদ্রগ্রস্ত নয়। রেলওয়ে আইনের আর কথা কি?

আমি শেঠকে বলিলাম—"আমি ফার্স্ট ক্লাসেই যাইব। আর যদি তাহা না হয় তবে যাইব ঘোড়ার গাড়ীতে। মাত্র সাঁইত্রিশ মাইল বই ত নয়।"

আবদুল গণি শেঠ উহার খরচ ও সময়ের কথা আমাকে ভাবিতে বলিলেন। কিন্তু আমার প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার প্রস্তাব তিনি অনুমোদন করিলেন। ইহার পর আমরা স্টেশনমাস্টারের নিকট চিঠি পাঠাইয়া দিলাম। চিঠিতে আমি যে ব্যারিস্টার তাহা জানাইলাম। প্রিটোরিয়ায় শীঘ্র পৌছানো দরকার তাহাও জানাইলাম। তাঁহাকে আরও লিখিলাম যে, ইহার উত্তর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করার সময় আমার নাই বলিয়া আমি স্টেশনে যাইব ও আশা করি প্রথম শ্রেণীর টিকিট পাইব। আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, স্টেশনমাস্টার লিখিত জবাব 'না'-ই দিবেন। ভাবিয়াছিলাম—কুলী ব্যারিস্টারের সম্বন্ধে স্টেশনমাস্টারের হয়ত একটা নিজস্ব ধারণা আছে। সুতরাং তিনি প্রথম শ্রেণীর টিকিট আমাকে না-ও দিতে পারেন। তাই আমি স্থির করিলাম—আমি নিখুঁত সাহেবী পোশাকে তাঁহার সামনে গিয়া দাঁড়াইব এবং তাঁহার সহিত কথা বলিব। মনে হইল—এরূপ করিলে হয়ত তাঁহার নিকট হইতে টিকিট আদায় করা যাইবে। সেই জন্য আমি ফ্রক্‌কোট, নেকটাই ইত্যাদি চড়াইয়া স্টেশনে পৌছিলাম। স্টেশনমাস্টারের সামনে একটি গিনি ফেলিয়া দিয়া

একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট চাহিলাম।

তিনি বলিলেন—"আপনিই কি আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন ?"

আমি বলিলাম—"হাঁ, আমাকে টিকিটটি দিলে কৃতজ্ঞ হইব। আমাকে আজই প্রিটোরিয়ায় যাইতে হইবে।"

স্টেশনমাস্টার হাসিলেন। আমার প্রতি দয়াও হইল। তিনি বলিলেন—"আমি 'ট্রান্সভালার' নহি, আমি 'হল্যাণ্ডার'। আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি। আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। আমি আপনাকে টিকিটও দিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু একটা শর্তে—যদি আপনাকে রাস্তায় গার্ড নামাইয়া দেয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতে বলে তবে আপনি আমাকে জড়াইবেন না; অর্থাৎ রেলওয়ের উপর দাবী করিবেন না। আমি আশা করি, আপনার যাওয়া নির্বিঘ্নেই ঘটিবে।" এই কথা বলিয়া তিনি টিকিট দিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম ও তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিলাম। আবদুল গণি শেঠ উঠাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া তিনি খুশিও হইলেন, আশ্চর্যও হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সাবধানও করিলেন। বলিলেন—"আপনি নির্বিঘ্নে প্রিটোরিয়ার পৌঁছিলে আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিব। আমার আশঙ্কা হয় যে, ট্রেনে গার্ড আপনাকে প্রথম শ্রেণীতে থাকিতে দিবে না, আর যদি গার্ড দেয়ও, তবে যাত্রীরা দিবে না।"

আমি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসিলাম। ট্রেন চলিল। ট্রেন জার্মিস্টনে পঁহুছিলে গার্ড টিকিট দেখিতে বাহির হইল। আমাকে প্রথম শ্রেণীতে দেখিয়াই সে চটিয়া উঠিল। আঙ্গুল দিয়া ইশারা করিয়া বলিল—"তৃতীয় শ্রেণীতে যাও।" আমার প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেখাইলাম। সে বলিল—"তাহাতে কিছু যায় আসে না—যাও তৃতীয় শ্রেণীতে।"

এই কামরায় একজন ইংরাজ ছিলেন। তিনি সেই গার্ডকে ধমকাইলেন—"তুমি এই ভদ্রলোককে কেন বিরক্ত করিতেছ? তুমি দেখিতেছ না উঁহার নিকট ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট আছে? উনি থাকায় আমার কোনও অসুবিধা হইতেছে না।" এই বলিয়া তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"আপনি যেমন আছেন আরাম করিয়া থাকুন।"

গার্ড রাগে গজগজ করিতে করিতে বলিল—"আপনি যদি কুলীর সঙ্গে বসিতে চান, তবে আমার কি ?" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় প্রিটোরিয়ায় পঁহুছিলাম।

১০

প্রিটোরিয়ায় প্রথম দিন

প্রিটোরিয়া স্টেশনে দাদা আবদুল্লার উকীলের কাছ হইতে কেউ না কেউ আসিবে আশা করিয়াছিলাম। কোনও ভারতবাসী আমাকে লইতে আসিবে না জানিতাম, কেন না কোনও ভারতবাসীর বাড়ীতে উঠিব না বলিয়াছিলাম। উকীল কাহাকেও স্টেশনে পাঠান নাই। পরে তাঁহার লোক না পাঠানোর কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি রবিবার দিন পঁহুছিয়াছিলাম। সেদিন কোন অসুবিধা না করিয়া লোক পাঠানো যায় না। আমি শঙ্কিত হইলাম। কোথায় যাইব ভাবিতে লাগিলাম। কোনও হোটেলেই যে স্থান পাইব না—এ সন্দেহ আমার ছিল।

১৮৯৩ সালের প্রিটোরিয়া স্টেশন ১৯১৪ সালের প্রিটোরিয়া স্টেশন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থান। ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা আলো জ্বলিতেছিল। যাত্রীও বেশী ছিল না। আমি সকল যাত্রীকে যাইতে দিলাম। ভাবিলাম—একটু ফাঁকা হইলে কালেক্টরকে টিকিট দিয়া জিজ্ঞাসা করিব যে, কোনও ছোট হোটেল, অথবা এমন কোনও বাড়ীর কথা তিনি বলিতে পারেন কিনা যেখানে যাইতে পারি। ইহা জিজ্ঞাসা করিতেও মন সরিতেছিল না, কেন না অপমান হওয়ার ভয় ছিল। স্টেশন খালি হইল। আমি টিকিট কালেক্টরকে টিকিট দিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম। তিনি বিনয়ের সহিত জবাব দিলেন। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, তিনি বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন না। তাঁহার কাছেই এক আমেরিকান নিগ্রো ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন—

"আমি দেখিতেছি আপনি সম্পূর্ণই অপরিচিত এবং আপনার কোন বন্ধুও এখানে নাই। আমার সহিত যদি আসেন ত এক ছোট হোটেল আছে, সেখানে আমি আপনাকে লইয়া যাইতে পারি। তাহার মালিক আমেরিকান এবং তাঁহাকে আমি ভালরকম জানি। মনে হয়, তিনি আপনাকে জায়গা দিবেন।"

আমার কিছু সন্দেহ যদিও হইল, তবুও আমি এই ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলাম। তিনি আমাকে জনস্টনের ফ্যামিলি হোটেলে লইয়া গেলেন। প্রথমে তিনি মিঃ জনস্টনকে এক কোণে লইয়া গিয়া কিছু কথা বলিলেন। মিঃ জনস্টন আমাকে এক রাত্রি রাখিতে স্বীকার করিলেন।

তাঁহার শর্ত এই যে,—আমার খাদ্য আমার ঘরে পঁহুছাইয়া দিবেন।

তিনি বলিলেন—"আমি আপনাকে কথা দিতেছি যে, আমার কাছে কালা-ধলার তফাত নাই। কিন্তু আমার গ্রাহক সকলেই গোরা। যদি আমি আপনাকে খানাঘরে খাইতে দিই তবে হয়ত তাঁহারা বিরক্ত হইবেন—হয়ত বা চলিয়া যাইবেন।"

আমি জবাব দিলাম—"আপনি আমাকে এক রাত্রির জন্য স্থান দিয়াছেন ইহাতেই আমি উপকৃত হইয়াছি। এদেশের অবস্থা আমি কিছু কিছু বুঝিয়াছি। আপনার অসুবিধা কোথায় তাহাও আমি জানি। আপনি স্বচ্ছন্দে আমার কামরায় আমার খাবার পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি আগামীকাল আমি অন্য কোন ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিব।"

আমাকে একটা কামরা দেখাইয়া দেওয়া হইল। আমি তাহাতে প্রবেশ করিলাম। একাকী বসিয়া খাবার কখন আসিবে সেই অপেক্ষা করিতেছিলাম। এই হোটেলে বেশী লোক থাকে না। প্লেট হাতে ওয়েটারকে দেখার বদলে মিঃ জনস্টন আসিতেছেন দেখিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন—"আপনাকে এই ঘরেই খাওয়াইব বলিয়াছিলাম, তাহাতে আমার লজ্জা বোধ হইতেছিল। এখানে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদিগকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ভোজন-গৃহে আপনার বসিয়া খাওয়াতে তাঁহাদের কোনও আপত্তি নাই। আপনি এখানে যতদিন ইচ্ছা থাকুন তাহাতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। এখন আপনার যদি ইচ্ছা হয় তবে ভোজন-গৃহে চলুন, আর না হয়ত এখানেও খাইতে পারেন।"

আমি তাঁহাকে পুনরায় ধন্যবাদ দিলাম। ভোজন-গৃহে গেলাম। তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম।

পরদিন সকালে উকীলের বাড়ীতে গেলাম। তাঁহার নাম এ. ডবলিউ বেকার। আবদুল্লা শেঠ তাঁহার বিষয় কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য প্রথম দেখা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে আমার কিছু নূতন ঠেকিল না। তিনি হৃদ্যতার সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন এবং কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও সব কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন—"ব্যারিস্টার হিসাবে আপনার এখানে যে কোনও কাজ আছে, তাহা নহে। আমরা বড় বড় ব্যারিস্টার মণ্ডলকেই এই মামলায় নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। মামলা দীর্ঘ ও জটিল। আপনার কাছ হইতে আমি সংবাদাদিই পাইতে চাই। ইহা ছাড়া

আপনার দ্বারা আমার মক্কেলের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করাও সহজ হইয়া পড়িবে। যে বিষয় তাঁহার নিকট হইতে জানা আবশ্যক তাহা আপনার হাত দিয়াই আনাইয়া লইব। ইহাতে যে কাজের সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার জন্য থাকার স্থান আমি এ পর্যন্ত খোঁজ করি নাই। আপনার সহিত দেখা হওয়ার পর খোঁজ করিব এই প্রকার ভাবিয়াছিলাম। এখানে বর্ণ-বিদ্বেষ খুব বেশী। সেই জন্য থাকার স্থান ঠিক করা সহজ নয়। কিন্তু একটি মহিলাকে আমি জানি, তিনি গরীব। তিনি এক রুটিওয়ালার স্ত্রী। আমার মনে হয় তিনি আপনাকে জায়গা দিবেন। ইহাতে তাঁহারও কিছু সাহায্য হইবে। চলুন আমরা সেইখানেই যাই।"

এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটিকে একপাশে লইয়া মিঃ বেকার কিছুক্ষণ কথা বলিলেন এবং তিনি আমাকে রাখিতে স্বীকার করিলেন। সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ শিলিং হিসাবে তিনি খরচ লইবেন।

মিঃ বেকার উকীল হইলেও গৃহী-ধর্ম-প্রচারক ছিলেন। তিনি বাঁচিয়া আছেন এবং এখন কেবল পাদরীর কাজই করিতেছেন। ওকালতী ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছেন। আর্থিক অবস্থা বেশ ভা'ল। তিনি এখনো আমার সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখিয়াছেন। পত্রের বিষয় একই। তাঁহার পত্রে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমার সহিত আলোচনা করেন এবং যীশুকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলিয়া স্বীকার না করিলে এবং তাঁহাকেই ত্রাণকর্তা বলিয়া না মানিলে পরম শান্তি পাওয়া যায় না—ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রথম সাক্ষাৎকালেই মিঃ বেকার আমার ধর্ম সম্বন্ধীয় মনোভাব জানিয়া লইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"আমি হিন্দু হইয়া জন্মিয়াছি। এই ধর্ম সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান নাই। অন্য ধর্ম সম্বন্ধেও খুব কমই জানি। আমি কোথায় আছি, আমি কে, আমি কি মানি, আমার কি মানা উচিত—এ সকল আমি কিছুই জানি না। আমার নিজের ধর্মে গভীরভাবে প্রবেশ করার ইচ্ছা আছে। অন্য ধর্ম সম্বন্ধেও যথাসম্ভব জানিতে ইচ্ছা আছে।" এই সকল শুনিয়া মিঃ বেকার সন্তুষ্ট হইলেন ও আমাকে বলিলেন—"আমি নিজে দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারেল মিশনের একজন ডিরেক্টর। আমার নিজের খরচায় আমি এক গির্জা তৈরী করিয়া দিয়াছি। সেখানে সময়-সময় আমি ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিয়া থাকি। আমি বর্ণভেদ মানি না। আমার

সঙ্গে কয়েকজন সহকর্মীও আছেন। আমরা রোজ একটার সময় মিলিত হই এবং আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করি। আপনি সেখানে আসিলে আমি সুখী হইব এবং আমার সঙ্গীদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করাইয়া দিব। তাঁহারাও আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া সুখী হইবেন। আমার বিশ্বাস আপনারও তাঁহাদের সঙ্গ ভাল লাগিবে। আমি কিছু ধর্মপুস্তকও আপনাকে পড়িতে দিব। তবে আসল পুস্তক ত বাইবেল। এই বাইবেল পাঠ করিবার জন্য আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

মিঃ বেকারকে ধন্যবাদ দিলাম। একটার সময় তাঁহাদের প্রার্থনায় যতদিন পারি যোগ দিতে স্বীকার করিলাম।

"তবে আগামী কাল একটায় এইখানে আসিবেন, আমরা প্রার্থনা মন্দিরে যাইব।"

আমি বিদায় লইলাম। বিশেষ বিচার করার সময় তখন ছিল না। মিঃ জনস্টনের নিকট গেলাম। বিল চুকাইয়া দিলাম। নূতন ঘরে গেলাম। সেইখানেই আহার করিলাম। গৃহিণী ভাল মানুষ। আমার জন্য তাঁহাকে নিরামিষ রান্না করিতে হইত। এই পরিবারের মধ্যে শীঘ্রই আত্মীয়ের ন্যায় বাস করিতে আমার বাধা হইল না। খাওয়া-দাওয়ার পর যে আত্মীয়ের নামে দাদা আবদুল্লা পত্র দিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। আলাপ পরিচয় হইল। তাঁহার কাছ হইতে ভারতীয়দের দুর্দশার আরও বিশেষ সংবাদ জানিলাম। তাঁহার ওখানে আমাকে রাখার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম—আমার থাকার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন—যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তাঁহাকে জানাইতে যেন দ্বিধা না করি।

সন্ধ্যা হইল। রাড়ী ফিরিলাম। আমি আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। হাতে কোনও জরুরী কাজ ছিল না। আবদুল্লা শেঠকে সংবাদ দিলাম। মিঃ বেকারের মিত্রাচারের মানে কি? এই প্রকার ধর্ম-বন্ধুর নিকট হইতে আমি কি পাইতে পারি? আমি খ্রীষ্টধর্ম পাঠাভ্যাস কতদূর পর্যন্ত করিব? হিন্দুধর্মের বইপত্র কোথায় পাইব? তাহা না জানিলে খ্রীষ্টধর্মের স্বরূপই বা আমি কেমন করিয়া বুঝিব? আমি একটিমাত্র সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলাম। যাহা পড়িতে হয়, তাহা পক্ষপাতশূন্য হইয়া পড়িব। মিঃ বেকার ও তাঁহার বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবহারে ঈশ্বর আমাকে যেমনভাবে

পরিচালিত করিবেন—তেমনি ভাবে চলিব। আমার নিজের ধর্ম যতদিন না সম্পূর্ণভাবে জানিতেছি, ততদিন অন্য ধর্ম গ্রহণ করার কথা ভাবিব না। এই সব ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১১

খ্রীষ্টানদিগের সহিত সম্বন্ধ

পরদিন মিঃ বেকারের সঙ্গে একটার সময় প্রার্থনা সমাজে গেলাম। সেখানে মিস হ্যারিস, মিস গেব, মিঃ কোটস প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় হইল। সকলে হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিলেন। আমিও তাঁহাদের অনুকরণ করিলাম। প্রার্থনায় যাঁহার যাহা ইচ্ছা ঈশ্বরের কাছে চাহিলেন। 'দিন যেন শান্তিতে কাটে' 'আমার হৃদয়ের দ্বার খোল' ইত্যাদি সাধারণ প্রার্থনাও হইল। আমার জন্য প্রার্থনা হইল—"আমাদের মধ্যে যে নূতন ভাই আসিয়াছেন, তাঁহাকে তুমি পথ দেখাও। যে শান্তি তুমি আমাদিগকে দিয়াছ সেই শান্তি তুমি তাঁহাকেও দাও। যে যীশু আমাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন তিনি তাঁহাকেও মুক্তি দিন।" এই প্রার্থনায় ভজন কীর্তন নাই। ঈশ্বরের নিকট নিজের যাহা চাওয়ার তাহা চাওয়া হয় ও তাহার পর সকলে পৃথক হইয়া যায়। এই সময় দুপুরের খানা খাওয়ার সময়। সেইজন্য এই প্রার্থনা সারিয়া সকলে নিজ নিজ খানা খাওয়ার জন্য গিয়া থাকেন। প্রার্থনায় পাঁচ মিনিটের বেশী যায় না।

মিস হ্যারিস ও মিস গেব প্রৌঢ়া কুমারী ছিলেন। মিঃ কোটস কোয়েকার ছিলেন। এই দুই মহিলা একত্র বাস করিতেন। তাঁহারা প্রতি রবিবারে তাঁহাদের ওখানে চারটার সময় চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রতি রবিবার যখন আমরা মিলিত হইতাম, মিঃ কোটসের কাছে ধর্ম-সংক্রান্ত আমার সাপ্তাহিক রোজ-নামচা (ডায়েরী) পড়িতে হইত। কী কী পুস্তক পড়িয়াছি, আমার মনের উপর সেই সব পুস্তকের কি প্রভাব বাড়িয়াছে—এই সব আলোচনা করিতাম। এই দুজন মহিলা তাঁহাদের মধুর অনুভূতির বিষয় শুনাইতেন ও নিজেদের পরম শান্তির কথা বলিতেন।

মিঃ কোটস খোলা-প্রাণ উদ্যমী যুবক কোয়েকার ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক গভীর হইল। আমরা অনেক সময় একসঙ্গে বেড়াইতে যাইতাম।

তিনি আমাকে অন্য খ্রীষ্টানদের কাছেও লইয়া যাইতেন।

মিঃ কোটস আমার উপর পুস্তকের বোঝা চাপাইতেন। যেগুলি তাঁহার কাছে ভাল লাগিত সেগুলি আমাকে পড়িতে দিয়া যাইতেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই ঐ সব পুস্তক পড়িব বলিয়া আমি স্বীকার করিতাম। পড়া হইয়া গেলে তাহা লইয়া আমরা আলোচনাও করিতাম। এই ধরনের পুস্তক ১৮৯৩ সালে আমি অনেক পড়িয়াছি। তাহার অনেকগুলির নাম আমার স্মরণ নাই। তাহার মধ্যে ডাক্তার পার্কারের 'সিটি টেম্পলের' টীকা, পিয়ার্সনের 'মেনি ইনফলিবল প্রুফস্' 'অনেক অভ্রান্ত প্রমাণ' প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল। শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে বাইবেলের ধর্ম সমর্থনের জন্য নানা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। আমার উপর এই গ্রন্থ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। পার্কারের টীকা নীতিবর্ধক গ্রন্থ। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের প্রচলিত মত সম্বন্ধে যাহার সন্দেহ আছে, এই গ্রন্থ হইতে তাহার সাহায্যলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। বাটলারের 'এনালজি' খুব গুরুত্বপূর্ণ কঠিন বই। বইটি বুঝিতে হইলে চার-পাঁচবার পড়া দরকার। নাস্তিককে আস্তিক করার জন্যই বইটি লিখিত বলা যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সব যুক্তি এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে আমার কোনও আবশ্যকতা ছিল না। কেন না এ সময় আমি নাস্তিক ছিলাম না। যীশুর অদ্বিতীয় অবতারত্বের সম্পর্কে এবং তাঁহার ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ হওয়ার সম্পর্কে যে সব যুক্তি উহাতে ছিল, তাহা আমার মনে কোনও ছাপ রাখিতে পারে নাই।

কিন্তু মিঃ কোটস পরাজয় স্বীকার করিবার লোক নন। তাঁহার ভালবাসার শেষ ছিল না। তিনি আমার গলায় বৈষ্ণবী কণ্ঠি দেখিলেন। তাঁহার কাছে এই কণ্ঠি কুসংস্কার বলিয়া মনে হইল ও ইহা দেখিয়া তিনি দুঃখ জানালেন। "এই কুসংস্কার আপনার শোভা পায় না। দিন ত, ছিঁড়িয়া ফেলি।"

"এই কণ্ঠি ছেঁড়া যায় না, মায়ের প্রসাদী যে।"

"কিন্তু আপনি কি উহা মানেন?"

"ইহার গূঢ় অর্থ আমি জানি না। ইহা না পরিলে আমার অনিষ্ট হইবে ইহাও আমি মানি না। কিন্তু যে মালা আমাকে মা আদর করিয়া পরাইয়াছেন, তাহা পরাই আমি শ্রেয়ঃ বলিয়া মানি। বিনা কারণে উহা আমি ত্যাগ করিতে পারি না। কালক্রমে যখন জীর্ণ হইয়া ছিঁড়িয়া যাইবে, তখন পুনরায় পরার আমার লোভ নাই। কিন্তু এ কণ্ঠি ছিঁড়িয়া ফেলা যায় না।"

মিঃ কোটস আমার যুক্তির মর্ম বুঝিতে পারিলেন না। কেন না আমার ধর্মে

তাঁহার কোনই আস্থা ছিল না। তিনি ত আমাকে অজ্ঞানতার গহ্বর হইতে টানিয়া তুলিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছিলেন। অন্য ধর্মে কিছু কিছু সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ণ সত্যস্বরূপ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করিলে আমার মোক্ষ নাই, যীশুর মধ্যস্থতা ছাড়া পাপ দূর হইতেই পারে না ও পুণ্য-কর্ম সমস্তই নিরর্থক—ইহাই তিনি আমাকে বুঝাইতেন। কোটস যেমন আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থ পড়িতে দিতেন, তেমনি যাঁহারা গোঁড়া খ্রীষ্টান বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের সহিতও আমাকে পরিচয় করাইয়া দিতেন। এই পরিচিতদের ভিতর "প্লাইমাউথ ব্রিদরেন" সম্প্রদায়ভুক্ত একটি খ্রীষ্টান পরিবারও ছিল।

মিঃ কোটসের দ্বারা যে সব লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম তাঁহাদের ভিতর অনেকগুলি লোককে ঈশ্বর-ভীরু—এই প্রকার মনে হইত। এই পরিবারটির সংস্পর্শে আসার পর তাঁহাদের একজন আমার সামনে যে যুক্তি তুলিয়া ধরিলেন তাহা এইরূপ—"আমাদের ধর্মের মহত্ত্ব আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। আপনার কথাতেই বুঝিতেছি, আপনাকে প্রতিদিন ক্ষণে ক্ষণে নিজের ভুলের সম্বন্ধে ভাবিতে হয়। অনুক্ষণ তাহার সংস্কার করিতে হয়, যদি পরিবর্তন না হয়, তবে আপনার অনুশোচনা করিতে হয়, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এই সকল কাজের দ্বারা আপনি কি করিয়া মুক্তি পাইবেন? আপনি শান্তি ত পাইবেন না। ইহা ত স্বীকার করেন যে, আমরা সকলেই পাপী। এইবার আমাদের মতের পরিপূর্ণতা দেখুন। আমাদের উন্নতি বা প্রায়শ্চিত্তের প্রচেষ্টা মিথ্যা। তবুও মুক্তি ত চাই। পাপের বোঝা কি করিয়া ঠেলিয়া ফেলিব? আমরা তাহা যীশুর উপর ফেলিয়া দিই। তিনি ঈশ্বরের একমাত্র নিষ্পাপ পুত্র। তিনিই বলিয়াছেন যে, যাহারা তাঁহাকে মানে তিনি তাহাদের পাপ ধুইয়া ফেলেন। তাহারা অবিনশ্বর জীবন লাভ করে। এইখানেই ত ঈশ্বরের অপার করুণা। যীশু দ্বারা এই মুক্তির ব্যবস্থাই আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। সেইজন্য আমাদের পাপ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপ ত হইবেই। এ জগতে নিষ্পাপ কে থাকিতে পারে? সেইজন্য যীশু সারা জগতের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। যাহারা তাঁহার মহান আত্মোৎসর্গ স্বীকার করিয়া লয়, তাহারাই অনন্ত শান্তির অধিকারী হইতে পারে। আপনার কত অশান্তি, আর আমাদের কি শান্তি!"

এই যুক্তি আমার কাছে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইল। আমি নম্রভাবে জবাব দিলাম—"সমগ্র খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃত খ্রীষ্টধর্ম যদি ইহাই হয়, তবে

আমার তাহাতে চলিবে না। আমি পাপের পরিণাম হইতে মুক্তি চাই না, আমি পাপ-বৃত্তি হইতে, পাপ-কর্ম হইতেই মুক্তি চাই। তাহা যতদিন না পাই, ততদিন আমার অশান্তিই আমার ভাল।”

প্লাইমাউথ ব্রাদার উত্তর দিলেন—“আমি জোর দিয়া বলিতেছি যে, আপনার প্রযত্ন নিষ্ফল, আমার কথা পুনরায় বিচার করিয়া দেখিবেন।”

এই ভাই যেমন বলিয়াছিলেন কাজেও তাহাই করিয়া দেখাইলেন। ইচ্ছাক্রমে নীতি-বিগর্হিত কাজ করিয়া তিনি আমাকে দেখাইলেন যে, তাঁহার মন তাহার দ্বারা বিচলিত হয় নাই।

কিন্তু সকল খ্রীষ্টান যে এইপ্রকার বিশ্বাস করেন না তাহা আমি পূর্বেও জানিতাম। মিঃ কোটস নিজে পাপকে ভয় করিয়া চলিতেন। তাঁহার হৃদয় নির্মম ছিল, তিনি হৃদয়-শুদ্ধির আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন। সেই ভগ্নীরাও এই প্রকারেরই ছিলেন। আমার হাতে যে সব পুস্তক আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ছিল অনুরাগের ভাবেই পরিপূর্ণ। তাই সম্প্রতি আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে মিঃ কোটস আমার সম্পর্কে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম—প্লাইমাউথ ব্রাদারের অনুচিত মত হইতে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে আমার ভ্রমাত্মক ধারণা হইবে না।

আমার মুশকিল সত্যসত্যই ছিল। কিন্তু তাহা এই ব্যাপার লইয়া নহে—তাহা বাইবেল ও তাহার প্রচলিত অর্থ লইয়া।

১২

ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয়

খ্রীষ্টানদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা আরও বেশী কিছু বলিবার পূর্বে সেই সময়কার অন্য অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক্।

দাদা আবদুল্লার যে স্থান ছিল নাতালে, শেঠ তৈয়ব হাজী খান মহম্মদের সেই স্থান ছিল প্রিটোরিয়াতে। তাঁহাকে বাদ দিয়া জনসাধারণের কোনও কাজ হইতে পারিত না। আমি প্রথম সপ্তাহেই তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইয়াছিলাম। আমি যে প্রিটোরিয়ার প্রত্যেক ভারতীয়ের সংস্পর্শে আসিতে চাই সে কথাও তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। ভারতীয়দের অবস্থা ভাল করিয়া

বুঝিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমার সকল কাজে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করি। তিনি খুশি হইয়া এই সাহায্য দিতে প্রস্তুত হইলেন।

আমার প্রথম কাজ হইয়াছিল—সমস্ত ভারতীয়কে এক সভায় সমবেত করিয়া, বর্তমান অবস্থার চিত্র তাঁহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা। শেঠ হাজী মহম্মদ হাজী জুসব, যাঁহার নামে আমার পরিচয়-পত্র ছিল, তাঁহার বাড়ীতে এই সভা আহ্বান করা হইল। তাহাতে প্রধানতঃ মেমন ব্যবসায়ীরাই উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিছু হিন্দুও ছিলেন। প্রিটোরিয়াতে অল্পসংখ্যক হিন্দুই বাস করিতেন।

ইহাই আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা বলা যায়। আমি সত্য সম্পর্কেই কিছু বলিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। ব্যবসার মধ্যে সত্যের স্থান নাই—এই কথাই আমি ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে শুনিয়া আসিতেছি। একথা আমি তখনও মানি নাই—আজও মানি না। ব্যবসা ও সত্য পরস্পর মিশ খায় না—এইরূপ যাঁহারা বলেন, এমন বন্ধু আজও আমার আছেন। তাঁহারা ব্যবসাকে রূঢ় বাস্তব ব্যাপার বলেন, আর সত্যকে বলেন ধর্ম। তাঁহাদের যুক্তিতে ব্যবসা এক বস্তু, আর ধর্ম অন্য বস্তু। ব্যবসার মত রূঢ় বাস্তব ব্যাপারে শুদ্ধ সত্য চলে না। সেইজন্য যথাশক্তি সত্য বলা বা করা তাঁহাদের মত। আমি আমার বক্তৃতায় দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। ব্যবসায়ীদের দুইটি কর্তব্যের কথা আমি বলি। যাঁহারা বিদেশে আসিয়াছেন তাঁহাদের দায়িত্ব, যাঁহারা দেশে থাকেন তাঁহাদের দায়িত্ব অপেক্ষা বেশী। কেন না এখানে অল্পসংখ্যক ভারতবাসীর চালচলন দ্বারাই কোটি কোটি ভারতবাসীর বিচার করা হইবে।

ইংরাজের চালচলনের তুলনায় ভারতীয়দের যে সকল ত্রুটি-গ্লানি আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। বিশেষ জোরের সঙ্গে বলিলাম যে—হিন্দু, মুসলমান, পারসী, খ্রীষ্টান, অথবা গুজরাটী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, কচ্ছী, সুরাটী ইত্যাদির মধ্যে ভেদের বা পার্থক্যের কথাটা ভুলিয়া যাওয়া কর্তব্য।

ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশা প্রতিকারের জন্য একটি সমিতি স্থাপনা করিয়া সংশ্লিষ্ট আমলার কাছে আবেদন জানানো আবশ্যক—এই প্রকার এক প্রস্তাব করিলাম এবং এই উদ্দেশ্যে যতটা সময় পারি বিনা বেতনে কাজ করিতে প্রস্তুত আছি, একথাও জানাইলাম।

সেখানে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিল। ব্যবসায়ীদের নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আবেদন নিবেদন অবশ্যই করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ক্ষীণকণ্ঠ কে শোনে?

ট্রান্সভালে ১৮৮৫ সালে কঠোর আইন পাস হইয়াছিল। ১৮৮৬ সালে এই আইনের কতকটা সংস্কার হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, ভারতবাসী মাত্রকেই তিন পাউণ্ড হিসাবে প্রবেশ-ফি দিতে হইবে। আরও স্থির হয় যে, কেবল তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই তাহারা জমি পাইতে পারিবে এবং তাহাও আবার মালিকী-স্বত্বে পাইবে না। ভোটের অধিকার তাহাদের অবশ্যই নাই। ইহা কেবল এশিয়াবাসীদের জন্যই বিশেষ নিয়ম। কিন্তু কালো লোকদের জন্য যে সকল নিয়ম আছে, তাহাও তাহাদের উপর প্রযোজ্য। এই আইন অনুসারে ভারতীয়দের সাধারণ 'ফুটপাথে'ও চলার অধিকার ছিল না। রাত্রি নয়টার পর লাইসেন্স ব্যতীত তাহারা বাহিরেও যাইতে পারিত না। এই শেষোক্ত আইন ভারতীয়দের উপর কম-বেশী প্রযুক্ত হইত। যাহারা আরব বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিত তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া ইহার ভিতর ফেলা হইত না। ছাড় দেওয়া পুলিসের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত।

এই উভয় নিয়মের প্রভাব আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই অর্জন করা হইয়াছিল। মিঃ কোটসের সঙ্গে অনেক সময় আমি সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইতাম। বাড়ী ফিরিতে রাত দশটাও বাজিত। যদি পুলিস আমাকে ধরে তবে? এই সংশয় ও আশঙ্কা আমার যত না হইত, কোটসের হইত তার চেয়েও বেশি। নিজের হাবসীদিগকে তিনি লাইসেন্স দিতেন। কিন্তু আমাকে কেমন করিয়া লাইসেন্স দিবেন? নিজের চাকরদের জন্যই মালিক লাইসেন্স দিতে পারেন। আমি যদি লইতে চাই, আর মিঃ কোটস যদি দিতেও চান, তবুও দেওয়া যায় না। কেন না তাহাতে ঠকানো হয়। আমাদের সঙ্গে তো প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ নহে।

সেইজন্য মিঃ কোটস অথবা তাঁহার কোনও বন্ধু আমাকে সরকারী উকিল ডাঃ ক্রাউজের কাছে লইয়া গেলেন। আমরা উভয়েই একই 'ইন' হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসিয়াছি। রাত নয়টার পর বাহিরে থাকার জন্য আমার লাইসেন্স চাই একথা তাঁহার অসহ্য বোধ হইল। তিনি আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে লাইসেন্স না দিয়া এক পত্র দিলেন। পত্রের অর্থ এই যে, আমি যখন খুশি বেড়াইতে পারিব। পুলিস আমার উপর হস্তক্ষেপ

করিতে পারিবে না। আমি বাহিরে যাইবার সময় এই পত্রখানা সর্বদাই আমার সঙ্গে রাখিতাম। উহা কখনো ব্যবহার করিতে হয় নাই। ইহাও কেবল আকস্মিক ব্যাপার মাত্র।

মিঃ ক্রাউজ আমাকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল—একথাও বলা চলে। কখন কখন তাঁহার ওখানে যাইতাম। তাঁহার বিখ্যাত ভাইয়ের সহিত তিনিই পরিচয় করাইয়া দেন। ইনি জোহানেসবর্গে পাবলিক-প্রসিকিউটর ছিলেন। বুয়ার-যুদ্ধের সময় ইংরাজ আমলাকে খুন করার জন্য তাঁহার কোর্ট মার্শালের বিচারে সাত বৎসরের জন্য জেলের আদেশ হয়। তাঁহার সনদ বেঞ্চাররা কাড়িয়া লন। যুদ্ধের পর তিনি জেল হইতে মুক্তি পান, এবং সম্মানের সঙ্গে ট্রান্সভালের আদালতে প্রবেশ করেন ও নিজ ব্যবসা আরম্ভ করেন। পরে জনসাধারণের কাজ করার সময় এই পরিচয় খুব কাজে লাগিয়াছিল।

ফুটপাথে চলার বিধি-নিষেধ আমার পক্ষে কিছু গুরুতর ব্যাপারে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি রোজই প্রেসিডেণ্ট স্ট্রীটের এক খোলা ময়দানে বেড়াইতে যাইতাম। এই মহল্লায় প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের বাড়ী ছিল। তাঁহার বাড়ীর চেহারাতে কোনও রকমের আড়ম্বর ছিল না। বাড়ীতে বেড়াইবার কম্পাউণ্ড পর্যন্ত ছিল না। অন্য প্রতিবেশীর বাড়ীর সহিত এই বাড়ীর কোনও তফাতই দেখা যাইত না। এ বাড়ী অপেক্ষা অনেক বড় ও সাজানো-গোছানো বাগানওয়ালা বাড়ী এই প্রিটোরিয়াতেই বহু লক্ষপতির ছিল। প্রেসিডেণ্ট তাঁহার সাদাসিধা চালচলনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বাড়ীর সামনে এক সিপাহী ঘুরিত বলিয়া এই বাড়ীটি যে কোনও সরকারী আমলার তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। সিপাহীর গা ঘেঁষিয়া আমি প্রত্যহই এই রাস্তা দিয়া যাইতাম। সিপাহী আমাকে কিছু বলিত না। সিপাহী মধ্যে মধ্যে বদলায়। একদিন এক সিপাহী সাবধান না করিয়াই এবং ফুটপাথ হইতে নামিয়া যাইতে না বলিয়াই আমাকে ধাক্কা মারিল, লাথি দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল। মিঃ কোটস তখন ঘোড়ায় চড়িয়া ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। লাথি মারার কারণ আমি জিজ্ঞাসা করিতে যাইব, তাহার পূর্বেই তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"গান্ধী, আমি সমস্তই দেখিয়াছি। আপনি নালিশ করিলে আমি সাক্ষ্য দিব। আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে যে, আপনার উপর এই জুলুম হইল।"

আমি বলিলাম—"ইহাতে দুঃখের কারণ নাই, সিপাই বেচারা কি জানে!

তাহার কাছে কালা ত কালাই! সে নিগ্রোদের সঙ্গে এইরকম ব্যবহারই করিয়া থাকে। সেইজন্য আমাকেও ধাক্কা মারিয়াছে। আমি নিয়ম করিয়াছি যে, ব্যক্তিগত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আদালতে যাইব না। সেইজন্য আমি মামলা করিব না।"

"আপনার স্বভাবের উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। তবুও পুনরায় চিন্তা করিয়া দেখিবেন। এইসব লোককে কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার।" অতঃপর সেই সিপাহীর সহিত কথা বলিয়া তিনি তাকে ধমকাইলেন। আমি সকল কথা বুঝিতে পারিলাম না। সিপাহীটি ছিল ডচ। সুতরাং তাহার সহিত ডচ ভাষাতেই কথা হইয়াছিল। সিপাহী আমার নিকট মাফ চাহিল।

মাফ চাহিবার পূর্বেই আমি তাহাকে মাফ করিয়াছিলাম।

সেই হইতে আমি সে রাস্তা ত্যাগ করিলাম। অন্য সিপাহী এই ঘটনার খবর কি জানিবে? আবার ইচ্ছা করিয়া লাথি কেন খাইব? সেইজন্য আমি বেড়াইতে যাওয়ার অন্য রাস্তা বাছিয়া লইলাম।

এই ঘটনা ভারতীয়দের জন্য আমার অনুভূতিকে আরও তীব্র করিল। এই ধারা সম্বন্ধে ব্রিটিশ এজেণ্টের সঙ্গে আলোচনা করিয়া, প্রয়োজন হইলে এক 'টেস্ট-কেস' করার কথা ভারতীয়দের বলিলাম।

এই প্রকারে ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্গতির কথা কেবল পড়িয়া-শুনিয়া নহে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারাও ভাল করিয়া জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি দেখিলাম—যেসব ভারতবাসী আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলাফেরা করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা উপযুক্ত স্থান নহে। এই অবস্থার কি করিয়া পরিবর্তন হয়, সেজন্য আমার মন খুব বেশী করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু এখন আমার প্রধান কর্তব্য দাদা আবদুল্লার মামলার দিকে মনোযোগ দেওয়া।

১৪
মামলা তৈরী

প্রিটোরিয়ায় যে এক বৎসর কাটাইলাম উহা আমার নিকট অমূল্য। আমার জনসাধারণের জন্য কাজ করার শক্তির পরিমাপ এইখানে কতকটা পাইলাম। ঐ কাজের জন্য শিক্ষাও এইখানে পাইয়াছিলাম। এইস্থানেই ধর্ম-চিন্তা আমার তীব্র হইতে থাকে। সত্যিকার ওকালতী আমি এইখানেই শিক্ষা করিলাম—

একথাও বলা যায়। নূতন ব্যারিস্টার পুরাতন ব্যারিস্টারের অফিসে থাকিয়া যাহা শিক্ষা করে, তাহাও আমি এইখানেই শিখিলাম। ওকালতী করিতে আমি যে একেবারে অপটু নই এই বিশ্বাস আমার এইখানেই আসিল। ভাল উকীল হওয়ার ভিতর যে রহস্য আছে তাহার সন্ধানও আমি এইখানেই পাইলাম।

দাদা আবদুল্লার কেস ছোট ছিল না। দাবি ছিল ৪০,০০০ পাউণ্ড অথবা ছয় লক্ষ টাকার। যে ব্যবসা সম্পর্কে এই মোকদ্দমা তাহার হিসাব জটিল। দাবির কতকটা অংশ নির্ভর করিতেছিল প্রমিসরী নোট দেওয়ার উপর, আর কতকটা অংশ নির্ভর করিতেছিল প্রমিসরী নোট দেওয়ার অঙ্গীকার পালন করার উপর। প্রতিপক্ষের জবাব এই ছিল যে, প্রমিসরী নোট ফাঁকি দিয়া লওয়া হইয়াছে, এবং তাহার পুরা মূল্য পাওয়া যায় নাই। এই অবস্থায় আইনের জটিলতা অনেক ছিল, হিসাবের জটিলতাও খুব ছিল।

উভয় পক্ষই বড় বড় ব্যারিস্টার ও সলিসিটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই জন্য এই উভয় কাজেরই অভিজ্ঞতা লাভ করার সুন্দর অবকাশ পাইলাম। বাদীর পক্ষ হইতে সলিসিটরের জন্য মামলা তৈরী করার ও অবস্থা বুঝার সম্পূর্ণ ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। ইহা হইতেই সলিসিটর মামলা তৈরীতে কি অংশগ্রহণ করে, আবার ব্যারিস্টার তাহার কতকটা ব্যবহার করে তাহা আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই মামলা তৈরী করা হইতেই, আমার বুঝিবার শক্তি ও সাজানোর শক্তি কতটা আছে তাহার পরিচয়ও আমি ভাল রকমই পাইব।

মামলার দিকে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। আমি উহাতে তন্ময় হইয়া গেলাম। পূর্বাপর সমস্ত কাগজপত্র পড়িয়া লইলাম। মক্কেলের বিশ্বাস ও কুশলতার শেষ ছিল না। সেইজন্য আমার কাজ খুব সহজ হইয়াছিল। কিভাবে হিসাব রাখিতে হয়, আমি তা অল্প-অল্প শিখিয়া লইয়াছিলাম। অনেক গুজরাটী কাগজপত্র ছিল, তাহার অনুবাদ আমাকেই করিতে হইত। সেই জন্য অনুবাদ করার শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

পরিশ্রম খুব হইত। পূর্বে যে ধর্ম-আলোচনা ও জনসাধারণের কাজের কথা বলিয়াছি উহাতেও আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহা হইলেও এখন ঐ সকল আমার কাছে গৌণ ছিল। মামলা তৈরী করাকেই আমি সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছিলাম। সেজন্য আইন পুস্তক বা অন্য যাহা কিছু পড়া দরকার তাহা পূর্বেই পড়িয়া শেষ করিয়া রাখিতাম। অবশেষে মামলার ঘটনার উপর আমার

এমন অধিকার জন্মিল যে, তেমন অধিকার বাদী প্রতিবাদীরও ছিল না। কেন না আমার কাছে উভয় পক্ষেরই কাগজপত্র ছিল।

পরলোকগত মিঃ পিস্কাটের কথা আমার মনে হইল। পরে দক্ষিণ আফ্রিকার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার পরলোকগত মিঃ লিওনার্ডও প্রসঙ্গক্রমে সেই কথারই সমর্থন করিয়াছিলেন। মিঃ পিস্কাট বলিতেন—"আইনের তিন চতুর্থাংশ হইতেছে ঘটনা।" একবার একটি মামলায় আমি দেখিতে পাই যে, ন্যায় আমার মক্কেলের দিকে আছে, কিন্তু আইন তাহার বিরুদ্ধে যাইতেছে। আমি নিরাশ হইয়া মিঃ লিওনার্ডের সাহায্য গ্রহণ করি। ঘটনার দিক দিয়া ঐ মামলা তাঁহার নিকট ভাল মনে হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"মিঃ গান্ধী, আমি একটা জিনিস শিখিয়াছি; যদি ঘটনাগুলির উপর ঠিকমত দখল থাকে তবে আইন উহার সহিত আপনিই আসিয়া পড়ে। সর্বাগ্রে মামলার ঘটনাগুলির ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে আবার মামলার ঘটনাগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া পরে আসিতে বলিলেন। নূতন করিয়া আবার ঘটনার ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা করায়, আমি উহাতে নূতন আলোর রেখা দেখিতে পাইলাম। উহার অনুরূপ একটি মামলা দক্ষিণ আফ্রিকার পুরানো মামলার মধ্যেও খুঁজিয়া পাইলাম। আমি উৎফুল্ল হইয়া মিঃ লিওনার্ডের নিকট গেলাম। তিনিও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"দেখুন আমাদের এই মামলা জিতিতে হইবে। কোন্ জজ বেঞ্চে বসেন তাহার দিকেও খেয়াল রাখিতে হইবে।"

দাদা আবদুল্লার মামলা তৈরী করার সময় ঘটনাবলীর এই মহিমা এমনভাবে আমার কাছে ধরা পড়ে নাই। ঘটনা অর্থাৎ সত্য। এই সত্যকে যদি ধরিয়া থাকি, তবে আইন নিজেই আসিয়া সাহায্যের হাত প্রসারিত করিবে।

আমি এই মামলার শেষ পর্যন্ত গিয়া দেখিলাম যে, আমার মক্কেলের পক্ষে যুক্তি খুব জোরালো। আইন তাঁহারই দিকে সাহায্য করিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিলাম যে মামলায় যাঁহারা লড়িতেছেন তাঁহারা উভয়েই আত্মীয় এবং একই শহরের বাসিন্দা এবং ইহাতে তাঁহাদের উভয়েরই দুঃখ হইবে। মামলা যে কবে শেষ হইবে বলা যায় না। আদালতে যদি মামলা থাকে তবে যত দীর্ঘদিন ইচ্ছা চালানো যায়। মামলা দীর্ঘ হইলে দু'পক্ষের একজনেরও লাভ নাই। উভয়েরই সেই জন্য ইচ্ছা ছিল—মামলা যাহাতে শীঘ্র শেষ হয় তাহার চেষ্টা করা।

তৈয়ব শেঠকে আমি অনুরোধ করিলাম, আপসে মিটাইয়া ফেলার জন্য পরামর্শ দিলাম। উভয়েই বিশ্বাস করিতে পারেন—এমন সালিশের হাতে যদি মামলা ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে শীঘ্রই মিটিয়া যায়। উকীলের খরচ এত বেশী হইতেছিল যে, তাহাতে বড় ব্যবসায়ীও ডুবিয়া যায়। দুইজনেই এই মামলার জন্য এত চিন্তিত ছিলেন যে, স্থির হইয়া অন্য কোনও কাজ করিতে পারিতেছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে দুই পক্ষে বৈরী ভাবও বৃদ্ধি পাইতেছিল। ওকালতী ব্যবসার উপরেও আমার ঘৃণা আসিতেছিল। উভয় পক্ষের উকীলেরাই নিজ নিজ পথে জয়লাভের জন্য আইন খুঁজিয়া বাহির করিতেছিলেন এবং মক্কেলকে তদনুসারে পরামর্শ দিতেছিলেন। যে জয়লাভ করে সেও যে কখনও মামলার সমস্ত খরচ উঠাইয়া লইতে পারে না, এই সত্য আমি এই মামলাতেই প্রথম দেখিলাম। মামলার কোন পক্ষের কাছ হইতে কোর্ট যে ফী গ্রহণ করে, সে একরকমভাবে কোর্ট দ্বারা নির্দিষ্ট। কিন্তু মক্কেল ও উকীলের মধ্যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি ফীর ব্যবস্থা আছে। এসকল আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমার মনে হইল যে, উভয়ের ভিতর আত্মীয়তা ফিরাইয়া আনা—দুই আত্মীয়কে মিলাইয়া দেওয়াই আমার ধর্ম। আমি মিটাইয়া ফেলিবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। তৈয়ব শেঠ রাজী হইলেন। অবশেষে সালিশ নিযুক্ত হইল। সালিশের নিকট দাদা আবদুল্লা জিতিলেন।

কিন্তু ইহাতেও আমার তৃপ্তি হইল না। যদি সালিশের রায় তখনই কার্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে তৈয়ব হাজী খান মহম্মদের এত পয়সা নাই যে, তিনি সব দিতে পারেন। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী পোরবন্দর-মেমনদের এক অলিখিত নিয়ম ছিল যে, প্রাণ দিবে সে-ও ভাল, তথাপি দেউলিয়া হইবে না। তৈয়ব শেঠ ৩৭,০০০ পাউণ্ড একেবারে বাহির করিয়া দিতে পারিবেন না। রাস্তা মাত্র একটিই ছিল—দাদা আবদুল্লা যদি অর্থ ধীরে ধীরে পরিশোধ করার সময় দেন। সালিশ নিযুক্ত করিতে আমার যত না শ্রম করিতে হইয়াছিল, এই আদায়ের মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়ার জন্য রাজী করিতে আমার তদপেক্ষা অধিক বেগ পাইতে হইল। উভয় পক্ষই রাজী হইলেন। উভয়েরই প্রতিষ্ঠা বাড়িল।

আমার আনন্দের অবধি রহিল না। আমি সত্যকার ওকালতী শিখিলাম। আমি মানুষের ভাল দিক দেখিতে শিখিলাম এবং মানুষের

হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করিতে শিখিলাম। আমি দেখিলাম যে, উকীলের কাজ উভয় পক্ষের ভিতর বিচ্ছেদ দূর করা। এই শিক্ষা আমার মনে এমন বদ্ধমূল হইল যে, আমার বিশ বৎসরের ওকালতীর ভিতর অধিকাংশ সময়ই, অফিসে বসিয়া শত শত মামলার বাদী প্রতিবাদীর ভিতর মিটমাট করিতেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাহাতে আমি কিছুই হারাই নাই। আত্মা ত হারাই নাই-ই—অর্থক্ষতি যে হইয়াছে একথাও বলা যায় না।

১৫

ধর্মোচ্ছ্বাস

এখন খ্রীষ্টান বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচার করার সময় আসিয়াছে।

আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মিঃ বেকারের চিন্তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি আমাকে ওয়েলিংটন সম্মেলনে (কন্‌ভেনশন) লইয়া গেলেন। কয়েক বৎসর পর পর প্রটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টানেরা ধর্ম-জাগৃতি বা আত্মশুদ্ধির জন্ম মিলনের ব্যবস্থা করিতেন। ইহাকে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা ধর্মের পুনরুদ্ধার—এই নামে অভিহিত করা যায়। ওয়েলিংটন সম্মেলন এই ধরনেরই একটি সম্মেলন ছিল। মিঃ বেকার আশা করিয়াছিলেন যে, এই সম্মেলনের ধর্ম-জাগৃতির আবেষ্টন, ইহাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের ধর্মোৎসাহ, তাঁহাদের সরল হৃদয় আমার উপর এমন গভীর ছাপ ফেলিবে যে, আমি আর খ্রীষ্টান না হইয়া থাকিতে পারিব না।

কিন্তু মিঃ বেকারের শেষ ভরসা ছিল প্রার্থনার শক্তির উপর। প্রার্থনার উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত প্রার্থনা ঈশ্বর নিশ্চয়ই শোনেন। মিঃ মূলার (একজন খ্যাতনামা ভক্ত খ্রীষ্টান) নিজের বৈষয়িক কর্মেও প্রার্থনা দ্বারা পরিচালিত হইতেন। মিঃ মূলারের এই দৃষ্টান্ত তিনি আমাকে দিতেন। আমি খুব নীরব ও নির্বিকার থাকিয়া প্রার্থনা সম্বন্ধে তাঁহার কথা শুনিতাম। আমি তাঁহাকে এই আশ্বাসও দিতাম যে, যদি খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য হৃদয় হইতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে অন্য কোনও বাধা আমাকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে বিরত করিতে পারিবে না। অন্তরের আহ্বানের অধীন হওয়ার শিক্ষা আমি কয়েক বৎসর পূর্বেই লাভ করিয়াছি। উহার অধীন হইতে আমার মনে আনন্দ আসিত। উহার বিরুদ্ধে যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন ও দুঃখদায়ক ছিল।

আমরা ওয়েলিংটনে গেলাম। আমার ন্যায় 'কালো সাথী'কে সঙ্গে লওয়ার জন্য মিঃ বেকারকে মুশকিলে পড়িতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ আমার জন্য অনেক সময় তাঁহাকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। মিঃ বেকার রবিবার পথ চলিতেন না। সেইজন্য যাওয়ার সময় পথে একটা রবিবার পড়ায়, রাস্তাতেই আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। স্টেশনের হোটেলের অনেক হাঙ্গামার পর আমাকে ঢুকানো হইল। কিন্তু সেখানকার ভোজন-গৃহে আমাকে প্রবেশ করিতে দিতে হোটেল-ওয়ালা রাজী হইল না। মিঃ বেকারও সহজে ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি হোটেলের অতিথির অধিকার দাবি করিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহার অসুবিধা আমার অজ্ঞাত রহিল না। ওয়েলিংটনে তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন। সেখানেও তাঁহাকে এজন্য কতকগুলি ছোটখাটো অসুবিধায় পড়িতে হয়। অসুবিধাগুলি তিনি গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেগুলি আমার কাছে ধরা পড়িয়াছিল। সম্মেলনটি ছিল ভক্ত খ্রীষ্টানদের একটি মিলন ক্ষেত্র। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। রেভারেণ্ড মারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার জন্য অনেকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কতকগুলি ভজন আমার কাছে ভারি মিষ্টি লাগিয়াছিল।

সম্মেলন তিন দিন ছিল। সম্মেলনে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের ধর্মভাব আমি বুঝিতেছিলাম ও অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু তাহাতে আমার ধর্মমত পরিবর্তন করার কারণ পাইলাম না। আমি নিজেকে খ্রীষ্টান না বলিলে স্বর্গে যাইতে পারিব না, মোক্ষ পাইব না—এমন কথা আমার মন আমাকে বলিল না। কথাটা আমি আমার কয়েকজন সাধু খ্রীষ্টান বন্ধুকেও বলিয়াছিলাম এবং তাঁহারা তাহাতে আঘাতও পাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি নাচার।

আমার অসুবিধার মূল কারণ ছিল গভীরতর। 'যীশুখ্রীষ্টই একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র, তাঁহাকে যে মানে সে-ই উদ্ধার পায়'—এ কথা আমি গ্রহণ করিতে পারি না। মানুষ যদি ঈশ্বরের পুত্র হয়, তবে আমরা সকলেই তাঁহার পুত্র। যীশু যদি ঈশ্বর-সম হ'ন—ঈশ্বর হ'ন, তবে মানুষমাত্রই ঈশ্বর-সম—ঈশ্বর হইতে পারে। যীশু মৃত্যু দ্বারা ও তাঁহার রক্ত দ্বারা জগতের পাপ ধৌত করিয়া গিয়াছেন, অক্ষরে অক্ষরে একথা মানিতে আমার বুদ্ধি প্রস্তুত নহে। রূপক হিসাবেই উহা সত্য। আবার খ্রীষ্টানরা মানেন যে—কেবল মানুষেরই আত্মা আছে। অন্য জীবের নাই, এবং দেহের বিনাশের সঙ্গেই তাহাদের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়।

এ কথার সঙ্গেও আমার মত মিলে না। যীশুকে একজন ত্যাগ-পূত মহানুভব ধর্মগুরু বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারি। এ কথা স্বীকার করি যে, যীশুর মৃত্যুতে জগৎ একটা বড় মহৎ দৃষ্টান্ত পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কোনও অভূতপূর্ব বা রহস্যময় প্রভাব আছে, ইহা আমার হৃদয় স্বীকার করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টানদের পবিত্র জীবন হইতে আমি এমন কিছু পাই নাই, যাহা অন্য ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র জীবন হইতে পাওয়া যায় না। তাহাদের জীবনে যে পরিবর্তন দেখা যায় সেরূপ পরিবর্তন অপরের জীবনেও আমি দেখিয়াছি। তত্ত্বের দিক দিয়াও খ্রীষ্টধর্ম তত্ত্বের ভিতর কোনও অসাধারণত্ব নাই। ত্যাগের দৃষ্টিতে দেখিলে হিন্দুধর্মই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে হয়। আমি খ্রীষ্টধর্মকে পূর্ণ ধর্ম অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইলে খ্রীষ্টান বন্ধুদের কাছে আমি এই হৃদয়োচ্ছ্বাসের কথা ব্যক্ত করিয়া থাকি। কিন্তু ইহার সন্তোষজনক জবাব তাঁহাদের নিকট হইতে পাই নাই।

তথাপি আমি খ্রীষ্টধর্মের পূর্ণতা যেমন স্বীকার করিতে পারি নাই, তেমনি হিন্দুধর্মের পূর্ণত্বের বিষয় অথবা তাহার সর্বশ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ও আমি তখন স্থির করিতে পারি নাই। হিন্দুধর্মের ত্রুটি আমার দৃষ্টির সম্মুখে পীড়াদায়ক ভাবে দেখা দিত। যদি অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অঙ্গ হয় তবে উহা গলিত অঙ্গ, অথবা ত্যাজ্য অঙ্গ। অতগুলি বর্ণ এবং জাতির অস্তিত্বের অর্থ আমি বুঝিতে পারিতাম না। বেদ ঈশ্বর প্রণীত ইহার মানে কি? বেদ যদি ঈশ্বর প্রণীত হয়, তবে বাইবেল-কোরাণও নয় কি?

যেমন খ্রীষ্টান বন্ধুরা আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টিত ছিলেন, মুসলমান ভাইয়েরাও তেমনি চেষ্টা করিতেছিলেন। আবদুল্লা শেঠ আমাকে ইসলাম ধর্মপুস্তকে মনোনিবেশ করিতে প্রভাবিত করিতেন। উহার সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁহারও অনেক কিছু বলার ছিল।

আমি আমার কঠিন অবস্থার কথা রায়চাঁদ ভাইকে জানাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতদের সঙ্গেও পত্র ব্যবহার করি। তাঁহাদের জবাবও পাই। রায়চাঁদ ভাইয়ের পত্রে কতকটা শান্তি পাইলাম। তিনি আমাকে ধৈর্য রাখিতে ও হিন্দুধর্ম গভীরভাবে অনুশীলন করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার একটি কথার ভাবার্থ এই প্রকার ছিল—

"হিন্দুধর্মের মধ্যে যে গূঢ় বিচারসমূহ আছে, আত্মার প্রতি যে দৃষ্টি

রহিয়াছে, যে দয়া রহিয়াছে, তাহা অন্য ধর্মে নাই। পক্ষপাতহীন বিচার করিয়া আমার ইহাই বিশ্বাস হইয়াছে।" আমি সেলের কোরাণের অনুবাদ ক্রয় করিয়া তাহা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ইসলাম-ধর্ম সম্পর্কিত অন্য পুস্তকও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বিলাতের খ্রীষ্টান বন্ধুদের সঙ্গেও পত্রালাপ করিলাম। তাঁহাদের মধ্যে একজন মিঃ এডওয়ার্ড মেইটল্যাণ্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার সহিত পত্রালাপ চলিল। তিনি আনা কিংসফোর্ডের সঙ্গে মিলিয়া 'পারফেক্ট ওয়ে' বা 'শুদ্ধমার্গ' নামক যে বই লিখিয়াছিলেন, তাহা আমাকে পড়িবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের কোন কোন মতামত তাহাতে খণ্ডন করা হইয়াছে। 'বাইবেলের নূতন অর্থ' নামক পুস্তকখানাও তাঁহারা আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। এই পুস্তকগুলি আমার ভাল লাগিল। এগুলি হইতে হিন্দুধর্মের সমর্থন পাইলাম। টলস্টয়ের 'দি কিংডম অফ গড ইজ উইদিন ইউ' বা 'বৈকুণ্ঠ তোমার হৃদয়ে' পুস্তকখানা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। উহার ছাপ আমার হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল। এই পুস্তকের স্বাধীন চিন্তাধারা, ইহার গভীর নীতি, ইহার সত্যের তুলনায় মিঃ কোটস্ প্রদত্ত সমস্ত বই শুষ্ক মনে হইল।

এই ধরনের পড়াশোনা আমাকে খ্রীষ্টান বন্ধুদের অনভিপ্রেত পথেই লইয়া গেল। এডওয়ার্ড মেইটল্যাণ্ডের সঙ্গে আমার পত্রালাপ দীর্ঘ দিন চলিয়াছিল; কবি রায়চাঁদ ভাইয়ের সঙ্গেও তাঁহার অন্তিমকাল পর্যন্ত পত্রালাপ চলে। তিনি কতকগুলি পুস্তক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি পড়িয়াছিলাম। এই গ্রন্থগুলির ভিতর, পঞ্চীকরণ, মণিরত্নমালা, যোগবাশিষ্ঠের 'মুমুক্ষু প্রকরণ', হরিভদ্র সুধীর 'ষড়দর্শন সমুচ্চয়' ইত্যাদি ছিল।

যদিও আমি খ্রীষ্টান মিত্রদের অনভিপ্রেত পথে চলিয়া গেলাম, তাহা হইলেও তাঁহাদের সহিত মিশিবার ফলে আমার ভিতরে যে ধর্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার জন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরঋণী থাকিব। তাঁহাদের সাহচর্যের স্মৃতি সর্বদাই আমার মনের ভিতর জাগরূক আছে। পরবর্তীকালে এই মধুর সম্পর্ক নিবিড়তর হইয়া উঠিয়াছিল—কমে নাই।

১৬

কে জানে কাল কি হবে

পলের ঠিকানা নাই এই ভবে,
বুঝ মন, কে জানে কাল কি হবে।

মামলা শেষ হইয়া গেল। প্রিটোরিয়ায় থাকার আর প্রয়োজন রহিল না। আমি ডারবানে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে আসিয়া ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আবদুল্লা শেঠ আমাকে অভিনন্দন না জানাইয়া ছাড়িয়া দিবেন না। তিনি সিডেনহামে আমার জন্য এক বিদায় সভার আয়োজন করিলেন।

আমার কাছে কতকগুলি সংবাদপত্র পড়িয়াছিল। সেগুলি আমি দেখিতেছিলাম। তাহার এক কোণে আমি ছোট একটা বিজ্ঞপ্তি দেখিলাম। শিরোনামা ছিল "ইণ্ডিয়ান ফ্রেঞ্চাইজ"—উহার অর্থ "ভারতীয়দের ভোটের অধিকার।" বিজ্ঞপ্তির মর্ম এই যে, ভারতীয়দের নাতালের ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য মনোনয়ন করার যে অধিকার ছিল, তাহা রদ করা। এই বিষয়ে একটি বিল ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইতেছিল। আমি এই বিলের কথা জানিতাম না। সভায় যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেউই এই অধিকার প্রত্যাহারের বিষয় কোনই খবর রাখিতেন না।

আমি আবদুল্লা শেঠকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—"এ সব খবর আমরা কি জানি? যখন আমাদের ব্যবসার উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়ে, তখনই আমরা জানিতে পারি। দেখুন না, অরেঞ্জ-ফ্রী-স্টেটে আমাদের ব্যবসার মূলেই কুঠারাঘাত করা হইল। উহার জন্য আমরা আন্দোলন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। খবরের কাগজে যাহা পড়ি সে কেবল বাজার দর দেখিবার জন্য। আইন-কানুনের কথা আমরা কি জানি? আমাদের চোখ কান—আমাদের গোরা উকিল।"

"কিন্তু এখানে জন্মিয়াছে ও ইংরাজী জানে এমন যুবকরা যদি ভারতবাসীদের আপনার করিয়া লয়, তবে কেমন হয়?"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আরে ভাই" আবদুল্লা শেঠ কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, "তাহাদের কাছে কি পাত্তা পাওয়া যাইবে? সে বেচারারা আমাদের কি বুঝিবে? তাহারা আমাদের কাছ দিয়াও আসে না। সত্য বলিতে কি, আমরাও তাহাদের

পরিচয় রাখি না। তাহারা খ্রীষ্টান বলিয়া গোরা পাদরীদের হাতের মুঠার মধ্যে। গোরা পাদরীরা আবার সরকারের বশীভূত।"

আমার চোখ খুলিল। এই শ্রেণীকে আমাদের আপনার জন করিয়া লইতে হইবে। খ্রীষ্ট ধর্মের কি এই অর্থ? তাহারা খ্রীষ্টান বলিয়াই কি দেশ হইতে পৃথক? তাহারা কি বিদেশী হইয়া গিয়াছে?

কিন্তু আমি দেশে ফিরিতেছি, তাই উপরের চিন্তাধারা ব্যক্ত করিলাম না। আবদুল্লা শেঠকে বলিলাম :—

"কিন্তু এই আইন যদি কোন দিন পাস হয়, তাহা হইলে আপনাদের পক্ষে বড়ই কঠিন হইবে। ইহা ভারতীয়দের অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ। ইহাতে আমাদের আত্মসম্মানেরও হানি আছে।"

"তাহা হইতে পারে। কিন্তু আপনাকে আমি এই ভোটের (ফ্রেঞ্চাইজ) ইতিহাস বলি। আমরা ইহার কিছুই বুঝি না। আমাদের বড় উকিল মিঃ এসকম্বকে আপনি জানেন। তিনি জবর লড়িয়ে। তাঁহার এবং এখানকার ইঞ্জিনীয়ারের মধ্যে খুব লড়াই চলিতেছিল। মিঃ এসকম্ব-এর ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের ব্যাপারও এই লড়াই-এর মধ্যে আসিয়া পড়ে। মিঃ এসকম্ব আমাদিগকে আমাদের অধিকারের কথা বলেন। তাঁহার কথা মত আমাদের নাম আমরা ভোটার তালিকায় লিখিয়া দেওয়াই ও সমস্ত ভোট তাঁহাকে দিই। আপনি ত দেখিতেই পাইতেছেন যে, এই অধিকারের মূল্য আপনি আজ যাহা দিতেছেন আমরা তাহা দিই নাই। কিন্তু আপনি এখন বলিতেছেন বলিয়া আমরা বুঝিতেছি। ভাল, আপনি এ বিষয় কি পরামর্শ দেন?"

অন্য আগন্তুকেরা এই কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন—"আমি আপনাকে সত্য কথা বলিব? যদি আপনি এই স্টীমারে যাওয়া বন্ধ করেন ও মাসখানেক থাকেন তবে আপনি যেমন বলিবেন আমরা তেমনি ভাবেই লড়িতে পারি।"

অপর একজন বলিয়া উঠিলেন,—"খাঁটি কথা। আবদুল্লা শেঠ, আপনি গান্ধী ভাইকে আটকাইয়া রাখুন।"

আবদুল্লা শেঠ ওস্তাদ লোক। তিনি বলিলেন—"এখন উহাকে আটকাইবার আমার অধিকার নাই; অথবা আমারও যেমন আপনাদেরও তেমনি অধিকার আছে। কিন্তু আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক। আপনারা সকলে মিলিয়া উহাকে ঠেকাইয়া রাখুন। উনি কিন্তু ব্যারিস্টার,

সুতরাং উঁহার ফীর কি হইবে ?”

ফীর কথায় আমি ব্যথিত হইলাম ; আমি মাঝখানে বলিলাম—

“আবদুল্লা শেঠ, ইহাতে ফীর কথাই থাকিতে পারে না। জনসেবাতে ফী আবার কি ? আমি যদি থাকিয়া যাই তবে এক সেবক হিসাবেই থাকিয়া যাইতে পারি। এই ভাইদের সকলকে আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আপনারা যদি সকলে পরিশ্রম করিতে স্বীকার করেন, তবে আমি একমাস থাকিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। ইহাও ঠিক যে, যদিও আপনাদের আমাকে কিছু দিতে হইবে না, তথাপি এই কাজ বিনা পয়সায় হইবে না। আমাদের তারবার্তা পাঠাইতে হইবে, অনেক কিছু ছাপাইতে হইবে। যাতায়াতের গাড়ীভাড়া লাগিবে। কখনো আমাদের স্থানীয় উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে। আমি এখানকার আইন জানি না, অনুসন্ধানের জন্য আইনের বই কিনিতে হইবে। আর এ কাজ এক হাতে হয় না। আমাকে সাহায্য করার জন্য অনেক লোকের দরকার হইবে।”

এক সঙ্গে অনেকে বলিয়া উঠিলেন—“ঈশ্বর পরম করুণাময়। পয়সা আসিয়া পড়িবে। লোকও আছে। আপনি থাকা স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইল।”

বিদায় সভা এইভাবে কার্যকরী সমিতিতে পরিণত হইল। আমি খাওয়া দাওয়া তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ঘরে ফিরিতে বলিলাম। লড়াই-এর ছবি আমি মনে মনে আঁকিতে লাগিলাম। ভোট দিবার অধিকার কাহাদের আছে জানিয়া লইলাম। আমি একমাস থাকিয়া যাওয়া স্থির করিলাম।

এইভাবে ঈশ্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার স্থায়ীবাসের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং আত্মসম্মানের জন্য লড়াই করার বীজ বপন করিলেন।

১৭

নাতালে থাকিয়া গেলাম

১৮৯৩ সালে নাতালে শেঠ হাজী মহম্মদ হাজী দাদা ভারতবাসী সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য নেতা ছিলেন। ধনাঢ্য হিসাবে শেঠ আবদুল্লা হাজী আদম প্রধান ছিলেন। কিন্তু তিনি ও অন্যান্য সকলে জন-সেবার কাজে শেঠ হাজী মহম্মদকেই প্রধান স্থান দিতেন। সেই জন্য তাঁহার সভাপতিত্বে আবদুল্লা শেঠের বাড়ীতে এক সভা আহূত হইল। উহাতে ভোটাধিকার বিলের বিরোধিতা

করা স্থির হইল। স্বেচ্ছাসেবক ভর্তি করা হইল। নাতালে যে ভারতীয়দের জন্ম হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতীয় খ্রীষ্টান যুবকদিগকে এই সভায় আহ্বান করা হইয়াছিল। মিঃ পল ডারবানে আদালতের দোভাষী এবং মিঃ সুএন গডফ্রে মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রভাব বশতঃ ঐ সম্প্রদায়ের অনেক যুবক সভায় আসিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইলেন। ব্যবসায়ীদেরও অনেকেই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন—শেঠ দাউদ মহম্মদ, মহম্মদ কাসম কমরুদ্দীন, শেঠ আদমজী মিঞা খাঁ, এ. কোলেন্দভেলু পিলে, সি. লক্ষ্মীরাম, রঙ্গস্বামী পড়িয়াচি এবং আমদজীভা। পারসী রুস্তমজী ত ছিলেনই। কেরানীদের মধ্য হইতে পারসী মানেকজী, যোশী, নরসিংহরাম প্রভৃতি দাদা আবদুল্লা ও অন্যান্য বড় বড় ব্যবসায়ীদের গদির লোক ছিলেন। জনসাধারণের কাজে নিজেদিগকে নিয়োজিত দেখিয়া ইঁহারা নিজেরাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। কারণ, এই প্রকার জনসাধারণের কাজে নিমন্ত্রিত হওয়া ও অংশ গ্রহণ করা তাঁহাদের এই প্রথম। এই প্রথম দুঃখের সম্মুখে তাঁহারা উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, মনিব, চাকর, হিন্দু-মুসলমান, পারসী, খ্রীষ্টান, গুজরাটী, মাদ্রাজী, সিন্ধী ইত্যাদি ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সকলেই ভারতমাতার সন্তান এবং সেবক—এই ভাবের দ্বারা তাঁরা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বিলের দ্বিতীয় পাঠ হইয়া গিয়াছিল, অথবা হওয়ার কথা। সেই সময়কার ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতায় এ প্রকার মন্তব্যও হইয়াছিল যে, এই প্রস্তাবিত আইন এত কঠিন হইলেও ভারতীয়দের পক্ষ হইতে কোনও বিরোধ হয় নাই এবং সেই জন্য তাহারা ভোটের অধিকার লাভের যে যোগ্য নয় তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

আমি অবস্থাটা সভায় বুঝাইয়া দিলাম। প্রথম কাজ ছিল ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিকে তারযোগে জানানো যে, এই বিলের আলোচনা এখন যেন সভায় মুলতুবী রাখা হয়। এই রকম তারবার্তা প্রধান মন্ত্রী স্যার জন রবিন্‌সনকেও পাঠানো হইল। অন্য একখানা পাঠানো হইল—দাদা আবদুল্লার বন্ধু হিসাবে মিঃ এস্‌কম্বকে। এই তারের জবাব পাওয়া গেল যে, বিলের আলোচনা দুই দিন মুলতুবী থাকিবে। সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

আবেদন লেখা হইল। তিনখানা লেখা দরকার ছিল। আর একখানা তৈরী করা হইল সংবাদপত্রে দেওয়ার জন্য। যত পারা যায় স্বাক্ষর লওয়া

আবশ্যক। এ সমস্ত কার্যই এক রাত্রির মধ্যে করিয়া ফেলা দরকার। শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকগণ ও আরও অনেকে সারা রাত জাগিয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মিঃ আর্থার বলিয়া এক বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁহার হস্তাক্ষর ভাল ছিল। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে আরজির নকল করিলেন। অপরে উহার অন্য নকল করিল। একজন বলেন, আর পাঁচজন লেখেন। এইভাবে পাঁচখানা নকল এক সঙ্গেই হইল। ব্যবসায়ী স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজ নিজ গাড়ী লইয়া অথবা গাড়ী ভাড়া করিয়া স্বাক্ষর লইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

আরজি পাঠানো হইল, সংবাদপত্রে ছাপানো হইল। এ সম্পর্কে অনুকূল সমালোচনাও শোনা গেল। এসবের প্রভাব ব্যবস্থাপক সভার ওপর বেশ ভালভাবেই পড়িয়াছিল। সেখানেও আলোচনা যথেষ্ট হইল। বিপক্ষের লোকেরা আরজিতে দেওয়া কারণগুলি যুক্তিহীন বলিয়া বর্ণনা করিলেন। কিন্তু সে বলার মধ্যে জোর ছিল না। তবুও বিল পাশ হইয়াই গেল।

বিল যে পাশ হইবে সে কথা সকলেই জানিত। কিন্তু এই আন্দোলন, সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন জীবন আনিয়া দিল। সকলেই বুঝিলেন যে, ভারতীয় সম্প্রদায় মাত্র একটি এবং তা অবিভক্ত; যেমন বাণিজ্য অধিকারের জন্য লড়িতে হইবে, তেমনি রাজনৈতিক অধিকারের জন্যও সকলকেই লড়িতে হইবে। উহাই সকলের ধর্ম।

এই সময় লর্ড রিপন ঔপনিবেশিক মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার কাছে একখানি বিরাট দরখাস্ত পাঠানো স্থির হইল। কাজটা সহজ ছিল না এবং এক দিনেরও কাজ নহে। স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত হইল। কার্য শেষ করার জন্য সকলেই লাগিয়া গেলেন।

দরখাস্ত লিখিবার জন্য আমি খুব পরিশ্রম করিলাম। এই সম্বন্ধে যেখানে যে সাহিত্য আমি পাইয়াছিলাম তাহা পড়িয়া ফেলিলাম। আমরা ভারতবর্ষেও ভোটের এক প্রকার অধিকার পাইয়া থাকি, এই যুক্তি এবং এখানে ভোটের অধিকারী ভারতীয় সংখ্যায় অধিক নহে, এই ব্যবহারিক যুক্তি—এই দুই যুক্তিকে দরখাস্তের মূল ভিত্তিরূপে রচনা করা হইল।

দরখাস্তে দশ হাজার স্বাক্ষর লওয়া হইয়াছিল। পনের দিনের মধ্যেই সমস্ত স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে নাতাল হইতে দশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করা পাঠকেরা একটা ছোটখাটো কাজ মনে করিবেন না। সারা নাতাল হইতেই স্বাক্ষর লওয়ার দরকার ছিল। এ কাজ করিতে

লোকে অভ্যস্ত ছিল না। না বুঝিয়া যে সহি করিবে তাহার সহি লওয়া হইবে না—একথা পর্যন্ত স্থির করা হইয়াছিল। সেইজন্য উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক দ্বারাই সহি লওয়া চলিত। গ্রামগুলি দূরে দূরে ছিল। কেবল সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়া কাজ করিলেই এই প্রকার কাজ শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারে। তাহাই হইয়াছিল। ইঁহারা সকলেই আশাতীত উৎসাহ লইয়া কাজ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শেঠ দাউদ মহম্মদ, পারসী রুস্তমজী, আদমজী মিঞা খাঁ ও আমদ জীভানীর মূর্তি এখনো আমার চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে। দাউদ শেঠ সারাদিন নিজের গাড়ী লইয়া ঘুরিতেন। কেহ হাত খরচাও ল'ন নাই।

দাদা আবদুল্লার বাড়ী ধর্মশালা অথবা সরকারী অফিসের মত হইয়া পড়িয়াছিল। শিক্ষিত ভাইয়েরা আমার কাছেই থাকিতেন। তাঁহাদের এবং অন্য কর্মীদের খাওয়া দাদা আবদুল্লার ওখানেই হইত। সকলেরই খুব খরচ করিতে হইয়াছিল।

দরখাস্ত পাঠানো হইল। এক হাজার নকল ছাপানো হইয়াছিল। এই দরখাস্ত দ্বারা ভারতবর্ষের লোকেরা নাতালের প্রথম পরিচয় পাইলেন। যত সংবাদপত্রের ও জন-নায়কের নাম আমি জানিতাম, তাঁহাদের সকলের কাছেই দরখাস্তের নকল পাঠানো হইয়াছিল।

'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' ইহার উপর সম্পাদকীয় লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক ভারতীয়দের দাবির সমর্থন খুব জোরের সঙ্গেই করিয়াছিলেন। বিলাতে এই দরখাস্তের নকল উভয় পক্ষের নেতাদের কাছেও পাঠানো হইয়াছিল। উহাতে লণ্ডন টাইমসের সমর্থন পাওয়া গেল। আশা হইল—বিলের মঞ্জুরী না-ও হইতে পারে।

এখন আমার নাতাল ছাড়ার উপায় ছিল না। লোকে আমাকে চারিদিক হইতে ধরিয়া ফেলিল ও নাতালে আমাকে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমার অসুবিধার কথাগুলি জানাইলাম। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, জনসাধারণের খরচায় আমার থাকা হইবে না। ভিন্ন বাড়ী করার আবশ্যকতা দেখিলাম। কিন্তু ভাল পাড়ায় ভাল বাড়ী চাই।

আমি ইহাও ভাবিলাম যে, অন্যান্য ব্যারিস্টাররা যেমন থাকেন তেমন ভাবে থাকিলে সম্প্রদায়ের মান বাড়িবে। এই রকম বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে

বছরে ৩০০ পাউণ্ডের কমে চলে না। যদি সম্প্রদায় এই পরিমাণ অর্থ ওকালতি হইতে পাওয়াইয়া দেওয়ার কথা দিতে পারেন, তবে থাকা স্থির করিলাম ও সম্প্রদায়কেও তাহা জানাইলাম।

তাঁহারা বলিলেন—"ঐ পরিমাণ অর্থ যদি আপনি জন-সেবার কাজে নিযুক্ত থাকার জন্য চা'ন, তবে তাহা আমরা দিতে পারিব। উহা উঠাইয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। ওকালতিতে যাহা পাইবেন তাহা আপনার থাকিবে।"

আমি বলিলাম—"সাধারণ সেবার কাজের মূল্য স্বরূপ আপনাদের নিকট হইতে ত আমি টাকা লইতে পারিব না। ও কাজে আমার ওকালতি বুদ্ধি কিছু লাগিবে না। সুতরাং সেজন্য টাকাই বা লইব কেন? তাহা ছাড়া আপনাদের নিকট হইতে জন-সেবার কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেই হইবে। যদি নিজের খরচ লই, তবে আপনাদের নিকট হইতে বেশী টাকা লইতে আমার সংকোচ হইবে, অবশেষে আটকাইয়া যাইব। সম্প্রদায়কে বৎসরে ৩০০ পাউণ্ডের বেশীই সাধারণ সেবায় খরচ করিতে হইবে।"

"আমরা ত আপনার পরিচয় পাইয়াছি। আপনি কি আপনার নিজের জন্য টাকা লইবেন? আপনাকে যদি আমরা এখানে রাখিতে চাই, তবে আপনার খরচের ভারও ত আমাদের লওয়া দরকার।"

"ইহা ত আপনাদের স্নেহ ও সাময়িক উৎসাহের কথা। এই স্নেহ ও এই উৎসাহ চিরকাল স্থায়ী থাকিবে একথা কেহ মনে করেন? আমাকে হয়ত কোনও দিন আপনাদিগকেও শক্ত কথা শুনাইতে হইতে পারে। তখন আমি আপনাদের স্নেহের সম্মান রাখিতে পারিব কি না ঈশ্বর জানেন। কিন্তু আসল কথা হইতেছে, জন-সেবার জন্য আমার পয়সা লওয়া চলিবে না। আপনারা সকলে যদি আপনাদের ওকালতির কাজ আমাকে দেওয়া স্থির করেন, তবে তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ইহাও আপনাদের পক্ষে কঠিন হইতে পারে। আমি গোরা ব্যারিস্টার নই। কোর্ট আমাকে গ্রাহ্য করে কি না কে জানে? আর আমি ওকালতিতে কেমন কাজের হইব তাহা ত আমি নিজেই জানি না। সুতরাং প্রথম হইতে আমাকে ওকালতির ফী দেওয়াতেও আপনাদেরই বিপদ। তা সত্ত্বেও যদি আপনারা আমাকে ওকালতির ফী দেন তবে তাহা কেবল আমার জন-সেবার পুরস্কার রূপে পাইতেছি বলিয়াই আমি গণ্য করিব।"

আলোচনায় অবশেষে ইহাই স্থির হইল যে, প্রায় কুড়ি জন ব্যবসায়

আমাকে এক বৎসরের জন্য তাঁহাদের ওকালতি কাজের জন্য বাঁধা রাখিলেন। ইহা ছাড়া দাদা আবদুল্লা আমাকে বিদায়কালে যে উপহার দিতেছিলেন তাহার পরিবর্তে তিনি আমার ঘরের আসবাবপত্র কিনিয়া দিলেন। আমি নাতালে থাকিয়া গেলাম।

১৮

কালোর বাধা

আদালতের প্রতীক চিহ্ন—একটা তুলাদণ্ড একজন নিরপেক্ষ অন্ধ জ্ঞানী বৃদ্ধা অকম্পিত হাতে ধরিয়া রহিয়াছেন। বিধাতা তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়াই অন্ধ করিয়া দিয়াছেন, যেন তিনি বাহিরের চেহারা দেখিয়া বিচার না করেন, গুণ দেখিয়াই বিচার করেন। নাতালের উকিল সভা কিন্তু আমার বাহ্যিক চেহারা দেখিয়াই আমাকে ওকালতিতে প্রবেশাধিকার দিতে আপত্তি করিলেন। আদালত এই ব্যাপারে ন্যায়ের চিহ্ন অম্লান রাখিয়াছিলেন।

আমার ওকালতি সনদ লওয়া দরকার। আমার কাছে বোম্বাই হাইকোর্টের সার্টিফিকেট ছিল। বিলাতের সার্টিফিকেট বোম্বাই হাইকোর্টের দপ্তরে ছিল। আদালতে প্রবেশ করার দরখাস্তে নিজের চরিত্র সম্বন্ধে দুইখানা সার্টিফিকেটও নিয়মমত আবশ্যক হয়। এই সার্টিফিকেট শ্বেতাঙ্গদের কাছ হইতে লইলে ভাল হইবে বলিয়া, আমি আবদুল্লা শেঠের পরিচয়ে আমার সম্বন্ধে দুইজন বিখ্যাত শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীর প্রমাণ-পত্র লইয়াছিলাম। দরখাস্ত কোনও উকিলের হাত দিয়া দিতে হয় এবং সাধারণতঃ এই ধরনের দরখাস্ত এটর্ণি জেনারেল বিনা ফী-তেই লইতেন। মিঃ এসকম্ব এটর্ণি জেনারেল ছিলেন। তিনি যে আবদুল্লা শেঠের উকিল তাহা পাঠকেরা জানেন। তাঁহার সহিত আমি দেখা করিলাম এবং তিনি সানন্দে আমার দরখাস্ত দাখিল করিতে স্বীকার করিলেন।

ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে উকিল সভা হইতে আমি একটানা নোটিস পাইলাম। নোটিসে আমার ব্যারিস্টার-দলভুক্ত হওয়ার বিরোধিতার কথা জানানো হইয়াছে। উহার এক কারণ দেখানো হইয়াছে যে, আমি যে দরখাস্ত করিয়াছি তাহার সহিত আদত সার্টিফিকেট দিই নাই। বস্তুতঃ বিরুদ্ধতার কারণ ভিন্ন। সে কারণ হইতেছে এই যে, ওকালতি করার সম্বন্ধে

আইন প্রণয়নকালে কালো কি হলদে রংএর মানুষ দরখাস্ত করিবে সে কথাটা ভাবিয়া দেখা হয় নাই। শ্বেতাঙ্গদের দুঃসাহসিকতার জন্যই নাতাল দেশ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই জন্য সেখানে তাদের প্রাধান্য থাকা চাই। আমি কালো হইয়া যদি উকিল হইতে পারি, তবে ধীরে ধীরে তাদের প্রাধান্য যাইতে পারে এবং ঐ প্রাধান্য রক্ষার বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে—এই ছিল সত্যকার আশঙ্কা।

এই বিরুদ্ধতা করার জন্য উকিল সমাজ হইতে এক খ্যাতনামা ব্যারিস্টারকে রাখা হইয়াছে। দাদা আবদুল্লার সঙ্গে এই উকিলেরও সম্পর্ক ছিল। আমাকে তিনি শেঠকে দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন ও আমার সঙ্গে খোলাখুলি ভাবেই কথা বলিলেন। তিনি আমার সকল খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও উত্তর দিলাম। পরে তিনি বলিলেন :—

"আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নাই। আমার ভয়, যে সকল ধূর্ত এখানে জন্মিয়াছে আপনি যদি তাহাদের একজন হন! তাহার উপর আপনি আবার আপনার মূল সার্টিফিকেট দেন নাই। সেই জন্যই আমার সন্দেহ হয়। এমন লোকও দেখা গিয়াছে যে, অপরের সার্টিফিকেট ব্যবহার করিয়াছে। আপনি শ্বেতাঙ্গদের কাছ হইতে যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন, আমার কাছে উহার কোনও মূল্য নাই। তাহারা আপনার কথা কি জানে। আপনার সহিত তাহাদের কতটুকু পরিচয়?"

"এখানে ত আমার সকলেই পরিচিত। আবদুল্লা শেঠও আমাকে এইখানেই দেখিয়াছেন।"—মাঝখানে আমি এই কথাগুলি বলিলাম।

"হাঁ, কিন্তু আপনিই ত বলিতেছেন তিনি আপনার দেশের লোক। আপনার পিতা দেওয়ান ছিলেন, একথা যদি সত্য হয়, তবে আপনার পরিবারকে শেঠ আবদুল্লা নিশ্চয়ই জানেন। সেই রকম এফিডেভিট যদি আপনি যোগাড় করিতে পারেন তবে আমার কোনও আপত্তি থাকিবে না। আমি উকিল সভাকে লিখিয়া দিব যে, আমার পক্ষে তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয় লইয়া বিরোধ করা চলিবে না।"

আমার ক্রোধ হইল—কিন্তু আমি তাহা ব্যক্ত করিলাম না। যদি আমি আবদুল্লা শেঠের সার্টিফিকেট দিতাম তবে তাহা অগ্রাহ্য হইত, এবং তখন তাঁহারা শ্বেতাঙ্গদের সার্টিফিকেট চাইতেন। আমার জন্মের সহিত আমার ওকালতির যোগ্যতার কি সম্পর্ক? আমি অসৎ অথবা কাঙ্গাল মা-বাপের

সন্তানই যদি হইয়া থাকি, তাহা হইলেও আমার যোগ্যতার প্রশ্নে উহার স্থান কোথায় ? কিন্তু ঐ সব বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত কোনও বিতর্ক না করিয়া জবাব দিলাম :—

"যদিও এ সকল অবস্থা জানার কোনও অধিকার উকিল সভার আছে বলিয়া আমি স্বীকার করি না, তবুও আপনি চাহিতেছেন বলিয়া আমি ঐ প্রকার সার্টিফিকেটও পাঠাইতে প্রস্তুত আছি।"

আবদুল্লা শেঠের পরিচয়-পত্র লইলাম ও তাহা সেই উকিলকে দিলাম। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু উকিল সভার তাহাতে সন্তোষ হইল না। তাঁহারা আমার প্রবেশলাভের বিরোধিতা আদালতের নিকট উপস্থিত করিলেন। আদালত মিঃ এসকম্বের উত্তর না শুনিয়াই বিরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। প্রধান জজ বলিলেন :—

"দরখাস্তকারী মূল সার্টিফিকেট দেন নাই—এই যুক্তি গ্রাহ্য নহে। যদি তিনি মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়া থাকেন তবে তাঁহার উপর মিথ্যা ব্যবহারের জন্য ফৌজদারী করা যায়, তাঁহার ওকালতিতে প্রবেশ বাতিল করা যায়। আদালতের ধারায় সাদা-কালোর ভেদ নাই। মিঃ গান্ধীর ওকালতি করা আটকাইবার অধিকার আমাদের নাই। দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। মিঃ গান্ধী আপনি এক্ষণে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারেন।"

আমি দাঁড়াইলাম। রেজিস্ট্রারের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা লইলাম। লওয়ার পর প্রধান জজ বলিলেন—"এখন আপনাকে আপনার পাগড়ি খুলিতে হইবে। উকিল হিসাবে ওকালতির উপযুক্ত পোশাক বিষয়ে আদালতের নিয়ম আপনাকে পালন করিতে হইবে।"

আমার সীমা আমি বুঝিলাম। ডারবানের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারীতে যে পাগড়ি পরায় আগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা এখানে বজায় রাখা চলিল না। অবশ্য এ আদেশের বিরুদ্ধেও যুক্তি ছিল। কিন্তু আমাকে ত বৃহত্তর সংগ্রামে লড়িতে হইবে। পাগড় পরিয়া থাকার জেদ রাখিয়া আমার যুদ্ধ-বিদ্যা আমি সমাপ্ত করিতে চাই না। উহা অপেক্ষাও বড় কাজ আছে।

আবদুল্লা শেঠ ও অন্যান্য বন্ধুরা আমার নম্রতা (অথবা দুর্বলতা) পছন্দ করিলেন না। তাঁহাদের মনে হইল যে, আমার উকিল হিসাবেও পাগড়ি পরার জেদ করাই উচিত ছিল। আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। 'দেশ অনুযায়ী বেশ' এই প্রবচনের রহস্য বুঝাইলাম। ভারতবর্ষে যদি পাগড়ি

খুলিবার প্রথা গোরারা অথবা জজ করে, তবে তাহার বিরোধিতা করা যায়। নাতালের ন্যায় দেশে আদালতের এক কর্মচারী হিসাবে আমার এই প্রকার বিরোধ করা শোভা পায় না। এই প্রকারের যুক্তি দিয়া আমি বন্ধুদিগকে কতক শান্ত করিলেও, আমার মনে হয় না আমি এ কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিয়াছিলাম যে, একই বস্তুকে বিভিন্ন অবস্থাতে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা আবশ্যক। কিন্তু আমার জীবনে আগ্রহ ও অনাগ্রহ সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া আসিতেছে। সত্যাগ্রহে ইহা অনিবার্য, এ সত্য আমি পরে অনেকবার অনুভব করিয়াছি। এই মিটমাটের প্রবৃত্তির জন্য আমি অনেকবার জীবনে ক্ষতিগ্রস্তও হইয়াছি ও বন্ধুদের অসন্তোষের ভাজনও হইয়াছি। কিন্তু সত্য বজ্র অপেক্ষাও কঠিন এবং পুষ্প অপেক্ষাও কোমল।

উকিল-সভার এই বিরোধ দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার বিজ্ঞাপনের কাজ করিয়াছিল। অনেক কাগজ আমার বিরুদ্ধে এ বিরোধ, উকিল-সভা ঈর্ষাবশতঃ করিয়াছে বলিয়া আলোচনা করিয়াছিল। সুতরাং এই বিজ্ঞপ্তি হইতে আমার কাজ কতক অংশে সহজ হইয়া উঠে।

১৯

নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস

উকিলের কাজ করিব ইহা আমার পক্ষে গৌণ বিষয় ছিল এবং বরাবর গৌণই রহিয়া গিয়াছিল। আমার নাতালে থাকা সার্থক করার জন্য জনসেবার কাজে আমার তন্ময় হওয়া আবশ্যক। ভারতীয়দের ভোটের অধিকারবিরোধী আইনের সম্বন্ধে দরখাস্ত করিয়াই ত বসিয়া থাকা যায় না। ঐ বিষয়ে যদি চেষ্টা চলিতে থাকে, তবেই সংস্থা সমূহের উপর উহার প্রভাব হইতে পারে। এইজন্য এক নূতন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার আবশ্যকতা দেখা গেল। আবদুল্লা শেঠের সহিত আলোচনা করিলাম এবং অন্য সঙ্গীদের সহিত একত্র হইয়া এক সাধারণ সংস্থা গঠন করা স্থির করিলাম। এই নূতন সংস্থার নামকরণ লইয়াও এক মহাসংকট উপস্থিত হইল। এই সংস্থা কাহারও পক্ষপাতী হইবে না। কংগ্রেস নামটি বিলাতের কনজারভেটিভ দলের অর্থাৎ রক্ষণশীল দলের অপ্রীতিকর —ইহা আমি জানিতাম। কিন্তু কংগ্রেসই ভারতবর্ষের প্রাণ। তাহার শক্তি বৃদ্ধি করা চাই। ঐ নাম লুকানোতে অথবা ঐ নাম রাখিতে সংকোচ করায়

কাপুরুষতার গন্ধ আসে। এই বিষয়ে আমার যুক্তি দিয়া সংস্থাকে কংগ্রেস নাম দেওয়ার প্রস্তাব করিলাম ও ১৮৯৪ সালের মে মাসের ২২শে তারিখ 'নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' স্থাপিত হইল।

দাদা আবদুল্লার গৃহ লোকে ভরিয়া গিয়াছিল। সকলেই এই সংস্থাকে খুব উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন। নিয়মাবলী সাদাসিধা করা হইয়াছিল। চাঁদা ভারি রকম ধরা হইয়াছিল। প্রতি মাসে কমপক্ষে পাঁচ শিলিং করিয়া না দিলে কেহ সভ্য হইতে পারিবে না। ধনী ব্যবসায়ী-দিগকে তাঁহারা যত বেশি দিতে পারেন তাহাই দিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। আবদুল্লা শেঠের নামে ধরা হইল প্রতি মাসে দুই পাউণ্ড। অন্য দুই জন বন্ধুও দুই পাউণ্ড হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইলেন। আমি নিজেও দেখিলাম যে, আমারও দিতে সংকোচ করিলে চলিবে না। সেইজন্য প্রতি মাসে এক পাউণ্ড লিখাইলাম। ইহা ত আমার পক্ষে অনেকটা বীমা করার মত হইল। তবে আমি ভাবিলাম, যে, যদি আমার খরচাই চালাইতে হয়, তবে আমার প্রতি মাসে এক পাউণ্ড দেওয়া বেশি নয়। ঈশ্বর আমার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার উপরে সভ্য না হইয়াও দান স্বরূপ যে যাহা দিতেন, লওয়া হইত।

কিন্তু কাজে নামিয়া দেখিলাম লোক না হইলে চাঁদা আদায় হয় না। যাঁহারা ডারবানের বাহিরে থাকেন তাঁহাদের নিকট বার বার যাওয়া সম্ভব ছিল না। প্রারম্ভিক উৎসাহের উপর নির্ভর করার দোষ শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। ডারবানে বার বার যাতায়াত করিলে টাকা আদায় হয়। আমি সেক্রেটারী ছিলাম। টাকা আদায় করার ভার আমার উপর ছিল। আমার ও আমার কেরানীর প্রায় সমস্ত দিন চাঁদা সংগ্রহেই ব্যয় হইত। অবশেষে কেরানীও আর পারিয়া উঠিল না। এইবার মনে হইল—চাঁদা মাসিক না হইয়া বার্ষিক হওয়া দরকার ও তাহা সকলেরই অগ্রিম দেওয়া চাই। সভা ডাকিলাম। সকলেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। কম করিয়া বার্ষিক তিন পাউণ্ড চাঁদা নির্ধারিত হইল, ইহাতে আদায় করার কাজ সহজ হইল।

গোড়াতেই আমি শিখিয়া লইয়াছিলাম যে, জন-সেবার কাজ ধার করিয়া করা উচিত নয়। অন্য কাজের ব্যাপারে লোকের কথায় বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু টাকা দেওয়ার কথায় বিশ্বাস করা যায় না। প্রতিশ্রুত টাকা লোকে

অনতিবিলম্বে দিয়া দেয়—ইহা আমি কদাচ দেখি নাই। নাতালের ভারত-বাসীরাও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নন। সেই জন্য "নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস" কখনও ধার করিয়া কাজ চালায় নাই।

সভ্য সংগ্রহ করিতে আমার সহকর্মীদের অসীম উৎসাহ ছিল। উহাতে তাঁহারা আনন্দ পাইতেন, তাঁহাদের অমূল্য অভিজ্ঞতাও লাভ হইত। অনেক লোক সন্তুষ্ট হইয়া নাম লিখাইতেন ও টাকা দিয়া দিতেন। মুশকিল হইত কিছু দূর-দূরান্তের গ্রামের কাজে। জন-সেবার কাজ কি লোকে তাহা বুঝিত না। তথাপি অনেক দূরের জায়গার লোকও আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন ও স্থানীয় বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ীরা অতিথিসৎকার করিতেন।

এই চাঁদা আদায়ে বাহির হইয়া একবার এক জায়গায় আমাদের মুশকিল হইয়াছিল। সেখানে যাঁহার কাছে ছয় পাউণ্ড পাওয়ার কথা সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি তিন পাউণ্ডের বেশি দিতে চাহেন না। যদি তাহাই লওয়া যায় তবে অপরের নিকট হইতে বেশি পাওয়া যাইবে না। সেই বাড়িতেই সকলে উঠিয়াছিলাম। আমরা সকলেই অভুক্ত রহিলাম, বলিলাম—যদি চাঁদাই না পাওয়া যায় তবে খাই কেমন করিয়া ? তাঁহাকে অনেক মিনতি করিলাম। কিন্তু তাঁহার কথার নড়চড় নাই। গ্রামের অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও তাঁহাকে বুঝাইলেন। ধস্তাধস্তিতে সারারাত কাটিল। সকল সঙ্গীরই ক্রোধ হইয়া গেল কিন্তু কেউ বিনয় ত্যাগ করিলেন না। অবশেষে একরকম প্রত্যুষে এই ভাই-এর হৃদয় গলিল। তিনি ছ'পাউণ্ড দিলেন এবং আমাদিগকেও ভোজ দিলেন। এই ঘটনা টোঙ্গাটে হয়। কিন্তু ইহার ধাক্কা উত্তর সীমায় স্টেঙ্গর ও ভিতরে চার্লস-টাউন পর্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। আমাদের টাকা আদায়ের কাজ সহজ হইয়া গেল।

কিন্তু টাকা সংগ্রহ করাই একমাত্র কাজ ছিল না। বস্তুতঃ প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি টাকা না রাখার তত্ত্ব আমি বুঝিয়া গিয়াছিলাম। প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতি মাসে দরকার অনুযায়ী সভা আহ্বান করা হইত। পূর্বের অধিবেশনের বিবরণ পাঠ করা হইত ও নানাপ্রকার আলোচনা হইত। আলোচনা করিতে ও সংক্ষেপে সারাংশ বলিতে লোক তখনও অভ্যস্ত হয় নাই। তাঁহারা দাঁড়াইয়া বলিতে সংকুচিত হইত। সভার নিয়ম সকলকে বুঝাইয়া দিলাম, তাঁহারা তাহা মানিয়া লইলেন। উহার সুবিধাও তাঁহারা দেখিতে পাইলেন এবং যাঁহাদের কখনো প্রকাশ্যে বলার অভ্যাস ছিল না তাঁহারাও সাধারণের বিষয়ে বলিতে ও বিচার করিতে শিখিলেন।

জনসাধারণের কাজে সামান্য সামান্য খরচায় অনেক টাকা লাগিয়া যায়, ইহা আমি জানিতাম। সেইজন্য আরম্ভকালে আমি রসিদ-বহি পর্যন্ত না ছাপানোই স্থির করি। আমার আপিসে সাইক্লোস্টাইল ছিল, তাহাতেই রসিদ ছাপাই। রিপোর্টও ঐ রকম করিয়াই ছাপাই। যখন কংগ্রেসের অর্থ-ভাণ্ডারে অনেক টাকা হইল, সভ্য সংখ্যা বাড়িল, কাজ বাড়িল, তখনই রসিদ ইত্যাদি ছাপানো হয়। ব্যয় সম্বন্ধে এইরূপ সতর্কতা প্রত্যেক সংস্থাতেই দরকার। তথাপি এই নিয়ম সাধারণতঃ পালন করা হয় না বলিয়াই আমি জানি। আর সেই জন্যই ছোট হইতে ক্রমবর্ধমান এই সংস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করিতেছি। লোকের রসিদের দরকার না থাকিলেও আগ্রহপূর্বক রসিদ দেওয়া হইত। এইজন্য হিসাব প্রথম হইতে কড়া-ক্রান্তিতে ঠিক থাকিত। আমার বিশ্বাস আজও নাতাল-কংগ্রেসের দপ্তরে ১৮৯৪ সালের সম্পূর্ণ খরচার খাতা পাওয়া যাইবে। সূক্ষ্মভাবে ও নির্ভুলভাবে রাখা হিসাবই প্রত্যেক সংস্থার প্রাণ। উহা না থাকিলে সেই সংস্থা পরিণামে দূষিত ও দুর্নামগ্রস্ত হইয়া যায়। শুদ্ধ হিসাব ব্যতীত শুদ্ধ সত্যকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের অন্যতম কার্য ছিল—আফ্রিকায় যে সকল ভারতীয়ের জন্ম, তাঁহাদের সেবা। সেই জন্য কংগ্রেস হইতে "কলোনিয়াল বর্ণ ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল এসোসিয়েশন" স্থাপনা করা হয়। এই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকেরাই প্রধানতঃ উহার সভ্য ছিলেন। এজন্য তাঁহাদিগকে যে চাঁদা দিতে হইত তাহার পরিমাণ খুব সামান্যই ছিল। ইহাতে তাঁহাদের অসুবিধার কথা আলোচিত হইত, তাঁহাদের বিচার-শক্তি বাড়িত, ব্যবসায়ীদের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক বাড়িত এবং তাঁহাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের সেবার সুযোগও মিলিত। এই সংস্থা আলোচনা-সভার মত ছিল। ইহার উদ্যোগে নিয়মমত সভা হইত, বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা হইত, প্রবন্ধ পাঠ করা হইত। উহার সহিত সংশ্লিষ্ট একটি ছোট পাঠাগারও স্থাপন করা হইয়াছিল।

কংগ্রেসের তৃতীয় কার্য ছিল প্রচার। ইহাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজদের মধ্যে এবং বাহিরে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে এখানকার সত্য অবস্থা জানাইবার চেষ্টা হইত। এইজন্য আমি দুখানা বই লিখিয়াছিলাম। প্রথমখানা ছিল—"দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী প্রত্যেক ইংরাজের প্রতি নিবেদন।" উহাতে নাতালের ভারতীয়দিগের সাধারণ অবস্থার বৃত্তান্ত তথ্য প্রমাণ সহ দেওয়া

হইয়াছিল। অন্যখানা ছিল—"ভারতীয়দের ভোটের অধিকার সম্পর্কে একটি নিবেদন।" ইহাতে ভারতীয়দের ভোটের অধিকারের ইতিহাস প্রমাণাদি সহ দেওয়া হইয়াছিল। এই দুটি বই লেখার জন্য খুব পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল ও খুব পড়াশোনা করিতে হইয়াছিল। তাহার ফল তখনই পাওয়া যায়। উহার বহুল প্রচার হইয়াছিল। এই সকল প্রচেষ্টার দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা অনেক বন্ধু লাভ করেন। ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে সকল দল হইতেই সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের কাছে ইহা দ্বারা কাজ করার একটা সুনির্দিষ্ট পথও খুলিয়া গিয়াছিল।

২০

বালাসুন্দরম

যাহার যেমন ভাবনা তাহার তেমন সিদ্ধি হয়—এই নিয়ম আমার প্রতি অনেকবার খাটিতে দেখিয়াছি। আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, দরিদ্রের সেবা করি এবং এই ইচ্ছাই আমাকে অনায়াসে সেবার জন্য দরিদ্র লোক জুটাইয়া দিয়াছে।

উপনিবেশ-জাত ভারতীয়েরা এবং কেরানীরা "নাতাল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস"-এর সভ্য হইতে পারিলেও, মজুর ও গিরমিটিয়া শ্রেণীর লোক কংগ্রেসে ছিল না। কংগ্রেস তখনো তেমন হয় নাই। গরীবেরা কংগ্রেসের চাঁদা দিয়া ও সভ্য হইয়া কংগ্রেসকে নিজেদের করিতে পারিত না। সুতরাং কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের মনকে আকৃষ্ট করিবার একটিমাত্র পথ ছিল—তাহাদের সেবার দায়িত্ব কংগ্রেসের গ্রহণ করা। এই রকম একটা ঘটনা, একটা সেবার ডাক, এমন সময় আসিল যখন কংগ্রেস অথবা আমি কেউই সেজন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তখন আমার ওকালতীর মেয়াদ দুই-চার মাসের বেশি হয় নাই। কংগ্রেসেরও শৈশব উত্তীর্ণ হয় নাই। এই সময় একদিন এক মাদ্রাজী আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার কাপড় ছেঁড়া, তাহার দেহ কাঁপিতেছে, মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে, সামনের দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে এই অবস্থায় পাগড়ি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তার মালিক তাহাকে নিদারুণভাবে প্রহার করিয়াছে। আমার তামিল-ভাষী কেরানীর নিকট জিজ্ঞাসা

করিয়া তাহার অবস্থা জানিয়া লইলাম। বালাসুন্দরম এক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গের কাছে কাজ করিত। কোনও কারণে রাগ হওয়ায় মালিক জ্ঞানশূন্য হইয়া বালাসুন্দরমকে গুরুতরভাবে প্রহার করিয়াছে। উহাতে বালাসুন্দরমের দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আমি তাহাকে ডাক্তারের নিকট পাঠাইলাম। তখন কেবল শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারই পাওয়া যাইত। বালাসুন্দরমের আঘাতের বিবরণ সম্বলিত একটি সার্টিফিকেট আমার আবশ্যক ছিল। এই সার্টিফিকেট সহ আমি বালাসুন্দরমকে সঙ্গে করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গেলাম। বালাসুন্দরমের এফিডেভিট দিলাম। এফিডেভিট পড়িয়া ম্যাজিস্ট্রেট মালিকের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিলেন ও মালিকের নামে সমন জারি করার হুকুম দিলেন।

মালিককে সাজা দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না। বালাসুন্দরমকে তাহার নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইয়া আসা আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি গিরমিটিয়াদের সম্বন্ধে আইন খুঁজিয়া দেখিলাম। যদি কেহ চাকরি ছাড়িয়া দেয়, তবে মনিব তাহার উপর দেওয়ানী দাবি করিতে পারে অথবা তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ করিতে পারে। গিরমিট ও সাধারণ চাকুরিতে অনেক তফাত ছিল। তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে এই যে, যদি গিরমিটিয়ারা চাকুরি ছাড়ে, তবে তাহা ফৌজদারী অপরাধ হয় এবং সেজন্য তাহাকে জেল খাটিতে হয়। এইজন্য সার উইলিয়াম উইলসন হান্টার ইহাকে একপ্রকার দাসত্বই বলিয়াছেন। ক্রীতদাসের মত গিরমিটিয়ারা মালিকের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য। বালাসুন্দরমকে ছাড়াইয়া আনার দুইটি পথ ছিল। এক হইতেছে—গিরমিটিয়াদের আমলা অর্থাৎ আইনতঃ যে তাহাদের রক্ষক, সে যদি গিরমিট রদ করে অথবা অন্য কাহাকেও দান করে, দ্বিতীয় পথ হইতেছে—মালিক নিজে যদি ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক হয়। আমি মালিকের সহিত দেখা করিলাম। মালিককে বলিলাম—আপনাকে আমার আদালত হইতে দণ্ড দেওয়াইবার ইচ্ছা নাই। ঐ লোকটির আঘাত গুরুতর হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন। এক্ষণে আপনি যদি গিরমিট অন্যের নামে দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। মালিক তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন। তাহার পরে আমি সেই রক্ষকের সহিত দেখা করিলাম। তিনিও সম্মত হইলেন। কিন্তু শর্ত এই যে, বালাসুন্দরমের জন্য নূতন মালিক আমাকে খুঁজিয়া দিতে হইবে।

নূতন কোনও ইংরাজ মালিক এইবার আমার খোঁজ করার দরকার হইল।

ভারতীয়েরা গিরমিটিয়া রাখিতে পারেন না। আর আমারও অল্পসংখ্যক ইংরাজের সঙ্গেই পরিচয় ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমার উপর দয়া করিয়া বালাসুন্দরমকে রাখিতে প্রস্তুত হইলেন। আমি তাঁহার এই উপকার কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট মালিকের দোষ সাব্যস্ত করিয়া, গিরমিট অপরের নামে বদলাইয়া দেওয়ার স্বীকৃতি লিখিয়া লইলেন।

বালাসুন্দরমের মামলার পর আমাকে গিরমিটিয়ারা চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। আমাকে তাহাদের বন্ধু বলিয়া ধরিয়া লইল। বস্তুতঃ আমার ইহা ভালই লাগিল। আমার অফিস গিরমিটিয়াদের ভিড়ে ভরিয়া উঠিল, আর আমার পক্ষেও তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা জানার সুবিধা হইল।

বালাসুন্দরমের কেসের কথা মাদ্রাজ পর্যন্ত পঁহুছিল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যাহারা নাতালে গিরমিটিয়া হইয়া যাইত তাহারাও অন্য গিরমিটিয়াদের নিকট হইতে এই ঘটনা জানিয়া লইয়াছিল।

এই মামলার বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। কিন্তু লোকের কাছে ইহা নূতন লাগিল এই জন্য যে, তাহাদের জন্য প্রকাশ্যভাবে কাজ করিতে প্রস্তুত একজন লোকের দেখা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেই তাহাদের মনে আনন্দ এবং আশার সঞ্চার হইয়াছিল।

আমি উপরে জানাইয়াছি যে, বালাসুন্দরম নিজের পাগড়ি হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার ভিতরে বড়ই করুণ কাহিনী রহিয়াছে। উহা আমাদের লজ্জার পরিচয়ে পূর্ণ। আমার পাগড়ি খোলার কথা ত পাঠকেরা জানেন। গিরমিটিয়া অথবা কোন অজানা ভারতীয় যদি শ্বেতাঙ্গের সম্মুখীন হয়, তবে তাহার সম্মানার্থে তাহাকে পাগড়ি খুলিতে হইবে। কেবল পাগড়ি নয়, টুপি হোক, ফেটা হোক বা অন্য যাহাই হোক তাহাই খুলিতে হইবে। দুই হাতে সেলাম করাও যথেষ্ট নয়। বালাসুন্দরম ভাবিয়াছিল আমার সম্মুখেও তেমনি করিয়া আসিতে হইবে। এইরূপ দৃশ্য আমার চোখে এই প্রথম পড়িল। আমার লজ্জা হইল। আমি বালাসুন্দরমকে ফেটা বাঁধিতে বলিলাম। সে অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াই ফেটা বাঁধিল। তবে ফেটা বাঁধিতে যে তাহার আনন্দ হইয়াছিল তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। অপরকে অপমান করিয়া, লোকে কেমন করিয়া নিজে মান পাইতেছে এইরূপ মনে করে, এ রহস্য আমি আজ পর্যন্তও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

২১

তিন পাউণ্ড কর

বালাসুন্দরমের ঘটনা দ্বারাই আমি গিরমিটিয়া ভারতীয়দের সংস্পর্শে আসি। কিন্তু গিরমিটিয়াদের উপর স্থাপিত কর রদ করার জন্য যে আন্দোলন করি, সেই আন্দোলনকালেই তাহাদের অবস্থার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতম পরিচয় ঘটে।

১৮৯৪ সালে নাতাল সরকার গিরমিটিয়া ভারতীয়দিগের উপর প্রতি বছর ২৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩৭৫ টাকা কর ধার্য করার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব পড়িয়া আমি স্তম্ভিত হই ও আমি স্থানীয় কংগ্রেসের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করি। কংগ্রেস ইহা লইয়া আন্দোলন করা স্থির করেন।

এই কর-স্থাপনার গোড়ার কথা উল্লেখ করা দরকার।

১৮৬০ সালে যখন নাতালে আখের চাষ ভাল হইতেছিল, তখন সেখানকার বাসিন্দা শ্বেতাঙ্গরা দেখিল যে, তাহাদের মজুরের দরকার। মজুর না পাওয়া গেলে আখের চাষ হয় না, চিনি তৈরী করা চলে না। সেইজন্য নাতালবাসী শ্বেতাঙ্গরা ভারত সরকারের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখিয়া, ভারতীয় মজুর নাতালে লইয়া যাওয়ার জন্য অনুমতি গ্রহণ করে। স্থির হয়—তাহারা পাঁচ বছর মজুরি করার জন্য বাধ্য থাকিবে ও পাঁচ বছর পরে স্বাধীনভাবে নাতালে বসবাস করিতে পারিবে। তাহারা জমির উপর সম্পূর্ণ মালিকী স্বত্ব কিনিয়া লইতেও পারিবে। এই সকল লোভ দেখানো হইয়াছিল। সে সময় শ্বেতাঙ্গরা ভাবিয়াছিল যে, মজুরেরা যদি নিজেদের পাঁচ বছরের চুক্তি পূর্ণ করার পর সেখানে থাকিয়া চাষ-বাস করে তাহা হইলে তাহাতে নাতালের লাভই হইবে।

হিন্দু ভারতীয় মজুরেরা নাতালে আশাতিরিক্তভাবে লাভ করিতে শুরু করে। তাহারা প্রচুর পরিমাণে শাক-সব্জী উৎপন্ন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষ হইতে কতক নূতন জাতের শাক-সব্জী তাহারা প্রবর্তন করিল ও যেসব সব্জী সেখানে হইত, তাহাও সস্তায় উৎপন্ন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষ হইতে আম লইয়া সেখানে রোপন করিল। আবার ইহার সঙ্গেই তাহারা ব্যবসাও করিতে আরম্ভ করিল। বাড়ি করার জন্য জমি খরিদ করিয়া গিরমিট (চুক্তি) শেষে অস্তে তাহারা জমির মালিক হইয়া, গৃহস্থ হইয়া বসিয়া যাইতে লাগিল। মজুর হইয়া যে সকল লোক গিয়াছিল, তাহাদের পিছনে পিছনে ব্যবসাদারেরাও যাইতে লাগিল। ব্যবসায়ীদের মধ্যে পরলোকগত শেঠ আবুবকর আমদই সর্বপ্রথম

যান। তিনি নিজের ব্যবসা খুব জমাইয়া লইয়াছিলেন।

এই সব ঘটনায় শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা চমকিয়া উঠিল। যখন ইহারা ভারতীয় মজুরদিগকে আদর করিয়া লইয়াছিল, তখন তাহাদের ব্যবসা-বুদ্ধির শক্তি সম্পর্কে খেয়াল করে নাই। গিরমিটিয়ারা কৃষক হিসাবে স্বাধীনভাবে যদি থাকে তাহাতে তখনও তাহাদের ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ভারতীয়েরা তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য জগতেও প্রবেশ করিবে, ইহা অসহ্য হইল।

ইহাই ভারতীয়দের সঙ্গে বিরোধের মূল। তাহার পর আরও অন্য ঘটনা আসিয়া মিশে। আমাদের ভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা, আমাদের সাদাসিধা চলন, আমাদের অল্পলাভের সন্তোষ, স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের অবহেলা, ঘর-বাড়ি সাফ রাখিতে আমাদের আলস্য, বাড়ি-ঘর সংস্কার করিতে কৃপণতা, আমাদের ভিন্ন ধর্ম—এ সমস্তই এই বিরোধ সম্প্রসারিত করে।

ভোট দিবার অধিকার উঠাইয়া দেওয়া ও গিরমিটিয়ার উপর মাথা পিছু কর ধার্য করার আইনের ভিতর দিয়া, এই বিরোধই মূর্তি পরিগ্রহ করে। আইনের কথা ছাড়া বাহিরে নানা রকমে খোঁচা দেওয়াও আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল।

প্রথমতঃ প্রস্তাব হয় যে, গিরমিটিয়াদের জোর করিয়াই ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে গিরমিটের শেষকালটা তাহাদের ভারতবর্ষেই পূর্ণ হয়। এই প্রস্তাব ভারত সরকারের পক্ষে স্বীকার করার সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্য অন্য একটি প্রস্তাব হয়। সে প্রস্তাবের মর্ম এইরূপ—

১। মজুরীর চুক্তি পূর্ণ করিয়াই গিরমিটিয়ারা ভারতে ফিরিয়া যাইবে, অথবা

২। দুই-দুই বছরের জন্য নূতন গিরমিট করিতে হইবে। প্রতি গিরমিটের সময় কেবল বেতন কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। এবং

৩। যদি ফিরিয়া না যায় ও যদি পুনরায় গিরমিটও না করে তবে তাহাকে প্রতি বৎসর মাথা প্রতি ২৫ পাউণ্ড কর দিতে হইবে।

এই প্রস্তাবে ভারত সরকারকে সম্মত করাইবার জন্য সার হেনরি বিন্‌স ও মিঃ মেসনের ডেপুটেশন ভারতবর্ষে পাঠানো হয়। লর্ড এলগিন তখন ভাইসরয়। তিনি ২৫ পাউণ্ডের কর না-মঞ্জুর করিলেও প্রত্যেক ভারতীয়ের নিকট হইতে ৩ পাউণ্ড কর লওয়ায় স্বীকৃত হইলেন। আমার তখনও মনে হইয়াছিল, এবং এখনও মনে হয় যে, ভাইসরয় এই সম্মতি দিয়া প্রকাণ্ড একটি ভুল করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন নাই। নাতালের শ্বেতাঙ্গদের

সুবিধা দেখিতে তিনি ধর্মতঃ বাধ্য নন। তিন-চার বৎসর পরেই এই কর, সেখানকার ভারতীয় স্ত্রীলোকদের কাছ হইতে এবং তাদের প্রতেক ১৬ বছর বয়সের ছেলের ও ১৩ বৎসর বয়স্কা কন্যার কাছ হইতে আদায় করাও স্থির হয়। এই ব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রী ও দুই ছেলে-মেয়ে সহ চারজনের একটি পরিবারের উপর বছরে ১২ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৯০ টাকা করের বোঝা চাপানো হয়। অথচ এই সময় স্বামীর উপার্জন মাসিক গড়ে ১৪ শিলিংএর বেশি ছিল না। করের নামে এত বড় জুলুম দুনিয়ায় আর কোথাও গরীবের উপর অনুষ্ঠিত হয় নাই।

এই করের বিরুদ্ধে আমরা প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলাম। যদি নাতাল-ইণ্ডিয়ান-কংগ্রেসের তরফ হইতে প্রতিবাদ না করা হইত, তবে ভাইসরয় হয়ত ২৫ পাউণ্ড করই মঞ্জুর করিতেন। ২৫ পাউণ্ড হইতে যে ৩ পাউণ্ড হয়, তাহার মূলে ছিল হয়ত কংগ্রেসেরই আন্দোলন। তবে আমার অনুমান ভুলও হইতে পারে। ভারত সরকার প্রথম হইতেই ২৫ পাউণ্ড অস্বীকার করিয়াছিলেন ও কংগ্রেস-আন্দোলন না হইলেও হয়ত ৩ পাউণ্ডেই স্বীকৃত হইতেন। তাহা হইলেও ভারতবর্ষের যে ইহাতে ক্ষতি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের কল্যাণের রক্ষক হইলে, এই অমানুষিক কর দেওয়ার ব্যবস্থায়, ভাইসরয় কদাচ সম্মতি দিতে পারিতেন না।

২৫ পাউণ্ড হইতে ৩ পাউণ্ড (৩৭৫ টাকা হইতে ৪৫ টাকা) কর হওয়ায় কংগ্রেসের যে বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। কংগ্রেস যে ভারতীয়দের কল্যাণসাধন করিতে পারিল না, ইহাই তাহার পরিতাপের বিষয় হইয়া রহিল। তিন পাউণ্ড কর যে উঠাইয়া দিতেই হইবে, কংগ্রেস এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কখনো ত্যাগ করে নাই। এই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে ২০ বৎসর লাগিয়াছিল। তাহাতে কেবল নাতালের নয় সারা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দেরও যোগ দিতে হয়। গোখলে এই ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়েন। ইহাতে গিরমিটিয়া ভারতীয়েরা পুরাপুরি যোগ দিয়াছিল। ইহার জন্য কত লোককে গুলি খাইয়া মরিতে হইয়াছে, দশ হাজারের উপর লোককে জেল ভোগ করিতে হইয়াছে।

অবশেষে সত্যের জয় হয়। ভারতীয়দের তপশ্চর্যায় সত্য উজ্জ্বল মূর্তিতে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার জন্য অখণ্ড শ্রদ্ধা, ধৈর্য ও সদিচ্ছার আবশ্যক হইয়াছিল। যদি ভারতীয় সম্প্রদায় হার মানিয়া লড়াই হইতে বিরত হইত, যদি কংগ্রেস লড়াই পরিহার করিত ও এই কর অনিবার্য বলিয়া ধরিয়া

লইত, তাহা হইলে এই কর আজ পর্যন্তও গিরমিটিয়া ভারতীয়দিগের কাছ হইতে লওয়া হইতে থাকিত এবং ইহা ভারতীয়দের এবং সমস্ত ভারতবর্ষের অপমানের কারণ হইয়া থাকিত।

২২
ধর্ম নিরীক্ষণ

এইভাবে আমি যে সম্প্রদায়ের সেবায় একাত্ম এবং ওতঃপ্রোত হইয়া গিয়াছিলাম, তাহার উদ্দেশ্য ছিল আমার আত্ম-দর্শনের অভিলাষ। ঈশ্বরের দর্শন সেবার দ্বারাই হইতে পারে, এই ধারণা করিয়া সেবা-ধর্ম স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। ভারতীয়দের সেবা করিতাম, কেননা সেই সেবাই অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার কাছে সহজে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং ঐ ধরনের সেবা আমি করিতেও জানিতাম। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিলাম বেড়াইতে, কাথিয়াওয়াড়ের চক্রান্ত হইতে মুক্তি পাইতে এবং জীবিকা উপার্জন করিতে। কিন্তু এখানে আসিয়া ঈশ্বরের অনুসন্ধানে অথবা আত্মদর্শন করার সাধনায় আমি নিমগ্ন হইয়া গেলাম। ধর্ম কি, তাহা জানার ইচ্ছা খ্রীষ্টান ভাইয়েরা আমার অন্তরে তীব্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই জিজ্ঞাসা কি করিয়া মিটে তাহা জানিতাম না। আর যদিও বা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে চাহিতাম, তথাপি যে খ্রীষ্টান ভাই-ভগ্নীরা ছিলেন তাঁহারা শান্ত হইতে দিতেন না। ডারবানে মিঃ স্পেনসর ওয়ালটন ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার মিশনের প্রধান। তিনি আমাকে খুঁজিয়া লইলেন। আমি তাঁহার একপ্রকার পরিবারভুক্তই হইয়া গেলাম। এই সকলের মূলে ছিল প্রিটোরিয়ার মেলামেশা। মিঃ ওয়ালটনের একটি নিজস্ব ধরন ছিল। তিনি আমাকে খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি নিজের জীবন আমার সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। নিজের কর্মপ্রচেষ্টা আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মপত্নী অতিশয় নম্র ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন।

এই দম্পতির ভাব আমার ভাল লাগিত। আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদ আছে তাহা আমরা উভয়েই জানিতাম। এই ভেদ আলোচনা করিয়া দূর করার মত নহে। যেখানে উদারতা সহিষ্ণুতা ও সত্য রহিয়াছে, সেখানে ভেদ লাভ দায়কই হইয়া পড়ে। এই দম্পতির নম্রতা, কর্মোদ্যম, কাজে

আত্মসমর্পণ আমার ভাল লাগিত।

ইঁহাদের সংস্পর্শ আমাকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিল। ধর্মগ্রন্থাদি পড়ায় যে অবকাশ আমার প্রিটোরিয়াতে ছিল, তাহা এখন পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু যেটুকু সময় পাইতাম, ধর্মগ্রন্থ পড়ার জন্যই দিতাম। আমার পত্রালাপ চলিতেছিল। রায়চাঁদভাই আমাকে পরিচালনা করিতেছিলেন। কোনও বন্ধু আমাকে নর্মদাশঙ্করের 'ধর্ম-বিচার' পুস্তক পাঠান। তাহার প্রস্তাবনা হইতে আমি খুব সাহায্য পাই। নর্মদাশঙ্করের বিলাসময় জীবনের কথা আমি শুনিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনের পরিবর্তনের কথা প্রস্তাবনায় পড়িয়া আকৃষ্ট হই এবং সেই হইতে এই পুস্তকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয়। আমি বইটি মন দিয়া পড়িলাম। ম্যাক্সমূলারের 'হিন্দুস্থান কি শিখাইতে পারে' নামক পুস্তকখানি পড়িয়া খুব আনন্দ পাইয়াছিলাম। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রকাশিত উপনিষদের ভাষান্তর সমূহও পড়িয়াছিলাম। আমার হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব বৃদ্ধি পাইল। উহার সৌন্দর্য আমি বুঝিতে লাগিলাম। কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হইল না। ওয়াশিংটন আরভিং কৃত মহম্মদ চরিত্র ও কার্লাইয়ের মহম্মদ স্তুতি পড়িলাম। পয়গম্বরের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িল। 'জরথুস্ত্রর বচন' নামক পুস্তকও পড়িলাম।

এইভাবে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার অল্প-বিস্তর জ্ঞান হইল, আত্ম-নিরীক্ষণ ও সমীক্ষাও বাড়িল। বই পড়িয়া যা পছন্দ হয়, তাহাই কার্যে পরিণত করার অভ্যাস বৃদ্ধি পাইল। এইজন্যই হিন্দু-ধর্ম পুস্তক হইতে প্রাণায়াম বিষয়ে কতকগুলি ক্রিয়া যতটা বই দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। ভারতবর্ষে ফিরিয়া কোন গুরুর তত্ত্বাবধানে উহা করিব বলিয়া তখন স্থির করিয়াছিলাম। সে আশা এখনো পূর্ণ হয় নাই।

টলস্টয়ের বইগুলি পড়িয়া ফেলিলাম। তাঁহার 'গসপেল ইন ব্রীফ', 'হোয়াট টু ডু' ইত্যাদি বই আমার হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলিয়াছিল। বিশ্বপ্রেম কতদূর পর্যন্ত পঁহুছিতে পারে তাহা আমি ক্রমশঃই বেশি করিয়া বুঝিতে লাগিলাম।

এই সময় অন্য একটি খ্রীষ্টান পরিবারের সংস্পর্শে আসি। তাঁহাদের ইচ্ছায় আমি প্রতি রবিবারে ওয়েসলিয়ান গির্জায় যাইতাম। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ থাকিত। ওয়েসলিয়ান গির্জায় আমার ভাল লাগে নাই। সেখানকার বক্তৃতা আমার নিকট নীরস লাগিত। দর্শকদের ভিতরে

আমি ভক্তিভাবও দেখি নাই। দেউলে সমাগত জনমণ্ডলী আমার নিকট ভক্ত-সজ্ঘ বলিয়া মনে হইত না। কতকটা খেলাচ্ছলে, কতকটা নিয়ম পালনের জন্য সেখানে কতগুলি সাংসারিক জীবের সমাগম বলিয়া মনে হইয়াছিল। কখন কখন এই সভায় আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুম আসিত। আমার লজ্জা হইল। কিন্তু আমার আশেপাশের অন্য লোককেও ঝিমাইতে দেখিয়া এই লজ্জা-বোধ আমার আবার তখনই কমিয়া যাইত। এ অবস্থা আমার ভাল লাগিত না। অবশেষে আমি গির্জায় যাওয়া ছাড়িয়া দিলাম।

যে পরিবারে আমি প্রতি রবিবারে যাইতাম, শেষে সেখানে যাইতে এক-রকম নিষেধ করাই হইয়াছিল বলা যায়। গৃহিণী সরল সাদাসিধা হইলেও খানিকটা সঙ্কীর্ণ-মনা ছিলেন। তাঁহার সহিত সব সময়েই কোন-না-কোনও ধর্ম-চর্চা হইতই। সেই সময় আমি "লাইট অফ এসিয়া" বইটি পড়িতেছিলাম। আমরা যীশু ও বুদ্ধের জীবনের তুলনামূলক বিচার করিতে লাগিলাম।

"দেখুন না গৌতমের দয়া। সে দয়া মানুষজাতিকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য সকল প্রাণী পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার কাঁধের উপর ছাগলছানাটা তুলিয়া লইয়াছেন; আর সে খেলিতেছে এ দৃশ্যের কথা চিন্তা করিয়া আপনার হৃদয় কি প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না? প্রাণীমাত্রের প্রতি এই প্রেম, আমি যীশুর জীবনে দেখিতে পাই না।"

ভগ্নীর দুঃখ হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম। ঐ আলোচনা আর বাড়াইলাম না। আমরা খাওয়ার ঘরে গেলাম। তাঁহার বছর পাঁচেকের এক ছেলে আমার সঙ্গে ছিল। এই ছেলেটির মুখখানা হাসি-হাসি ছিল। আমি যদি ছেলেপিলে পাই তবে আর কি চাই? ছেলেটির সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করিয়া লইলাম। আমি তাহার প্লেটে দেওয়া মাংসের টুকরাকে তুচ্ছ করিয়া আমার প্লেটের আপেলের প্রশংসা করিতেছিলাম। অজ্ঞান বালক আমার কথায় মজিয়া গেল ও আপেলের প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিন্তু মা? সে বেচারীর ভয় হইল।

আমি সাবধান হইলাম, চুপ করিলাম। কথার বিষয় বদলাইলাম। পরের রবিবারে আমি সাবধান হইয়াই সেখানে গেলাম বটে, কিন্তু আমার পা চলিতেছিল না। তবু সেখানে যাওয়া বন্ধ করা দরকার বোধ করিলাম না, বরং না যাওয়াই অনুচিত হইবে বলিয়া মনে হইল। কিন্তু মহিলাটিই আমার অসুবিধা দূর করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—"মিঃ গান্ধী, আপনি কিছু মনে

করিবেন না। কিন্তু আমার বলা দরকার যে, আপনার সঙ্গ আমার ছেলের উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এখন সে রোজ মাংস খাইতে অস্বীকার করে ও আপনার আলোচনার কথা মনে করিয়া ফল খাইতে চায়। ইহা ত আমার চলে না। ছেলে যদি মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দেয়, তবে অসুখে না পড়িলেও দুর্বল হইবেই তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিব। আপনার কথাবার্তা আমাদের সঙ্গেই বলা ভাল। ছেলেদের উপর উহার প্রভাব খারাপ হয়।"

"মিসেস……আমি দুঃখিত। আপনার মায়ের বুকের ব্যথা আমি বুঝিতে পারি। আমারও ছেলে আছে। এই অসুবিধা সহজেই শেষ করা যায়। আমি যে কথা বলি তার যে প্রভাব না হইবে,—কি খাই বা না খাই, তাহার প্রভাব তার চেয়ে বেশি হইবে। সেইজন্য রবিবারে আপনার এখানে না আসাই সব চেয়ে ভাল। আশা করি আমাদের বন্ধুত্বের ইহাতে কোন বাধা পড়িবে না।"

মহিলাটি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আপনি বাধিত করিলেন।"

২৩

গৃহস্বামী

বিলাতে ও বোম্বাইতে যে বাসা করিয়া ছিলাম নাতালের গৃহস্থপনা তাহা হইতে অন্য রকমের ছিল। নাতালে কতকগুলি ব্যয় কেবল লোক দেখানোর জন্যই করিতে হইত। সেখানে ভারতীয় ব্যারিস্টার হিসাবে, ভারতবাসীদের প্রতিনিধি হিসাবে আমার রীতিমত খরচ করা দরকার বলিয়া মনে হইত। সেই-জন্য ভাল পাড়ায় ভাল বাড়ি ভাড়া লইয়াছিলাম। ঘরের আসবাবপত্রও ভাল রকমই করা হইয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া সাদাসিধা ধরনের ছিল, কিন্তু ইংরাজ বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিতাম, ভারতীয় সঙ্গীদেরও নিমন্ত্রণ করিতাম। সেইজন্য স্বভাবতঃই খরচা বেশি হইত। তখন চাকরের বড় অসুবিধা বোধ হয়। কিন্তু কাহাকেও চাকর করিয়া রাখার মত বুদ্ধি আমার ছিল না।

এক বন্ধুকে সঙ্গীরূপে রাখিয়াছিলাম আর একজন পাচক ছিল। আপিসে যাঁহারা মুহুরীর কাজ করিতেন তাঁহারাও কেউ কেউ আমার বাসায়ই থাকিতেন।

এই পরীক্ষা ভালই উতরাইয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতে আমি সংসারের তিক্ত-

অভিজ্ঞতাও পাইয়াছিলাম।

আমার এই সঙ্গীটি খুব কার্যদক্ষ ও আমার মতে বিশ্বাসী লোক ছিল। কিন্তু আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই। আপিসের যেসব মুহুরীকে বাড়িতে রাখিয়াছিলাম তাহাদের একজনের উপর তাহার হিংসা হয়। সে এরকম কৌশল-জাল রচনা করিল, যাহাতে এই মুহুরীটির উপর আমি সন্দিহান হইয়া পড়ি। এ মুহুরীটি বড়ই স্বাধীন স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি বাড়ি ও আপিস দুই-ই ত্যাগ করিলেন। আমার দুঃখ হইল। ভাবিতাম—"তাঁহার উপর অন্যায় করা হয় নাই ত?"

ইতিমধ্যে আমি যে পাচককে রাখিয়াছিলাম কোনও কারণে তাহাকে অন্যত্র যাইতে হয়। তাহার বদলে অন্য পাচক রাখা হইল। পরে দেখিলাম যে, এই পাচক উড়ুক্কু ধরনের লোক। কিন্তু তাহা হইলেও সে আমার উপকারই করিয়াছিল। এই পাচক আসার দুই তিন দিন পরেই সে দেখিতে পায় যে, আমার বাড়িতে আমার অজ্ঞাতে কিছু কিছু কলুষিত ব্যাপার ঘটে। দেখিয়া সে আমাকে সাবধান করা স্থির করে। বিশ্বাসপরায়ণ এবং খাঁটি লোক বলিয়া দশজন আমাকে জানিত। সেইজন্য আমার গৃহে যে পাপ চলিতেছিল তাহা তাহার নিকট ভয়ানক বলিয়া মনে হয়। আমি দুপুরের খাওয়ার জন্য বেলা একটার সময় বাড়ি আসিতাম। একদিন প্রায় বারোটার সময় এই পাচক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—"যদি বিস্ময়কর কিছু দেখিতে হয় তবে তাড়াতাড়ি বাড়ি আসুন।"

আমি বলিলাম –"তার মানে? কি কাজ আছে আমাকে খুলিয়া বল। আমাকে এমন করিয়া বাড়ি লইয়া তুমি কি দেখাইতে চাও?"

পাচক বলিল—"যদি না আসেন তবে পস্তাইবেন, ইহার বেশি আমি আপনাকে আর কিছু বলিতে পারিব না।"

তাহার দৃঢ়তায় আমি আকৃষ্ট হইলাম। আমার মুহুরীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ি আসিলাম। পাচক আগে আগে চলিল। সে দোতলার উপর গেল। যে কামরায় আমার সেই সঙ্গীটি থাকিত তাহা দেখাইয়া বলিল—"এই কামরা খুলিয়া দেখুন।"

এতক্ষণে আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। আমি কামরার দরজায় ঘা দিলাম। জবাব কি পাওয়া যায়? আমি খুব জোরে দরজা ঠুকিতে লাগিলাম। দেওয়াল কাঁপিতে লাগিল। দরজা খুলিল। ভিতরে এক কুচরিত্রা স্ত্রীলোককে

দেখিতে পাইলাম। আমি তাহাকে বলিলাম—"ভগ্নী, তুমি বাড়ি যাও, আর এঘরে কখনো পা দিও না।" সাথীকে বলিলাম—"আজ হইতে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ শেষ হইল। আমি খুব ঠকিয়াছি ও বেকুব বনিয়াছি। আমার বিশ্বাসের ইহাই প্রতিদান!"

সাথী ফিরিয়া দাঁড়াইল, উল্টা আমার সব কথা প্রকাশ করিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইল।

"আমার কিছুই গোপন নাই, আমি যাহা কিছু করিয়াছি তুমি খুব প্রকাশ করিয়া দিও, কিন্তু আমার সহিত সম্বন্ধ শেষ হইল।"

ইহাতে সে আরও বিগড়াইল। মুহুরী নীচে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে বলিলাম—"আপনি যান ত, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আমার সেলাম দিবেন। বলিবেন আমার এক সঙ্গী কুকার্য করিয়াছে। তাহাকে আমি বাড়ি রাখিতে চাই না, কিন্তু সে বাহির হইতে চাহিতেছে না। অনুগ্রহ করিয়া তিনি যেন সাহায্য করেন।"

অপরাধী শক্তের ভক্ত। আমি ঐ প্রকার বলিলে, সে নরম হইল। মাফ চাহিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট লোক না পাঠাইতে মিনতি করিল ও ঘর ছাড়িয়া যাইতে স্বীকার করিল। অবশেষে ঘর ছাড়িয়া গেল।

এই ঘটনা আমার জীবনে আমাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে সাবধান করিয়া দেয়। এই সঙ্গীটি যে আমার নিকট মোহের স্বরূপ ছিল, অনিষ্টের আকর হইয়াছিল, তাহা আমি এতদিনে স্পষ্টরূপে দেখিতে পারিলাম। সৎকার্য করার জন্য মন্দপথ গ্রহণ করায় যে ফল হয়, সঙ্গীকে আমার কাছে রাখায় তাহাই হইয়াছিল। আমি কণ্টক লতায় পারিজাত পাওয়ার আশা করিয়াছিলাম। তাহার চাল-চলন ভাল ছিল না। তথাপি আমার প্রতি তাহার আনুগত্যে বিশ্বাস করিতাম। তাহাকে ভাল করার চেষ্টায় আমি নিজেই প্রায় নষ্ট হইতে বসিয়াছিলাম। আমার হিতার্থীরা এই বিষয়ে যে পরামর্শ দিতেন আমি তাহারও অনাদর করিয়াছি। মোহ আমাকে অন্ধের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছিল।

যদি সেই পাচক অকস্মাৎ আমার চোখ না খুলিয়া দিত, আমি যদি সত্য ঘটনার খবর না পাইতাম, তাহা হইলে হয়ত এরূপও ঘটিতে পারিত যে, আমি যতটা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছি ততটা কখনও করিতে পারিতাম না। আমার সেবাকার্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। কেন না সেই সঙ্গীটি আমার সৎ চেষ্টায় অবশ্যই বাধা দিত। তাহার জন্য কতবার আমি বাধা পাইয়াছি।

আমাকে অন্ধকারে রাখার ও বিপথে পরিচালিত করার শক্তি তাহার ছিল।

কিন্তু রাম যাহাকে রাখেন কে তাহাকে ধ্বংস করিবে? আমার নিষ্ঠা শুদ্ধ ছিল। সেই জন্য আমি ভুল করিলেও উত্তীর্ণ হইয়াছি ও আমার এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতা আমাকে সাবধান করিয়াছে।

কে জানে ঈশ্বরই সেই পাচককে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিনা? সে রসুই করিতে জানিত না। সুতরাং আমার ওখানে সে নাও আসিতে পারিত। কিন্তু সে না আসিলে আমাকেও অন্য কেহ জাগ্রত করিতে পারিত না। সেই স্ত্রীলোকটি যে সেইদিনই কেবল আমার বাড়িতে আসিয়াছিল তাহা নয়। কিন্তু আর কাহারও কি এই পাচকের মত সাহস ছিল? সঙ্গীটির উপর আমার অহেতুক বিশ্বাসের কথা অপর সকলেই জানিত।

এইভাবে আমার উপকার করিয়া সেই পাচক সেইদিনই, সেদিন কেন, তখনই বিদায় চাহিল। তার কথা, "আমি আপনার বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আপনি ভোলা মানুষ। এখানে থাকা আমার কর্ম নয়।"

আমিও আগ্রহ করিলাম না।

এখন আমি জানিলাম যে, এই লোকটাই মুহুরীর সম্পর্কেও আমার মনে অযথা সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিল। মুহুরীর প্রতি আমি যে অবিচার করিয়াছিলাম তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি কখনো তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই। উহা আমার কাছে বরাবরই একটা দুঃখের বিষয় রহিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গা বাসন যতই সারানো হোক না কেন, তাহা মেরামতি বাসনই হয়, তাহা নূতন বা ত্রুটিহীন বাসন কদাপি হয় না।

২৪

দেশাভিমুখে

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার তিন বৎসর কাটিয়া গেল। আমি সকল লোক চিনিয়াছি, লোকেরাও আমাকে চিনিয়াছে। ১৮৯৬ সালে ছয় মাসের জন্য দেশে আসার অনুমতি চাহিলাম। কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাকে দীর্ঘদিন থাকিতে হইবে। আমার ওকালতী ভালই চলিতেছিল বলা যায়। জনসেবার কাজে আমার উপস্থিতির আবশ্যকতা

লোকেও বুঝিতে পারিয়াছিল। এইবার দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি সপরিবারে থাকাই স্থির করিলাম। সুতরাং দেশ হইতে একবার ঘুরিয়া আসাও সঙ্গত বলিয়া মনে হইল। ইহাও দেখিলাম যে, যদি দেশে যাই তবে সেখানেও জনসেবার কাজ করিতে পারিব। দেশে জনমত শিক্ষিত করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্নে তাহাদেরও চিত্ত আকর্ষণ করা যাইতে পারে। তিন পাউণ্ডের কর যেন গলিত ক্ষতের ন্যায় হইয়াছিল। যতদিন তাহা না উঠিতেছে ততদিন শান্তি নাই।

কিন্তু আমি যদি দেশে যাই তবে কংগ্রেসের ও শিক্ষা-মণ্ডলের কাজ কে চালায়? দুইজন সঙ্গীর উপর দৃষ্টি পড়িল—আদমজী মিঞা খান এবং পারসী রুস্তমজী। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভিতরেও কতকগুলি কাজের লোক ছিল। কিন্তু যাহারা সম্পাদকের কার্য করিতে পারিবে, নিয়মিতভাবে কাজ করিয়া যাইতে পারিবে ও উপনিবেশ-জাত ভারতীয়দের মন হরণ করিতে পারিবে, এমন লোকের মধ্যে উক্ত দুইজনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা যায়। সম্পাদকের ইংরাজী ভাষায় সামান্য জ্ঞান থাকাও দরকার। এই দুইজনের মধ্য হইতে পরলোকগত আদমজী মিঞা খানকে সম্পাদকের পদ দেওয়ার জন্য কংগ্রেসকে জানাইলাম এবং কংগ্রেসও তাহা অনুমোদন করিলেন। পরে দেখা গিয়াছিল যে, এই নির্বাচন খুব ভাল হইয়াছিল। কর্মনিষ্ঠা, উদারতা, মিষ্ঠ স্বভাব ও ভদ্রতা দ্বারা শেঠ আদমজী মিঞা খান সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন এবং সকলের এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের সম্পাদকের কাজ করার জন্য উকিল ব্যারিস্টার কি খুব ইংরাজী জানা লোকের আবশ্যক নাই।

১৮৯৬ সালের মধ্যভাগে আমি দেশে যাওয়ার জন্য 'পঙ্গোলা" স্টীমারে উঠিলাম। এই স্টীমার কলিকাতাগামী ছিল।

স্টীমারে অনেক যাত্রী ছিল। দুইজন ইংরাজ সরকারী আমলা ছিলেন। একজনের সঙ্গে প্রতিদিন এক ঘণ্টা সতরঞ্চ খেলা হইত। স্টীমারের ডাক্তার আমাকে একখানা "তামিল শিক্ষক" বই দেন। আমি উহা পড়িতে আরম্ভ করি।

নাতালে দেখিয়াছিলাম যে, মুসলমানদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হইলে উর্দু শিক্ষা করা দরকার। তেমনি মাদ্রাজীদের সহিত মিশিতে হইলেও তামিল জানা আবশ্যক।

উর্দু শিক্ষার জন্য সেই ইংরাজ বন্ধুর অনুরোধে, ডেকের যাত্রীদের মধ্য হইতে

বেশ এক মুন্সী খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলাম। আমাদের উর্দু শিক্ষা ভালই চলিতেছিল। ইংরাজ আমলাটি স্মরণশক্তিতে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। উর্দু অক্ষর পড়িতে আমার কষ্ট হইত, কিন্তু তিনি একবার শব্দ দেখিলে আর ভুলিতেন না। আমি আরও পরিশ্রম করিতে লাগিলাম কিন্তু তাঁহার সমান হইতে পারিলাম না।

তামিল অভ্যাসও ভালই চলিতে লাগিল। উহাতে কাহারও সাহায্য পাই নাই। পুস্তকখানা এমন ভাবেই লেখা যে অপরের সাহায্যের বিশেষ দরকার করে না।

আমার আশা ছিল যে, এই পাঠাভ্যাস যে আরম্ভ করা গেল দেশে পৌঁছিয়াও তাহা বজায় রাখিতে পারিব। কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮৯৩ সালের পর হইতে আমার পড়া ও অন্যান্য বিষয় আয়ত্ত করার কাজ প্রধানতঃ জেলেই হইয়াছে। এই উভয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি আমি কিছুটা অর্জন করিয়াছিলাম এবং তাহা জেলে গিয়াই সম্ভব হইয়াছিল—দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে তামিল, আর উর্দু যারবেদা জেলে। তাহা হইলেও তামিল ভাষা কখনো বলিতে পারি নাই। যেটুকু পড়িতে শিখিয়াছিলাম, তাহাও চর্চার অভাবে ভুলিয়া যাইতেছি। এই ভাষাজ্ঞানের অভাব আমাকে পীড়া দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় মাদ্রাজীদের কাছ হইতে আমি অপর্যাপ্ত প্রেমামৃত পান করিয়াছি। সর্বদাই তাহা আমার স্মরণে আছে। তাহাদের শ্রদ্ধা, তাহাদের কর্মচেষ্টা, তাহাদের মধ্যে অনেকের নিঃস্বার্থ ত্যাগের কথা, এখনও কোন তামিল বা তেলেগু বন্ধু দেখিলে আমার মনে হয়। উহারা প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিল, এবং পুরুষ ও স্ত্রী সমানে আমার সঙ্গে কাজে যোগ দিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার লড়াই নিরক্ষরদের জন্য করা হইয়াছিল, আর যোদ্ধাও ছিল নিরক্ষরেরাই। সে যুদ্ধ যেমন গরীবদের জন্য, যুদ্ধও করিয়াছিল তেমনি গরীবেরাই।

এই সকল সরল ও সৎস্বভাব ভাইভগ্নীদের হৃদয় আকর্ষণ করিতে আমার ভাষাজ্ঞানের অভাব কখনো অন্তরায় হয় নাই। তাহারা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী, ভাঙ্গা ইংরাজীতে কথা বলে, তাহাতেই আমাদের কাজ চলিয়া যায়। আমি এই প্রেমের প্রতিদানের জন্য তামিল ও তেলেগু শিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তামিল কতকটা শিখিয়াছিলাম; তেলেগু শিক্ষার চেষ্টাও ভারতবর্ষে করিয়াছিলাম। কিন্তু 'ক-খ'র উপর আর উঠিতে পারি নাই।

আমি তামিল তেলেগু শিখিতে পারি নাই—পারার আশাও আর রাখি না; সেইজন্য আশা করি যে দ্রাবিড় ভাষাভাষীরা হিন্দী শিক্ষা করিবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্রাবিড়-মাদ্রাজীরা অল্পবিস্তর হিন্দী বলিতে পারে। মুশকিল হইতেছে—যাহারা ইংরাজী জানে তাহাদের লইয়া। কে জানে কেন ইংরাজীর জ্ঞান আমাদের নিজেদের ভাষাজ্ঞানের অন্তরায় স্বরূপ হইয়া থাকে।

কিন্তু বিষয়ান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার জাহাজ-ভ্রমণকথা শেষ করিতে হইবে। পাঠকদের কাছে এখনও 'পঙ্গোলা' জাহাজের কাপ্তেনের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। আমাদের ভিতর বন্ধুত্ব হইয়াছিল। এই ব্যক্তিটি 'প্লাইমাউথ ব্রাদার' সম্প্রদায়ের। সেইজন্য নৌবিদ্যার আলোচনা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বিদ্যার কথাই আমাদের মধ্যে অধিক হইত। তিনি নীতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাস—এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করিতেন। তাঁহার কাছে বাইবেলের শিক্ষা ছেলেখেলার মত ছিল। ইহার সৌন্দর্য ছিল ইহার সরল বিশ্বাস। তিনি বলিতেন—"বালক, স্ত্রী, পুরুষ, সকলে যেন যীশুতে ও তাঁহার বলিদানে শ্রদ্ধা রাখে, তাহা হইলেই তাহাদের পাপ ধৌত হইয়া যাইবে।" এই 'প্লাইমাউথ ব্রাদার'টি, প্রিটোরিয়ার প্লাইমাউথ ব্রাদারটির স্মৃতি আবার নতুন করিয়া ঝালাইয়া তুলিল। যে ধর্মে নৈতিক বাধা-নিষেধ আছে তাহা তাঁহার কাছে নীরস লাগে। এই মিত্রতা ও আধ্যাত্মিক আলোচনার মূলে ছিল আমার নিরামিষ আহার। আমি কেন মাংস খাই না, গোমাংসে কি দোষ, ঈশ্বর যেমন বৃক্ষ ও শাক-সবজি মানুষের আনন্দ ও আহারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, পশু-পক্ষীও কি তেমনি সেইজন্যই সৃষ্টি করেন নাই? এই প্রশ্নমালা আধ্যাত্মিক আলোচনায় পরিণত না হইয়া যায় না।

আমরা একে অপরকে বুঝাইতে পারি নাই। আমি আমার এই সিদ্ধান্তে দৃঢ় ছিলাম যে, ধর্ম ও নীতি একই বস্তু। কাপ্তেনেরও তাঁহার নিজের মতের সত্যতার সম্বন্ধে অনুমাত্রও সন্দেহ ছিল না।

চব্বিশ দিন পরে এই আনন্দদায়ক ভ্রমণ শেষ করিয়া আমি হুগলীর সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে কলিকাতায় নামিলাম। সেই দিনই বোম্বাই যাওয়ার টিকিট করিলাম।

ভারতবর্ষে

কলিকাতা হইয়া বোম্বাই যাইতে প্রয়াগ পথে পড়ে। এখানে ট্রেন ৪৫ মিনিট থামে। এই অবকাশে আমি শহরে একবার চক্কর দিয়া আসিব স্থির করিলাম। ডাক্তারখানা হইতে আমার ঔষধ কেনারও দরকার ছিল। কেমিস্ট ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিল, তারপর ঔষধ তৈয়ারী করিতে অনেক সময় লইল। আমি স্টেশনে পঁহুছিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল। স্টেশনমাস্টার আমার জন্য এক মিনিট গাড়ি অপেক্ষা করাইয়াও আমাকে না দেখিয়া আমার জিনিসগুলি নামাইয়া লইয়াছিলেন।

আমি কেলনারের হোটেলে একটা কামরা লইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। এই শহরের 'পাইওনিয়ার' পত্রিকার খ্যাতি আমি শুনিয়াছিলাম। ঐ পত্রিকাটি যে ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী আমি তাহা জানিতাম। আমার মনে হয়, সে-সময় মিঃ চেজনী (জুনিয়ার) উহার সম্পাদক ছিলেন। আমার সংকল্প ছিল যে, সকল পক্ষের সঙ্গেই দেখা করিয়া সকলেরই সাহায্য গ্রহণ করিব। আমি তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া দেখা করার অভিপ্রায় জানাইলাম। ট্রেন ফেল করার কথা লিখিলাম ও পরদিন দুপুরেই চলিয়া যাইব জানাইলাম। জবাবে তিনি আমাকে শীঘ্রই দেখা করিতে বলিলেন। আমি সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। আমি এ বিষয়ে যাহা লিখিব তিনি তাঁহার কাগজে সে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করিবেন—একথা জানাইয়া বলিলেন—"কিন্তু আপনার সকল দাবি স্বীকার করিতে পারিব, এ কথা বলিতে পারি না। ঔপনিবেশিকদের দিকটাও ত আমাকে দেখিতে হইবে!"

আমি উত্তর দিলাম—"আপনি যদি এ প্রশ্নটা তলাইয়া দেখেন ও আলোচনা করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। আমি শুদ্ধ ন্যায়বিচার ছাড়া আর কিছুই চাই না।"

বাকি দিনটা ত্রিবেণীর রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া ও আমার হাতে যে কাজ আছে তাহার চিন্তায় কাটাইয়া দিলাম। এই আকস্মিক সাক্ষাৎ দ্বারা পরে নাতালে আমার উপর যে আক্রমণ হইয়াছিল তাহারই বীজ রোপণ করিলাম।

বোম্বাইয়ে না থামিয়া সরাসরি রাজকোট গেলাম ও সেখানে একটি বই

লিখিলাম। বইটি লিখিতে ও ছাপাইতে মাসখানেক গেল। ইহার সবুজ রং-এর মলাট ছিল। সেইজন্য বইটি পরে 'সবুজ পুঁথি' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহাতে আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুরবস্থার কথা, ইচ্ছাকৃত ভাবেই কম করিয়া লিখিয়াছিলাম। নাতালে আমি যে বই প্রকাশ করার কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহার ভাষা ইচ্ছা করিয়া তার চেয়ে নরম রাখিয়াছিলাম। কেন না আমি জানিতাম, ছোট দুঃখও দূর হইতে দেখিলে বড় বলিয়া মনে হয়। 'সবুজ পুঁথি' দশ হাজার ছাপাইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদপত্রের কাছে ও বিভিন্ন দলের নেতাদের কাছে পাঠাইলাম। পাইওনিয়ার পত্রিকাতেই ইহা সর্বপ্রথম সম্পাদক কর্তৃক আলোচিত হয়। ইহার টেলিগ্রাম বিলাতে যায় এবং তাহার খবর আবার টেলিগ্রামে রয়টার কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হয়। এই তার মাত্র তিন লাইনের ছিল। তাহাতে নাতালে ভারতীয়দের উপর যে দুর্ব্যবহার করা হয় সেই সম্বন্ধে আমার বর্ণনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল। আমি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলাম তারের খবর সে ভাষায় ছিল না। উহার যে ফল হইয়াছিল তাহা ভবিষ্যতে দেখিতে পাইব। ক্রমে ক্রমে সকল সংবাদপত্রেই এই প্রশ্নের আলোচনা হইয়াছিল।

এই পুস্তিকা ডাকে দেওয়ার মত করিয়া মুড়িয়া ফেলা এক মুশকিলের ব্যাপার হইল। কেন না সেজন্য যদি পয়সা খরচ করি তবে তাহাতে অনেক পয়সা খরচ হয়। কিন্তু সহজে একাজ করার এক বুদ্ধি বাহির করিলাম। পাড়ার ছেলেদিগকে ডাকিয়া বলিলাম যে, যেদিন স্কুল না থাকে সেইদিন সকালে দুই তিন ঘণ্টা করিয়া খাটিয়া এগুলি তাহাদের তৈরী করিয়া দিতে হইবে। ছেলেরা খুশি হইয়া এই সেবা করিতে স্বীকার করিল। আমার দিক হইতে আমি তাহাদিগকে আমার পুরানো টিকিটের সংগ্রহ যাহা ছিল তাহা দিব ও আশীর্বাদ দিব বলিয়া জানাইলাম। ছেলেরা খেলাচ্ছলে আমার কাজ উঠাইয়া দিল। ছেলেদিগকে স্বেচ্ছা-সেবক তৈরী করার এই আমার প্রথম পরীক্ষা। এই ছেলেদের ভিতর দুইজন আজ আমার সহকর্মী।

এই সময়ে বোম্বাইয়ে প্রথমবার মড়ক দেখা দিল। চারিদিকে আতঙ্ক। রাজকোটেও মড়ক দেখা দেওয়ার ভয় ছিল। আমার মনে হইল যে, আমি স্বাস্থ্যবিভাগে কাজ করিতে পারি। দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষকে আমি আমার সেবা লওয়ার জন্য লিখিলাম। রাজ্যস্তরের কমিটি গঠিত হইল ও আমাকেও তাহার ভিতরে গ্রহণ করা হইল। পায়খানার পরিচ্ছন্নতা দেখার ভার আমি

লইলাম ও কমিটিকে গলিতে গলিতে লইয়া পায়খানা পরীক্ষা করিব স্থির করিলাম। গরীব লোকেরা নিজেদের পায়খানা দেখিতে দিতে কোনও আপত্তি করিল না। কেবল তাহাই নয়, যে সংস্কার সাধন করিতে বলা হইয়াছে তাহাও কার্যে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু যখন আমরা বড়লোকদের বাড়ির পায়খানা দেখিতে বাহির হইলাম তখন কোন কোন জায়গায় পায়খানা দেখিতেই অনুমতি পাই নাই, সংস্কার ত দূরের কথা। আমার সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, ধনীদের পায়খানা বড়ই কদর্য। সেগুলি অন্ধকার, দুর্গন্ধ এবং অশেষ ক্লেদপূর্ণ—সিঁড়ির উপর কীট থিক থিক করিতে থাকে। ইহা ব্যবহার করা মানে, প্রতিদিন জীবন্ত নরকে প্রবেশ করা। আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কার খুব সাদাসিধা ছিল—মাটিতে মল পড়িতে না দিয়া বালতি ব্যবহার করা; জল মাটিতেই শুষিতে না দিয়া বালতিতে জমিতে দেওয়া; বসিবার স্থান ও মেথর আসার রাস্তার মধ্যে যে দেওয়াল আছে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা, যাহাতে মেথর উপর-নীচ সমান সাফ করিতে পারে ও পায়খানা বড় হয় ও তাহাতে হাওয়া ও আলো প্রবেশ করিতে পারে। বড়লোকেরা এই সংস্কার করিতে নানা বাধা উপস্থিত করিলেন এবং অবশেষে উহা করাই হইল না।

কমিটিকে 'ঢেড়বাড়া' বা অস্পৃশ্যদের বস্তিতেও যাইতে হয়। সেখানে সভ্যেরা যাইবেন, তারপর আবার পায়খানাও পরিদর্শন করিবেন, ইহা তাঁহাদের কাছে একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। কমিটির সভ্যদের মধ্যে মাত্র একজন আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। আমি কিন্তু 'ঢেড়বাড়াতে' গিয়া আনন্দিত ও আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আমি জীবনে প্রথম এই অঞ্চলে আসিলাম। ঢের ভাই-বহিনেরা আমাদিগকে দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। আমরা যখন পায়খানা দেখিতে চাহিলাম তখন তাহারা বলিল—

"আমাদের এখানে পায়খানা কোথায়? আমাদের পায়খানা জঙ্গলে। পায়খানা আপনাদের মত বড়মানুষদের জন্য।"

"তাহা হইলে তোমাদের ঘর ত আমাদিগকে দেখিতে দিবে?"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আসুন না ভাই সাহেব, আপনাদের যদি ইচ্ছা হয় তবে দেখুন, আমাদের আবার ঘর!"

আমি ভিতরে গেলাম। ঘর ও আঙ্গিনার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া খুশি হইলাম।

ঘরের ভিতরটা পরিষ্কার লেপা রহিয়াছে দেখিলাম। আঙ্গিনা, ঘরের ভিতর এবং যে কিছু বাসন ছিল সমস্ত সাফ—ঝক ঝক করিতেছে।

সেখানে মড়কের ভয় নাই বলিয়া মনে হইল।

একটা বাড়ির পায়খানার সম্বন্ধে না লিখিয়া পারা যায় না। প্রত্যেক ঘরে নর্দমা ত ছিলই, তাহা দিয়া জলও যায় প্রস্রাবও যায়। সেইজন্য ঘরে দুর্গন্ধ না হইয়া যায় না। এক বাড়িতে শোয়ার ঘরে নর্দমা ও পায়খানা দুই-ই দেখা গেল। এখানে মল নল দিয়া নীচে গড়াইয়া পড়ে। এই ঘরে তিষ্ঠিবার যো ছিল না। সেই গৃহস্বামী কি করিয়া যে শুইতেন তাহা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন।

কমিটি বৈষ্ণব হাবেলীতেও গিয়াছিল। হাবেলীর প্রধানের সহিত গান্ধী পরিবারের খুব ভাল সম্বন্ধ ছিল। হাবেলীর প্রধান আমাদিগকে হাবেলীর সব কিছু দেখিতে দিতে, সম্ভব হইলে সংস্কার সাধন করিতেও স্বীকৃত হইলেন। হাবেলীতে একটা অংশ ছিল যাহা তিনি নিজে কখনো দেখেন নাই। এই জায়গায় হাবেলীর ভুক্তাবশিষ্ট ও পাতা সকল দেওয়ালের উপর দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলা হয়। সেইজন্য স্থানটি কাক-চিলের ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছিল। পায়খানা ত কদর্য ছিলই। হাবেলীর প্রধান কতটা সংস্কার করিয়াছিলেন, তাহা আর আমার দেখা হয় নাই।

হাবেলীতে এই নোংরা দেখিয়া মনে দুঃখ হইল। যে হাবেলীকে আমরা পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য করি সেখানে স্বাস্থ্যের নিয়ম খুবই প্রতিপালিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। স্মৃতিকারেরা যে বাহ্যাভ্যন্তর শুচির উপর খুবই জোর দিয়াছেন, সে কথা তখনও আমি জানিতাম।

২৬

রাজভক্তি ও শুশ্রূষা

যে প্রকার শুদ্ধ রাজভক্তি আমি আমার ভিতরে অনুভব করিতেছিলাম, অন্য কাহাকেও সেরূপ করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সত্যের উপর আমার যে স্বাভাবিক নিষ্ঠা আছে, সেইখানেই আমার রাজভক্তিরও মূল—ইহা আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। রাজভক্তি অথবা অন্য কোনও বস্তুর ভান করা আমার দ্বারা কখনো হয় নাই। নাতালে আমি যে কোনও সভায় যাইতাম,

সেখানে তখন 'গড সেভ দি কিং' গীত হইত দেখিতাম। আমার মনে হইত যে, এ গানে আমারও যোগ দেওয়া দরকার। ব্রিটিশ রাজনীতির দোষ আমি তখনও জানিতাম, তাহা হইলেও মোটের উপর আমার ভালই লাগিত। তখন আমি মনে করিতাম যে, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র ও আমলারা মোটের উপর প্রজার পোষক।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি বিপরীত নীতি দেখিতাম। বর্ণ-বিদ্বেষ দেখিতাম। কিন্তু মনে করিতাম যে, উহা সাময়িক ও স্থানবিশেষে সীমিত। সেইজন্য রাজভক্তিতে আমি ইংরাজদের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করিতে চাহিতাম। সেইজন্য ইংরাজের রাষ্ট্রগীতি 'গড সেভ দি কিং' আমি শিখিয়া লইয়াছিলাম। উহা সভায় গীত হইলে আমার সুরও উহাতে মিলাইতাম, এবং যে যে স্থানে রাজভক্তি দেখানো আবশ্যক বিনা আড়ম্বরে দেখাইতাম।

আমি কখনো আমার জীবনে এই রাজভক্তি স্বার্থের জন্য ব্যবহার করি নাই। উহা হইতে কোন প্রকারে লাভবান হওয়ার ধারণা আমার কোনও দিন হয় নাই। রাজ-অনুরক্তিকে ঋণ মনে করিয়া আমি সর্বদাই তাহা শোধ দিয়া আসিয়াছি।

যখন ভারতবর্ষে আসিলাম তখন মহারাণীর হীরক জুবিলীর জন্য প্রস্তুত হওয়া আরম্ভ হইয়াছে। রাজকোটেও এক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। তাহাতে আমি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। আমি নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলাম। কমিটির কার্যে দম্ভের স্পর্শ আছে বলিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল। আমি দেখিলাম যে, লোক দেখানোর জন্য সমস্ত আয়োজন হইতেছে। দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। সমিতিতে থাকিব কিনা এই প্রশ্ন আমার নিকট উপস্থিত হইল। অবশেষে আমার কর্তব্য পালন করিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে স্থির করিলাম।

'বৃক্ষরোপণ' করার এক প্রস্তাব ছিল। ইহার ভিতরেও আমি দম্ভ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম—বৃক্ষরোপণ কেবল সাহেবদের খুশি করার জন্যই করা হইতেছে। আমি লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, বৃক্ষরোপণ করিতে কেউ বাধ্য নন, উহা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। যদি রোপণ করিতে হয়, তবে আন্তরিকতার সঙ্গে করিবেন, নচেৎ আদৌ করা উচিত নয়। আমার স্মরণ আছে যে, এরূপ বলাতে লোকে আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। আমার বৃক্ষরোপণ কার্য আমি রীতিমতই করিয়াছিলাম এবং বৃক্ষটির যত্ন লইয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে।

পরিবারের ছেলেদের ‘গড সেভ দি কিং’ শিখাইতাম। ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদিগকেও শিখাইয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে। কিন্তু উহা সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের সময় না জুবিলীর সময় তাহা মনে নাই। পরে এই গান গাহিতে আমার খটকা লাগিত। অহিংসা সম্বন্ধে আমার ধারণা যতই স্পষ্ট হইতে লাগিল, আমার বাক্য ও চিন্তা সম্বন্ধেও আমি ততই সতর্ক হইতে লাগিলাম। এই গানে এই দুই লাইন আছে :—

"ছিন্ন কর গো শত্রুরে তার—কর তাহাদের নাশ,
ব্যর্থ কর গো তাদের বুদ্ধি—শয়তানী অভিলাষ।"

ইহা গান করিতে আমার খটকা লাগিল। আমার মিত্র ডাক্তার বুথকে আমার অসুবিধার কথা বলিলাম। তিনি স্বীকার করিলেন যে, অহিংসা মানুষের এই গান করা শোভা পায় না। শত্রু হইলেই যে শয়তান হইবে একথা কি করিয়া বলা যায়? শত্রু হইলেই যে খারাপ—ইহাই বা কি করিয়া স্বীকার করা যায়? ঈশ্বরের নিকট ত কেবলমাত্র ন্যায়ই প্রার্থনা করা যায়। ডাঃ বুথও এই যুক্তি স্বীকার করিলেন। তাঁহার নিজের সমাজে গাওয়ার জন্য নূতন গান রচনা করিলেন। এই ডাক্তার বুথের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় পরে হইবে।

অনুরক্তির ন্যায় শুশ্রূষাও আমার একটি স্বভাব-লব্ধ গুণ। রোগী নিজের লোকই হোক, কি পরই হোক, তাহাকে শুশ্রূষা করিতে ভাল লাগে, একথা বলিতে পারি। রাজকোটে থাকিয়া যখন দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ করিতেছিলাম সেই সময় একবার বোম্বাই ঘুরিয়া আসিলাম। প্রধান প্রধান শহরগুলিতে সভা আহ্বান করিয়া লোকমত গঠন করিতে ইচ্ছা ছিল। এইজন্যই গিয়াছিলাম। প্রথমতঃ জজ রাণাডের সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিলেন ও আমাকে স্যার ফিরোজশা মেহতার সঙ্গে দেখা করিতে বলিলেন। তাহার পর আমি জস্টিস বদরুদ্দীন তৈয়বজীর সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনিও আমার কথা শুনিয়া সেই পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন—"জস্টিস রাণাডে অথবা আমার, আপনাকে এ বিষয়ে পরিচালিত করিবার শক্তি খুব বেশি নাই। আপনি ত আমাদের অবস্থা জানেন। প্রকাশ্যভাবে ইহাতে আমরা যোগ দিতে পারি না। কিন্তু আপনার সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি রহিয়াছে। সত্যকার পরিচালক হইতে পারেন স্যার ফিরোজশা।"

স্যার ফিরোজশার সঙ্গে দেখা করিতামই। কিন্তু এই দুই গুরুজনের কাছ

হইতে তাঁহারই পরামর্শ অনুযায়ী চলার উপদেশ শুনিয়া, ফিরোজশার লোক-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইল।

ফিরোজশার সঙ্গে দেখা করিলাম। আমি তাঁহার দ্বারা অভিভূত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তাঁহাকে যে সকল আখ্যা দেওয়া হয় তাহা আমি শুনিয়াছিলাম। সুতরাং আমি জানিতাম—এইবার "বোম্বাইয়ের সিংহ", "বোম্বাইয়ের মুকুটহীন বাদশাহের" সঙ্গে আমাকে দেখা করিতে হইবে। কিন্তু বাদশাহ আমাকে ভড়কাইয়া দিলেন না। পিতা যুবক পুত্রকে যেরূপ স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করেন, তিনিও সেইরূপ স্নেহের সঙ্গেই আমাকে গ্রহণ করিলেন। চেম্বারে তাঁহার সঙ্গে আমাকে দেখা করিতে বলিলেন। তিনি তাঁহার অনুবর্তী বন্ধুগণ দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। সেখানে ওয়াচা ছিলেন, কামা ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ওয়াচার নাম আমি শুনিয়াছিলাম। তাঁকে ফিরোজশার ডান হাত বলিয়া গণ্য করা হইত। বীরচন্দ গান্ধী তাঁহাকে পরিসংখ্যানবিদ বা 'স্ট্যাটিসটিসিয়ান' বলিয়া আমার কাছে পরিচয় দিয়াছিলেন। ওয়াচা বলিলেন—"গান্ধী, আমাদের আবার দেখা হইবে।"

এ সমস্তই দুই মিনিটের মধ্যে হইয়া গেল। স্যার ফিরোজশা আমার কথা শুনিয়া লইয়াছিলেন। জস্টিস রাণাডে ও তৈয়বজীর সঙ্গে যে আমি দেখা করিয়াছিলাম তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। "গান্ধী, তোমার জন্য আমাকে জনসাধারণের সভা আহ্বান করিতে হইবে। তোমাকে সাহায্য করিতে হইবে।" তারপর মুন্সীর দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে সভার দিন স্থির করিতে বলিলেন। দিন ঠিক করিয়া আমাকে বিদায় সম্ভাষণ করিলেন এবং সভার পূর্বদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিলেন। আমি নির্ভয় হইয়া ও মনের আনন্দে বাড়ি ফিরিলাম।

বোম্বাইএ আমার যে ভগ্নীপতি ছিলেন এই সময় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার অসুখ হইয়াছিল এবং আর্থিক অবস্থাও তাঁহার ভাল ছিল না। ভগ্নী তাঁহাকে একা শুশ্রূষা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। পীড়া গুরুতর ছিল, আমি তাঁহাকে আমাদের বাড়িতে আসিতে বলিলাম। তাঁহারা সম্মত হইলেন। ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে লইয়া রাজকোটে আসিলাম। আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম ব্যারাম তদপেক্ষা গুরুতর ছিল। আমি তাঁহাকে আমার ঘরেই রাখিলাম। সারাদিন তাঁহার কাছে থাকিতাম। রাত্রিতে জাগিতে হইত। তাঁহার তাঁকে

সেবা করার সময়ও আমি দক্ষিণ আফ্রিকার কাজই করিতেছিলাম। ভগ্নীপতির স্বর্গলাভ হইল। কিন্তু তাঁহার সেবা করার অবকাশ যে আমি পাইয়াছিলাম, সেজন্য আমার মনে যথেষ্ট তৃপ্তি আসিয়াছিল।

আমার এই শুশ্রূষা করার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃই বৃহৎ আকার ধারণ করে। অবশেষে উহা এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, শুশ্রূষার জন্য অনেক সময় আমি কাজকেও উপেক্ষা করিয়াছি। স্ত্রীকে এমন কি সমস্ত পরিবারকেও উহাতে নিযুক্ত করিয়াছি।

এই সেবাবৃত্তির ভিতর যখন আনন্দ না থাকে তখন ইহার কোনও স্বার্থকতা নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে ইহার আকর্ষণ স্থায়ীও হইতে পারে না। খাতিরে পড়িয়া অথবা লোক দেখানোর জন্য অথবা লজ্জার ভয়ে যে সেবা তাহা লোককে নীচু করিয়া ফেলে, নীরস করিয়া ফেলে। যে সেবার আনন্দ নাই তাহাতে না আছে সেবকের লাভ, না আছে সেবিতের উপকার। যে সেবায় আনন্দ আছে সে সেবার তুলনায় আরাম অথবা অর্থোপার্জন-প্রবৃত্তি তুচ্ছ বোধ হয়।

২৭

বোম্বাই-এ সভা

ভগ্নীপতির মৃত্যুর পরদিনই সভার জন্য আমাকে বোম্বাই যাইতে হইয়াছিল। সাধারণ সভার জন্য বক্তৃতা তৈরী করিতে আমার সময় হয় নাই। রাত জাগিয়া ক্লান্তি আসিয়াছিল। গলার স্বর বসিয়া গিয়াছিল। ঈশ্বর যেমন করিয়া হোক আমাকে দিয়া কাজ চালাইয়া লইবেন, এইপ্রকার ভাবিয়া আমি বোম্বাই গেলাম। বক্তৃতা লেখার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

সভার পূর্বদিন সন্ধ্যা পাঁচটার সময় নির্দেশমত স্যার ফিরোজশার আপিসে হাজির হইলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"গান্ধী, তোমার বক্তৃতা তৈরী আছে ত?"

"না জী, আমি ত বক্তৃতা মুখে-মুখেই করিব স্থির করিয়াছি।"—ভয়ে ভয়ে আমি এই জবাব দিলাম।

"বোম্বাই-এ উহা চলিবে না। এখানে বক্তৃতা ভারি খারাপভাবে রিপোর্ট করা হয়। যদি এই সভা হইতে কিছু সুবিধা করিয়া লইতে চাও, তবে তোমাকে বক্তৃতা লিখিতে হইবে ও রাতারাতি ছাপাইয়া ফেলিতে হইবে। বক্তৃতাটা

রাত্রিতে লিখিয়া ফেলিতে পারিবে না?"

আমি শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম, এবং লিখিতে চেষ্টা করিব বলিলাম।

"তাহা হইলে তোমার কাছ থেকে বক্তৃতা আনিবার জন্য কখন লোক যাইবে?"—বোম্বাইয়ের সিংহ বলিয়া উঠিলেন।

"এগারটার সময়।"—আমি উত্তর দিলাম।

স্যার ফিরোজশা মুন্সীকে ঐ সময় বক্তৃতা লইয়া আসিয়া রাত্রেই ছাপিয়া ফেলিতে আদেশ করিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

পরদিন সভায় গেলাম। বক্তৃতা লিখিয়া ফেলার কথা বলার মধ্যে কতটা বিজ্ঞতা ছিল তাহা আমি দেখিতে পাইলাম। করমজী কাওয়াসজী ইনস্টিটিউট হলে সভা হইয়াছিল। আমি শুনিয়াছিলাম যে, যদি স্যার ফিরোজশার বক্তৃতা থাকে তবে সভায় দাঁড়াইবার স্থান থাকে না; প্রধানতঃ ছাত্ররাই শ্রোতা থাকে।

এই প্রকার সভার আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। আমার বোধ হইল আমার স্বর কেউ শুনিতে পাইবে না। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। স্যার ফিরোজশা আমাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন—'আর একটু জোরে বল—আর একটু জোরে'—এই রকম বলিতে লাগিলেন। আমার ত মনে হয় আমার স্বর ক্রমে নীচু হইতে লাগিল।

আমার পুরাতন বন্ধু কেশবরাও দেশপাণ্ডে আমাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতে আমি বক্তৃতাখানা দিয়াছিলাম। তাঁহার কণ্ঠস্বর উপযুক্ত ছিল, কিন্তু শ্রোতৃবর্গ কি তাহা শোনে? 'ওয়াচা, ওয়াচা' শব্দ হইতে লাগিল। ওয়াচা উঠিলেন। তিনি দেশপাণ্ডের কাছ হইতে কাগজখানা লইলেন ও আমার কার্য নিষ্পন্ন করিলেন। সভা তখনই শান্ত হইল ও শেষ পর্যন্ত সকলে বক্তৃতা শুনিল। যেখানে নিন্দার সেখানে 'শেম শেম' ও যেখানে হর্ষের সেখানে হাততালির ধ্বনি হইতে লাগিল। আমি সন্তুষ্ট হইলাম।

স্যার ফিরোজশার নিকটও ঐ বক্তৃতা ভাল লাগিয়াছিল। আমি অতিমাত্রায় আনন্দিত হইলাম।

এই সভার ফলস্বরূপ দেশপাণ্ডে ও একজন পারসী ভদ্রলোক এই কার্যে আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা উভয়েই আমার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। পারসী ভদ্রলোকটি এখন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী,

সেইজন্য তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে ভয় হয়। তাঁহাকে জজ খরশেদজী সংকল্পচ্যুত করেন এবং ঐ বিচ্যুতির পশ্চাতে এক পারসী ভগ্নী ছিলেন। সমস্যা দাঁড়াইল—তিনি বিবাহ করিবেন, কি দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিবেন? তিনি বিবাহ করাই বাছিয়া লইয়াছিলেন। এই পারসী বন্ধুর চ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত পারসী রুস্তমজী করেন এবং এই পারসী ভগ্নীর চ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন অন্যান্য পারসী ভগ্নীরা যাঁহারা খাদির কাজে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। সেইজন্য এই দম্পতিকে আমি মাফ করিয়াছি। দেশপাণ্ডের পরিণয়ের প্রলোভন ছিল না। কিন্তু তিনিও আসিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত তিনি নিজেই করিতেছেন। আবার ফিরিবার সময় জাঞ্জীবারে এক তৈয়বজীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনিও যাওয়ার আশা দিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় কে আসে? এই না আসার দোষ তাঁহার বদলে আব্বাস তৈয়বজী ভোগ করিতেছেন। আমার ব্যারিস্টার বন্ধুদের দক্ষিণ আফ্রিকায় লইয়া যাওয়ার ইচ্ছা, এইভাবে নিষ্ফল হইয়াছে।

এইস্থানে আমার পেস্তনজী পাদশাহের কথা স্মরণ হইতেছে। তাঁহার সঙ্গে বিলাতেই আমার মধুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। লণ্ডনের এক নিরামিষ ভোজন-গৃহে পেস্তনজীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাঁহার ভাই বরজোরজীর 'পাগল' খ্যাতির কথা আমি জানিতাম। কিন্তু কখনো দেখি নাই। তিনি ঘোড়ার প্রতি দয়াবশতঃ ট্রামে চড়িতেন না। শতাবধানীর ন্যায় স্মরণ-শক্তি থাকিলেও তিনি ডিগ্রী লন নাই। স্বভাব এমন স্বাধীন ছিল যে কোনও বন্ধন মানিতেন না, এবং পারসী হইয়াও নিরামিষাহারী। পেস্তনজী ইঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যও প্রখর ছিল। বিলাতেও তিনি এই খ্যাতি পাইয়াছিলেন। তবে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কের মূল ছিল নিরামিষাহার। তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট পৌঁছানো আমার শক্তির বহির্ভূত ছিল।

বোম্বাই-এ পেস্তনজীকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। তিনি হাইকোর্টে 'প্রোথোনোটারী' ছিলেন। যখন তাঁহার সহিত দেখা হয় তখন তিনি বৃহৎ গুজরাটী অভিধান প্রণয়নে নিযুক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে সাহায্য করার জন্য আমি একজন বন্ধুকেও বাদ দিই নাই। পেস্তনজী পাদশাহ ত আমাকেই দক্ষিণ আফ্রিকায় না যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলিলেন—"আমি আপনাকে সাহায্য করিব কি, আপনার যাওয়াই আমি পছন্দ করি না। কেন

নিজের দেশে কি কিছু কম কাজ আছে? আপনার ভাষার দিকে তাকাইলেই দেখিবেন—সেখানে সেবার কত দরকার। আমাদের বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা নাই। ইহা সেবার একটি ক্ষেত্র। দেশের দারিদ্র্যের কথা ধরুন। দক্ষিণ আফ্রিকায় কষ্ট আছে, কিন্তু তাহার জন্য আপনার মত লোককে অপব্যয় করা আমি সহ্য করিতে পারি না। যদি এখানে আপনি স্বাধীনতা পাইতে পারেন, তবে ওখানেও সাহায্য করিতে পারিবেন। আমি জানি, আমি আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিব না, কিন্তু আপনার ন্যায় অপর কাহাকে আপনার সাথী হওয়ারও ত সাহায্য করিতে পারিব না।" আমার একথা ভাল লাগিল না। কিন্তু পেস্তনজী পাদশাহ সম্বন্ধে সম্মান বাড়িল। তাঁহার দেশ-প্রেম, ভাষা-প্রেম দেখিয়া আমি মোহিত হইলাম। আমাদের মধ্যে প্রেম-বন্ধন ইহাতে আরো দৃঢ় হইল। তাঁহার দৃষ্টিকেন্দ্র আমি পুরাপুরি দেখিতে পাইলাম। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজ ছাড়ার বদলে, আরো বেশি করিয়া ধরিয়া থাকা দরকার বলিয়া আমার মনে হইল।

দেশ-প্রেমী মাতৃভূমিকে সেবা করার কোন পথকেই উপেক্ষা করিতে পারে না। আমার জন্য গীতার শ্লোকে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ * ৩।৩৫

অর্থাৎ, পরধর্ম সুলভ হইলেও এবং তাহা নিজধর্ম গুণহীন হইলেও, নিজধর্ম অনেক শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে মৃত্যুও শ্রেয়। পরধর্ম ভয়াবহ।

২৮

পুণায়

স্যার ফিরোজশা আমার যাত্রাপথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে আমি পুণায় গেলাম। পুণায় দুই দল আছে সে খবর আমি জানিতাম। আমার সকলেরই সাহায্য লইতে হইবে। লোকমান্যের সহিত দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন :—

"দুই দলের সাহায্য লওয়া যে স্থির করিয়াছেন তাহা খুব ভাল। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে মতভেদ নাই। কিন্তু আপনার একজন নিরপেক্ষ সভাপতি দরকার। আপনি প্রফেসর ভাণ্ডারকরের সঙ্গে দেখা করুন। তিনি

আজকাল কোনও আন্দোলনে যোগ দেন না, তবে এই কাজে যোগ দিতে পারেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া কি ফল হইল, আমাকে জানাইবেন। আমি আপনাকে পুরাপুরি সাহায্য করিতে চাই। আপনি প্রফেসর গোখলের সহিত ত দেখা করিবেন নিশ্চয়ই। যখনই ইচ্ছা আমার সঙ্গে অসংকোচে দেখা করিতে আসিবেন।"

লোকমান্যকে আমি এই প্রথম দেখিলাম। তাঁহার লোকপ্রিয়তার কারণ আমি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম।

এই স্থান হইতে আমি গোখলের কাছে গেলাম। তিনি ফার্গুসন কলেজে ছিলেন। আমাকে খুব আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন ও আপনার লোক করিয়া লইলেন। তাঁহার সঙ্গেও আমার প্রথম পরিচয়। কিন্তু কে জানে কেন, আমার মনে হইল এই পরিচয় যেন কতকালের। স্যার ফিরোজশাকে আমার হিমালয়ের মত লাগিয়াছিল, আর লোকমান্যকে সমুদ্রের মত। গোখলেকে দেখিলাম গঙ্গার ন্যায়। উহাতে স্নান করা যায়। হিমালয়ে চড়া যায় না, সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবার ভয় আছে। কিন্তু গঙ্গার কোলে খেলা করা যায়, ডিঙ্গি লইয়া পার হওয়া যায়। গোখলে আমাকে খুব ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন, যেন কোন ছাত্র স্কুলে ভর্তি হইতে আসিয়াছে। কাহার কাহার সহিত দেখা করিব, কেমন করিয়া দেখা করিব, তাহা বলিয়া দিলেন ও আমার বক্তৃতা দেখিতে চাহিলেন। আমাকে কলেজটি ঘুরিয়া ফিরাইয়া দেখাইলেন। যখন দেখা করার দরকার হয় তখন আবার দেখা করিতে ও ডাক্তার ভাণ্ডারকর কি বলেন তাহা জানাইতে বলিয়া তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে গোখলে জীবিতকালে আমার হৃদয়ে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং দেহান্তের পর আজও যে আসন অধিকার করিতেছেন, সে স্থান আর কেউ পান নাই।

যেমন পুত্রকে পিতা স্নেহ করেন, তেমনি ভাণ্ডারকর আমাকে গভীর স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কাছে যখন গেলাম তখন দুপুর হইয়াছে। তখন পর্যন্তও আমি আমার কাজ করিয়া যাইতেছি। ইহাতেই এই উদ্যমশীল শাস্ত্রজ্ঞের আমাকে ভাল লাগিল। নিরপেক্ষ সভাপতি করায় আমার আগ্রহ দেখিয়া তিনি উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক কথা, ঠিক কথা।" আমার কাজের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"যাহাকে হোক জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে যে, আমি আজকাল কোনও রাজনৈতিক কাজে যোগ

দিই না। কিন্তু তোমাকে আমি ফিরাইতে পারি না। তোমার মামলা এত জোরালো এবং তোমার উদ্যম এমন প্রবল যে, তোমার সভায় যাইতে আমার অস্বীকার করার উপায় নাই। শ্রীযুত তিলক ও শ্রীযুত গোখলের সহিত দেখা করিয়া ভাল করিয়াছ। তাঁহাদের বলিও যে, উভয় পক্ষ হইতে সভা আহ্বান করিলে আমি যাইব ও সভাপতি হইব। সময়ের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নাই। যে সময় উভয় পক্ষের অনুকূল হইবে সেই সময়েই আমার সুবিধা হইবে।" ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ দিয়া তিনি আমাকে বিদায় দিলেন।

বিনা গণ্ডগোলে বিনা আড়ম্বরে এক সামান্য গৃহে পুণার এই বিদ্বান ও ত্যাগী মণ্ডল সভা করিলেন ও আমাকে সম্পূর্ণ উৎসাহিত করিয়া বিদায় দিলেন।

আমি সেখান হইতে মাদ্রাজ গেলাম। উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মাদ্রাজ আমার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বালাসুন্দরমের কাহিনী সভায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আমার বক্তৃতা আমার আন্দাজে দীর্ঘ হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দ সভার লোক মনোযোগপূর্বক শুনিয়াছিল। সভার পর 'সবুজ পুঁথি'র জন্য হিড়িক পড়িয়া যায়। মাদ্রাজে বইটি সংশোধন করিয়া দশ হাজার ছাপাই। তাহার বেশিভাগ খরচ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমি দেখিয়াছিলাম যে, দশ হাজার আবশ্যক ছিল না—উৎসাহের বেগে বেশি ছাপানো হইয়াছিল। আমার বক্তৃতার প্রভাব ত কেবল ইংরাজী-ভাষা জানা লেখকের উপর পড়িয়াছিল। কেবল সেই শ্রেণীর জন্য মাদ্রাজে দশ হাজার বই ছাপানোর দরকার ছিল না।

এখানে সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য আমি স্বর্গগত জি. পরমেশ্বরণ পিল্লের নিকট হইতে পাই। তিনি 'মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ডে'র সম্পাদক ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা তিনি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার অফিসে সময় সময় ডাকিতেন ও উপদেশ দিতেন। 'হিন্দু' পত্রিকার শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গেও দেখা করিয়াছিলাম। তিনি ও ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু জি. পরমেশ্বরণ তাঁহার নিজের কাগজখানা আমাকে এই কাজের জন্য যথা-ইচ্ছা ব্যবহার করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং আমিও ব্যবহার করিয়াছিলাম। সভা 'পাচ্যাপ্পা' হলে হইয়াছিল। ডাক্তার সুব্রহ্মণ্যম সভাপতি হইয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে।

মাদ্রাজে আমি অনেকের কাছ হইতে ভালবাসা ও উৎসাহ পাইয়াছিলাম।

যদিও তাঁহাদের সকলের সঙ্গে ইংরাজীতে কথাবার্তা বলিতে হইয়াছিল, তথাপি আমার সেখানে নিজের বাড়ির মত মনে হইতেছিল। ভালবাসা কোন্ বাধা না লঙ্ঘন করিতে পারে?

২৯

শীঘ্র ফিরিয়া আসুন

মাদ্রাজ হইতে আমি কলিকাতায় গেলাম। কলিকাতায় গিয়া বড়ই মুশকিলে পড়িলাম। উঠিলাম গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে। কাহারও সঙ্গে পরিচয় নাই। হোটেলে 'ডেলী টেলিগ্রাফের' প্রতিনিধি এলারথর্পের সঙ্গে পরিচয় হইল। তিনি বেঙ্গল ক্লাবে থাকিতেন। সেখানে আমাকে তিনি নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন তিনি জানিতেন না যে, হোটেলের বৈঠকখানায় (ড্রইং রুমে) ভারতবাসীর প্রবেশ নিষেধ। পরে তিনি এই বাধার বিষয় জানিতে পারেন এবং আমাকে তাঁহার নিজের কামরায় লইয়া যান। স্থানীয় ইংরাজদের ভারতবাসীর প্রতি এই বিরুদ্ধভাবের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমাকে বৈঠকখানায় না লইয়া যাইতে পারার জন্য ক্ষমাও চাহিয়াছিলেন।

বাঙ্গলার সর্বজনমান্য সুরেন্দ্রনাথের সহিত ত দেখা করিতে হইবেই। তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। আমি যখন দেখা করিলাম তখন তাঁহার চারদিকে আরো অন্য লোক ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"আপনার এই কাজে লোক যে মনোযোগ দিবে এমন বোধ হয় না। আপনি ত জানেন—আমাদের এখানকার ঝঞ্ঝাটই কম নয়। তবুও আপনার জন্য যতটা পারা যায় করিতে হইবে। এই কাজে আপনার মহারাজাদের সাহায্য লওয়া দরকার। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং রাজা স্যার প্যারীমোহন মুখার্জী ও মহারাজ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করুন। ইঁহারা উভয়েই উদার প্রকৃতির লোক এবং জনসেবার কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।" এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আমি দেখা করিলাম। কিন্তু কোন সুবিধা হইল না। তাঁহারা গা লাগাইলেন না। দুইজনেই এক কথা বলিলেন—"কলিকাতায় সাধারণ সভা করা সহজ কথা নয়। যদি করিতে হয়, তবে তা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উপর নির্ভর করে।"

আমার অসুবিধা ক্রমবর্ধমান হইতে চলিল। 'অমৃতবাজার' পত্রিকার অফিসে

গেলাম। যে ভদ্রলোক আমার সহিত দেখা করিলেন, তিনি আমাকে কোনও ভবঘুরে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। 'বঙ্গবাসী'তে গিয়া নাকালের একশেষ হইলাম। আমাকে ত ঘণ্টাখানেক বসাইয়া রাখিলেন। সম্পাদক মহাশয় অপরের সহিত কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার কাছে লোক যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু আমার দিকে তিনি ফিরিয়াও তাকান না। এক ঘণ্টা আশা করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমি কথা বলিতে আরম্ভ করিতেই তিনি বলিলেন—"আপনি দেখিতেছেন না, আমার হাতে কত কাজ রহিয়াছে? আপনার মত বহু লোক আমার কাছে আসিয়া থাকে। আপনি চলিয়া যাইতে পারেন। আমি আপনার কথা শুনিতে পারিব না।" আমার মনে অল্পক্ষণের জন্য দুঃখ হইল। কিন্তু তখনই আমি সম্পাদকের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। 'বঙ্গবাসী'র খ্যাতি শুনিয়াছিলাম। সম্পাদকের নিকট যে লোকজন যাতায়াত করিতেছে তাহাও দেখিলাম। তাঁহারা সকলেই তাঁহার পরিচিত। তাঁহার কাগজে আলোচ্য বিষয়ের অভাব ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকার নামও তখন কেউ শোনে নাই। তাঁর কাছে নিত্য নতুন লোক নিজের দুঃখের কাহিনী বলিতে আসে. আর তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দুঃখকেই সর্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করে। সম্পাদকের কাছে তাহাদের ভিড় লাগিয়াই আছে। সম্পাদক বেচারা আর কি করে? আর্তজন মনে করে—সম্পাদকের মস্ত একটা শক্তি আছে। সম্পাদক ত জানেন যে, তাঁর কর্তৃত্ব তাঁহার আপিসঘরের দরজার বাহিরে এক পাও নয়।

আমি নিরাশ হইলাম না। অন্যান্য সম্পাদকদের সঙ্গে দেখা করিতে লাগিলাম। আমার প্রথা অনুযায়ী আমি ইংরাজদের কাছেও গেলাম। 'স্টেটসম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' উভয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্নের গুরুত্ব জানিতেন। তাঁরা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করিলেন। 'ইংলিশম্যানের' মিঃ সনডার্স আমাকে আপনজনের মত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আপিস আমার অবাধ ব্যবহারের জন্য মুক্ত করিয়া দিলেন, তাঁহার কাগজ আমার ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি যে সম্পাদকীয় মন্তব্য এ বিষয়ে লিখিয়াছিলেন, তাহাও আমাকে আবশ্যক মত সংশোধন করিয়া দিতে অনুমতি দিলেন। আমাদের মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছিল—একথা বলার অতিশয়োক্তি হইবে না। তাঁহার দ্বারা যে সাহায্য হইতে পারে, তাহা তিনি করিবেন বলিয়া আমাকে কথা দিলেন এবং আমি দক্ষিণ আফ্রিকায়

ফিরিয়া গেলে তাঁহাকে পত্র লিখিতে বলিলেন। আমি জানি, তিনি তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীর খারাপ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমার সঙ্গে পত্রালাপ বন্ধ করেন নাই। আমার জীবনে এই প্রকার অপ্রত্যাশিত মধুর সম্বন্ধ অনেক হইয়াছে। আমার ভিতরে অতিশয়োক্তির অভাব ও সত্যপরায়ণতা লক্ষ্য করিয়াই মিঃ সনডার্সের আমাকে ভাল লাগিয়াছিল। তিনি আমাকে কম জেরা করেন নাই। তিনি এই জেরা হইতে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের দিকটাও পক্ষপাতশূন্য হইয়া আমি দেখিতেছি এবং তাহাদের স্বার্থের সম্বন্ধেও আমার দৃষ্টি অন্ধ নহে।

আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বলিতেছে যে, বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি ন্যায়বিচার করিলেই নিজের পক্ষেও ন্যায়বিচার পাওয়া সহজে যায়।

এই প্রকার অপ্রত্যাশিত সাহায্য পাইয়া কলিকাতাতেও সাধারণ সভা করার আশা হইল। ইতিমধ্যে ডারবান হইতে তার পাইলাম—"পার্লামেণ্ট জানুয়ারিতে বসিবে। শীঘ্র ফিরিয়া আসুন।"

অতঃপর আমি সংবাদপত্রে জানাইয়া দিলাম—কেন আমাকে এখনই ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। প্রথম যে স্টীমার বোম্বাই হইতে পাওয়া যায় তাহাতেই আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য দাদা আবদুল্লার বোম্বাইএর এজেণ্টকে তার করিলাম। দাদা আবদুল্লা নিজে 'কুরল্যাণ্ড' স্টীমারখানা কিনিয়া লইয়াছিলেন। সেইজন্য উহাতেই আমাকে সপরিবারে বিনাব্যয়ে লইয়া যাওয়ার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিলেন। আমি ধন্যবাদের সহিত এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া ডিসেম্বরের প্রথম ভাগেই আমার ধর্মপত্নী, দুই পুত্র এবং আমার বিধবা ভগ্নীর একমাত্র পুত্রকে লইয়া দ্বিতীয়বার দক্ষিণ আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই স্টীমারের সঙ্গে দ্বিতীয় স্টীমার 'নাদেরী'ও রওনা হইল। উহার এজেণ্টও দাদা আবদুল্লা। দুই স্টীমারে মোট প্রায় আটশত ভারতীয় যাত্রী ছিল। তাহাদের অর্ধেকের বেশি ট্রান্সভাল যাইতেছিল।

তৃতীয় ভাগ

তরঙ্গ গর্জন

সপরিবারে ইহাই আমার প্রথম সমুদ্র-যাত্রা। আমি অনেকবার একথা লিখিয়াছি যে, হিন্দু-সংসারে বাল্য-বিবাহ হইলেও এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামী লেখাপড়া জানা হইলেও স্ত্রী নিরক্ষর থাকে। আর তাহাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধান থাকিয়া যায় এবং স্বামীকে স্ত্রীর শিক্ষক হইতে হয়। আমাকে আমার স্ত্রীর ও ছেলেপুলেদের, পোশাকপরিচ্ছদ, খাওয়া-পরা ও চাল-চলন সামলাইয়া লইতে হইত। উহাদের আচার-ব্যবহার আমাকে শিখাইতে হইত। তখনকার দিনের কয়েকটি ঘটনার কথা মনে হইল খুব হাসি পায়। হিন্দু স্ত্রী পতিপরায়ণতাকে ধর্মের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মানে, হিন্দু স্বামী নিজেকে স্ত্রীর ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। স্ত্রীকে সে যেমন নাচায় স্ত্রী তেমনি নাচে।

যে সময়ের কথা আমি লিখিতেছি তখন আমি মনে করিতাম যে, সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে যথাসম্ভব ইউরোপীয়দের মত হইতে হইবে। এইপ্রকার করিলেই খাতির পাওয়া যাইবে, আর খাতিরে না জমিলে দেশ-সেবা করা যায় না।

সেইজন্য স্ত্রীর ও ছেলেদের পোশাক কেমন হইবে আমিই স্থির করিয়া দিলাম। ছেলেপুলেদের যদি কাথিয়াওয়াড়ী বাণিয়ার মত দেখায় তবে কি ভাল লাগে? পারসীরা সকলের চেয়ে বেশি সভ্য হইয়াছে বলিয়া লোকে জানিত। সেইজন্য ইউরোপীয় পোশাকের অনুকরণে যেখানে অসুবিধা হইল সেখানে পারসীর অনুকরণ করিলাম। স্ত্রীর জন্য পারসী ভগ্নীরা যে শাড়ি পরেন সেই শাড়ি ও ছেলেদের জন্য পারসী কোট পাতলুন আনিয়া দিলাম। জুতা-মোজা ত সকলেরই থাকাই চাই। এই দুইটা জিনিস স্ত্রীর ও ছেলেদের অনেক দিন ধরিয়া ভাল লাগে নাই। জুতায় পা চাপিয়া ধরে, মোজায় দুর্গন্ধ হয়, পা ব্যথা করে। কিন্তু এসকল অসুবিধার জবাব আমার কাছে তৈরি ছিল। জবাবের মধ্যে যুক্তি যত না ছিল হুকুমের জোর ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি। নাচার হইয়াই স্ত্রীও ছেলেরা পোশাকের পরিবর্তন স্বীকার করিয়া লইল।

তেমনি নিরুপায় হইয়া এবং তাহা হইতেও বেশি অসুবিধা ভুগিয়া, উহাদের খাওয়ার সময় ছুরি-কাঁটা ব্যবহার করিতে হইল। কিন্তু যখন ঐ সকল জিনিসের উপর হইতে আমার মোহ চলিয়া গেল, তখন আবার তাহাদিগকে জুতা-মোজা, ছুরি-কাঁটা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পরিবর্তন গ্রহণের সময় উহা যেমন দুঃখদায়ক হইয়াছিল, আবার ত্যাগ করার সময়ও তেমনি দুঃখদায়ক হইয়াছিল। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, সভ্য হওয়ার জন্য পোশাক ও আচারের বোঝা ফেলিয়া দিয়া আমরা হালকা হইয়াছিলাম।

এই স্টীমারে কয়েকজন আত্মীয় ও পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ও ডেকের অন্য যাত্রীদের সঙ্গে আমি খুব মেলামেশা করিতাম। মক্কেল ও বন্ধুর স্টীমার বলিয়া নিজের ঘরের মত আমি অবাধে যেখানে সেখানে ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারিতাম।

স্টীমার অন্য কোনও বন্দরে না থামিয়া সোজা নাতালে পঁহুছিবে বলিয়া পথ মাত্র আঠার দিনে শেষ হইবার কথা। নাতাল পঁহুছিবার তিন-চার দিন পূর্বে আমরা ভীষণ তুফানের মুখে পড়িলাম। এ তুফান হয়ত সামনে যে আর একটা ভীষণ ঝড় আসিতেছে তাহারই সাবধানতার সংকেত। দক্ষিণ প্রদেশে এই সময় গ্রীষ্মকাল ও ঝড়বৃষ্টির সময়। দক্ষিণ সমুদ্রে এই সময় ছোট-বড় ঝড় হইয়া থাকে। ঝড়ের এত জোর ছিল ও এত অধিকক্ষণ ছিল যে, যাত্রীরা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল।

স্টীমারে দৃশ্য ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ। দুঃখের সময় সকলেই এক হইয়া গিয়াছিল, ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়াছিল। ঈশ্বরকে সকলেই অন্তরের সঙ্গে ডাকিতেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান একত্রে মিলিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেছিলেন। কেউ কেউ বা মানত করিতেছিলেন। কাপ্তেনও যাত্রীদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিয়াছিলেন ও সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছিলেন—"ঝড় অবশ্য খুবই ভীষণ। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ভীষণ তুফানে তিনি ইতিপূর্বে পড়িয়াছেন। স্টীমার মজবুত, সহজে ডুবিবে না।" যাত্রীদিগকে তিনি যতই বুঝান না কেন, যাত্রীদের ভরসা আসে না। ঝড়ের আঘাতের এমন আওয়াজ হইতেছিল যে, এই বুঝি স্টীমার ভাঙ্গিয়া গেল, এই কাটিয়া গেল। এমন দুলিয়া উঠে যে, আমরা পড়িয়া যাওয়ার মত হই। ডেকের উপর থাকে কার সাধ্য! "ঈশ্বর রাখিলেই রক্ষা"—ইহা ছাড়া আর কোনও কথা শুনা যাইতেছিল না।

আমার স্মরণ আছে, এই সংকটাপন্ন অবস্থায় চব্বিশ ঘণ্টা কাটে। তারপর

মেঘ কাটিয়া যায়, সূর্য দেখা যায়। কাপ্তেন বলিলেন—"তুফান শেষ হইয়া গিয়াছে।" লোকের মুখ হইতে চিন্তার ভাব দূর হইল, ঈশ্বরের নামও ফুরাইল। মৃত্যুর ভয় চলিয়া যাওয়াতেই গান-বাজনা, খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হইয়া গেল। ঈশ্বর-চিন্তা মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া পড়িল। অবশ্য নামাজ রহিল, ভজনও রহিল। কিন্তু ঝড়ের সময় উহা হইতে যে গম্ভীর সুর উঠিয়াছিল তাহা মুছিয়া গেল।

এই ঝড় আমাকে যাত্রীদলের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আমার ঝড়ের ভয় ছিল না, অথবা নামমাত্র ছিল। প্রায় এই প্রকার ঝড় আমি পূর্বেও পাইয়াছি।

ঝড়ের দোলায় আমার গা-বমি ভাব আসিত না, ঝড়ের দাপটে আমার মাথা ঘুরিত না, সেইজন্য আমি যাত্রীদের মধ্যে নির্ভয়ে ঘুরিতে পারিতাম, তাহাদিগকে আশ্বাস দিতে পারিতাম ও কাপ্তেনের কাছ হইতে আকাশের অবস্থার সংবাদ আনিয়া শুনাইতে পারিতাম। এই স্নেহের বন্ধন আমার খুব উপকারে আসিয়াছিল।

জাহাজ ১৮ই কি ১৯শে ডিসেম্বর ডারবানের বন্দরে নোঙ্গর করিল। 'নাদেরী'ও সেই দিনই আসে।

কিন্তু সত্যিকার তুফান এইবার সম্মুখে উত্তাল হইতে চলিয়াছে।

২

তুফান

১৮ই ডিসেম্বর কিংবা তার পরদিন দুইখানা স্টীমারই নোঙ্গর করিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দরে স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে পুরা পরীক্ষা করিয়া তবে নামিতে দেওয়া হয়। যদি রাস্তায় কাহারও সংক্রামক রোগ হয় তবে 'কোয়েরেণ্টাইনে'—সংসর্গ-প্রতিষিদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া দেয়। বোম্বাইতে যখন আমরা জাহাজে চড়ি তখন সেখানে প্লেগ ছিল, সেজন্য আমাদিগকে 'কোয়েরেণ্টাইনে' রাখার ভয় ছিলই। বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিলেই হলুদ নিশান উঠাইয়া রাখিতে হয়। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া গেলে নিশান নামাইবার হুকুম হয়। তখন যাত্রীদের আত্মীয়-পরিজনেরা স্টীমারে প্রবেশ করিতে পারে।

এইজন্য আমাদের স্টীমারের উপর হলুদ নিশান উড়িতেছিল। ডাক্তার আসিলেন। পরীক্ষা করিয়া পাঁচ দিন 'কোয়েরেণ্টাইনে' থাকিবার আদেশ দিলেন। ইহার কারণ, মড়কের বিষ তেইশ দিন পরেও দেখা দিতে পারে। সেইজন্য বোম্বাই ত্যাগ করার ২৩ দিন পর্যন্ত স্টীমারের 'কোয়েরেণ্টাইন'-বাসের আদেশ হইল। কিন্তু কেবল স্বাস্থ্যের জন্যই এ হুকুম দেওয়া হয় নাই। আমাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য নাতালের শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দারা আন্দোলন করিতেছিল। উহাই এই হুকুমের প্রধান কারণ ছিল।

দাদা আবদুল্লার লোকেরা শহরের এই আন্দোলন সম্বন্ধে খবর আমাদিগকে দিতেছিলেন। শ্বেতাঙ্গরা প্রতিদিন বড় বড় সভা করিতেছিল, দাদা আবদুল্লাকে ধমক দেখাইতেছিল, আবার তাঁহাকে লোভও দেখাইতেছিল। যদি দাদা আবদুল্লা স্টীমার দুইখানা ফেরত পাঠাইয়া দেন তবে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতেও তাহারা প্রস্তুত ছিল। দাদা আবদুল্লা কোম্পানী ভয় পাওয়ার পাত্র নহেন। সে সময় আবদুল করিম হাজী আদম কোম্পানীর প্রধান কর্তা ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যতই লোকসান হোক না কেন, স্টীমার বন্দরে লাগাইবেন ও যাত্রীদের নামাইবেন। তিনি আমার কাছে প্রতিদিন সমস্ত বিবরণ সহ চিঠি দিতেন। আমাদের ভাগ্যক্রমে এই সময় স্বর্গীয় মনসুখলাল হীরালাল নাজর আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য নাতালে আসিয়াছিলেন। তিনি কর্ম-কুশল ও নির্ভীক ছিলেন। তিনিই সম্প্রদায়কে উপযুক্ত পরামর্শ দিতেছিলেন। তাঁহাদের উকিল ছিলেন মিঃ লাটন। তিনিও তেমনি নির্ভীক ছিলেন। তিনি শ্বেতাঙ্গদের কাজের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং কেবল উকিল বলিয়া পয়সার জন্যই কাজ না করিয়া, অকৃত্রিম বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছিলেন। এমনি করিয়া ডারবানে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ জমিয়া গেল। একদিকে মুষ্টিমেয় গরীব হিন্দুস্থানী, এবং তাঁদের হাতে গোনা কয়েকজন ইংরাজ মিত্র। আর অন্য দিকে ধনবল, বাহুবল, বিদ্যাবল ও সংখ্যাবলে পূর্ণ বলীয়ান ইংরাজ। এই বলবান প্রতিপক্ষের সঙ্গে শাসন কর্তৃত্বের শক্তিও যুক্ত হইয়াছিল। কেন না নাতাল সরকার খোলাখুলি ভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মিঃ হ্যারী এসকম্ব মন্ত্রীমণ্ডলীর একজন বিশেষ শক্তিশালী সদস্য ছিলেন। তিনি এই যোদ্ধ-মণ্ডলের সভায় প্রকাশ্যভাবেই যোগ দিলেন। আমাদের 'কোয়েরেণ্টাইন' স্বাস্থ্যের দিক হইতে না বসাইয়া যেমন করিয়া হোক, এজেন্ট অথবা যাত্রীদের ভয় দেখাইয়া ফিরাইয়া পাঠানোর জন্যই বসানো হইয়াছিল।

এজেণ্টকে ত ভয় দেখানো চলিতেছিলই, এখন আমাদের উপরেও এই বলিয়া ভয় দেখানো আরম্ভ হইল যে, 'যদি না ফিরিয়া যাও তবে তোমাদিগকে সমুদ্রের জলে ডুবাইয়া দেওয়ার জন্য আসিতেছি। আর যদি ফিরিয়া যাও, তবে যাওয়ার ভাড়াও দিয়া দিতে পারি।' আমি যাত্রীদের মধ্যে খুব ঘুরিতে লাগিলাম। তাহাদিগকে ধৈর্য রাখিতে বলিলাম। 'নাদেরী'র যাত্রীদিগকেও ধৈর্য রাখার অনুরোধ পাঠাইলাম। যাত্রীরা শান্ত রহিল, সাহস হারাইল না।

যাত্রীদের আমোদের জন্য আমরা স্টীমারের উপরেই খেলার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। বড়দিন আসিল। সেদিন কাপ্তেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদিগকে ভোজ দিলেন। যাত্রী বলিতে প্রধানতঃ আমি ও আমার পরিবার। ভোজের পর বক্তৃতা ত হওয়াই চাই। আমি পশ্চিমের সভ্যতার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলাম। আমি জানিতাম যে, উহা গম্ভীর বিষয় আলোচনার সময় নয়। কিন্তু আমার দ্বারা আর কোনও বক্তৃতা হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। আমি খেলাধূলায় যোগ দিতাম, কিন্তু আমার মন ত ছিল ডারবানে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেইখানে। আমিই এই লড়াইয়ের লক্ষ্য ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ ছিল—

১। আমি ভারতবর্ষে গিয়া নাতালবাসী শ্বেতাঙ্গদের অসম্ভব রকম নিন্দা করিয়াছি।

২। আমি ভারতবাসীদের দ্বারা নাতাল ভরিয়া ফেলিতে চাই। সেইজন্য 'কুরল্যাণ্ড' ও 'নাদেরী'তে ভারতবাসী বোঝাই করিয়া লইয়া আসিয়াছি।

আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। আমার জন্য দাদা আবদুল্লা মহালোকসানের মধ্যে পড়িয়াছেন। যাত্রীদের জীবন আমার দ্বারা বিপন্ন হইয়াছে এবং পরিবারকে সঙ্গে আনিয়া তাহাদিগকেও সেই বিপদের মধ্যে ফেলিয়াছি।

কিন্তু এ সকলের জন্য আমি নিজে নির্দোষ। আমি কাহাকেও নাতাল আসিতে বলি নাই। 'নাদেরী'র যাত্রীদিগকে ত আমি দেখিও নাই, আর 'কুরল্যাণ্ডে' আমার দুইজন আত্মীয় ব্যতীত আর কাহারও নাম-ধাম পর্যন্ত আমি জানিতাম না। আমি ভারতবর্ষে গিয়া নাতালের শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে এমন একটা কথাও উচ্চারণ করি নাই, যা আমি পূর্বে নাতালে বলি নাই। আর আমি যা বলিয়াছি তার জন্য আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণও রহিয়াছে।

এজন্য নাতালের ইংরাজেরা যে সভ্যতার ফসল, যে সভ্যতার তাহারা সমর্থক,

সেই সভ্যতা সম্পর্কে আমার মনে গ্লানির সৃষ্টি হইয়াছিল। আমি এই বিষয় ভাবিতেছিলাম, আর আমার এই সকল ভাবনা আমি সেই ছোট সভায় প্রকাশ করিলাম এবং শ্রোতারাও তাহা ধীরভাবে শুনিলেন। আমি যে মনোভাব হইতে আমার বক্তব্য পেশ করিয়াছিলাম, কাপ্তেন ইত্যাদিরা সেই ভাবেই তাহা লইয়াছিলেন। উহা হইতে তাঁহাদের জীবনের কোনও পরিবর্তন হইয়াছিল কিনা তাহা আমি জানি না। কিন্তু ইহার পর এই বিষয় লইয়া কাপ্তেন ও অন্য আমলাদের সঙ্গে আমার অনেক কথা হইয়াছিল। বক্তৃতায় আমি বলি—"পশ্চিমের সভ্যতা প্রধানতঃ হিংসামূলক এবং পূর্বদেশের সভ্যতা অহিংসামূলক।" প্রশ্নকর্তারা আমার সিদ্ধান্তের উপর আমাকে চাপিয়া ধরিলেন। বিশেষ করিয়া কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"শ্বেতাঙ্গরা যেমন ভয় দেখাইতেছে, কাজেও যদি তেমনি ক্ষতি করিয়া বসে, তবে আপনার অহিংসার সিদ্ধান্ত কিভাবে প্রয়োগ করিবেন ?"

আমি জবাব দিলাম—"আমার আশা আছে, তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবার ও তাঁহাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ না লওয়ার সাহস ও বুদ্ধি ঈশ্বর আমাকে দিবেন। আজও তাঁহাদের উপর আমার কোন ক্রোধ নাই। তাঁহাদের অজ্ঞতার ও তাঁহাদের সংকীর্ণ দৃষ্টির জন্য দুঃখ হয়। তাঁহারা যাহা বলিতেছেন, তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহাই ঠিক, একথা তাঁহারা শুদ্ধভাবেই বিশ্বাস করেন—ইহা আমি স্বীকার করি। সেইজন্য আমার ক্রোধের কারণ নাই।"

প্রশ্নকর্তা হাসিলেন। আমার কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না।

এমনি করিয়া আমাদের দীর্ঘ দিন কাটিতে লাগিল। কবে যে এই 'সূতিকা-গৃহ'-বাসের মেয়াদ শেষ হইবে তাহা স্থির নাই। এ বিষয় বন্দরের আমলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে—'ব্যাপারটা আমাদের হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সরকার যখন হুকুম করিবে তখনই নামিতে দিতে পারিব।'

অবশেষে যাত্রীদিগের উপর ও আমার উপর চরম-পত্র আসিল। আমাদের হত্যা করিবার ভয় দেখানো হইল। জবাবে আমরা জানাইলাম যে, বন্দরে নামার অধিকার আমাদের আছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইলাম যে, আমরা নামিব এবং যতই ক্ষতি হোক না কেন, আমাদের সেই অধিকার বজায় রাখার জন্য আমরা কৃতসংকল্প।

অবশেষে বত্রিশ দিন পরে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ১৩ই জানুয়ারী স্টীমারকে মুক্তি দেওয়া হইল ও যাত্রীদিগকে নামিতে হুকুম দেওয়া হইল।

৩

পরীক্ষা

জাহাজ ডকে আসিল, যাত্রীরা নামিল। কিন্তু মিঃ এসকম্ব আমার সম্বন্ধে কাপ্তেনকে বলিয়া পাঠাইলেন—"গান্ধীকে ও তাঁহার পরিবারকে সন্ধ্যাবেলা নামাইয়া দিও। তাঁহার উপর শ্বেতাঙ্গরা খুব চটিয়া আছে এবং তাঁহার জীবনের আশঙ্কা আছে। ডক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সন্ধ্যাবেলায় তাঁহাকে নামাইয়া লইয়া যাইবেন।"

কাপ্তেন এই সংবাদ আমাকে দিলেন। আমি তাহা পালন করিতে স্বীকৃত হইলাম। এই সংবাদ পাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই মিঃ লাটন আসিলেন এবং কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"যদি মিঃ গান্ধী আমার সঙ্গে আসেন তবে আমার দায়িত্বে আমি তাঁহাকে লইয়া যাইতে চাই। স্টীমার-এজেণ্টের উকিল হিসাবে আমি একথা আপনাকে বলিতেছি যে, গান্ধীর সম্বন্ধে যে সংবাদ আপনি পাইয়াছেন সে বিষয়ে আপনি দায়-মুক্ত হইলেন।" কাপ্তেনের সঙ্গে এই কথাবার্তা বলিয়া তিনি আমার কাছে আসিলেন। আমাকে তিনি যাহা বলিলেন তাহা কতকটা এই রকমের—"যদি আপনার প্রাণের ভয় না থাকে, তবে আমি ইচ্ছা করি যে, মিসেস্ গান্ধী ও ছেলেপিলেরা গাড়ি করিয়া রুস্তমজী শেঠের বাড়ি যান। আপনি ও আমি তাঁহাদের পিছনে পিছনে হাঁটিয়া যাই। আপনি অন্ধকারে লুকাইয়া শহরে প্রবেশ করিবেন, ইহা আমার মোটেই পছন্দ হয় না। আমি মনে করি, আপনার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করিবে না। এখন ত সব শান্ত আছে। শ্বেতাঙ্গরা সব চলিয়া গিয়াছে। সে যাই হোক্ না কেন, আমার মতে আপনার লুকাইয়া শহরে প্রবেশ করা উচিত নয়।"

আমি সম্মত হইলাম। আমার স্ত্রী ও ছেলেপিলে গাড়িতে করিয়া রুস্তমজী শেঠের বাড়িতে গেলেন ও নিরাপদে পৌছিলেন। আমি কাপ্তেনের কাছে বিদায় লইয়া মিঃ লাটনের সঙ্গে নামিলাম। রুস্তমজী শেঠের বাড়ি প্রায় দুই মাইল দূরে।

আমরা জাহাজ হইতে নামিলে কতকগুলি ছোকরা আমাকে দেখিতে পাইয়া 'গান্ধী-গান্ধী' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। দুই-চারজন দৌড়াইয়া আসিয়া বেশি করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মিঃ লাটন দেখিলেন—ভিড় বাড়িতেছে, তিনি রিকশা ডাকিলেন। উহাতে চড়া আমি কখনও পছন্দ করি না। এই

আমার প্রথম অভিজ্ঞতা হইতে যাইতেছিল। কিন্তু ছোকরারা বসিতে দিল না। তাহারা রিকশাওয়ালাকে ধমকাইতে সে বেচারা পলাইল।

আমরা অগ্রসর হইলাম। ভিড় বাড়িয়াই চলিল। চারিদিক ভিড়ে ভরিয়া গেল। ভিড়ের ধাক্কা প্রথমেই মিঃ লাটনকে আমার কাছ হইতে পৃথক করিয়া ফেলিল। তারপর জনতা আমার উপর ঢিল ও পচা ডিম ছুঁড়িতে লাগিল। একজন আমার পাগড়ি ফেলিয়া দিল। লাথি দেওয়া আরম্ভ হইল। আমার প্রায় মূর্ছা হইবার উপক্রম। আমি একটি বাড়ির রেলিং ধরিয়া শ্বাস লইলাম। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা যাইতেছিল না, অনবরত ঘুষি ও কিল পড়িতেছিল। পুলিসের প্রধান কর্তার স্ত্রী আমাকে জানিতেন। এই সময়ে তিনি এই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দ্রুত আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং রৌদ্র না থাকিলেও তাঁহার ছাতা খুলিলেন। ইহাতে ভিড় কতকটা নরম হইল। মিসেস আলেকজেণ্ডারকে আঘাত না করিয়া আমাকে মারা যায় না।

আমার উপর মার চলিতেছে দেখিয়া ইতিমধ্যে কোনও ভারতীয় যুবক থানায় দৌড়াইয়া গিয়াছিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডার আমাকে বাঁচাইবার জন্য একটা দল পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা সময়মত আসিয়া পৌঁছিল। আমার রাস্তা পুলিস থানার নিকট দিয়াই ছিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থানায় আশ্রয় লওয়ার জন্য বলিলেন। আমি বলিলাম, যখন লোকে নিজের ভুল দেখিবে তখন শান্ত হইয়া যাইবে। তাহাদের ন্যায়বুদ্ধির উপর আমার বিশ্বাস আছে।

পুলিসদের দল পরিবৃত হইয়া ভাল ভাবেই পারসী রুস্তমজীর বাড়িতে পৌঁছিলাম। আমার সারা শরীরেই খুব আঘাত লাগিয়াছিল। কেবল একটা জায়গায় ছড়িয়া গিয়াছিল। স্টীমারের ডাক্তার দাদী বরজোর উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভাল করিয়া শুশ্রূষা করিলেন।

বাড়ির ভিতরে শান্তি ছিল, কিন্তু বাহিরে শ্বেতাঙ্গরা ধরণা দিয়াছিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হইল। তখনও জনতা চীৎকার করিতেছিল—"গান্ধীকে আমাদের কাছে দাও।" এই সময় মিঃ আলেকজেণ্ডার সেখানে পৌঁছিয়া কখনো বা ধমক দিয়া, কখনো বা তাহাদিগকে ভুলাইয়া বশে রাখিতেছিলেন।

তাহা হইলেও তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন। একসময় তিনি এই মর্মে খবর

পাঠাইলেন—"যদি আপনি আপনার বন্ধুর বাড়িঘর ও আপনার পরিবার প্রাণে বাঁচাইতে চান, তবে আমি যেমন বলিতেছি, তেমনি করিয়া আপনাকে এই বাড়ি হইতে পলাইয়া বাহির হইতে হইবে।"

একই দিনে আমার ঠিক দুই বিপরীত কাজ করিবার অবকাশ উপস্থিত হইল। যখন জীবনের ভয় মাত্র কাল্পনিক ছিল, তখন মিঃ লাটন আমাকে প্রকাশ্যভাবে বাহিরে আসিতে বলিলেন এবং আমি তাঁহার কথা রাখিলাম। যখন মৃত্যুর আশঙ্কা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তখন অন্য মিত্র অনুরূপ পরামর্শ দিলেন এবং আমি তাঁহার কথাও রাখিলাম। কে বলিতে পারে জীবনের ভয়ে, অথবা বন্ধুর ধন-প্রাণের ভয়ে, কি পরিবারের জন্য, অথবা এই তিনটার জন্যই আমি পলাইবার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম? কে বলিতে পারে যে, আমার স্টীমারের উপর হইতে সাহস করিয়া নামা ও বিপদ প্রত্যক্ষ দেখিয়া লুকাইয়া পলানো—এ উভয় কার্যই ঠিক হইয়াছে কিনা? কিন্তু যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে এখন আলোচনা মিথ্যা। যাহা গত হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করাই আবশ্যক এবং তাহা হইতে শিক্ষালাভ করাই উপযুক্ত কাজ। বিশেষ কোনও ঘটনায়, বিশেষ লোক কেমনভাবে চলিবে একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বাহিরের ব্যবহার হইতে কোনও লোকের গুণের যখন পরীক্ষা করা হয়, তখন তাহাও যে অসম্পূর্ণ এবং আনুমানিক মাত্র, ইহাও আমাদের জানা দরকার।

সে যাহাই হোক, পলাইবার চেষ্টায় আমি শরীরের জখমের কথা ভুলিয়া গেলাম। আমি ভারতীয় সিপাহীর পোশাক পরিলাম। মাথায় যদি ডাণ্ডা পড়ে তবে তাহা হইতে বাঁচিবার জন্য পিতলের তাওয়া রাখিয়া তাহার উপর মাদ্রাজী বড় ফেটা জড়াইলাম। আমার সহিত দুইজন ডিটেক্টিভ ছিলেন, তাঁহাদের একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পোশাক পরিলেন, মুখে ভারতীয়দের মত রং মাখাইলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি কি পরিয়াছিলেন তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আমি পাশের গলি দিয়া নিকটবর্তী এক দোকানে গেলাম। সেখানে গুদামের চটের বস্তার মধ্য দিয়া অন্ধকারে কোনভাবে রাস্তা করিয়া দোকানের গেট দিয়া বাহির হইলাম ও ভিড়ের মধ্য দিয়া চলিলাম। গলির সামনেই গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল। তাহাতে চড়াইয়া আমাকে সেই থানায় লইয়া যাওয়া হইল, যেখানে পূর্বে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আলেকজেণ্ডার আমাকে আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলেন। এইভাবে একদিক দিয়া আমাকে যখন লইয়া যাওয়া হইতেছিল, অন্যদিকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আলেকজেণ্ডার তখন ভিড়ের লোকের সঙ্গে

কৌতুক করিয়া তাদের সঙ্গে গান গাহিতেছিলেন—

'আমরা এখন গান্ধীকে নেব,
তেঁতুলের ডালে ফাঁসি ঝুলাব।'

যখন আমার নিরাপদে থানায় পৌছার সংবাদ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আলেকজেণ্ডার পাইলেন, তখন তিনি জনতাকে বলিলেন—"তোমাদের শিকার ত এই দোকানের মধ্য দিয়া নিরাপদে পলাইয়াছে।" কথাটা শুনিয়া ভিড়ের মধ্যে কেউ ক্রুদ্ধ হইল, কেউ হাসিল। অনেকেই একথা বিশ্বাস করিল না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আলেকজেণ্ডার বলিলেন—"তাহা হইলে তোমাদের মধ্য হইতে কাউকে সঙ্গে দাও। আমি তাকে ঘরের ভিতরে লইয়া যাই; সে খুঁজিয়া দেখিবে। যদি গান্ধীকে খুঁজিয়া পাও, তবে তোমাদের হাতেই গান্ধীকে ছাড়িয়া দিব। যদি না পাও তবে ঘরে ফিরিয়া যাইবে। পারসী রুস্তমজীর বাড়ি নিশ্চয় তোমরা লুট করিতে চাও না। আর গান্ধীর স্ত্রী-পুত্রকেও তোমরা নিশ্চয় মারিতে চাও না।"

ভিড়ের লোকরা প্রতিনিধি বাছিয়া দিল। তারা তল্লাসী শেষে ভিড়ের কাছে নিরাশাজনক খবর দিল। সকলেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আলেকজেণ্ডারের চতুরতার প্রশংসা করিল। কিন্তু কতকগুলি দুষ্ট লোক ইহা লইয়াও হল্লা করিল। তথাপি ভিড় ভাঙ্গিয়া গেল।

পরলোকগত মিঃ চেম্বারলেন তখন উপনিবেশ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইংলণ্ডের মন্ত্রী। আমার উপর যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদের নামে নালিশ করিবার জন্য ও যাহাতে ন্যায়বিচার হয় তাহার জন্য তিনি তার করিলেন। মিঃ এসকম্ব আমাকে নিজের কাছে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। আমার উপর অত্যাচারের জন্য দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন ও বলিলেন—"আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ হইলে তাহা যে আমাকে ব্যথিত করিত তাহা আপনি জানেন। মিঃ লাটনের পরামর্শ অনুসারে আপনি পূর্বেই নামিয়া আসিয়া দুঃসাহসের কাজ করিয়াছিলেন, যদিও ঐরূপ করার আপনার অধিকার ছিল। কিন্তু আমার কথা শুনিলে এই দুর্ঘটনা হইত না। এখন আপনি যদি অত্যাচারকারীদিগকে চিনিয়া থাকেন, তবে তাহাদিগকে ধরিয়া নালিশ চালাইতে আমি প্রস্তুত আছি। মিঃ চেম্বারলেন তাহাই করিতে বলিয়াছেন।"

আমি জবাব দিলাম—"আমি কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করিব না।

হাঙ্গামাকারীদের মধ্যে দুই একজনকে আমি চিনি। কিন্তু তাহাদিগকে সাজা দিয়া কি লাভ? আমি হাঙ্গামাকারীদিগকে দোষীও বলি না। তাহাদিগকে একথা বলা হইয়াছে যে, আমি ভারতবর্ষে গিয়া অতিশয়োক্তি করিয়া নাতালের শ্বেতাঙ্গদের ক্ষতি করিয়াছি। এ কথা যদি তাঁহারা বিশ্বাস করে ও রাগ করে তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? দোষ ত উপরওয়ালাদের। আর যদি আমাকে বলিতে দেন, তবে বলিব—দোষ আপনারই। আপনি ইচ্ছা করিলে অশান্ত লোকদের ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা আপনি করেন নাই। কারণ আপনিও রয়টারের তারের খবর বিশ্বাস করিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন যে, আমি অতিশয়োক্তি করিয়াছি। আমি কাহারও নামে নালিশ করিতে চাই না। যখন সত্য অবস্থা প্রকাশিত হইবে ও সকলে তাহা জানিবে, তখন তাহারা ভুল বুঝিতে পারিবে।"

"আপনি যদি একথা আমাকে লিখিয়া দেন তবে মিঃ চেম্বারলেনকে তার করিয়া আমি জানাইতে পারি। অবশ্য তাড়াতাড়ি কিছু লিখিয়া দিতে আমি আপনাকে বলি না। আপনি মিঃ লাটন ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যা সঙ্গত মনে করেন তাহাই করিবেন। তবে এটুকু আমি বলিতে পারি যে, যদি আপনি নালিশ না করেন তবে সব শান্ত করিতে, আমার খুব সাহায্য করা হইবে; এবং আপনার প্রতিষ্ঠাও তাহাতে যথেষ্ট বাড়িবে।"

আমি জবাব দিলাম—"এ বিষয়ে আমার কর্তব্য স্থির হইয়াই আছে। আমি কাহারও নামে নালিশ করিব না ইহা নিশ্চয়। একথা আমি এখনই আপনাকে লিখিয়াও দিতেছি।"

এই কথা বলিয়া যাহা লেখা আবশ্যক আমি তাঁহাকে লিখিয়া দিলাম।

৪
শান্তি

হাঙ্গামার দুইদিন পরেও যখন আমি মিঃ এসকম্বের সঙ্গে দেখা করিলাম তখন পর্যন্ত থানাতেই ছিলাম। আমাকে রক্ষা করার জন্য আমার সঙ্গে একজন সিপাহী থাকিত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তখন আর ওরূপ সাবধানতার আবশ্যকতা ছিল না।

যেদিন আমি নামিয়াছিলাম সেই দিনই অর্থাৎ হলুদ পতাকা নামাইবার

সঙ্গে সঙ্গেই "নাতাল-অবজারভারের" প্রতিনিধি আমার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন ও তাহার উত্তরে আমি একে একে আমার নামে আরোপিত অভিযোগের জবাব সম্পূর্ণভাবে দেই। স্যার ফিরোজ শার অনুগ্রহে আমি সেই সময় না লিখিয়া একটা বক্তৃতাও ভারতবর্ষে দিই নাই। আমার এই সকল বক্তৃতা ও লেখার সংগ্রহ আমার কাছে ছিল। আমি সেগুলি তাঁহাকে দিলাম এবং প্রমাণ করিয়া দিলাম যে, ভারতবর্ষে এমন একটা বিষয়ও বলি নাই, যা এর চেয়ে কঠিন ভাষায় দক্ষিণ আফ্রিকায় না বলিয়াছি। আমি ইহাও দেখাইয়া দিলাম যে, 'কুরল্যাণ্ড' ও 'নাদেরী'তে যাত্রী আনা সম্পর্কে আমার অণুমাত্রও হাত ছিল না। যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের অনেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার পুরানো অধিবাসী এবং অধিকাংশই নাতালে নয়, ট্রান্সভালে থাকিতে আসিয়াছে। সে সময় নাতালে রোজগার তেমন সুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু ট্রান্সভালে বেশ রোজগার হইতেছিল। সেইজন্য অনেক ভারতীয় সেইখানে যাওয়াই স্থির করিয়াছিল।

এই পরিষ্কার খবরের জন্য ও হাঙ্গামাকারীদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে অস্বীকার করার জন্য শ্বেতাঙ্গরাই তাহাদের আচরণের জন্য লজ্জিত হইয়া উঠিল। সংবাদপত্রসমূহও আমাকেই নির্দোষ বলিয়া সমর্থন করিয়াছিল এবং হাঙ্গামাকারীদের নিন্দা করিয়াছিল। এমনি করিয়া পরিণামে আমার লাভই হইল। আর আমার লাভ মানে আমার কাজের লাভ। ইহাতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা বাড়িল এবং আমার কাজ খুব সহজ হইল।

তিন-চার দিনের মধ্যেই আমি নিজের বাড়িতে গেলাম ও অল্পদিনেই এই ব্যাপারটা একেবারে মিটিয়া গেল। উকিল হিসাবেও আমার ব্যবসা, উপরের ঘটনা হইতে জমিয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু এদিকে যেমন ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠা বাড়িল, অপর দিকে তেমনি তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবও বাড়িল। ভারতীয়দের ভিতরে যে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়িবার শক্তি আছে তাহা শ্বেতাঙ্গরা এইবার বুঝিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভারতীয়দের সম্বন্ধে ভয়ও বৃদ্ধি পায়। তাই নাতালের কাউন্সিলে এমন দুইটা আইন পাস হইল, যাহাতে ভারতীয়দের কষ্ট আরও বাড়ে। এই দুইটি আইনের একটির দ্বারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় লোকসান হইল। দ্বিতীয় আইন সৃষ্টি করিল, ভারতবাসীদের সেখানে যাওয়ার বিরুদ্ধে কড়া বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা। ভাগ্যক্রমে ভোটের অধিকার লইয়া লড়াইয়ের সময় এই

সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ভারতীয় বলিয়াই কোনও আইন প্রণয়ন করা চলিবে না। অর্থাৎ আইনের চোখে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ থাকিতে পারিবে না। সেইজন্য উপরের দুই আইনের ভাষা এমন ছিল যে, তাহা সকলের সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু আসলে তাহা কেবল ভারতীয়দের উপরই চাপ দেওয়ার জন্য হইয়াছিল।

এই আইনগুলি পাস হওয়ায় আমার কাজও খুব বৃদ্ধি পায় এবং ভারতীয়দের মধ্যেও নব জাগরণ হয়। এই আইন সম্পর্কে কোন ভারতীয়েরই অনভিজ্ঞ থাকা সঙ্গত নয়—একথা সম্প্রদায় বুঝিল এবং আমরাও সেজন্য আইনের অনুবাদও প্রকাশ করিলাম। এই আইন লইয়া তর্ক অবশেষে বিলাত পর্যন্ত গড়াইয়া ছিল। কিন্তু আইন বাতিল হইল না।

আমার অধিকাংশ সময়ই জন-সেবায় কাটিতে লাগিল। মনসুখলাল নাজর নাতালে ছিলেন লিখিয়াছি। তিনি আমার সঙ্গেই থাকিয়া গেলেন এবং জন-সেবার কাজে আন্তরিকভাবে যোগ দিলেন। আমার কাজ কতকটা হাল্কা হইল।

আমার অনুপস্থিতিতে শেঠ আদমজী মিঞা খান কংগ্রেস সম্পাদকের পদে থাকিয়া ভারী সুন্দরভাবে কাজ চালাইতেছিলেন। সভ্যসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং স্থানীয় কংগ্রেসের আয় প্রায় এক হাজার পাউণ্ড বেশি হইতেছিল। যাত্রীদের উপর যে হাঙ্গামা হইতেছিল সেজন্য ও উক্ত আইনের জন্য যে জাগরণ দেখা দেয় তাহার সুযোগ লইয়া আমি উহা আরও বাড়াইবার বিশেষ চেষ্টা করিলাম ও কালে আয় প্রায় ৫০০০ পাউণ্ড হইল। কংগ্রেসের স্থায়ী তহবিল গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা আমার ছিল। ভাবিলাম—যদি উহা হইতে জমি খরিদ করিয়া ভাড়া দেওয়া যায়, তবে যে ভাড়া আসিবে তাহাতেই কংগ্রেস ব্যয়নির্বাহ সম্বন্ধে আমরা নির্ভর হইতে পারিব। সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান চালাইবার এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি আমার কল্পনা সঙ্গীদের জানাইলাম। তাঁহারাও ইহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন। বাড়ি কিনিয়া তাহাতে ভাড়াটে বসাইলাম। সম্পত্তির জন্য ভাল ট্রাস্ট গঠিত হইল। এই সম্পত্তি আজও বর্তমান আছে। কিন্তু উহা এখন আত্মকলহের হেতু হইয়াছে এবং ভাড়া আদালতে জমিতেছে।

এই দুঃখদায়ক ঘটনা আমি দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করার পর ঘটিয়াছে। কিন্তু সাধারণ সংস্থার জন্য স্থায়ী ফণ্ড গঠন করা সম্বন্ধে আমার ধারণা দক্ষিণ আফ্রিকাতেই বদলাইয়া গিয়াছিল। অনেক সাধারণ সংস্থা গঠন, ও তাহার

পরিচালনের দায়িত্ব লওয়ার পর আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে, কোনও সাধারণ সংগঠন স্থায়ী তহবিলের উপর নির্ভর করিয়া চালাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে। কারণ স্থায়ী তহবিল উহার নৈতিক অধোগতিরই বীজ বহন করিয়া আনে।

সাধারণ সংগঠন মানে জনসাধারণের সম্মতিতে ও তাঁদের অর্থে পরিচালিত সংস্থা। এই সংস্থায় যখন লোকের সাহায্য পাওয়া যায় না, তখন তাহার অস্তিত্ব রাখার অধিকারও চলিয়া যায়। স্থায়ী সম্পত্তির আয়ে পরিচালিত সংস্থা লোকমতের উপর নির্ভর করে না। কত সময় বিপরীত আচরণ পর্যন্ত করে। এই অভিজ্ঞতা আমাদের ভারতবর্ষেই ভূরি ভূরি হইয়াছে। ধর্ম-সংস্থা বলিয়া প্রচলিত কত অনুষ্ঠানের হিসাব-কিতাব পর্যন্তও নাই। উহার ট্রাস্টিরাই উহার মালিক হইয়া পড়িয়াছেন এবং কাহারও নিকট যে তাঁহাদের জবাব দিবার আছে এ কথাও তাঁহারা স্বীকার করেন না। সেই জন্য প্রকৃতি যেমন প্রতিদিন সৃষ্টি করিয়া চলে, সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠানেরও তেমনি হওয়া উচিত যে প্রতিষ্ঠানকে লোকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নয়, তাহা সাধারণের প্রতিষ্ঠান বলিয়া চালাইবার অধিকারও কাহারো নাই। প্রতি বৎসর প্রাপ্ত চাঁদাই উহার জনপ্রিয়তার এবং পরিচালকদিগের বিশ্বস্ততার কষ্টি-পাথর। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকেই এই কষ্টি-পাথরে কষা দরকার—ইহাই আমার মত।

আমার এই উক্তি যেন কেহ ভুল না বুঝেন। উপরের মন্তব্য সে সকল সংস্থার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, যাহাদের বাড়ি ইত্যাদির আবশ্যক। সাধারণ প্রতিষ্ঠানের চলতি খরচা লোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদা দ্বারাই মিটানো দরকার।

এই সিদ্ধান্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের সময় দৃঢ় হয়। এই ছয় বৎসরের সংগ্রাম স্থায়ী তহবিল ছাড়াই চালানো হইয়াছে। উহাতে লক্ষ লক্ষ টাকার আবশ্যক হইয়াছে। এমন দিনের কথা আমার স্মরণ আছে যখন আগামী কালের খরচার টাকা কোথায় পাইব, তাহা জানিতাম না। কিন্তু সে কথা পরে হইবে। উপরের কথার সমর্থন পাঠকগণ যথাক্রমে দেখিতে পাইবেন।

৫

বালকদের শিক্ষা

১৮৯৭ সালের জানুয়ারিতে আমি যখন ডারবানে নামিলাম তখন আমার সঙ্গে তিনটি বালক ছিল—আমার ভাগিনেয়—বয়স দশ বৎসর, বড় ছেলে—বয়স নয় বৎসর ও অপরটি—বয়স পাঁচ বৎসর। ইহাদের কোথায় পড়াইব ?

শ্বেতাঙ্গদের স্কুলে আমার ছেলেদের পাঠাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহাতে কেবল অনুগ্রহ ও অপমান গ্রহণ করা হইত। কারণ সকল ভারতীয় ছেলে সেখানে পড়িতে পারে না। ভারতীয় ছেলেদের পড়ার জন্য খ্রীষ্টীয় মিশনারী স্কুল ছিল। সেখানেও আমার ছেলেদের পাঠাইতে প্রস্তুত ছিলাম না। সেখানে যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা আমার পছন্দ হইত না। গুজরাটী ভাষা সেখানে কোথা হইতে পড়ানো হইবে ? হয় ইংরাজী ভাষা, না হয়ত অশুদ্ধ তামিল ও হিন্দী ভাষার সাহায্যে পড়ানো যায়। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা করাও খুব সহজ ছিল না। এই সকল ও অন্যান্য অসুবিধা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আমি নিজে অবশ্য ছেলেদের কিছু কিছু পড়াইতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা অল্পক্ষণ মাত্র ও অনিয়মিত ভাবে হইত। আমার মনোমত গুজরাটী কোনও শিক্ষক খুঁজিয়া পাই নাই। আমি কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। আমার পছন্দমত একজন ইংরাজ শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞাপন দিলাম। মনে করিলাম, এমনি করিয়া যে শিক্ষক পাওয়া যাইবে তাহাকে দিয়া নিয়মিত পাঠ শিক্ষা দেওয়াইব, আর তাহার উপর আমি যেমন চালাইতেছিলাম তেমনি চালাইব। এক ইংরাজ মহিলাকে মাসিক সাত পাউণ্ড বেতনে রাখিয়া দেওয়া হইল এবং এইভাবে দিনকতক চলিল।

আমি ছেলেদের সঙ্গে কেবল গুজরাটীতেই কথাবার্তা বলিতাম। সেইজন্য তাহারা কিছু কিছু গুজরাটী শিখিতে পারিয়াছিল। আমার তখন মনে হইত, ছেলেদের মা-বাপের কাছ হইতে দূরে রাখিতে নাই। সুব্যবস্থিত ঘরে ছেলেরা যে শিক্ষা পায়, স্কুল-বোর্ডিংএ তাহা হইতে পারে না। সেইজন্য ছেলেদের বেশির ভাগ আমার সঙ্গেই রাখিয়াছিলাম। ভাগিনেয় ও বড় ছেলেকে আমি কয়েক মাস দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্কুল-বোর্ডিংএ রাখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অল্পকাল পরেই আবার ফিরাইয়া আনি। পরে আমার বড় ছেলে বয়স হইলে নিজের

ইচ্ছায় আহমেদাবাদের হাইস্কুলে পড়ার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়িয়া চলিয়া আসে। আমার ভাগিনেয়কে আমি যে ধরনের শিক্ষা দিতে পারিতাম তাহাতেই তাহার সন্তোষ হইত বলিয়া আমার মনে হয়। সে পূর্ণ যৌবনে দিন কয়েকের জন্য অসুখে ভুগিয়া স্বর্গে গিয়াছে। অপর তিন ছেলের কেউই স্কুলে যায় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের সময় যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে দিন কতক নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিয়াছিল মাত্র।

ছেলেদের শিক্ষায় এই সকল পরীক্ষা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল। ইহাদের আমি নিজেই লেখাপড়া শিখাইতে চাহিলেও তত সময় দিতে পারি নাই। সেইজন্য এবং অন্য প্রকার ঘটনাচক্রে আমি তাহাদের ইচ্ছানুরূপ লেখাপড়ার সুযোগ দিতে ব্যর্থ হইয়াছি। এজন্য আমার সকল ছেলেরই আমার উপর কম-বেশি অভিযোগ রহিয়াছে। যখনই তাহারা এম-এ, বি-এ, অথবা কোনও ম্যাট্রিকুলেটের সংস্পর্শে আসে, তখনই তাহারা স্কুলে না পড়ার অসুবিধা দেখিতে পায়।

তাহা হইলেও আমার বিশ্বাস এই যে, তাহারা যে ব্যবহারিক জ্ঞান পাইয়াছে, মাতাপিতার যে সংসর্গ তাহারা পাইয়াছে, স্বাধীনতার যে দৃষ্টান্ত তাহারা দেখিতে পাইয়াছে, যদি আমি তাহাদিগকে কোনও স্কুলে পাঠাইবার আগ্রহ করিতাম, তাহা হইলে তাহারা তাহা পাইত না এবং তাহাদের সম্পর্কে যে নিশ্চিন্ততা আজ. আমার আছে তাহাও থাকিত না। যে সাদাসিধা জীবনযাপন করার ও সেবাভাব পোষণ করার শিক্ষা তাহারা আমার নিকট হইতে পাইয়াছে, আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিলাতের স্কুলে ভর্তি হইলে, অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃত্রিম শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে, তাহা তাহারা পাইত না। উপরন্তু তাহাদের কৃত্রিম জীবনযাত্রা আমার দেশ-সেবার বাধ্য হইয়া উঠিত।

সেইজন্য যদিও আমি তাহাদিগকে ইচ্ছানুসারে লেখাপড়া শিখাইতে পারি নাই, তথাপি পরবর্তীকালে তখনকার দিনের কথা বিচার করিয়াও আমার এ কথা মনে হয় না যে, আমি তাহাদিগকে আমার সাধ্যমত শিক্ষা দিই নাই। বস্তুতঃ আমার মনে সেজন্য কোন অনুতাপও নাই। আবার বিপরীত দিকে আমি আমার বড় ছেলের যে শোচনীয় পরিণাম দেখিতে পাই, তাহা আমার প্রথম বয়সের অর্ধপক্ক জীবনের প্রতিধ্বনি বলিয়াই আমি মনে করি। যে সময়ের কথা তাহার স্মৃতিতে ছাপ রাখার মত, সেই সময়টা ছিল আমার মোহের সময়—আমার.ভোগের সময়। কিন্তু সে কেন মানিবে যে উহা আমার

মোহের সময়? সে কেন মনে করিবে না যে, উহাই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল? সে কেন মনে করিবে না যে, পরে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল তাহাই মোহ হইতে উদ্ভূত—ভ্রান্তি-প্রসূত? বস্তুতঃ সে তাহা মনে করিতেও পারে। সে মনে করিতে পারে যে, সেই প্রথম বয়সটাই আমার জাগরণের কাল। আমার পরবর্তীকালীন আমূল পরিবর্তন সূক্ষ্ম আত্মাভিমানের ফল, তাহা আমার অজ্ঞানের পরিচায়ক। যদি আমার ছেলেরা ব্যারিস্টার ইত্যাদি পদবী পাইত তবে কি হানি হইত? তাহাদের উন্নতির পথে বাধা হওয়ার আমার কি অধিকার আছে? আমি কেন তাহাদিগকে ডিগ্রী ইত্যাদি গ্রহণ করিতে দিয়া তাহাদের ইচ্ছামত জীবন-পথ বাছিয়া লইতে দিই নাই?—এই রকমের প্রশ্ন আমার কয়েকজন বন্ধুও আমার কাছে অনেকবার করিয়াছেন। কিন্তু এই সব প্রশ্নের মধ্যে যে কোন যুক্তি আছে তাহা আমার মনে হয় না। আমি অনেক ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন বালকের উপর আমি ভিন্ন ভিন্ন রকম পরীক্ষা করিয়াছি, অথবা করিতে সাহায্য করিয়াছি। তাহার পরিণামও আমি দেখিয়াছি। এই সব ছেলেরা ও আমার ছেলেরা সমসাময়িক। আমি এ কথা স্বীকার করি না যে, আমার ছেলেদের চেয়ে তাহারা মানুষ হিসাবে বড় হইয়া গিয়াছে, অথবা তাহাদের কাছ হইতে আমার ছেলেদের বিশেষ কিছু শিখিবার আছে।

তাহা হইলেও আমার পরীক্ষার পরিণাম ত ভবিষ্যৎকালেই জানা যাইবে। এই বিষয়ে এখানে আলোচনা করার তাৎপর্য এই যে, যাঁহারা মানুষের উন্নতির ও প্রগতির ইতিহাসের অনুশীলন করিবেন, তাঁহারা গৃহ-শিক্ষা ও স্কুলের শিক্ষার পার্থক্য এবং বাপ-মা নিজের জীবনে যে পরিবর্তন আনে তাহা ছেলেদের উপর কিভাবে কাজ করে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিমাপ ইহাতে পাইবেন।

আবার সত্যের পূজারী দেখিতে পাইবেন যে, সত্যের প্রয়োগ তাঁহাকে কতদূর পর্যন্ত লইয়া যায়। স্বাধীনতা দেবীর উপাসক দেখিবেন যে, স্বাধীনতা দেবী কি দুর্ভোগ দিয়া থাকেন। ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য। যদি আমি ছেলেদের আমার কাছে রাখিয়াও আমার আত্মসম্মান বলি দিতাম, যদি অপর ভারতীয়েরা যে শিক্ষা তাহাদের ছেলেদের দিতে পারে না, সে শিক্ষা আমার ছেলেদের দিতে আমার প্রবৃত্তি হইত, তবে আমার ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইলে তাহারা যে আত্মমর্যাদার ও স্বাধীনতার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা পাইত না। যেখানে

স্বাধীনতা ও পুঁথিপড়া বিদ্যার মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হয়, সেখানে কে না বলিবে যে, স্বাধীনতা পুঁথির বিদ্যা অপেক্ষা হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ ?

যে সকল যুবককে আমি ১৯২০ সালে স্বাধীনতা-ঘাতক স্কুল ও কলেজ ছাড়িতে বলিয়াছিলাম, যাঁহাদিগকে আমি বলিয়াছিলাম যে,—গোলামীর ভিতর থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করা অপেক্ষা স্বাধীনতার জন্য নিরক্ষর থাকিয়া প্রকাশ্য রাস্তায় পাথর ভাঙ্গাও ভাল, তাঁহারা আজ হয়ত দেখিতে পারিবেন যে, আমার সে কথার মূল কোথায় !

৬
সেবাবৃত্তি

আমার ব্যবসা ঠিক চলিতেছিল, কিন্তু তাহাতে আমার তৃপ্তি ছিল না। জীবন খুব সরল করা চাই, কিছু কায়িক সেবা-কার্য করা চাই, এই প্রকার একটা আলোড়ন হৃদয়ের মধ্যে চলিতেছিল।

এমন সময় একদিন এক আতুর—এক কুষ্ঠ-রোগ-পীড়িত ব্যক্তি আমাদের ঘরে আসিল। তাহাকে খাওয়াইয়া বিদায় করিতে মনে চাহিল না। তাহাকে একটা কামরায় রাখিলাম, তাহার ঘা সাফ করিলাম ও তাহার সেবা করিলাম।

কিন্তু এমন করিয়া দীর্ঘদীন চালানো যায় না। বাড়িতে তাহাকে রাখার মত ব্যবস্থা ছিল না, আমার সাহসও ছিল না। আমি তাহাকে গিরমিটিয়াদের জন্য সরকারী হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলাম।

কিন্তু তাহাতে মনের ক্ষুধা মিটিল না। এই রকম শুশ্রূষা প্রতিদিন যদি কিছু কিছু করা যায় তবে কত ভাল হয়। ডাক্তার বুথ ছিলেন সেণ্ট এডিসন মিশনারীদের কর্তা। তিনি প্রতিদিনই সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন। তিনি বড় ভাল ও সদাশয় লোক ছিলেন। পারসী রুস্তমজীর দানশীলতার সাহায্যে ডাঃ বুথের অধীনে একটি খুব ছোট হাসপাতাল খোলা হইল। এই হাসপাতালে শুশ্রূষাকারী (নার্স) রূপে কাজ করিতে আমার প্রবল ইচ্ছা হইল। সেখানে ঔষধ দেওয়ার কাজ এক কি দুই ঘণ্টার জন্য থাকিত। সেজন্য একজন বেতনভোগী লোক অথবা স্বেচ্ছাসেবকের আবশ্যক ছিল। এই কাজের ভার লওয়া ও ঐ সময়টা নিজের কাজ হইতে বাঁচানো ঠিক করিলাম। আমার ওকালতির কাজ ছিল আপিসে বসিয়া পরামর্শ দেওয়া,

অথবা দস্তাবেজ তৈরি করা, মামলা আপস করা। অল্প-স্বল্প মামলা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টেও হইত। কিন্তু সে সমস্ত মামলায় প্রতিপক্ষ লড়াই করিত না। অর্থাৎ সেগুলি আনকনটেস্টেড মামলা ছিল। এই রকম মামলা থাকিলে তাহা মিঃ খানের ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়া আমি হাসপাতালে সময় দিতাম। মিঃ খান আমার পরে আসিয়াছিলেন এবং আমার সঙ্গেই থাকিতেন।

প্রতিদিন সকালে যাইতে হইত। যাইতে আসিতে ও হাসপাতালের কাজ করিতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিত। এই কাজ করিয়া মনে কতকটা শান্তি পাইলাম। আমার কাজ ছিল রোগীদের ব্যারাম কি বুঝিয়া লইয়া ডাক্তারকে তাহা জানানো ও ডাক্তার যে ব্যবস্থা করেন, সেই মত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া। এই ভাবে দুঃখী ভারতীয়দের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারা অধিকাংশই তামিল অথবা তেলেগু অথবা উত্তর ভারতীয় গিরমিটিয়া ছিল।

উত্তরকালে এই অভিজ্ঞতা আমার খুব কাজে আসিয়াছিল। বুয়র যুদ্ধের সময় আমি যে শুশ্রূষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম, তাহাতে ও অন্য রোগীর ব্যবস্থাতেও এই বিদ্যা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

ছেলেদের লালন-পালন করার প্রশ্নও আমার মনের ভিতর জাগরূক ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার আরো দুই ছেলে হয়। তাহাদেরকে কিভাবে পালন করিব, এই প্রশ্নের সমাধানে আমার হাসপাতালের কাজ খুব সাহায্য করিয়াছিল। আমার স্বাধীন স্বভাব আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে—এখনো দিতেছে। প্রসবের সময় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিব, ইহা আমি ও আমার স্ত্রী ঠিক করিয়াছিলাম। সেইজন্য ডাক্তার ও দাই-এর ব্যবস্থা ছিলই। কিন্তু যদি ঠিক সময়ে ডাক্তার না পাওয়া যায় ও দাই পলায় তবে আমার কি অবস্থা হইবে? শিক্ষিতা দেশী দাই ভারতবর্ষেই বড় মিলে না, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহা যোগাড় করা যে কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সকল কারণে আমি প্রসব করানো বিদ্যা অভ্যাস করিয়া লইলাম। ডাক্তার ত্রিভুবন দাসের 'মায়ের জন্য উপদেশ' নামক পুস্তক পড়িলাম। সেই বই পড়িয়া ও এদিক সেদিক হইতে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহার সাহায্যে আমি দুইটি শিশুকেই আতুড়ে শুশ্রূষা করিয়াছিলাম—একথা বলা যায়। দুইবারই দাই-এর সাহায্য অল্পদিনের জন্য লইয়াছিলাম, কোনবারেই সে দুই মাসের বেশি ছিল না। এ সাহায্যও প্রধানতঃ স্ত্রীর সেবার জন্য। ছেলেদের নাওয়ানো ধোয়ানোর

কাজ প্রথম হইতেই আমি করিতাম। শেষে ছেলেটির জন্মের সময় আমি কঠিন পরীক্ষায় পড়িয়া যাই। প্রসূতির বেদনা হঠাৎ আরম্ভ হয়। ডাক্তার বাড়ি ছিলেন না। দাই যোগাড় করিতেও সময় গেল। সে উপস্থিত থাকিলেও তাহার দ্বারা প্রসব করানোর কাজ চলিত না। প্রসবের সময়কার সমস্ত কাজই আমাকে নিজের হাতে করিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ এই কাজ আমি উক্ত বই হইতে ভালভাবে পড়িয়া লইয়াছিলাম বলিয়া আমাকে ভীত হইতে হয় নাই।

আমি দেখিলাম যে, যদি ছেলেপিলেকে ভাল ভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, তবে বাপ ও মা দুজনেরই শিশুপালন সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ করা দরকার। আমি এই বিষয় যে অনুশীলন করিয়াছিলাম তাহার সুফল পদে পদে পাইয়াছি। যে সবল স্বাস্থ্য আমার ছেলেরা আজ ভোগ করিতেছে, যদি শিশুপালন সম্বন্ধে আমার সাধারণ জ্ঞান না থাকিত, তবে তাহা ভোগ করিতে পারিত না। আমাদের মধ্যে একটা ভুল বিশ্বাস আছে যে, প্রথম পাঁচ বৎসর শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার কাল নয়। কিন্তু আসলে হইতেছে এই যে, প্রথম পাঁচ বৎসরে তাহারা যে শিক্ষা পায়, পরে সে রকম শিক্ষা আর পাইতে পারে না। শিশুদের শিক্ষা মায়ের পেটে থাকিতেই শুরু হয়—একথা আমি অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। গর্ভাধানকালে মাতাপিতার দেহ ও মনের অবস্থার প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে। গর্ভকালে মায়ের প্রকৃতি, মায়ের আহার-বিহারের ভাল-মন্দ ফল লইয়াই বালক জন্মগ্রহণ করে। জন্মিবার পরও মাতা-পিতার অনুকরণ করিতে থাকে। শিশু নিজে অসমর্থ বলিয়াই মাতা-পিতার উপর তাহার বিকাশ নির্ভর করে।

দম্পতির এই প্রকার সংকল্প করা সঙ্গত যে, তাহারা কখনো ভোগ-লালসা তৃপ্ত করার জন্য সংসর্গ করিবে না। কেবল যখন সন্তানলাভের ইচ্ছা হইবে তখনই সংসর্গ করিবে। রতি-সুখ এক স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহা মনে করা ঘোর অজ্ঞতা। জনন-ক্রিয়ার উপর সংসারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। সংসার ঈশ্বরের লীলার স্থান, তাঁহার মহিমার প্রতিবিম্ব। যাঁহারা একথা বুঝিবেন যে, এই জগতের কার্য সুব্যবস্থিত ভাবে চলার জন্যই রতি-ক্রিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা ভোগের বাসনা সর্বতোভাবে পরিহার করিবেন এবং রতিকার্যের ফল স্বরূপ যে সন্তান হয়, তাহাকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক হইতে উন্নত করার যোগ্য জ্ঞান লাভ করিয়া প্রয়োগ করিবেন এবং সেই জ্ঞানের সুফল ভবিষ্যৎ বংশকেও দিয়া যাইবেন।

ব্রহ্মচর্য—১

এখন ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে বলার সময় আসিয়াছে। বিবাহের পর হইতেই এক-পত্নী-ব্রত আমার হৃদয়ে স্থান লইয়াছিল। স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করা আমার সত্যব্রতের অঙ্গ ছিল। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গেও যে ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে, ইহা আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কি ঘটনায় অথবা কোন্ বইর প্রভাবে আমার মনে এই বিচারের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা আমার এখন পরিষ্কার মনে নাই। তবে এ পর্যন্ত মনে আছে যে, ইহাতে রায়চন্দ ভাইয়ের প্রভাব যথেষ্ট ছিল।

তাঁহার সঙ্গে এই বিষয়ে একটি কথোপকথন মনে পড়িতেছে। একসময় আমি গ্ল্যাডস্টোনের প্রতি মিসেস্ গ্ল্যাডস্টোনের প্রেমের প্রশংসা করিতাম। পার্লামেণ্ট ভবনেও মিসেস্ গ্ল্যাডস্টোন স্বামীর জন্য নিজে চা করিয়া দিতেন। এই বিখ্যাত দম্পতির এটা একটা নিয়ম হইয়া উঠিয়াছিল—একথা আমি কোথাও পড়িয়াছিলাম। ঘটনাটি আমি কবিকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম এবং ইহার জন্য ঐ দম্পতির প্রশংসাও করিয়াছিলাম। রায়চন্দ ভাই বলিলেন—"ইহাতে আপনি মহত্ত্বের কি দেখিলেন? যদি সেই মহিলা গ্ল্যাডস্টোনের ভগ্নী হইতেন, অথবা তাঁহার বিশ্বস্ত চাকর হইত, ও এমনি ভালবাসার সঙ্গে চা দিত তবে? এই রকম ভগ্নী, এই রকম চাকরের দৃষ্টান্ত কি আপনি আজও দেখিতে পান না? নারী-জাতির পরিবর্তে পুরুষ যদি এই প্রকার ভালবাসা দেখাইত তবে কি আপনি অধিকতর আনন্দিত ও আশ্চর্যান্বিত হইতেন না? আমি যাহা বলিলাম বিচার করিয়া দেখিবেন।"

রায়চন্দ নিজে বিবাহিত ছিলেন। আমার স্মরণ আছে, সে সময় তাঁহার সে কথা কঠিন বোধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, চুম্বক যেমন লোহাকে আকৃষ্ট করে তাঁহার এই কথাও আমাকে তেমনিভাবে আকৃষ্ট করিল। পুরুষ চাকরের ঐ প্রকার বিশ্বস্ততার মূল্য ত স্ত্রীর বিশ্বস্ততার মূল্য অপেক্ষা হাজার গুণ বেশি। পতি-পত্নীর মধ্যে ঐক্য হয়, এইজন্য উভয়ের মধ্যে প্রেমও হয়। ইহাতে আশ্চর্য কিছু নাই। চাকর মনিবে সেই প্রেমের বিকাশ দরকার। দিনে দিনে কবির বাক্যের প্রভাব আমার উপরে বাড়িতে লাগিল।

আমার পত্নীর সঙ্গে কি প্রকারের সম্বন্ধ রাখিব? পত্নীকে ভোগের বাহন

রূপে ব্যবহার করিলে পত্নীর প্রতি কি রকম বিশ্বস্ততা দেখানো হয়? যতদিন আমি ভোগের অধীন থাকিব ততদিন আমার পত্নী-ব্রাত্যের কিছুই মূল্য নাই। এখানে একথা বলা দরকার যে, আমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সত্ত্বেও, কোন দিনই পত্নীর দিক হইতে আক্রমণ আসে নাই। সেইদিক হইতে দেখিলে, আমি যখনই ইচ্ছা করি না কেন, ব্রহ্মচর্য পালন করা আমার পক্ষে সহজ ছিল। কেবল আমার নিজের অক্ষমতা অথবা ভোগের আসক্তিই আমাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না।

আমার মানসিক জাগরণের পরেও দুইবার নিষ্ফল হইয়াছিলাম—চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হইয়াছিলাম। আমার এই বিফলতার হেতু—আমার চেষ্টার মূলে উচ্চ আদর্শ ছিল না, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সন্তানের জন্মদান বন্ধ করা। উহার জন্য বাহ্যিক বস্তু ব্যবহার বিষয়ে আমি বিলাতে কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম। আমি নিরামিষ আহার প্রসঙ্গে ডাক্তার এলিন্সনের এই উপায় প্রচারের উল্লেখ করিয়াছি। তাহার কতকটা ক্ষণিক প্রভাব আমার উপর হইয়াছিল, কিন্তু এই সব পদ্ধতি সম্বন্ধে মিঃ হিলসের বিরুদ্ধতা, তাঁহার অন্তর-সাধনা ও সংযমসাধনার সমর্থনের প্রভাবই আমার মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে এবং সেই অনুভূতিই চিরস্থায়ী হইয়াছিল। সেইজন্য সন্তানের জন্মদানের অনাবশ্যকতা বুঝিয়া, সংযম-পালনের দিকেই আমার চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলাম।

সংযম পালন করিতে নানান অসুবিধা ছিল। আলাদা আলাদা খাট করিলাম। রাত্রিতে পরিশ্রম-শেষে খুব শ্রান্ত হইয়া শুইতে আসিতে লাগিলাম। কিন্তু এই সকল চেষ্টার যথেষ্ট সুফল আমি শীঘ্র দেখিতে পাই নাই। কিন্তু আজ অতীত দিনের উপর চোখ ফিরাইলে দেখি, এই সকল প্রচেষ্টাই আমাকে অন্তিম বল দিয়াছিল।

অবশেষে ১৯০৬ সালে শেষ সংকল্প গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। তখনো সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় নাই। এবং এই সত্যাগ্রহ কল্পনা আমার স্বপ্নেও ছিল না। বুওর যুদ্ধের পর নাতালে জুলু বিদ্রোহ হয়। সে সময় আমি জোহানেসবর্গে ওকালতি করিতাম। তখন স্থির করিয়াছিলাম যে, এই বিদ্রোহের সময় নাতাল সরকারকে আমার যথাসাধ্য সাহায্য করা আবশ্যক। সরকার সে সাহায্য গ্রহণও করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে সে বর্ণনা করিব। এই সাহায্য দানের বিষয় লইয়াই আমার মনে তীব্র দ্বন্দ্ব ও আন্দোলন উপস্থিত হয়। আমার যেমন স্বভাব, আমি একথা আমার সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করি। আমার মনে

হইল, সন্তানের জন্মদান ও সন্তান-পালন জনসেবার পরিপন্থী। এই জুলু বিদ্রোহের সময় সেবা-কার্যে যোগ দেওয়ার জন্য আমি আমার জোহানেসবর্গের বাসা উঠাইয়া দিই। সযত্নে সাজানো বাড়ি মাসখানেক ব্যবহার করিতে না করিতেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। স্ত্রী ও ছেলেদের ফিনিক্সে রাখিয়া আমি সেবক-দল সহ বাহির হইয়া পড়ি। সেই সময় যখন কঠিন কুচ-কাওয়াজ (মার্চ) করিতেছিলাম, তখনই আমার মনে হয় যে, যদি আমি জনসেবায় নিমগ্ন হইতে চাই, তবে আমার পুত্রান্বেষণ ও বিত্তান্বেষণ এই দুই স্পৃহা ত্যাগ করা দরকার এবং বাণপ্রস্থ ধর্ম পালন করা দরকার।

এই বিদ্রোহের ব্যাপারে আমাকে দেড় মাসের বেশি থাকিতে হয় নাই। কিন্তু এই ছয় সপ্তাহ আমার জীবনের অতিশয় মূল্যবান সময়। ব্রতের মহত্ত্ব আমি এই সময় খুব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম। আমি দেখিলাম যে, ব্রত বন্ধন নহে, উহা স্বাধীনতার তোরণ দ্বার স্বরূপ। এতদিন পর্যন্ত আমি যে আমার প্রচেষ্টায় সফলতা পাই নাই, তাহা কেবল আমার সংকল্প স্থির ছিল না বলিয়া— আমার নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস ছিল না বলিয়া। সেইজন্য আমার মন অনেক চঞ্চলতা ও অনেক বিকারের বশীভূত হইত। আমি দেখিলাম যে, মানুষ ব্রতের বন্ধন না লইলে মোহের বন্ধনে পড়ে। ব্রতের বন্ধন গ্রহণ করিলেই ব্যভিচার হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ এক-পত্নীর সম্বন্ধের বন্ধন যথার্থ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে। 'আমি চেষ্টা করার সার্থকতা মানি, কিন্তু ব্রতের দ্বারা বদ্ধ হইতে চাই না'— এই প্রকার উক্তি দুর্বলতার লক্ষণ। উহা একপ্রকার সূক্ষ্ম ভোগেরই ইচ্ছা। যে বস্তু পরিত্যাজ্য তাহা সর্বথা ত্যাগ করার দ্বারা হানি কি করিয়া হইতে পারে? যে সাপ আমাকে দংশন করিতে আসিতেছে তাহাকে আমরা ত্যাগ করার চেষ্টা করি না, নিশ্চিতভাবেই ত্যাগ করি। আমি জানিয়াছি যে, কেবল প্রচেষ্টার উপর থাকা মানে মৃত্যু। প্রচেষ্টা করার মধ্যে সর্পের ভয়ঙ্করত্ব সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব আছে। সেই জন্য যখন কোনও বস্তু আমরা ত্যাগ করিতে চেষ্টা মাত্র করি, তখন সেই বস্তুর ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট দৃষ্টি গড়িয়া ওঠে নাই—একথা বলা যায়। 'আমার সংকল্প যদি পরে বদলায় তবে'—এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া আমরা অনেক সময় ব্রত লইতে ভয় পাই। এই যুক্তির মধ্যে স্পষ্ট দর্শনের অভাব আছে। সেই জন্যই নিষ্কুলানন্দ বলিয়াছেন :—

'ত্যাগ না টেকেরে বৈরাগ বিনা।'

যখন কোনও বস্তু বিশেষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন সে বিষয়ে ব্রত গ্রহণ অনিবার্য বস্তু হয়।

৮

ব্রহ্মচর্য—২

ভালরকম বিচার-বিবেচনা ও অনেক রকম আলাপ-আলোচনা করার পর ১৯০৬ সালে ব্রহ্মচর্য ব্রত লইয়াছিলাম। ব্রত লওয়ার জন্য আমি পত্নীর সঙ্গে পূর্বে পরামর্শ করি নাই। কেবল ব্রত লওয়ার সময় করিয়াছিলাম। তাঁহার দিক হইতে আমি কোনও বিরোধ বা বাধা পাই নাই।

ব্রত লইতে কষ্টকর বোধ হইতেছিল। আমার শক্তির স্বল্পতা অনুভব করিতেছিলাম। মনের বিকার কিভাবে চাপিয়া রাখিব? নিজের পত্নীর সঙ্গে বিকারযুক্ত সম্বন্ধ ত্যাগ—নতুন জিনিস বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহা হইলেও ব্রত লওয়া যে কর্তব্য তাহাও আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমার ইচ্ছা শুদ্ধ ছিল। ঈশ্বর সংকল্প-রক্ষার শক্তি দিবেন ভাবিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

আজ কুড়ি বৎসর পরে সেই ব্রতের কথা স্মরণ করিয়া আমার আনন্দমিশ্রিত বিস্ময় বোধ হয়। সংযম পালন করার মানসিকতা ১৯০১ সাল হইতেই প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু এখন যে স্বাধীনতা ও আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলাম, ১৯০৬ সালের পূর্বে তাহা ভোগ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তখন আমি বাসনাবদ্ধ ছিলাম এবং যে কোনও মুহূর্তে বাসনার বশীভূত হইয়া পড়িতে পারিতাম। কিন্তু এখন আর বাসনা আমার উপর চাপিয়া বসিতে সমর্থ হইল না। এখন হইতে ব্রহ্মচর্যের মহিমা, ঐশ্বর্য আমার কাছে প্রতিদিন উজ্জ্বল ভাবে প্রতিভাত হইতে লাগিল। আমি ফিনিক্সে ব্রত লইয়াছিলাম।

আহতদিগকে শুশ্রূষা করার কাজ হইতে অবকাশ পাওয়ার পরই আমাকে জোহানেসবর্গে যাইতে হয়। আমি সেখানে গেলাম ও এক মাসের মধ্যেই সত্যাগ্রহের ভিত্তি স্থাপিত হইল। কে জানে—এই ব্রহ্মচর্য ব্রত লওয়ার আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ সত্যাগ্রহের জন্য ভিত্তি তৈরি করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছিল কিনা! সত্যাগ্রহের কল্পনা আমি পূর্ব হইতে রচনা করি নাই। উহার উৎপত্তি আপনা হইতেই হইয়াছিল—অনিচ্ছালব্ধ ভাবেই

হইয়াছিল। আমি দেখিতেছি যে, আমি তার পূর্বে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলাম যেমন, ফিনিক্স-যাওয়া, জোহানেসবর্গের বাড়ির সমস্ত খরচা কমাইয়া ফেলা, পরিশেষে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ—এই সমস্তই সত্যাগ্রহের জন্ম আমাকে প্রস্তুত করিয়া তোলার ভূমিকা মাত্র।

পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন মানে ব্রহ্ম-দর্শন। এই জ্ঞান আমি শাস্ত্র পাঠ করিয়া পাই নাই। এই অর্থ আমার কাছে ধীরে ধীরে অনুভব-সিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ঐ সম্পর্কে শাস্ত্রবাক্য আমি পরে পড়িয়াছিলাম। ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই শরীর-রক্ষা, বুদ্ধি-রক্ষা ও আত্মার রক্ষা। এই বিষয়গুলি আমি ব্রত লওয়ার পর দিন দিন গভীর ভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মচর্য এখন এক ঘোর তপশ্চর্যার বদলে আমার কাছে এক আনন্দময় অনুভূতির বস্তু হইয়া উঠিল এবং এই ছায়ার আশ্রয়েই আমার জীবন পরিচালিত হইতে লাগিল। এখন হইতে উহার সৌন্দর্যের নিত্য নতুনত্ব আমি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিতে লাগিলাম।

যদিও আমি ব্রহ্মচর্য হইতে রস উপভোগ করিতেছিলাম তথাপি ইহাতে নীরসতা ও কঠিনতা ছিল না—একথা যেন কেউ না মনে করেন। আজ ছাপ্পান্ন বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। তবুও তাহার কঠিনতা অনুভব আমি করিতেছি। ইহা যে তীক্ষ্ণ অসি-ধার-ব্রত, ইহা যে তরবারির ধারের উপর দিয়া চলার মত কঠিন ব্রত, তাহাও প্রতিদিন নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করিতেছি। ইহার জন্ম নিরন্তর জাগৃতির ও সতর্কতার আবশ্যকতা দেখিতেছি।

ব্রহ্মচর্য যদি পালন করিতে হয় তবে সর্বাগ্রে স্বাদেন্দ্রিয় অর্থাৎ রসনার উপর সংযম রাখা আবশ্যক। যদি স্বাদ জয় করা যায়, তবে ব্রহ্মচর্য অতিশয় সহজ হয়—একথা আমি নিজে অনুভব করিলাম। সেইজন্ম আমার আহারের পরীক্ষা কেবল নিরামিষ আহারের দিক হইতে নয়, ব্রহ্মচর্য রক্ষা করার দৃষ্টিকোণ হইতেই দেখিতে লাগিলাম। ব্রহ্মচারীর খাদ্য অল্প, সাদাসিধা, বিনা মশলায় ও স্বাভাবিক অবস্থায় হওয়া চাই। ইহা আমি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছি।

ব্রহ্মচারীর খাদ্য যে ফল-মূল তাহা আমি ছয় বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। যখন আমি শুক্‌নো ও টাটকা ফলমূলের উপর নির্ভর করিতাম, তখন আমি যে প্রকার বিকারশূন্যতা অনুভব করিয়াছিলাম, খাদ্য পরিবর্তনের পর আর সেইরূপ অনুভব হয় নাই। ফলাহারের সময় ব্রহ্মচর্য পালন করা সহজ ছিল, দুধ খাওয়ার পর উহা কঠিন হয়। ফলাহার ত্যাগ

করিয়া দুধ খাওয়া কেন আরম্ভ করিলাম তাহা যথাস্থানে বলা হইবে। এখানে কেবল এইটুকুই বলা যথেষ্ট যে, ব্রহ্মচর্যের পক্ষে দুধ খাওয়া যে বিঘ্নকারক তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে কেহ যেন একথা বুঝিবেন না যে, ব্রহ্মচারী মাত্রকেই দুধ খাওয়া ত্যাগ করিতে হইবে। খাদ্যের প্রভাব ব্রহ্মচর্যের উপর কতটা, সে বিষয় অনেক পরীক্ষা করার আবশ্যকতা আছে। খাদ্য হিসাবে দুধের মত স্নায়ু-গঠনকারক ও তেমনি সহজপাচ্য কোনও ফল আছে কিনা তাহা এ পর্যন্তও আমি জানিতে পারি নাই। ফল অথবা কোন অন্ন জাতীয় খাদ্য ঐ প্রকার গুণসম্পন্ন বলিয়া কোনও ডাক্তার বা বৈদ্যও আমাকে দেখাইতে পারেন নাই। সেইজন্য দুধকে বিকার-উপস্থিতকারী খাদ্য জানিয়াও উহা ত্যাগ করার পরামর্শ কাউকে দিতে পারি না।

ব্রহ্মচর্যের জন্য বাহ্য সাধনের মধ্যে যেমন আহার্যের প্রকার ও পরিমাণের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, তেমনি উপবাসেরও আবশ্যক। ইন্দ্রিয় এত বলবান যে,—তাহাকে যদি চারিদিক হইতে—উপর হইতে, নীচ হইতে, দশদিক হইতে ঘিরিয়া রাখা যায়, তবেই তাহা বশে থাকে। খাদ্য না দিলে যে ইন্দ্রিয় সকল কাজ করিতে পারে না একথা সকলেই জানে। সুতরাং ইন্দ্রিয় দমন করার জন্য ইচ্ছাকৃত উপবাস যে খুব সাহায্য করে, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। কোন কোন লোক উপবাস করিয়াও নিষ্ফল হয়। তাহার কারণ এই যে, উপবাসই সব করিয়া দিবে এইরূপ মনে করিয়া তাহারা মাত্র স্থূল উপবাস করে। মনে মনে তাহারা ছাপ্পান্ন রকম ভোগ করে, উপবাসকালে ও উপবাসের পর কি খাইবে তাহারই আস্বাদ লইতে থাকে। আর তাহার পর অভিযোগ করে যে, উপবাসে না হইল স্বাদেন্দ্রিয়ের সংযম, না হইল জননেন্দ্রিয়ের সংযম। উপবাসের সত্য উপযোগিতা তখনই দেখা যায়, যখন উপবাসের সঙ্গে মন দেহকে দমন করিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ মনের বিষয়-ভোগের প্রতি বৈরাগ্য আসা চাই। বিষয়ের মূল বা শিকড় মনের মধ্যে রহিয়াছে। সাধনার সম্পর্কে উপবাসাদির শক্তি পরিমিত। কারণ উপবাস করিয়াও মানুষ বিষয়াসক্ত থাকিতে পারে। কিন্তু উপবাস না করিয়া বিষয়াসক্তি সমূলে বিনাশ করা সম্ভব নহে। সেই জন্য ব্রহ্মচর্য পালনের পক্ষে উপবাস অনিবার্য অঙ্গ।

যাহারা ব্রহ্মচর্য পালন করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের মধ্যে অনেকে বিফল হয়, কেন না তাহারা খাওয়া-পরা দেখা ইত্যাদি বিষয়ে যদৃচ্ছা চলিয়াও ব্রহ্মচর্য রাখিতে চায়। তাহাদের এ আকাঙ্ক্ষা গ্রীষ্মকালে শীত-ঋতুর অনুভূতি পাওয়ার

ইচ্ছার মত। সংযমী ও স্বেচ্ছাচারীর মধ্যে, ভোগী ও ত্যাগীর মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই। সাম্য যদি দেখা দেয় তবে তাহাও সেক্ষেত্রে উপরে উপরে মাত্র। পার্থক্য বোধ ভাল রকমের আসা চাই। চক্ষুর ব্যবহার উভয়েই করে। ব্রহ্মচারী দেব-দর্শন করে, ভোগীর চোখ নাটকাভিনয়ে লীন থাকে। কানের ব্যবহার উভয়েই করে। একে ঈশ্বরভজন শোনে, অপরে বিলাস সংগীত শুনিয়া মজা পায়। জাগিয়া থাকে দুইজনেই। একজন জাগ্রত অবস্থায় হৃদয়-মন্দির-বিহারী রামকে পূজা করে, আর অপরে রঙ্গরসের প্লাবনে ঘুমের কথা ভুলিয়া যায়। দুইজনেই খায়। একজন শরীরকে সচল রাখার জন্য মুখকে প্রাপ্য ভাড়া দেয়, অপরে স্বাদের জন্য অনেক বস্তু দেহে প্রবেশ করাইয়া উহাকে দুর্গন্ধযুক্ত করিয়া ফেলে। এইভাবে উভয়ের ভিতর আচার-বিচারের ভেদ থাকিবেই ও এই ভেদ প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইবে—হ্রাস পাইবে না।

ব্রহ্মচর্যের অর্থ—মন, বাক্য ও দেহের সর্ব-ইন্দ্রিয়ের সংযম। এই সংযমের জন্য উপরে উল্লেখিত আসক্তিগুলির ত্যাগের আবশ্যকতা আছে, তাহা আমি প্রতিদিন অনুভব করিতেছি। যেমন ত্যাগের ক্ষেত্রের সীমা নাই, তেমনি ব্রহ্মচর্যের মহিমারও সীমা নাই। এই প্রকার ব্রহ্মচর্য অল্প চেষ্টায় লভ্য নয়। কোটি কোটি লোকের কাছে ইহা কেবল আদর্শ-রূপেই থাকিয়া যাইবে। যে ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছে সে নিজের ত্রুটির দর্শন নিত্যই করিবে। নিজের হৃদয়ের কোণে কোণে লুকানো বিকারের দিকে দৃষ্টি দিবে ও তাহা দূর করার চেষ্টা করিবে। যে পর্যন্ত চিন্তার উপর এমন অধিকার না পাওয়া যায় যে, বিনা ইচ্ছায় মনে একটা চিন্তাও আসিবে না, বুঝিতে হইবে ততক্ষণ সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য অর্জিত হয় নাই। চিন্তা মাত্রই বিকার। উহাকে বশ করা মানে মনকেই বশ করা। মনকে বশ করা, বায়ুকে বশ করা অপেক্ষাও কঠিন। তাহা হইলেও আত্মার পক্ষে এই অধিকার লাভ সম্ভব। এই কাজ কঠিন বলিয়াই অসাধ্য—একথা কেউ মনে করিবেন না। ইহাই পরম অর্থ, সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য। পরম অর্থের জন্য যে পরম সাধনা আবশ্যক, তাহাতে ত বিস্মিত হইবার কারণ নাই!

কিন্তু এই প্রকার ব্রহ্মচর্য-লাভ যে কেবলমাত্র সাধনার দ্বারাই হয় না, দেশে আসিয়া তাহা আমার কাছে ধরা পড়িল। তাহার পূর্ব পর্যন্ত আমি মোহের ভিতরে ছিলাম একথা বলা যায়। ফলাহার দ্বারা চিত্ত-বিকার সমূলে নষ্ট হয়, এই কথা আমি মানিয়া লইয়াছিলাম এবং অভিমানবশতঃ মনে করিতাম যে, আমার আর কিছু করার নাই।

কিন্তু আমার ব্রহ্মচর্য লাভের চেষ্টার সকল কথা বলার স্থান এ অধ্যায় নহে। ইতিমধ্যে এইটুকু বলিয়া রাখা যায় যে, আমি যে ব্রহ্মচর্য মানে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার বলিয়াছি, সেই প্রকার ব্রহ্মচর্য যে পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে যদি তাহার নিজের সাধনার সঙ্গে ঈশ্বরের উপর শ্রদ্ধা রাখে তবে তাহার নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥*

সেইজন্য রামনাম ও রাম-কৃপা মোক্ষার্থীর পক্ষে অন্তিম সাধনা। আমি ভারতবর্ষে ফিরিবার পর এই কথা বুঝিতে পারিয়াছি।

৯

সরল জীবনযাত্রা

ভোগ-বিলাসময় জীবন শুরু করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা টিকিল না। বাড়িখানা পরিপাটি করিয়া সাজাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমাকে মোহে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। ঐভাবে সংসার-যাত্রা শুরু করিয়া আমি খরচ কমাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ধোপার খরচা খুব লাগিত। কাপড় কাচিয়া দিতেও এত বিলম্ব করিত যে দুই-তিন ডজন শার্ট ও কলারেও আমার চলিত না। কলার রোজ বদলাইতে হয়; শার্ট রোজ না হইলেও একদিন অন্তর বদলাইতে হয়। ইহাতে দুইদিক হইতে ব্যয় পড়ে, ইহা আমার কাছে অনাবশ্যক বোধ হইল। এজন্য আমি কাপড় কাচার সরঞ্জাম যোগাড় করিলাম। কাপড় কাচা সম্বন্ধে বই পড়িয়া ধোপার বিদ্যা শিখিয়া লইলাম। স্ত্রীকেও শিখাইলাম। কাজ বাড়িল, কিন্তু নতুনত্বের আনন্দও পাওয়া গেল।

আমার হাতের কাচা প্রথম কলারটার কথা কখনো ভুলিতে পারিব না। এরারুট বেশি করিয়া দিয়াছিলাম, ইস্ত্রিও পুরা গরম করা হয় নাই। কলার পুড়িয়া যাইবে বলিয়া ইস্ত্রি বেশি করিয়া চাপি নাই। কলার শক্ত হইল বটে, কিন্তু উহা হইতে এরারুট ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

এই কলার পরিয়াই কোর্টে গেলাম। ইহাতে আমাকে লইয়া ব্যারিস্টারদের

---

* দেহধারী যখন নিরাহার থাকে তখন তাহার সে বিষয়ের ভোগ মন্দা পড়িয়া থাকে, কিন্তু রস যায় না। সে রসও ঈশ্বর সাক্ষাৎকার দ্বারা শান্ত হয়। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৫৯।

মজা করার সুবিধা হইল। কিন্তু ঠাট্টা সহ্য করার শক্তি তখনও আমার যথেষ্ট ছিল।

তাঁদের বলিলাম—"কলার নিজেই ধুইয়াছি। এরারুট কিছু বেশি পড়িয়াছিল। প্রথম চেষ্টা বলিয়া এরারুট উঠিয়া যাইতেছে। ইহাতে আমার কোন ক্ষতি হইতেছে না, উপরন্তু আপনাদের সকলকার আমোদ হইতেছে। বেশ ভালই ত!"

"ধোপা পাওয়া যায় না নাকি?"—একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এখানকার ধোপার খরচা আমার কাছে বড় বেশি বোধ হয়। একটা কলার ধোওয়ার খরচ প্রায় কলারের দামের সমান। তার উপর আবার ধোপার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। এর চেয়ে নিজে নিজে কাচিয়া লওয়াই আমি ভাল বলিয়া মনে করি।"

এই স্বাবলম্বনের সৌন্দর্য আমি বন্ধুদের বুঝাইতে পারি নাই।

একথা জানাইয়া রাখিতেছি যে, কালক্রমে আমি ধোপার কাজ বেশ ভালরকম শিখিয়াছিলাম। বাড়িতে ধোওয়া, ধোপার ধোওয়া অপেক্ষা কোন ক্রমেই খারাপ হইত না। আমার কলার ঠিক ধোপার ধোওয়া কলারের মত শক্ত ও চকচকে হইত।

স্বর্গগত মহামতি গোবিন্দ রাণাডে গোখলেকে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ একখানা উত্তরীয় দান করিয়াছিলেন। উত্তরীয়খানা গোখলে বিশেষ যত্নের সহিত রাখিতেন ও বিশেষ দিনে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সম্মানের জন্য জোহানেসবর্গের ভারতীয়েরা যে ভোজ দিয়াছিল, সেও ঐ রকম একটা বিশেষ দিন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে, এইখানেই তিনি খুব বড় একটা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সুতরাং এই দিনেও তিনি সেই উত্তরীয় ব্যবহার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উহা কোঁচকাইয়া গিয়াছিল, ইস্ত্রি করার আবশ্যক ছিল। ধোপার নিকট হইতে তাড়াতাড়ি ইস্ত্রি করিয়া আনা সম্ভব ছিল না। কাজেই আমি আমার ধোপার বিদ্যা উহার উপর প্রয়োগ করিতে চাহিলাম।

"তোমার ওকালতির উপর বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু এই উত্তরীয়ের উপর তোমার ধোপাগিরির পরীক্ষা করিতে দিব না। যদি উত্তরীয়খানা খারাপ করিয়া ফেল? ইহার মূল্য তুমি জানো?—এই বলিয়া অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই উপহার পাওয়ার ইতিহাস শুনাইলেন।

আমি সবিনয়ে জানাইলাম—"আমি কথা দিতেছি যে, আমার হাতে

উত্তরীয় খারাপ হইবে না।" তিনি তখন ইস্ত্রি করার অনুমতি দিলেন। তারপর তাঁহার নিকট হইতে আমার ধোপাগিরির সার্টিফিকেট পাইলাম। অতঃপর সারা পৃথিবী যদি আমার ধোপাগিরির যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তবে তাহাতে কি আসে যায়!

যেমন ধোপার মুখাপেক্ষিতা হইতে আমি মুক্তি পাইলাম, তেমনি নাপিতের অধীনতা হইতে মুক্ত হওয়ারও ব্যাপার ঘটিল। বিলাতে যাহারা যায় তাহারা সকলেই নিজে নিজে দাড়ি কামাইতে শিখে। কিন্তু নিজের চুল নিজে কাটিতে শিখে—একথা আমি জানি না। প্রিটোরিয়াতে আমি একবার এক ইংরাজ নাপিতের দোকানে গেলাম। সে রূঢ়ভাবে আমাকে কামাইতে অস্বীকার করে। তাহার এই অস্বীকৃতির মধ্যে অসম্মানের ভাবও ছিল। আমার দুঃখ হইল। আমি চুল ছাঁটাই ক্লিপ খরিদ করিলাম ও আরশির সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল ছাঁটিলাম। সম্মুখের চুল একরকম ছাঁটা হইল। কিন্তু পিছনের চুল ভাল ছাঁটা হইল না। কোর্টে গেলাম, আমাকে দেখিয়া হাসাহাসি পড়িয়া গেল।

"আপনার মাথায় চুল কি ইন্দুরে খাইয়াছে?"

আমি বলিলাম—"আরে না! আমার কালো মাথা কি ধলা নাপিত স্পর্শ করিতে পারে? তার চাইতে যেমন তেমন করিয়া নিজের হাতেই আমার চুল ছাঁটা ঢের ভাল।"

এই উত্তরে বন্ধুরা আশ্চর্য হইলেন না। দেখিতে গেলে সে নাপিতের কোনও দোষ ছিল না। সে যদি কালো রং-এর লোকের চুল ছাঁটে, তবে তাহার শ্বেতকায় খরিদ্দার ছুটিয়া যাইবে। আমাদের উচ্চবর্ণের চুল যে নাপিত ছাঁটে, আমরাই কি তাহাকে অস্পৃশ্যদিগকে কামাইতে দিই! ইহার প্রতিদান দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি একবার নয়, অনেকবার পাইয়াছি। ইহা আমাদের নিজেদের দোষেরই পরিণাম জানিয়া উহাতে কখনো আমার রাগ হয় নাই।

স্বাবলম্বন ও সাদাসিধা চাল-চলনের জন্য আমার আগ্রহ ইহার পর যে তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল, সে কথা যথাস্থানে আসিবে। ঐ ইচ্ছার মূল পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। উহা অঙ্কুরিত হওয়ার জন্য কেবল জলসেচের আবশ্যক ছিল। সে জল অনায়াসেই আসিয়া পড়িল।

১০

বুয়ার যুদ্ধ

১৮৯৭ হইতে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত আমার জীবনের অনেক ঘটনা বাদ দিয়া এখন বুয়ার যুদ্ধের কথায় আসিব। যখন যুদ্ধ বাধে তখন বুয়ারদের প্রতিই আমার সহানুভূতি ছিল। কিন্তু এই রকম অবস্থায় ব্যক্তিগত ধারণার উপর কার্য করার অধিকার নাই বলিয়া তখন আমি বিশ্বাস করিতাম। আমার মনে এই বিষয় লইয়া যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাসে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়াছি। সেইজন্য এখানে সে আলোচনা করার আর ইচ্ছা নাই। জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে সেই ইতিহাস পড়িতে বলি। এখানে কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে, ব্রিটিশ-রাজ্যের প্রতি আমার আনুগত্য-রক্ষার প্রেরণাই আমাকে এই যুদ্ধে টানিয়া নামাইয়াছিল। আমার এই বোধ জন্মিয়াছিল যে, যদি ব্রিটিশ-প্রজা বলিয়া প্রজার অধিকার চাহিয়া থাকি, তবে ব্রিটিশ-রাজ্য রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ, ব্রিটিশ-প্রজারূপে তাহাতে যোগ দেওয়াও আমার ধর্ম। তখন আমি ইহাও মনে করিতাম যে, ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ উন্নতি ব্রিটিশ-শাসনাধীনেই হইতে পারে।

সেই জন্য যতগুলি পাইলাম সঙ্গী সংগ্রহ করিয়া আহতদের শুশ্রূষা করার জন্য একটা দল দাঁড় করাইলাম।

এ পর্যন্ত এখানকার ইংরাজেরা সাধারণতঃ ইহাই মনে করিত যে, ভারতীয়েরা কোনও বিপদজনক কাজে যাইতে বা স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বুঝিতে পারে না। এই জন্য অনেক ইংরাজ বন্ধু আমাকে নিরাশা-পূর্ণ জবাব দিয়াছিলেন। কেবল ডাক্তার বুথ খুব উৎসাহ দিয়াছিলেন। তিনিই আমাদিগকে আহতকে শুশ্রূষা করার পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। আমরা ডাক্তারের কাছ হইতে যোগ্যতার সার্টিফিকেট পাইলাম। মিঃ লাটন ও স্বর্গগত মিঃ এসকম্বও আমাদের এই উদ্যম অনুমোদন করিলেন। অবশেষে যুদ্ধে সেবা করিতে দেওয়ার অনুমতির জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন করি। সরকার ধন্যবাদ দিয়া জানাইলেন যে, তখন আমাদের সেবা-কার্যের আবশ্যকতা নাই।

কিন্তু এই 'না' আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। ডাক্তার বুথের সাহায্য লইয়া তাঁহারই সঙ্গে আমি নাতালের 'বিশপে'র সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

আমার দলের অনেকে ভারতীয় খ্রীষ্টান ছিল। বিশপের কাছে আমার প্রস্তাব খুবই ভাল লাগিল। তিনি সাহায্য করিবেন বলিয়া কথা দিলেন। ইতিমধ্যে অদৃষ্টও আমাদের সাহায্য করিল। যে প্রকার মনে করা গিয়াছিল বুয়ারদের দৃঢ়তা ও বীরত্ব তাহা অপেক্ষা বেশি বলিয়া দেখা গেল। সরকারের অনেক সৈন্য সংগ্রহ করা (রংরুট) দরকার হইয়া পড়ে। তখন সরকার আমাদের সাহায্য লইতে স্বীকার করিলেন।

আমরা যে দল গঠন করিয়াছিলাম তাহাতে প্রায় ১১০০ লোক ছিল, এবং ইহার প্রায় ৪৪ জন নায়ক ছিল। প্রায় তিনশত জন স্বাধীন ভারতীয় এই দলে যোগদান করিয়াছিলেন, বাদবাকি সকলে ছিল গিরমিটিয়া। ডাক্তার বুথ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। দলের কাজ সহজ ছিল। কেন না আমাদিগকে গুলি-গোলার সীমানার বাহিরে কাজ করিতে হইত এবং রেডক্রশের* চিহ্নের জন্যও বিপদ খুব বেশি ছিল না। তাহা হইলেও সংকটের সময় গোলা-বারুদের সীমার মধ্যে গিয়াও আমাদিগকে কায করিতে হইয়াছিল। এই বিপদের মধ্যে আমাদিগকে নামানো হইবে না, সরকার নিজ ইচ্ছাতেই এইরূপ শর্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্পিয়নকোপ-এর পরাজয়ের পরে অবস্থা বদলায়। তখন জেনারেল বুলার সংবাদ দিলেন যে, যদিও আমরা বিপদের সীমার মধ্যে কাজ করিতে বাধ্য নই, তবুও যদি আমরা আহত সিপাহী ও আমলাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া ডুলিতে করিয়া লইয়া যাই তাহা হইলে সরকার উপকৃত হইবেন। বিপদের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাজ করিবার জন্য আমাদের আগ্রহই ছিল। সুতরাং স্পিয়নকোপ-এর যুদ্ধের পর গোলা-বারুদের সীমানার মধ্যে গিয়া কাজ করিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা করি নাই।

সকলকেই অনেক সময় রোজ কুড়ি-পঁচিশ মাইল মার্চ করিতে হইত। যাওয়ার বেলায় আহত সৈন্যকে ডুলিতে করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতে হইত। যে সকল আহত যোদ্ধাকে আমাদের বহন করিতে হইয়াছিল তাহার মধ্যে জেনারেল উডগেট প্রভৃতিও ছিলেন।

ছয় সপ্তাহের পর আমাদের দলকে বিদায় দেওয়া হয়। স্পিয়নকোপ ও ভালক্রানজের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ-সেনাপতিরা অকস্মাৎ স্থির করেন যে,

* রেডক্রশ মানে লাল স্বস্তিক। যুদ্ধের সময় এই চিহ্নযুক্ত পাট্টা শুশ্রূষাকারীদের বাম হাতে বাঁধা থাকে। নিয়ম এই যে, শত্রু তাহাদিগকে আঘাত করিবে না। এই সমস্ত বিবরণের জন্য "দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ" দেখুন।

লেডিস্মিথ প্রভৃতি স্থানের উদ্ধারের চেষ্টা আপাততঃ স্থগিত রাখা হইবে এবং ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে বেশি সৈন্য আসিয়া না পঁহুছানো পর্যন্ত কাজ আস্তে আস্তে চালানো হইবে।

আমাদের এই ছোট সেবাকার্য তখন খুবই প্রশংসা লাভ করিয়াছিল এবং ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। "ভারতীয়েরাও একই সাম্রাজ্যের সন্তান"—এই বলিয়া গান পর্যন্ত রচিত হয়। জেনারেল বুলার সরকারী কাগজ-পত্রের মধ্যে আমাদের দলের কাজের প্রশংসা করেন। দলপতিরা যুদ্ধের মেডেলও পুরস্কার পাইয়াছিলেন

ভারতীয় সম্প্রদায় বেশ ভালরূপেই সংগঠিত হইয়াছিল। গিরমিটিয়াদের সংস্পর্শে আমি খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই আসিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে একটা নবজাগরণের সাড়া দেখা দিয়াছিল এবং হিন্দু-মুসলমান, পারসী, খ্রীষ্টান, মাদ্রাজী, গুজরাটী, সিন্ধী প্রভৃতি সকলেই, ভারতবাসী বলিয়া একটা দৃঢ় অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই মনে করিল—এইবার ভারতীয়দের দুঃখ দূর হওয়া উচিত। শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহারেও সে সময় খুব পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল।

লড়াইয়ের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। আমরা হাজার হাজার 'টমী'র সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তাহারাও আমাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করিত ও আমরা তাহাদের সেবার জন্য আসিয়াছি বলিয়া উপকৃত বোধ করিত।

মানুষের স্বভাব দুঃখের সম্মুখে কেমনভাবে গলিয়া যায়, তাহার একটা মধুর স্মৃতির কথা এখানে না লিখিয়া পারি না। আমরা চিভেলীর ক্যাম্পের দিকে যাইতেছিলাম। এই যুদ্ধক্ষেত্রেই লর্ড রবার্টস-এর ছেলে লেফটেনান্ট রবার্টস আহত হইয়া মারা যান। লেফটেনান্ট রবার্টসের মৃতদেহ বহন করার সম্মান আমাদের উপর পড়িয়াছিল। সেদিন রৌদ্রের তেজ বড় প্রখর ছিল। আমরা মার্চ করিয়া চলিতেছিলাম। সকলেই পিপাসার্ত হইয়াছিল। জল পান করার যোগ্য এক ছোট ঝরণা রাস্তায় ছিল। কিন্তু কে আগে জল খাইবে? আমি স্থির করিলাম আগে 'টমী'রা পান করুক, তাহার পর আমরা পান করিব। 'টমী'রা অনুরোধ করিতে লাগিল আমাগিকেই প্রথমে পান করিবার জন্য। সুতরাং আমাদেরই মধ্যে অনেকবার "আপনারা আগে—আমরা পরে" এই ধরনের সাধাসাধি চলিয়াছিল।

১১

শহর সাফাই ও দুর্ভিক্ষে চাঁদা

সমাজের কোনোও অঙ্গ যদি নিশ্চল হইয়া থাকে তবে তা আমার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বোধ হয়। সম্প্রদায়ের দোষ ঢাকা, অথবা নিজের দোষ না শোধরাইয়া বেশি করিয়া অধিকার দাবি করা—এ ইচ্ছা আমার কখনও হইত না। সেই জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগের প্রতিকার করিতে, আমি সেখানে বাস করার প্রারম্ভকাল হইতেই চেষ্টা করিতেছিলাম। অভিযোগটি কতকাংশে সত্য। ভারতীয়েরা নিজেদের বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখে না, অত্যন্ত নোংরা হইয়া থাকে—একথা প্রায়ই শুনিতে হইত। এই অভিযোগ দূর করার জন্য সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তির নিজেদের গৃহ সংস্কারের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ডারবানে যখন মড়কের ভয় উপস্থিত হইল, প্রকৃতপক্ষে তখনই বাড়ি-বাড়ি গিয়া দেখার কাজ আরম্ভ হয়। এই কাজে মিউনিসিপ্যালিটির আমলারাও যোগ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের সম্মতি লইয়াই উহা আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা কার্যভার গ্রহণ করায় তাঁহাদের কাজ যেমন হালকা হইয়াছিল, ভারতীয়দের কষ্টও তেমনি কম হইয়াছিল। কেন না সাধারণতঃ যখন মড়কের উপদ্রব আরম্ভ হয়, তখন আমলারা অধীর হইয়া উঠেন। সকলের উপর কড়া নিয়ম প্রয়োগ করেন, এবং যাহাদের উপর তাঁহাদের বিরাগ থাকে তাহাদের উপর অসহ্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু এবার সম্প্রদায় নিজেদের ঘর-বাড়ি সাফ করার কাজ নিজেদের হাতে লওয়ায় তাহাদের উপর কঠোর ব্যবস্থা আর প্রযুক্ত হয় নাই।

এই ব্যাপারে আমার কতকগুলি দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইয়াছিল। স্থানীয় সরকারের কাছে আমাদের দাবি জানাইতে যত সহজে সম্প্রদায়ের সাহায্য পাইয়াছিলাম, লোকের কাছ হইতে তাহাদের কর্তব্য-পালন করার কাজ আদায় করিতে তেমন সহায়তা পাইলাম না। কোনও স্থানে অপমানিত হইলাম, কোনও স্থানে বিনয়ের সহিত উদাসীনতা প্রদর্শিত হইল। নোংরা সাফ করার কথাই লোকের ভাল লাগিত না। সুতরাং এজন্য কেমন করিয়া লোকে পয়সা খরচ করিবে? লোকের কাছ হইতে কোন কাজ আদায় করিতে যে অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন, এই ব্যাপারে সে কথাও খুব ভাল রকমে বুঝিলাম। গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সংস্কার করিবার গরজ হইতেছে সংস্কারকের।

যে সমাজই হোক না কেন, সংস্কারের চেষ্টা করিলেই সেইখানে বিরোধ বাধে, বিদ্বেষ জাগে। এমন কি প্রাণান্তকর উৎপীড়নও শুরু হয়। সংস্কারক যাহা সংস্কার মনে করে, সমাজ তাহাকে অন্যায়ই বা কেন মনে করিবে না? আর যদি অন্যায় বলিয়া মনে না-ও করে, তাহার প্রতি উদাসীন কেন থাকিবে না?

কিন্তু সে যাহাই হোক, এই আন্দোলনের ফল হইয়াছিল। ভারতীয়রা বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কতকটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমলাদের কাছে আমার প্রতিষ্ঠাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল অভিযোগ করা, অথবা অধিকার দাবি করাই আমার কাজ নয়। অভিযোগ করিতে বা পাওনা আদায় করিতে আমি যেমন দৃঢ়, নিজেদের ভিতরে সংস্কার সাধন করিতেও ততটাই উৎসাহী ও দৃঢ়।

এখন সমাজকে আর একদিকে আকর্ষণ করার কাজ বাকি ছিল। ভারতবর্ষের প্রতি নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে এবং সময় উপস্থিত হইলে সেই কর্তব্য পালন সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়কে তৎপর করিয়া তোলার প্রয়োজন ছিল। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। লোকে টাকা রোজগারের জন্যই ভারতবর্ষ ছাড়িয়া বিদেশে যায়। সুতরাং তাহাদের উপার্জনের কতক অংশ ভারতবর্ষের বিপদের দিনে দেওয়া সঙ্গত। ১৮৯৭ সালে একটা দুর্ভিক্ষ ও ১৮৯৯ সালে ততোধিক কষ্টকর আর একটা দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষে দেখা দেয়। এই উভয় দুর্ভিক্ষের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভাল রকম সাহায্য পাঠানো হইয়াছিল। প্রথমবারের দুর্ভিক্ষের সময় যে রকম টাকা তোলা হইয়াছিল, পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সময় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি টাকা উঠিয়াছিল। এই সময় আমরা ইংরাজদের কাছেও চাঁদা তুলিয়াছিলাম। তাহাদের কাছ হইতে ভালই সাড়া পাইয়াছিলাম। গিরমিটিয়ারাও নিজেদের অংশ পূর্ণ করিয়াছিল।

এই দুই দুর্ভিক্ষের সময় যে প্রথার প্রবর্তন হয়, এখন পর্যন্তও তাহাই চালু রহিয়াছে। ভারতবর্ষে কোনও সর্বজনীন সংকটের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভালরকম সাহায্য সেখানকার ভারতীয়েরা পাঠাইয়া আসিতেছেন।

এইভাবে ভারতীয়দের সেবা করিতে গিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার একটির পর আর একটি শিক্ষা অনায়াসে লাভ করিয়াছিলাম। সত্য এক বিশাল বৃক্ষ। পরিচর্যা করিলে এক বৃক্ষ হইতে অনেক ফল লাভ হয়। উহার অন্ত নাই। যতই উহার গভীরে প্রবেশ করা যায়, ততই উহা হইতে রত্ন আহরণ করা যায়, সেবার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়া উঠে।

১২

দেশে প্রত্যাবর্তন

লড়াইয়ের কাজ হইতে ছাড়া পাওয়ার পর আমার মনে হইল যে, আমার কার্যক্ষেত্র এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়, ভারতবর্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিয়া কিছু কিছু সেবা যে না করা যায় তাহা নয়। কিন্তু মনে হইতেছিল—এখানকার প্রধান কাজ যেন পয়সা উপার্জন করাই।

দেশের বন্ধুদের আকর্ষণও আমাকে দেশের দিকেই টানিতেছিল। আমার বোধ হইল যে, দেশে গেলে আমি বেশি কাজ করিতে পারিব। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ মিঃ খান ও মনসুখলাল নাজরই চালাইয়া লইতে পারিবেন।

আমি সঙ্গীদের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করিলাম। অনেক কষ্টে শর্ত রাখিয়া তাঁহারা এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। শর্ত এই হইল যে, যদি এক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় সম্প্রদায় আবশ্যকতা জানায়, তবে আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। এই শর্ত আমার কাছে কঠিন বোধ হইয়াছিল। কিন্তু আমি তাঁহাদের ভালবাসায় বদ্ধ হইয়াছিলাম।

কাচেরে তাঁতনে মনে হরজীয়ে বাঁধি
জেম জেম তাণে তেম তেমনীরে
মনে লাগী কটারী প্রেমনী॥—

হরির প্রেম ডোরে আমি বাঁধা; তিনি যেদিকে টানেন, সেইদিকেই আমি ফিরি।

মীরাবাঈ-এর এই উপমা কতক অংশে আমার সম্বন্ধেও খাটিত। "পঞ্চই পরমেশ্বর।" বন্ধুদের কথাও আমি তুচ্ছ করিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাদিগকে কথা দিলাম ও তাঁহাদের অনুমতি পাইলাম।

এই সময় আমার সঙ্গে নাতালেরই নিকট সম্বন্ধ ছিল বলা যায়। নাতালের ভারতীয়েরা আমাকে ভালোবাসার অমৃতে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। নানাস্থানে বিদায় অভিনন্দন দেওয়ার জন্য সভা হইয়াছিল ও প্রত্যেক স্থান হইতেই মূল্যবান উপহার আসিয়াছিল

১৮৯৬ সালে যখন আমি দেশে ফিরিয়াছিলাম তখনও বহু উপহার পাইয়াছিলাম। কিন্তু এবারকার উপহার ও সভার দৃশ্যে আমি অভিভূত হইলাম। উপহারের মধ্যে সোনা-রূপার জিনিস ত ছিলই, হীরার অলঙ্কারও ছিল।

এই সকল জিনিস গ্রহণ করার আমার কি অধিকার আছে? এই সকল

যদি লই, তবে সম্প্রদায়ের সেবার পরিবর্তে আমি অর্থ লই নাই একথা কেমন করিয়া মনকে বুঝাইব? এই উপহারগুলির মধ্যে সামান্যমাত্র আমার মক্কেলদের দেওয়া। সেগুলি বাদ দিলে বাকি সমস্তই আমার জনসেবার জন্য। তাহা ছাড়া আমার মনে মক্কেল ও অন্য সঙ্গীদের মধ্যে কোনই ভেদ ছিল না। প্রধান মক্কেলেরা সকলেই জনসেবার কাজে সাহায্য করিতেন।

এই উপহারগুলির মধ্যে আবার একটা পঞ্চাশ গিনির হার কস্তুরবাঈ-এর জন্য ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও এই সমস্তই যে আমার সেবার কার্যের জন্য দেওয়া, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। যে সন্ধ্যায় আমাকে প্রধান উপহার-গুলি দেওয়া হইয়াছিল, সে-রাত্রি আমার বিনিদ্র অবস্থায় কাটিল। আমি গৃহের ভিতর পায়চারি করিয়া কাটাইলাম, কোনও পথের সন্ধান পাইলাম না। শত শত টাকা মূল্যের উপহার ফিরাইয়া দেওয়া কষ্টকর, রাখা ততোধিক কষ্টকর। আমি যদি এগুলি রাখি, তবে আমার ছেলেদের কি হইবে? স্ত্রীর কি হইবে? তাহাদিগকে ত সেবার শিক্ষাই দেওয়া হইতেছিল। সেবার মূল্য লইতে নাই, ইহাই সর্বদা বুঝানো হইত। ঘরে দামী গহনা ছিল না। সরল জীবন শুরু হইয়াছিল, এই অবস্থায় সোনার ঘড়ি কে ব্যবহার করিবে? সোনার চেন, হীরার আংটি কে ব্যবহার করিবে? গহনাপত্রের মোহ আমি অপরকে ছাড়িতে বলিতেছিলাম। আমার এই গহনা-জহরৎ কোন্ প্রয়োজনে আসিবে?

আমার পক্ষে এই সকল দ্রব্য রাখা উচিত না—ইহা স্থির করিলাম। আমি পারসী রুস্তমজী ও অন্যান্যকে ট্রাস্টী বানাইয়া এই সমুদয় গহনা তাহাদিগকে সম্প্রদায়ের স্বার্থে ব্যবহার করিতে দিয়া এক পত্র লিখিলাম। সকালবেলায় স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত পরামর্শ করিয়া আমার ভার লাঘব করা স্থির করিলাম।

স্ত্রীকে বুঝানো কঠিন হইবে, আমি তাহা জানিতাম। আর ইহাও জানিতাম যে, ছেলেদের বুঝাইতে এতটুকুও কষ্ট হইবে না। ছেলেদিগকেই উকিল লাগাইব ঠিক করিলাম।

ছেলেরা চট করিয়াই বুঝিল। তাহারা বলিল—"এ গহনাপত্রে আমাদের প্রয়োজন নাই। আপনি সমস্তই ফিরাইয়া দিন। যদি কখনও এই জিনিসের দরকার হয়, তবে আপনি নিজেই কি দিতে পারিবেন না?"

আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমাদের মাকেও তোমরা বুঝাইয়া দিবে ত?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে ত আমাদেরই কাজ। এখন কি এই সকল গহনা মা

পরিতে পারিবেন ? এ সকল ত আমাদের জন্যই তাঁহার রাখিতে ইচ্ছা হইবে। আর আমরা যদি না রাখিতে চাই তবে কেন তিনি ফেরত দিবেন না ?

কিন্তু কাজের বেলা এত সহজে মিটে নাই।

"তোমার না হয় দরকার নাই—তোমার ছেলেদের না হয় দরকার নাই। ছেলেদিগকে তুমি যেমন নাচাইবে তেমনি নাচিবে। ভাল, আমাকেই না হয় না দিলে। কিন্তু আমার বৌদের বেলা ? তাহাদের ত দরকার হইবে ? কে জানে কাল কি ঘটে ? এত ভালবাসিয়া যে জিনিস দিয়াছে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া যায় না।"—এই ধরনের বাক্য-প্রবাহ চলিল, তাহার সহিত অশ্রুধারাও যোগ দিল। কিন্তু ছেলেরা দৃঢ় রহিল। আমিও টলিলাম না।

আমি নরম স্বরে বলিলাম—"ছেলেরা ত বিবাহ করিবে, কিন্তু আমরা কি উহাদিগকে বাল্যকালেই বিবাহ দিব ? বড় হইয়া যদি বিবাহ করিতে হয় তবে করিবে। আমাদের ঘরে কি শৌখিন বৌ আনিতে হইবে নাকি ? আর যদি তখন গহনার দরকারই হয় তবে আমি কি নাই নাকি ?"

"হ্যা, তোমাকে জানি। আমার গহনাগুলি কে নিয়াছে, তুমিই না ? আচ্ছা, আমাকে না হয় না-ই পরিতে দিলে, কিন্তু বউদের জন্যও কি রাখিতে দিবে না ? ছেলেদের ত আজ হইতেই বৈরাগী বানাইতেছ! এ গহনাপত্তর ফিরাইয়া দেওয়া যায় না, আর আমার হারের উপর তোমার অধিকারটাই বা কি ?"

"কিন্তু এ হার তোমার সেবার জন্য, না আমার সেবার জন্য দিয়াছে ?"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আচ্ছা, তাহাই হইল। কিন্তু তোমার সেবা ত আমারই সেবা। আমাকে যে রাতদিন খাটাইয়াছ তাহা সেবা নয় ? যাহাকে ইচ্ছা বাড়িতে রাখিয়াছ, আর আমাকে দিয়া দাসীগিরি করাইয়াছ তাহার কি ?"

যুক্তিগুলি যেন তীক্ষ্ণ বাণ। কতকগুলি একেবারে মর্মে গিয়া ঘা দিয়াছিল। কিন্তু গহনাপত্তর ত আমাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। অনেক কথাবার্তার পর আমি যেমন তেমন করিয়া তাঁহার সম্মতি লইলাম। ১৮৯৬ সালে ও ১৯০১ সালে যত কিছু ভেট পাইয়াছিলাম সমস্ত ফেরত দিলাম। উহার ট্রাস্ট গঠন করা হইল এবং আমার ইচ্ছা বা ট্রাস্টীদের ইচ্ছানুযায়ী এগুলি জনসেবার জন্য ব্যয় হইবে—এই শর্তে ব্যাঙ্কে রাখা হইল। টাকার আবশ্যকতা হওয়ায় এই গহনা বেচিতে চাহিয়া উহার বদলে অনেকবার টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। আজও বিপদকালে ব্যবহারের জন্য উহা জমা আছে ও উহাতে আরো অর্থ জমিতেছে।

এই কাজ করার জন্য পরে আমাকে কখনো অনুতাপ করিতে হয় নাই। পরে কস্তুরবাঈও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কাজটা ঠিকই হইয়াছিল। ইহাতে আমরা অনেক প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

আমি ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, জনসেবকের কোনও মূল্যবান উপহার লইতে নাই।

১৩

দেশে

দেশে যাওয়ার জন্য বিদায় লইলাম। রাস্তায় মরিসস পড়ে। সেখানে স্টীমার অনেক দিন থামিয়া ছিল। সেই জন্য মরিসসে নামি ও সেখানকার অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করি। সেখানকার গভর্ণর সার চার্লস ব্রুসের আতিথ্যে এক রাত্রি কাটাই।

ভারতবর্ষে পঁহুছিয়া কিছুদিন দেশভ্রমণে অতিবাহিত হয়। সে ১৯০১ সালের কথা। এই বৎসর কংগ্রেস কলিকাতায় বসিয়াছিল। দীনশা এডুলজী ওয়াচা সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেসে যাইতেই হইবে—স্থির করিলাম। এই আমার প্রথম কংগ্রেসের অভিজ্ঞতা।

যে গাড়িতে বোম্বাই হইতে ফিরোজশা মেহতা যাইতেছিলেন, আমিও সেই গাড়িতেই ছিলাম। তাঁহাকে আমার দক্ষিণ আফ্রিকার কথা বলিতে হইবে। মাঝে একটা স্টেশনে আমি তাঁহার কামরায় উঠিব এইরূপ কথা ছিল। তিনি নিজে একটি সেলুনে যাইতেছিলেন। তাঁহার বাদশাহী খরচ ও আড়ম্বরের পরিচয় আমি পাইয়াছিলাম। যে স্টেশনে তাঁহার কামরায় যাওয়ার কথা সেই স্টেশনে সেখানে গেলাম। সে সময় সেখানে দীনশাজী ও চিমনলাল শেতলবাড বসিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজনীতির আলোচনা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া স্যার ফিরোজশা বলিলেন—"গান্ধী, তোমার কাজ হইবে না। তুমি যে প্রকার বলিতেছ সে প্রকার প্রস্তাব অবশ্য আমরা পাস করিয়া দিব। কিন্তু আমাদের নিজের দেশেই আমাদের কোন্ ন্যায্য পাওনা মিলে? আমি ত বুঝি যে, আমাদের দেশেই আমাদের কর্তৃত্ব যতদিন না হয় ততদিন উপনিবেশে আমাদের অবস্থা বদলাইতে পারে না।"

আমি ত বসিয়া পড়িলাম! স্যার চিমনলালেরও সেই মত দেখিলাম। স্যার

দীনশা আমার দিকে করুণ নয়নে চাহিলেন।

আমি বুঝাইবার কিছু চেষ্টা করিলাম। কিন্তু বোম্বাইয়ের মুকুটহীন রাজাকে আমার মত লোক কি বুঝাইবে? কংগ্রেসে প্রস্তাব উপস্থিত করার অনুমতি পাইলাম। ইহাতেই আমাকে খুশি হইতে হইল।

"ওহে গান্ধী! আমাকে তোমার প্রস্তাবটা দেখাইয়া দিও"—এই বলিয়া স্যার দীনশা আমাকে উৎসাহিত করিলেন। আমি ধন্যবাদ দিলাম। পরবর্তী স্টেশনে গাড়ি থামিতেই নামিয়া নিজের কামরায় আসিলাম।

কলিকাতায় পঁহুছিলাম। শহরের প্রধান ব্যক্তিরা নেতাদের শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করাইয়া লইয়া গেলেন। আমি একজন স্বেচ্ছাসেবককে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি কোথায় যাইব? সে আমাকে রিপন কলেজে লইয়া গেল। সেখানে অনেক প্রতিনিধির স্থান হইয়াছিল। আমার সৌভাগ্যবশতঃ যে বিভাগে আমি ছিলাম সেই বিভাগেই লোকমান্য তিলক ছিলেন। আমার স্মরণ হয় একদিন পরে তিনি আসিয়াছিলেন। যেখানে লোকমান্য সেখানে ছোটখাটো একটা দরবার জমিয়া থাকে। আমি যদি চিত্রকর হইতাম, তবে যেমন ভাবে খাটের উপর তিনি বসিয়াছিলেন তাহার একটা চিত্র আঁকিতে পারিতাম। আজও সেই বৈঠকের কথা এমনই পরিষ্কার মনে আছে। তাহার সহিত দেখা করিতে যে অসংখ্য লোক আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজনের নামই কেবল আজ মনে পড়ে—তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতিবাবু। ইঁহাদের সেই উচ্চ হাস্য ও শাসন-কর্তাদের অন্যায় আচরণের গল্প ভুলিবার নয়।

এখন এ ক্যাম্পের সম্বন্ধে কিছু বলিব।

স্বেচ্ছাসেবকদের পরস্পরের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছিল। যে কাজ যাহাকে দেওয়া যায় সে কাজ তাহার নহে। সে তখনি আর একজনকে ডাকে, সে আবার ডাকে আর একজনকে। আর প্রতিনিধিদের কথা—তাহারা এদিকও নয় সেদিকও নয়।

আমি কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিলাম। তাহাদের দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছু কথা শুনাইলাম। তাহারা তাহাতে একটু লজ্জিত হইল।

তাহাদিগকে আমি সেবার মর্ম বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। তাহারা কিছু বুঝিল। কিন্তু সেবার জ্ঞান ত ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠে না। তাহার জন্য প্রথমতঃ ইচ্ছা থাকা চাই, তাহার পর অভিজ্ঞতা চাই। এই সরল সৎ-স্বভাব

সম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবকদের ইচ্ছা খুবই ছিল। কিন্তু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাহারা কোথা হইতে পাইবে? কংগ্রেস বৎসরে তিন দিন হইয়া চুকিয়া যায়। সারা বৎসরে মাত্র তিনদিনের শিক্ষায় কি হইবে?

যেমন স্বেচ্ছাসেবক, প্রতিনিধিরাও তেমনি। তাঁহাদেরও ঐ কয়দিনেরই শিক্ষা। নিজের হাতে তাঁহারা কিছুই করিবেন না। সব কথাতেই কেবল হুকুম। "স্বেচ্ছাসেবক, এটা আন—ওটা আন,"—এই চলে।

অস্পৃশ্যতা এখানেও খুব মানা হইতেছিল। দ্রাবিড়ী পাকশালা একেবারে একান্তে ছিল। এই প্রতিনিধিদের 'দৃষ্টি-দোষও' লাগিত। তাঁহাদের জন্য কলেজ কম্পাউণ্ডে বেড়া দিয়া একটি স্থান ঘিরিয়া লওয়া হইয়াছিল। সে ঘরের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়। লোকের খাওয়াদাওয়া সব তাহারই ভিতরে। রান্না ঘর নয়ত যেন একটা সিন্দুক। কোথাও তাহার ফাঁক নাই।

এসব বর্ণ-ধর্মের অপব্যবহার বলিয়া আমার বোধ হইল। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের যদি এই প্রকার অস্পৃশ্যতার শুচি-বাই থাকে তাহা হইলে এই প্রতিনিধিদিগকে যাহারা পাঠাইয়াছে তাহাদের অস্পৃশ্যতা যে কতদূর এই চিন্তায় আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

সেখানে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার অন্তই ছিল না। জল থইথই করিতেছিল। পায়খানার সংখ্যা কম ছিল। সেখানকার দুর্গন্ধের কথা আজও আমার স্মরণ আছে। স্বেচ্ছাসেবকদের আমি তাহা দেখাইলাম। তাহারা টানাসুরে বলিল—"ও ত মেথরের কাজ।" আমি ঝাঁটা চাহিলাম। তাহারা খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, পরে ঝাঁটা আনিয়া দিল। পায়খানা সাফ করিলাম। কিন্তু সে কেবল নিজের সুবিধার জন্য। ভিড় এত ছিল, পায়খানা এত খারাপ ছিল যে, প্রতিবার ব্যবহারের পরই সাফ করা দরকার। উহা করা আমার শক্তির অতিরিক্ত ছিল। সুতরাং আমার নিজের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু সাফ করিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট হইতে হইল। আমি দেখিলাম—অপরের এই নোংরায় বাধে না।

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। রাত্রিতে কেউ কেউ কামরার বারান্দাতেই প্রস্রাব করিত। সকালে স্বেচ্ছাসেবকদের আমি ময়লা দেখাইলাম। কেউ সাফ করিতে প্রস্তুত হইল না। সাফ করার সম্মান তখন আমি একাই গ্রহণ করিলাম।

আজ যদিও এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, তথাপি এরূপ অবিবেচক

প্রতিনিধি আজও আছে যাহারা ক্যাম্পের যেখানে সেখানে মলত্যাগ করিয়া স্থান খারাপ করে এবং সকল স্বেচ্ছাসেবক তাহা সাফ করিতে প্রস্তুত হয় না।

আমি দেখিলাম যে, এইপ্রকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় যদি কংগ্রেস বেশি দিন ধরিয়া চলার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে মড়ক লাগা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

১৪

কেরানী ও বেয়ারা *

কংগ্রেস বসিতে এখনো দুই-একদিন বাকি ছিল। আমি স্থির করিলাম যে কংগ্রেসের আপিসে যদি কোন কাজ পাওয়া যায় তবে আমি সেই কাজ করিব। অভিজ্ঞতাও বাড়িবে।

যেদিন কলিকাতায় পৌঁছিলাম সেইদিনই স্নানাহার করিয়া কংগ্রেস আপিসে গেলাম। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুত ঘোষাল সম্পাদক ছিলেন। ভূপেনবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কাজ করিতে চাহিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন :—

"আমার কাছে ত কোনও কাজ দেখিতেছি না, তবে মিঃ ঘোষাল হয়ত কিছু কাজ দিতে পারেন। আপনি তাঁহার কাছে যান।"

আমি ঘোষাল মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কাছে ত কেরানীর কাজ আছে, সে কাজ করিবেন?"

আমি জবাব দিলাম—"আমার সাধ্যায়ত্ত যে কোনো কাজ দিবেন তাহাই করিব। সেইজন্যই ত আপনার কাছে আসিয়াছি।"

"তুমি ঠিকই বলিয়াছ।" তাঁহার পাশে যেসব স্বেচ্ছাসেবক দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন—"ইনি কি বলিলেন, তোমরা শুনিলে?"

তারপর আমার দিকে তাকাইয়া আবার বলিলেন—"ঐ রহিয়াছে একতাড়া চিঠি। আর এই নাও আমার সামনের চেয়ার। তুমি বসিয়া যাও। আমার কাছে শত শত লোক আসিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গেই দেখা করিব, না যেসব

* 'বেয়ারা' ইংরাজী বেয়ারার শব্দের অপভ্রংশ—যে লোক ব্যক্তিগত সেবা করে—ফরমাস খাটে। কলিকাতায় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

বাজে চিঠি পত্র আসিয়াছে তাহারই জবাব দিব ? আমার কাছে এমন কেরানী কেউ নাই, যাহাকে দিয়া এই সব করাইয়া লইতে পারি। এই সব চিঠির অনেকগুলির মধ্যেই কিছু নাই। এখন তুমি সবগুলি দেখিয়া লও। যেগুলির উত্তর দেওয়ার সেগুলির উত্তর দাও। যেগুলির জন্য আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইও।" আমি এই বিশ্বাস লাভ করিয়া অত্যন্ত খুশি হইয়া গেলাম।

শ্রীযুত ঘোষাল আমার পরিচয় জানিতেন না। পরে তিনি আমার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐ চিঠির জবাবের কাজ আমার কাছে খুব সহজ লাগিল। প্রথম তাড়াটা আমি তখনই শেষ করিয়া ফেলিলাম। ঘোষাল মহাশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার বেশি কথা বলার স্বভাব ছিল। আমি দেখিলাম, কথা বলিতেই তাঁহার অনেক সময় যায়। আমার পরিচয় শুনিয়া আমাকে কেরানীর কাজ দেওয়ার জন্য তিনি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া বলিলাম—"আমি কে, আর আপনি কে ? আপনি কংগ্রেসের পুরাতন সেবক, আমার গুরুজনের সমান। আমি ত অনভিজ্ঞ যুবক মাত্র। কাজ দিয়া আপনি 'ত আমার উপকারই করিয়াছেন। আমি কংগ্রেসের কাজ করিতে চাই। আপনি ত আমাকে কাজ-কর্ম শিক্ষা করিবার অমূল্য সুযোগ দিয়াছেন।"

তিনি বলিলেন—"সত্য বলিতে কি, এই মনোভাবই ঠিক। কিন্তু আজকালের যুবকেরা ইহা মানে না। আর ধরিতে গেলে আমি ত কংগ্রেসের জন্ম হইতেই আছি। কংগ্রেসের জন্মকালে মিঃ হিউমের সঙ্গে আমারও যোগ ছিল।"

আমাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন প্রগাঢ় হইল। দুপুরে খাওয়ার সময় আমাকে তিনি সঙ্গে লইলেন। ঘোষালবাবুর জামার বোতাম কিন্তু 'বেয়ারা' লাগাইয়া দিত। ইহা দেখিয়া বেয়ারার কাজ আমি চাহিয়া লইলাম। উহা আমার ভাল লাগিত। গুরুজনের প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধার ভাব ছিল। যখন তিনি আমার সেবা-প্রবৃত্তি টের পাইলেন, তখন তাঁহার সমস্ত সেবাই আমাকে করিতে দিলেন। বোতাম লাগাইবার সময় মৃদু হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"দেখ না, কংগ্রেস সেক্রেটারীর বোতাম লাগাইবার সময়ও নাই, কেন না সকল সময়ই তাহাকে কাজ করিতে হয়।" তাঁহার ছেলেমানুষিতে আমার হাসি পাইল। কিন্তু ঐ ধরনের সেবায় আমার মনে আদৌ অনিচ্ছা ছিল না। এই সেবা দ্বারা আমার অগণিত লাভ হইয়াছিল।

অল্প দিনেই কংগ্রেস পরিচালনার ব্যাপারে বুঝিতে পারিলাম। অনেক নেতার সঙ্গে পরিচয় হইল। গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির গতিবিধি দেখিলাম। যে প্রকার সময় নষ্ট হইত তাহাও দেখিতে পাইলাম। তাহাতে দুঃখ হইল। যে কাজ একজনের দ্বারা হয়, তাহাতে অনেক লোক লাগানো হইতেছে দেখিলাম। আর কতকগুলি আবশ্যক কাজ হয়ই না, তাহাও দেখিলাম।

আমার মন এই সমস্ত কার্যের সমালোচনা করিত। কিন্তু মন উদার ছিল বলিয়া, উহার বেশি সংস্কার সম্ভব নয় একথা মানিয়া লইতাম। মনে মনে কাহারও কাজের মূল্য খাটো করিতাম না।

১৫

কংগ্রেসে

কংগ্রেস বসিল। মণ্ডপের গাম্ভীর্যপূর্ণ দৃশ্য, স্বেচ্ছাসেবকদের পংক্তি, মঞ্চের উপর রাষ্ট্রগুরুদিগকে দেখিয়া আমি অভিভূত হইলাম এবং এই মহতী সভায় আমার স্থান কোথায় ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইলাম।

সভাপতির অভিভাষণ একখানা পুস্তক ছিল। তাহার সবটা পড়া সম্ভব ছিল না। তাহার কতকাংশ পড়া হইল।

তারপর বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভ্য নির্বাচন। গোখলে আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন।

স্যার ফিরোজশা আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে সে কথা কে তোলে, কেমন করিয়া তোলা যায়, আমি বসিয়া ভাবিতেছিলাম। প্রত্যেক প্রস্তাবের জন্য লম্বা বক্তৃতা আর সকল বক্তৃতাই ইংরাজীতে। প্রত্যেক বক্তাই খ্যাতনামা ব্যক্তি। এই তূর্যধ্বনির মধ্যে আমার ক্ষীণ স্বর কে শুনিবে? যেমন রাত বাড়িয়া যাইতেছিল তেমনি আমার বুক ধুক্-ধুক্ করিতেছিল। শেষের দিকে বায়ুবেগে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইতেছিল বলিয়া আমার স্মরণ আছে। রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। আমার কিছু বলার সাহস হইতেছে না। আমি গোখলের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। তিনি আমার প্রস্তাব দেখিয়া লইয়াছিলেন।

তাঁহার চেয়ারের কাছে গিয়া আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—"আমার কিছু করুন।"

তিনি বলিলেন—"তোমার প্রস্তাবের কথা আমার মনে আছে। এখানকার তাড়াহুড়া ত দেখিতে পাইতেছ; কিন্তু আমি তোমার প্রস্তাব উপেক্ষিত হইতে দিব না।"

"কেমন, এখন ছুটি!"—স্যার ফিরোজশা বলিলেন।

গোখলে বলিলেন—"দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয়ে প্রস্তাব এখনো বাকি আছে। মিঃ গান্ধী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন।"

স্যার ফিরোজশা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি প্রস্তাবটা দেখিয়াছেন?"

"হ্যাঁ, দেখিয়াছি।"

"আপনার পছন্দ হইয়াছে?"

"ঠিক আছে।"

"তাহা হইলে গান্ধী পড়।"

"আমি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া শুনাইলাম।

গোখলে সমর্থন করিলেন।

"সর্বসম্মতি অনুসারে গৃহীত"—সকলে বলিয়া উঠিলেন।

ওয়াচা বলিলেন—"গান্ধী, তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিব।"

এই ব্যাপারে আমি খুশি হইলাম না। কেউই প্রস্তাব বুঝিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। সকলেই যাইবার জন্য ব্যস্ত। গোখলে প্রস্তাব দেখিয়াছেন, সেইজন্য আর কাহারও শোনারও দরকার নাই।

সকাল হইল। আমি ত আমার বক্তৃতা সম্বন্ধেই ভাবিতেছিলাম। পাঁচ মিনিটে কি বলিব? আমি ভালরকম তৈরি ছিলাম, কিন্তু শব্দ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। লিখিত বক্তৃতা পড়িব না স্থির করিয়াছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে অবাধে বক্তৃতা করিতে পারিতাম, সে শক্তি যেন এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল।

আমার প্রস্তাবের সময় উপস্থিত হইলে স্যার দীনশা আমার নাম ডাকিলেন। আমি দাঁড়াইলাম। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কোনও রকমে প্রস্তাবটা পড়িলাম। কোনও কবি নিজের লেখা কবিতা ছাপাইয়া সকল প্রতিনিধির মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে বিদেশে যাওয়ার ও সমুদ্র-যাত্রার প্রশংসা ছিল। তাহাই আমি পড়িয়া শুনাইলাম ও দক্ষিণ আফ্রিকার দুঃখের সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। ইতিমধ্যেই স্যার দীনশা ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, তখনো পাঁচ মিনিট হয় নাই।

আমি জানিতাম না যে, সময় শেষ হওয়ার দুই মিনিট পূর্বেই সাবধান করার জন্য ঘণ্টার শব্দ করা হয়। আমি অনেককে আধঘণ্টা, পৌনে একঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিতে শুনিয়া আসিতেছি, তাহাতেও ঘণ্টা বাজানো হয় নাই। আমার মনে দুঃখ হইল। ঘণ্টার শব্দ হইতেই আমি বসিয়া পড়িলাম। তখনকার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমি মানিয়া লইয়াছিলাম যে, ঐ কবিতাতেই স্যার ফিরোজশার জবাব দেওয়া হইয়াছিল।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সম্বন্ধে আর কোনও কথা নাই। তখনকার দিনে অভ্যাগত ও প্রতিনিধিদের মধ্যে কোনও ভেদ ছিল না। সকলেই হাত তুলিত। সকল প্রস্তাবই সর্ব-সম্মত হইয়া পাস হইত। আমার প্রস্তাবও তেমনি হইল। ইহাতে প্রস্তাবের সম্বন্ধে গুরুত্ব আমার নিকট কমিয়া গেল। তাহা হইলেও কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, ইহাই আমার আনন্দের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কংগ্রেসের সম্মতি যে বিষয়ে আছে, সারা দেশের সম্মতি তাহাতে আছে। একথা কাহার পক্ষেই বা যথেষ্ট নয়?

১৬

লর্ড কার্জনের দরবার

কংগ্রেস হইয়া গেল। আমার তখনো কলিকাতায় থাকিয়া চেম্বার্স অব কমার্স ইত্যাদির সহিত সাক্ষাৎ করার কাজ বাকি ছিল। সেইজন্য আমি কলিকাতায় এক মাস থাকিলাম। এইবারে হোটেলে না থাকিয়া ইণ্ডিয়া ক্লাবে থাকার জন্য পরিচয়-পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই ক্লাবে ভারতবর্ষের প্রধান নেতৃস্থানীয়েরা আসিয়া উঠিতেন। সেইজন্য সেখানে উঠিলে তাঁহাদের সহিত মেলামেশায় তাঁহারাও দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বন্ধে কিছু ভাবিবেন—এরূপ মনে হইয়াছিল। এই ক্লাবে প্রতিদিন না হইলেও প্রায়ই গোখলে বিলিয়ার্ড খেলিতে আসিতেন। আমি কলিকাতায় থাকিব জানিয়া তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে থাকার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি তাঁহার নিমন্ত্রণ ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আমিই নিজে নিজে সেখানে যাইব ইহা আমার কাছে উচিত বোধ হইল না। দুই-একদিন অপেক্ষা করার পর গোখলে আমাকে নিজেই সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। আমার সংকোচ দেখিয়া তিনি বলিলেন—"গান্ধী, এখন ত তোমাকে দেশে থাকিতে হইবে,

এত লজ্জা করিলে চলিবে না। যত লোকের সহিত সংস্পর্শে আসিবে ততই তোমার পক্ষে ভাল। তোমাকে দিয়া আমার কংগ্রেসের কাজ করাইতে হইবে।"

গোখলের কাছে যাওয়ার পূর্বে ইণ্ডিয়া ক্লাবের একটা অভিজ্ঞতার বিষয় লিখিব।

এই সময়ে লর্ড কার্জনের দরবার হইতেছিল। সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েকজন রাজা-মহারাজা এই ক্লাবে ছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সর্বদাই বাঙালীর সুন্দর ধুতি, শার্ট ও চাদর পরা অবস্থায় দেখিতাম। আজ তাঁহারা পাতলুন জেব্বা খানসামার পাগড়ি ও চমকদার বুট পরিয়াছিলেন। আমার মনে দুঃখ হইল, আমি এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আমাদের দুঃখ আমরাই জানি। আমাদের টাকাপয়সা ও আমাদের পদবী রাখার জন্য আমাদিগকে যে অপমান সহ্য করিতে হয়, আপনি তাহার কি বুঝিবেন?"

"তাহা যেন হইল, কিন্তু এই খানসামার পাগড়ি ও বুট কেন?"

"খানসামা ও আমাদের মধ্যে কি প্রভেদ আছে? তাহারা যেমন আমাদের খানসামা, আমরা তেমনি লর্ড কার্জনের খানসামা। আমি যদি 'লেভিতে' অনুপস্থিত হই তাহা হইলে আমাকে পস্তাইতে হইবে। আমি যদি আমাদের নিত্যকার পোশাক পরিয়া যাই, তবে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি লর্ড কার্জনের সঙ্গে সেখানে গিয়া একটা কথা বলারও সুবিধা হইবে? কখনো না।"

এই খোলা কথা শুনিয়া সেই বন্ধুটির উপর দয়া হইল। এই প্রসঙ্গে আর এক দরবারের কথা আমার মনে হইতেছে। লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন কাশী-হিন্দু-বিদ্যাপীঠের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন সেখানে প্রধানতঃ রাজা-মহারাজরাই ছিলেন। কিন্তু ভারত-ভূষণ মালব্যজী আমাকেও সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমি সেখানে গিয়াছিলাম। যে পোশাক কেবল স্ত্রীলোকেরই শোভা পায়, সেই পোশাকে রাজা-মহারাজদিগকে দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। রেশমী ইজার, রেশমী জামা ও গলায় হীরা-মতির মালা। হাতে বাজু-বন্ধ ও পাগড়ির উপর হীরা-মতির ঝালর। আবার সকলের কোমরেই সোনার হাতল দেওয়া তলোয়ার ঝুলানো ছিল। আমি তাহাদের কয়েকজনকে বলিয়াছিলাম যে, ঐ সকল ভূষণ রাজমর্যাদার চিহ্ন নহে, গোলামীর চিহ্ন। আমি মনে করিয়াছিলাম যে,

এই স্ত্রীজন-সুলভ ভূষণ তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই পরেন। কিন্তু পরে শুনিয়াছিলাম যে, এই রকম দরবারে রাজাদের সমস্ত মূল্যবান গহনা ও পোশাক পরারই আদেশ আছে। ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, কাহারও কাহারও ঐ পোশাক পরিতে গ্লানি বোধ হয় এবং এই দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় ব্যতীত অন্য কোনও সময় উহা ব্যবহার করেন না। এই অবস্থা কতটা সত্য তাহা জানি না। তাঁহারা এইপ্রকার পোশাক-পরিচ্ছদ অন্যত্র পরিধান না করেন ভালই, কিন্তু ভাইসরয়ের দরবারে যে, স্ত্রীলোকদের উপযুক্ত এইসব পোশাক পরিধান করিয়া আসেন, তাহাও অতিমাত্রায় গ্লানিকর। ধন, মান ও প্রভুত্ব মানুষের কতই না পাপ ও অনর্থের হেতু হয়!

১৭

গোখলের সঙ্গে একমাস—১

প্রথম দিন হইতেই আমাকে গোখলে অতিথি হইয়া থাকিতে দেন নাই। আমি যেন তাঁহার ছোট ভাই এমনি ভাবে রাখিয়াছিলেন। আমার কি কি দরকার তাহা জানিয়া লইয়াছিলেন ও যাহাতে সে সমস্ত পাই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে আমার প্রয়োজন অল্পই ছিল। সকল কাজই নিজ হাতে করিয়া লওয়ার অভ্যাস করিয়াছিলাম। সেই জন্য আমাকে অন্যের সেবা কমই লইতে হইত। আমার স্বাবলম্বনের অভ্যাস, আমার পোশাক ইত্যাদির সংস্কার, আমার শ্রমশীলতা ও আমার নিয়মানুবর্তিতা তাঁহার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি আমাকে এজন্য প্রশংসা করিয়া বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আমার কাছে তাঁহার কিছুই গোপনীয় ছিল না। যখনই কোনও বিশেষ ব্যক্তি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, তখনই আমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতেন। এই সকল পরিচয়ের মধ্যে আজ আমার সকলের আগে চোখে পড়ে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে। তিনি গোখলের বাড়ির কাছেই থাকিতেন ও প্রায়ই আসিতেন।

"ইনিই প্রফেসর রায়, যিনি মাসে আটশত টাকা উপার্জন করিয়াও নিজের জন্য মাত্র ৪০৲ টাকা রাখিয়া বাকি সমস্তই জনসেবায় দান করেন। ইনি বিবাহ করেন নাই,—করিবেনও না।"—গোখলে এই বলিয়া তাঁহার সঙ্গে

আমাকে পরিচয় করাইয়া দেন।

আজকাল ডাক্তার রায় ও সেদিনের প্রফেসর রায়ের মধ্যে আমি কম পার্থক্যই দেখিতে পাই। তখন যেমন পোশাক পরিতেন, আজও প্রায় তেমনি পরিতেছেন। তবে আজ খাদির পোশাক, তখন খাদি হয় নাই। স্বদেশী মিলের তৈরি কাপড় পরিতেন। গোখলে ও প্রফেসার রায়ের মধ্যে কথাবার্তা শুনিয়া আমার আশা মিটিত না। তাঁহারা হয় দেশের কল্যাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, নয়ত অন্য কোন জ্ঞানগর্ভ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। নেতাদের যখন সমালোচনা হইত তখন কোন কোন কথা শুনিয়া দুঃখ হইত। যাঁহাদিগকে মহা মহা যোদ্ধা বলিয়া ভাবিতাম, তাঁহাদিগকে ভারী ছোট দেখাইতে লাগিল।

গোখলের কার্যপদ্ধতি দেখিয়া আমার যেমন আনন্দ হইত তেমনি শিক্ষালাভও হইত। তিনি এক মুহূর্তও নষ্ট হইতে দিতেন না। তাঁহার সমস্ত কাজই দেশের সেবার জন্য দেখিলাম। সকল কথাই তাঁহার দেশের কথা। তাঁহার কথাতে মলিনতা, দম্ভ অথবা মিথ্যার স্পর্শ ছিল না। কথায় কথায় রাণাডের প্রতি তাঁহার পূজার ভাব ফুটিয়া উঠিত। 'রাণাডে এই বলিয়াছেন'— এ কথা তাঁহার কথাবার্তার মধ্যে লাগিয়াই থাকিত। আমি থাকিতেই রাণাডে জয়ন্তী (অথবা জন্মতিথি তাহা স্মরণ নাই) উৎসব অনুষ্ঠানের সময় হয়। গোখলে উহা নিয়মিত পালন করেন বলিয়া মনে হইল। তখন তাঁহার সঙ্গে আমি ছাড়া আরও দুইজন বন্ধু ছিলেন—ইঁহাদের একজন প্রফেসর কথাভাটে, ও অন্য বন্ধুটি একজন সবজজ। এই উৎসব পালন করার জন্য গোখলে আমাদের নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই সময় রাণাডে সম্পর্কে আমাদিগকে তিনি অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। রাণাডে, তেলং ও মণ্ডলিকের তুলনামূলক সমালোচনাও করিয়াছিলেন। তিনি তেলংএর ভাষার প্রশংসা করিয়াছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ আছে। সংস্কারক বলিয়া মণ্ডলিকের প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার মক্কেলের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার এক উদাহরণ-স্বরূপ, ট্রেন ফেল করায় স্পেশাল ট্রেন করিয়া তিনি গিয়াছিলেন—সে গল্পও শুনাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রাণাডের সর্ববিষয়-ব্যাপী শক্তির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, সেই সময়কার সমস্ত নেতার মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। রাণাডে কেবল জজই ছিলেন না। তিনি ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি সরকারী কর্মচারী হইয়াও দর্শক হিসাবে নির্ভয়ে কংগ্রেসে যোগ দিতেন। তাঁহার

বিজ্ঞতার উপর সকলের এমন আস্থা ছিল যে, সকলেই তাঁহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতেন। এই সকল কথা বলিতে গোখলের আনন্দের অবধি থাকিত না।

গোখলে ঘোড়ার গাড়ি রাখিতেন। আমি এই গাড়ি লইয়া তাঁহার কাছে অভিযোগ করি। আমি তাঁহার অসুবিধা বুঝিতে পারি নাই। তাই বলিয়াছিলাম—"আপনি কি সকল সময়েই ট্রামে যাইতে পারেন না? ইহাতে কি নেতাদের প্রতিষ্ঠা কমে?"

কতকটা দুঃখিত হইয়া তিনি উত্তর দিলেন—"তুমিও আমাকে বুঝিতে পারিলে না? কাউন্সিল হইতে যে অর্থ পাই, তাহা আমার নিজের জন্য ব্যবহার করি না। তোমার ট্রামে চড়া দেখিয়া আমার হিংসা হয়। আমার উহা করার যো নাই। তুমিও যখন আমার মত পরিচিত হইয়া পড়িবে, তখন তোমারও ট্রামে চলা সম্ভব হইবে না—অসুবিধা হইবে। নেতারা যাহা করেন তাহা যে আমোদ ভোগ করার জন্য করেন, একথা মনে করার কোনও কারণ নাই। তোমার সরল জীবন-যাত্রা আমার ভাল লাগে। আমি যতটা পারি সাদাসিধা ধরনে থাকি। কিন্তু আমাদের মত লোকের কতকগুলি খরচ অনিবার্য।"

এমন করিয়া আমার একটা নালিশ ত মিটিয়া গেল। কিন্তু আমার দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তর দিয়া তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—

"কিন্তু আপনি বেড়াইতেও ঠিকমত যান না। ইহাতে যে আপনি অসুস্থ থাকেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার হেতু নাই। দশটা কাজের মধ্যে বেড়াইবার অবকাশও কেন পাওয়া যাইবে না?"

জবাব পাইলাম—"তুমি কখন আমাকে বসিয়া থাকিতে দেখিতেছ যে, আমি বেড়াইতে যাওয়ার সময় করিব?"

আমি গোখলের সম্বন্ধে এত সম্মান পোষণ করিতাম যে, তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার উপরোক্ত জবাবে আমার তৃপ্তি হইল না, তবু চুপ করিয়া রহিলাম। আমি তখন মনে করিতাম এবং এখনো মনে করি যে, যতই কাজ থাক না কেন, যেমন খাওয়ার সময় করিয়া লওয়া হয়, তেমনি ব্যায়ামের সময়ও করিয়া লওয়া উচিত। তাহাতে দেশের সেবা কম না হইয়া বেশিই হয়—ইহাই আমার বিশ্বাস।

গোখলের সঙ্গে একমাস—২

গোখলের ছায়ার নীচে, ঘরে বসিয়াই আমি সকল সময় কাটাইতাম না। আমার দক্ষিণ আফ্রিকার খ্রীষ্টান বন্ধুদের বলিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে আসিয়া খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মিশিব ও তাঁহাদের অবস্থা জানিব। আমি কালীচরণ ব্যানার্জীর নাম শুনিয়াছিলাম। তিনি কংগ্রেসের অগ্রণীদের মধ্যে একজন ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল। সাধারণতঃ খ্রীষ্টানেরা হিন্দু-মুসলমানের সংস্রব হইতে ও কংগ্রেস হইতে আলাদা হইয়া থাকিতেন। সেই জন্য তাঁহাদের উপর যে অবিশ্বাসের ভাব ছিল, কালীচরণবাবুর সম্বন্ধে সে ভাব ছিল না। আমি তাঁহার সহিত দেখা করার কথা গোখলেকে বলায় তিনি বলিলেন—"ওখানে গিয়া তুমি কি পাইবে? তিনি খুব ভাল মানুষ, তবে আমার মনে হয় যে, তিনি তোমাকে আনন্দ দিতে পারিবেন না। আমি তাঁহাকে ভাল রকমেই জানি। তবে তোমার যদি যাওয়ার ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে যাও।"

আমি দেখা করার সময় চাহিয়া পাঠাইলাম। তিনি আমাকে তখনই সময় দিলেন এবং আমি দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার বাড়িতে তাঁহার ধর্ম-পত্নী তখন মৃত্যু-শয্যায় ছিলেন। কংগ্রেসে তাঁহাকে কোট পাতলুন পরিহিত দেখিয়াছিলাম। বাড়িতে তাঁহাকে ধুতি-জামা পরা দেখিলাম।

এই সাদাসিধা ধরন আমার ভাল লাগিল। তখন আমি নিজে যদিও পারসী কোট পাতলুন পরিতাম তবু এই পোশাক আমার খুব ভাল লাগিত। আমি তাঁহার সময় নষ্ট না করিয়া আমার প্রশ্নগুলি তাঁহাকে বলিয়া আমার যেখানে যেখানে বুঝিতে অসুবিধা হয় তাহা শুনাইলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ত মানেন যে, আমরা পাপ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি!"

আমি বলিলাম—"হাঁ মানি।"

"তাহা হইলেই দেখুন, এই মূল পাপের নিবারণের ব্যবস্থা হিন্দুধর্মে নাই, খ্রীষ্টধর্মে আছে।" অতঃপর তিনি বলিলেন—"পাপের প্রতিদান মৃত্যু এবং এই মৃত্যু হইতে বাঁচার পথ যীশুর শরণ, বাইবেল এ কথা বলেন।"

আমি ভগবদগীতার ভক্তিমার্গের উল্লেখ করিলাম। কিন্তু আমার কথায় কোনও ফল হইল না। আমি এই মহাশয় ব্যক্তিকে তাঁহার মহত্বের জন্য ধন্যবাদ

দিলাম। আমার মনে সন্তোষ আসিল না সত্য, তবে এই দেখা করায় আমার লাভই হইয়াছিল।

এই সময়টাতে আমি কলিকাতায় গলি-গলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম বলা যায়। পায়ে হাঁটিয়াই প্রায় সমস্ত কাজ করিতাম। এই সময়েই জজ মিত্রের সঙ্গে দেখা হইল, গুরুদাস ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা হইল। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে আমি তাঁহাদের সাহায্য চাহিলাম। রাজা স্যার প্যারীমোহন মুখার্জীর সঙ্গেও এই সময়েই দেখা করি।

কালীচরণ ব্যানার্জী আমাকে কালীমন্দিরের কথা বলিয়াছিলেন। আমার সেই মন্দির দেখার তীব্র ইচ্ছা হইয়াছিল। ইহার বর্ণনা পুস্তকাদিতে পড়িয়াছি। সেই জন্য একদিন গিয়া উপস্থিত হইলাম। জস্টিস মিত্রের বাড়ি সেই রাস্তাতেই ছিল। সেই জন্য তাঁহার সহিত যে দিন দেখা করিলাম, সেই দিন কালীমন্দিরেও গেলাম। রাস্তায় দেখিলাম সারি সারি ছাগ বলি দেওয়ার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। গলিতে দেখি সারি সারি ভিক্ষুক বসিয়া আছে। সাধু বাবারা ত ছিলেনই। সে সময়েও আমি হৃষ্টপুষ্ট ভিখারীদিগকে কিছু দিতাম না। তাহাদের একদল আমার পিছন লইয়াছিল।

এক বাবাজী রকের উপর বসিয়াছিল। সে বলিল—"আরে বেটা, কোথায় যাইতেছ?" আমি উত্তর দিলাম। সে আমাকে ও আমার সঙ্গীকে বসিতে বলিল। আমরা বসিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই ছাগ-বলি কি তুমি ধর্ম বলিয়া মনে কর?"

"জীব-হত্যা করাকে ধর্ম কে বলে?"

তাহা হইলে তুমি এখানে বসিয়া লোককে সেই কথা কেন বুঝাও না?"

"আমার সে কাজ নয়, আমি বসিয়া ঈশ্বর আরাধনা করি।"

"তাহা হইলে, আর কোনও জায়গা সেজন্য পাইলে না?"

"আমার সব জায়গাই সমান। লোক ত ভেড়ার পালের ন্যায়, একটা যেদিকে যায় সকলে সেইদিকে বেড়ায়। উহাতে আমাদের সাধুদের কি প্রয়োজন?"—বাবাজী বলিলেন।

আমি আর কথা বাড়াইলাম না। আমরা মন্দিরে গেলাম। সম্মুখে রক্তের নদী বহিতেছে। উহা দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিলাম না। আমার উত্তেজনা বোধ হইল, অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। সেই দৃশ্য আমি আজ পর্যন্তও ভুলিতে পারি নাই। সেই সময় কোনও বাঙ্গালীর বাড়িতে এক মজলিসে

আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সেইখানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ড-জড়িত পূজা লইয়া আমার আলোচনা হয়। তিনি বলিলেন—"ওখানে যে ঢাকের শব্দ হয়, যে গোলমাল হয়, তাহাতে ছাগদিগকে মারিলেও উহাদের ব্যথা বোধ হয় না।"

কথাটা মানিতে পারিলাম না। আমি সেই ভদ্রলোককে বলিলাম যে, ছাগলের যদি বাকশক্তি থাকিত তাহা হইলে তাহারা অন্য প্রকার বলিত। এই বলিদান প্রথা বন্ধ হওয়াই উচিত। বুদ্ধদেবের বাণী স্মরণে আসিল। কিন্তু আমি দেখিলাম—ইহা আমার শক্তির অতীত।

তখন যাহা ভাবিয়াছিলাম আজও তাহাই ভাবি। আমার কাছে একটা ছাগলের জীবনের মূল্য মানুষের জীবনের মূল্য অপেক্ষা কম নয়। মানুষের দেহ বাঁচাইবার জন্য ছাগের দেহ নাশ করিতে আমি প্রস্তুত নই। যে জীব যত বেশি নিরাশ্রয়, মানুষের অনুষ্ঠিত হিংসা হইতে বাঁচিবার দাবি সে জীবের তত বেশি আছে বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু যে যোগ্যতা অর্জন করে নাই, তাহার পক্ষে ইহাদিগকে রক্ষা করাও সম্ভব নহে। ছাগগুলিকে এই পাপময় যজ্ঞ হইতে বাঁচাইতে হইলে যে আত্মশুদ্ধির এবং যে ত্যাগের প্রয়োজন, আমার তাহা নাই। এই শুদ্ধি ও এই ত্যাগের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতেই আমার মরিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। এমন কোনও তেজস্বী পুরুষের উদ্ভব হোক্, এমন কোন তেজস্বিনী সতীর আবির্ভাব হোক্, যিনি মানুষকে এই মহাপাতক হইতে বাঁচাইতে পারিবেন, নির্দোষ প্রাণীটিকে রক্ষা করিতে পারিবেন ও মন্দিরকে শুদ্ধ করিবেন। এই প্রার্থনা নিরন্তর করিতেছি। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, ত্যাগ-বৃত্তি-পূর্ণ ভাবপ্রধান বাঙ্গালী জাতি কেমন করিয়া এই হত্যাকাণ্ড সহ্য করিতেছে?

১৯

গোখলের সহিত একমাস—৩

কালীমাতার জন্য অনুষ্ঠিত এই ভয়ঙ্কর যজ্ঞ দেখিয়া আমার বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা প্রবল হয়। ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধে আমি অনেক কথা পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জীবন-বৃত্তান্ত আমি কিছু কিছু জানিতাম। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি। তাঁহার লেখা কেশবচন্দ্রের জীবন-

বৃত্তান্তখানা পাইয়াছিলাম ও পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ ও আদি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভেদ বুঝিয়াছিলাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে দর্শন করিলাম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিবার জন্যও আমি ও প্রফেসর কথাভাটে গিয়াছিলাম। সে সময় তিনি কাহারও সহিত দেখা করিতেন না বলিয়া দেখা হয় নাই। কিন্তু সেই সময় তাঁহার ওখানে ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসব হইতেছিল। সেইখানে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা গিয়াছিলাম। সেখানে উচ্চাঙ্গের বাংলা গান শুনিয়াছিলাম। সেই হইতেই বাংলা গান আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

ব্রাহ্ম-সমাজের যতটা পারি দেখার পর একবার স্বামী বিবেকানন্দকে না দর্শন করিলে কেমন করিয়া চলিবে? অত্যন্ত উৎসাহের সহিত আমি বেলুড় মঠে গেলাম। অনেকটা পথই হাঁটিয়া গিয়াছিলাম। সবটা রাস্তাই হাঁটিয়া গিয়াছিলাম কি অর্ধেকটা রাস্তা—তাহা স্মরণ নাই। জন-বিরল স্থানে মঠ দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। স্বামীজী অসুস্থ, তিনি কলিকাতার বাড়িতে আছেন, এখন দেখা হইবে না শুনিয়া নিরাশ হইলাম। ভগ্নী নিবেদিতার ঠিকানা পাইলাম। চৌরঙ্গীর এক মহলে তাঁহার দর্শনও পাইলাম। কিন্তু তাঁহার সমারোহ দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম। কথাবার্তায় আমাদের মধ্যে বিশেষ কোনও ঐক্যের সূত্র ধরা পড়িল না। আমি একথা গোখলেকে বলিলাম। তিনি বলিলেন—"এই মহিলা উৎফুল্ল-স্বভাবা। তোমার সহিত তাঁহার ঐক্য না হওয়ায় আমি আশ্চর্য হই নাই।"

পুনরায় একবার পেস্তনজী পাদসাহের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি পেস্তনজীর বৃদ্ধা মাতাকে উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময় আমি সেখানে উপস্থিত হই। আমি তখন উভয়ের মধ্যে দোভাষীর কাজ করিলাম। এই ভগ্নীর ভিতরে হিন্দু-ধর্মের জন্য যে উচ্ছ্বসিত প্রেম ছিল, তাহা তাঁহার সহিত মনের মিল না হইলেও আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাঁর লেখা বইর পরিচয় পরে পাইয়াছি।

আমি দিনের কাজ এইরূপে ভাগ করিয়া লইয়াছিলাম—দক্ষিণ আফ্রিকার কাজের জন্য কলিকাতার নেতাদের সঙ্গে দেখা করা, কলিকাতার ধর্মানুষ্ঠানসমূহ দেখা এবং কলিকাতার সাধারণ প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিদর্শন করা। একদিন আমি এক সভায় বুয়ার যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেবা-দল কি কাজ করিয়াছে সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দিই। ডাঃ মল্লিক সভাপতি হইয়াছিলেন। ইংলিশম্যানের সঙ্গে

আমার পরিচয় এই সময় খুব কাজে লাগিয়াছিল। মিঃ সণ্ডার্স এই সময় পীড়িত ছিলেন। ১৮৯৬ সালে যেমন তাঁহার সাহায্য পাইয়াছিলাম এখনও তেমনি পাইলাম। আমার ঐ বক্তৃতা গোখলের পছন্দ হইয়াছিল। ডাক্তার রায়ের মুখেও উহার প্রশংসা শুনিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

গোখলের সঙ্গী বলিয়া বাংলা দেশে আমার কাজের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার জন্য বাংলার অগ্রগণ্য পরিবার সমূহের সংস্পর্শে আসা আমার পক্ষে সহজ হইয়াছিল ও বাংলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। এই চিরস্মরণীয় মাসের অনেক স্মৃতির কথা আমাকে বাদ দিয়া যাইতে হইবে। এই সময়েই আমি একবার ব্রহ্মদেশ হইতে ঘুরিয়া আসি। সেখানকার ফুঙ্গী-দিগের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। তাঁহাদের আলস্য দেখিয়া দুঃখ হইয়াছিল। স্বর্ণ-প্যাগোডা দর্শন করিয়াছিলাম। মন্দিরের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট মোমবাতি আমার চোখে ভাল লাগে নাই। মন্দিরের গর্ভ-গৃহে ইন্দুর চলা-ফেরা করিতেছে দেখিয়া স্বামী দয়ানন্দের অভিজ্ঞতার কথা মনে হইল। ব্রহ্মদেশের মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়া ও তাঁদের কাজকর্মে উৎসাহ দেখিয়া যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তেমনি আবার সেখানকার পুরুষদের অলসতা দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিলাম। আমি ইহাও তখনই দেখিয়াছিলাম যে, বোম্বাই যেমন ভারতবর্ষ নহে, রেঙ্গুনও তেমনি ব্রহ্মদেশ নহে। আর ভারতবর্ষে যেমন আমরা ইংরাজ ব্যবসাদারের কমিশন-এজেণ্ট হইয়াছি, তেমনি ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীরা ও ইংরাজেরা একত্র হইয়া ব্রহ্মদেশবাসীকে তাহাদের কমিশন এজেণ্ট বানাইয়া রাখিয়াছে।

ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি গোখলের কাছ হইতে বিদায় লইলাম। তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হইলেও যাইতে হইল, কেন না বাংলাদেশে—কলিকাতায় আমার যে কাজ করার ছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছিল।

ব্যবসার কাজে বসিয়া যাওয়ার পূর্বে আমার একবার তৃতীয় শ্রেণীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া এই শ্রেণীর যাত্রীদের দুঃখের কথা জানিয়া লওয়ার ইচ্ছা হয়। গোখলের কাছে আমি এই ইচ্ছার কথা বলিয়াছিলাম। তিনি প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু যখন আমার কি কি দেখার আশা আছে সে কথা বর্ণনা করিলাম, তখন তিনি খুশি হইয়া আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। আমি স্থির করি—প্রথমে কাশী যাইব এবং সেখানে গিয়া বিদুষী

অ্যানি বেসান্টকে দর্শন করিব। তিনি সে সময় পীড়িত ছিলেন।

এই ভ্রমণের জন্য আমার নতুন পোশাক ও সরঞ্জাম তৈরি করিয়া লইতে হইয়াছিল। গোখলে আমার জন্য একটা পিতলের ডিবা লাড়ুতে ভর্তি করিয়া দিলেন। বারো আনা দিয়া একটা ক্যাম্বিস ব্যাগ কিনিলাম। ছায়ার (পোরবন্দরের নিকটস্থ গ্রাম) উল দিয়া একটি জামা তৈরি করিয়া লইলাম। ব্যাগে কোট ধুতি, শার্ট ও তোয়ালে রাখার স্থান হইল। গায়ে দেওয়ার জন্য একটা কম্বল লইলাম। আর সঙ্গে একটা লোটা রাখিলাম। মাত্র ইহাই লইয়া আমি রওনা হইলাম।

গোখলে ও ডাক্তার রায় আমাকে স্টেশনে গাড়িতে তুলিয়া দিতে আসিলেন। দুই জনকেই আমি স্টেশনে না আসার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা আমার সে কথা শোনেন নাই। গোখলে বলিলেন—"তুমি ফার্স্ট ক্লাসে গেলে কখনো আসিতাম না। কিন্তু এখন যে আমার আসাই দরকার।"

প্লাটফর্মে আসিতে গোখলেকে কেউ আটকাইল না। তাঁহার মাথায় রেশমী পাগড়ি ছিল এবং কোট ও ধুতি পরা ছিল। ডাক্তার রায় বাঙ্গালীর সাধারণ পোশাক পরিয়া আসিয়াছিলেন। টিকিট-কলেক্টর তাঁহাকে ভিতরে আসিতে আটকায়। পরে গোখলে "আমার বন্ধু" বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া আসিয়াছিলেন। দুইজনে আমাকে এমনি করিয়া বিদায় দিলেন।

২০

কাশীতে

আমার গন্তব্যস্থান ছিল রাজকোট। পথে কাশী, আগ্রা, জয়পুর, পালনপুর হইয়া যাওয়া স্থির করিলাম। ঐ সকল স্থান দেখার জন্য প্রত্যেক জায়গায় এক এক দিনের বেশি সময় দেই নাই। এক পালনপুর ছাড়া অন্য সর্বত্র হয় ধর্মশালায়, নয়ত পাণ্ডার বাড়িতে যাত্রীদের মতই থাকিয়াছি। আমার স্মরণ আছে, এই যাত্রায় গাড়ীভাড়াসহ সর্বসাকুল্যে আমার একত্রিশ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তৃতীয় শ্রেণীর এই ভ্রমণে আমি সাধারণতঃ ডাকগাড়িতে উঠি নাই। আমি জানিতাম যে, ডাকগাড়িতে বেশি ভিড় হয়। তা ছাড়া তৃতীয়

শ্রেণীর সাধারণ ভাড়া হইতে ডাকগাড়ির ভাড়া বেশি ছিল। ডাকগাড়িতে না উঠার তাহাও ছিল আর একটা কারণ।

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির অপরিচ্ছন্নতা ও পায়খানার দুর্গন্ধ এখনও যেমন আছে তখনও তেমনি ছিল। আজকাল সামান্য কিছু উন্নতি হইলেও হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীতে সুবিধার যে পার্থক্য, তা ভাড়ার পার্থক্য হইতে অনেক বেশি। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা যেন ভেড়া, আর তাহাদের যে ব্যবস্থা তাহাও ভেড়ার জন্য যে ব্যবস্থা হইতে পারে সেই মত। ইউরোপে আমি তৃতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করিতাম। প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থা দেখার জন্য একবার মাত্র উহাতে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিয়াছি—প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীতে যে প্রভেদ তাহা ভারতবর্ষের মত নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় নিগ্রোরাই বেশির ভাগ তৃতীয় শ্রেণীতে যায়। তাহা হইলেও সেখানে তৃতীয় শ্রেণীতে অনেক সুবিধা আছে। কোন কোনও লাইনে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে শোয়ার ব্যবস্থাও আছে। বেঞ্চগুলিও গদিমোড়া। প্রত্যেক গাড়িতে যাহাতে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি লোক না উঠে তাহা সেখানে দেখা হয়। এখানে তৃতীয় শ্রেণীর কোনও গাড়িতে যাত্রীর সংখ্যা দেখা হয় বলিয়া আমি ত জানি না।

একদিকে রেল কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে যে সব অসুবিধা আছে তাহার জন্য, অন্যদিকে যাত্রীদের নিজেদের ভিতর যে সব বদ অভ্যাস আছে তাহার জন্য কোনও পরিচ্ছন্নতা-প্রিয় যাত্রীর পক্ষে তৃতীয় শ্রেণীতে চলা শাস্তি পাওয়ার শামিল। যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা, সময় অসময় না দেখিয়া বিড়ি খাওয়া, পান জর্দা চিবাইয়া যেখানে বসিয়া থাকিবে সেইখানেই পিক ফেলা, মেঝেতেই উচ্ছিষ্ট ফেলা, চেঁচাইয়া কথা বলা, কানে আঙ্গুল দিতে হয় এমন সব খারাপ কথা উচ্চারণ করা—এমন ত সর্বদাই হইতেছে।

১৯০২ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে চড়িয়াছি, এবং ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত একেবারে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তৃতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করিয়াছি। এই দুই সময়ে তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রমণের মধ্যে তফাত বিশেষ দেখি নাই। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এই মহাব্যাধি প্রতিকারের একটি মাত্র উপায়ই আমি জানি। সে উপায় হইতেছে—শিক্ষিত ব্যক্তিদের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করা ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অভ্যাস বদলাইতে চেষ্টা করা। তা ছাড়া রেল-কর্মচারীর প্রত্যেক ত্রুটির জন্য তাহাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা দরকার, যেন তাহারা সোয়াস্তি

না পায়। এই শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা নিজের জন্য সুবিধা খুঁজিবেন না, কদাচ ঘুষ দিবেন না ও যে কেউ আইন-ভঙ্গ করিবে তাহা বরদাস্ত করিবেন না। এই প্রকার করিলে অনেক সংস্কার হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আমার অসুস্থতার জন্য ১৯২০ সাল হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ প্রায় বন্ধই রাখিতে হইয়াছে, ইহা আমার পক্ষে দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। আবার বন্ধও করিতে হইয়াছে এমন সময়ে যখন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর দুঃখের কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিকার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। রেল ও স্টীমার কোম্পানী গরিব যাত্রীদের যে অসুবিধায় ফেলে, যাত্রীরা নিজেদের খারাপ অভ্যাসের জন্য যে কষ্ট পায়, সরকার বিদেশী বাণিজ্যের সুবিধার জন্য যেভাবে রেল চালায়, এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া আমাদের প্রজা-জীবনের এক সম্পূর্ণ পৃথক ও প্রয়োজনীয় কার্য বলিয়া ধরিতে হয়। ইহার পরিবর্তনের জন্য যদি দুই একজন বুদ্ধিমান ও কর্মঠ ব্যক্তি নিজেদের সমস্ত সময়ই ব্যয় করেন তাহা হইলেও তাহা বেশি নহে।

তৃতীয় শ্রেণীর দুঃখের কথার বর্ণনা এইখানেই বন্ধ রাখিয়া এখন কাশীর কথা বলিব। সকালে কাশীতে পৌছাই। অনেকগুলি পাণ্ডা আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। তাঁহাদের মধ্যে যাহাকে কিছুটা পরিচ্ছন্ন ও ভাল মনে হইল আমি তাহাকেই পছন্দ করিয়া লইলাম। আমার পছন্দ ভালই হইয়াছিল। পাণ্ডার আঙ্গিনায় একটা গাই ছিল। তাহার বাড়ির দোতলার ঘরটাতে আমাকে থাকিতে দিল। আমি বিধিমত গঙ্গাস্নান করিব ঠিক করিয়াছিলাম এবং সেইজন্য উপবাস করিয়াছিলাম। পাণ্ডা সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়া দিয়াছিল। তাহাকে পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, আমি পাঁচসিকার বেশি দক্ষিণা দিব না, ইহাতেই যাহা করিতে পারা যায় তাহা করিতে হইবে। পাণ্ডা আপত্তি না করিয়া তাহাতেই রাজী হইয়া বলিল—"আমরা পূজা ধনী ও গরিব সকলের জন্য এই রকমই করি। তবে দক্ষিণা যজমানের ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে দিয়া থাকে।" পাণ্ডাজী পূজাবিধিতে কিছু বাদ দিয়াছিল বলিয়া আমার বোধ হয় নাই। পূজা শেষ করিয়া আমি বারোটা একটার সময় বিশ্বনাথ দর্শন করিতে গেলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম তাহাতে দুঃখ পাইলাম।

১৮৯১ সালে যখন আমি বোম্বাইতে ওকালতি করিতাম তখন একবার প্রার্থনা সমাজের মন্দিরে 'কাশীতে তীর্থ যাত্রা' বিষয়ে এক বক্তৃতা শুনিয়া-ছিলাম। সেই জন্য কতকটা নিরাশ হওয়ার নিমিত্ত আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে অধিকতর নিরাশ হইলাম।

একটা সংকীর্ণ পিচ্ছিল গলি দিয়া মন্দিরে যাইতে হয়। সেখানে শান্তির নামও নাই। মাছির ভন-ভন ও দোকানপাট হইতে যাত্রীদের বেচা-কেনার গণ্ডগোল অসহ্য বোধ হইল।

যেখানে ধ্যান ও ভগবৎ চিন্তার পরিবেশ দেখিব আশা করিয়াছিলাম, সেখানে তাহার কিছুই পাওয়া গেল না। ধ্যানভাব হৃদয়ের মধ্যে চলিতেছিল। ভক্তি-নিমগ্না ভগ্নীদের দেখিলাম। তাঁহারা এমন বিহ্বল হইয়া আছেন যে, চারিদিকে কি ঘটিতেছে তার কিছুই জানেন না। কেবল ধ্যানে আত্মহারা হইয়া আছেন। কিন্তু ইহাতে ব্যবস্থাপকদের কোনও কৃতিত্ব নাই। ব্যবস্থাপকদের কর্তব্য কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চারধারে, যেমন বাহিরের দিক দিয়া তেমনি অন্তরের দিক দিয়া শান্ত, নির্মল, সৌরভিত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করা ও তা রক্ষা করা। তার বদলে আমি দেখিলাম যে, ধূর্ত দোকানীদের নূতন নূতন ফ্যাশনের খেলনা ও মিঠাই বিক্রয়ের বাজার চলিতেছে।

মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই পচা দুর্গন্ধ ফুলের স্তূপ। সুন্দর মার্বেল পাথরের মেঝে কাটিয়া তাহাতে টাকা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাতে ময়লা লাগিয়া থাকিতেছ। অন্ধ শ্রদ্ধাবশে কেউ এই কাজ করিয়াছেন।

জ্ঞান-বাপীর কাছে গেলাম। আমি এখানে ঈশ্বর খুঁজিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। মন অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল। জ্ঞান-বাপীর কাছেও আবর্জনা রহিয়াছে। দক্ষিণা দেওয়ার মত শ্রদ্ধা হইল না। সেই জন্য মাত্র একটি পয়সা আমি পাণ্ডাজীকে দিলাম। সে পয়সাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। দুই চারিটা গালাগালি শুনাইয়া দিয়া বলিল—"তুই যে অপমান করলি, সেজন্য তুই নরকে যাবি।"

আমি শান্তভাবে বলিলাম—"মহারাজ, আমাকে যদি নরকে যাইতে হয় ত যাইব কিন্তু আপনার মুখে ত খারাপ কথা শোভা পায় না। যদি ইচ্ছা হয় তবে পয়সাটা নিন, না হয়ত আমারই থাক।"

"যা, তোর পয়সায় আমার দরকার নাই" বলিয়া সে আমাকে আরো কিছু বেশি গালি দিল। আমি পয়সাটা লইয়া আসিতে আসিতে ভাবিলাম যে, পাণ্ডাজী পয়সাটা খোয়াইল ও আমার বাঁচিল। কিন্তু মহারাজ পয়সা খোয়াইবার লোক নহেন। তিনি তখন আমাকে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, রাখ। আমি তোর মত করিতে চাই না। যদি না লই তবে তোর অকল্যাণ হইবে।"

আমি নিঃশব্দে পয়সা দিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে আরও দুইবার কাশীর বিশ্বনাথ দেখিয়াছি। কিন্তু তখন ত মহাত্মা হইয়া গিয়াছি। সেইজন্য ১৯০২ সালের মত ব্যবহার আর কেমন করিয়া পাইব? আমার দর্শনার্থীরা আমাকে কি 'দর্শন' করিতে দেয়? 'মহাত্মা' হওয়ার দুঃখ আমার মত মহাত্মারাই জানেন। সেখানকার অপরিচ্ছন্নতা ও হট্টগোল পূর্বের ন্যায়ই দেখিয়াছি।

ভগবানের দয়া সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে তিনি এই তীর্থ-ক্ষেত্র দেখিতে পারেন। সেই মহাযোগী, তাঁহারই নামে কত প্রবঞ্চনা, অধর্ম ও ভণ্ডামি সহ্য করিতেছেন! তিনি ত বলিয়াই রাখিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমনি ফল। কর্মের নিয়মকে মিথ্যা কে করিতে পারে? ভগবান নিজে নিয়ম সৃষ্টি করিয়া, নিয়মের উপর সব ফেলিয়া দিয়া নিজে যেন অবসর লইয়াছেন।

ইহার পর আমি মিসেস বেসাণ্টের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। আমি জানিতাম যে, তিনি অল্পদিন হইল ব্যারাম হইতে উঠিয়াছেন। আমার নাম লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তখনই আসিলেন। আমার ত কেবল দর্শন করাই আবশ্যক ছিল। সেই জন্য বলিলাম—"আপনার শরীর খারাপ আমি জানি। আমি ত কেবল আপনাকে দর্শন করিতেই আসিয়াছি। অসুস্থ থাকিয়াও আপনি যে আমাকে দেখা দিয়াছেন এজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার আর সময় লইব না।"—এই বলিয়া আমি বিদায় লইলাম।

২১

বোম্বাই-এ বসিলাম

গোখলের খুব ইচ্ছা ছিল, আমি বোম্বাই-এ স্থির হইয়া বসি, ব্যারিস্টারী করি ও তাঁহার সঙ্গে জনসেবার কাজে যোগ দিই। তখন জনসেবা মানে কংগ্রেস-সেবা ছিল। তিনি যে সংস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার কাজও ছিল কংগ্রেস-পরিচালনা করা।

আমারও সেই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ব্যারিস্টারীতে সাফল্যের সম্বন্ধে আমার

আত্মবিশ্বাস ছিল না। পূর্বে যেভাবে ব্যারিস্টারীর শিক্ষা পাইয়াছি তাহাতে ভয় হইত। সেই জন্য প্রথমে রাজকোটেই গেলাম। সেখানে আমার পুরাতন হিতাকাঙ্ক্ষী, যিনি আমাকে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন, সেই কেবলরাম মাভজী দভে ছিলেন। তিনি আমাকে তিনটা মামলা দিলেন। কাথিয়াওয়াড়ের জুডিশ্যাল এসিস্টাণ্টের কাছে দুইটি আপীল, আর জামনগরে একটা নতুন মামলা। এই শেষোক্ত মামলাটা গুরুতর ছিল। এই মামলার দায়িত্ব লইতে আমি অনিচ্ছা প্রকাশ করি। কেবলরাম বলিয়া উঠিলেন—"হারিলে ত আমাদেরই হার হইবে! তোমার যথাসাধ্য তুমি কর। আর আমিও ত তোমার সঙ্গে আছি?"

এই মোকদ্দমায় আমার প্রতিপক্ষে ছিলেন শ্রীযুক্ত সমর্থ। বর্তমানে তিনি পরলোকে। আমি মামলা ভাল করিয়াই তৈরি করিয়াছিলাম। এ দেশের আইনের জ্ঞান আমার বেশি ছিল না। কেবলরাম দভেই আমাকে এই মামলার বিষয় তৈয়ার করিয়া দেন। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার পূর্বে বন্ধুরা আমাকে শুনাইয়াছিলেন যে, ফিরোজশাহের এভিডেন্স আইন মুখস্থ আছে, আর তাহাই তাঁর সাফল্যের কারণ। একথা আমার মনে ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার পথে আমি এ দেশের 'সাক্ষ্য আইন' টীকাসহ পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা ত ছিলই।

মোকদ্দমায় জয়লাভ হইল। ইহাতে কতকটা আত্মবিশ্বাস অর্জন করিলাম। আর ঐ দুইটা আপীল সম্বন্ধে ত পূর্ব হইতে জয়লাভের সন্দেহ ছিল না। এই জন্য বোম্বাই-এ বসিলেও ক্ষতি নাই মনে হইল।

এই বিষয় বলিবার পূর্বে ইংরাজ আমলার যে অবিচার ও অজ্ঞতার পরিচয় পাইয়াছিলাম তাহা বলিব। জুডিশ্যাল এসিস্টাণ্ট এক জায়গায় বসিয়া থাকেন না। তিনি চলিতে চলিতে মামলার বিচার করিতে থাকেন। যেখানে সাহেব যান সেইখানেই উকিল-মক্কেলকে যাইতে হয়। উকিলের সাধারণ ফী অপেক্ষা বাহিরে গেলে বেশি ফী পাওনা হয়। খরচ শেষে মক্কেলের ঘাড়েই পড়ে। এসব কথা জজ সাহেবের ভাবার দরকার নাই।

ভেরাভল নামক স্থানে এই আপীলের শুনানী হওয়ার কথা। ভেরাভলে এই সময় খুব মড়ক চলিতেছিল। প্রতিদিন পঞ্চাশ জন করিয়া মড়কে পড়িতে-ছিল, আর সেখানে লোকসংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি ছিল না। স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। আমি এক নির্জন ধর্মশালায় উঠিয়াছিলাম। ধর্মশালাটি গ্রাম হইতে কিছু দূরে ছিল। কিন্তু মক্কেলদের কি ব্যবস্থা আর

হইতে পারে! ঈশ্বরই তাহাদের মালিক।

এক উকিল বন্ধুর মামলাও এই জজের এজলাসে ছিল। তিনি আমাকে তার করেন যে, আমি যেন প্লেগের জন্য কোর্ট অন্যত্র লইয়া বসাইতে আরজি করি। সাহেবের কাছে আরজি করায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার ভয় করে নাকি?"

আমি বলিলাম—"আমার ভয়ের কথা ত হইতেছে না। আমি আমার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিব, কিন্তু মক্কেলদের বেলা কি হইবে?"

সাহেব বলিলেন - "মড়ক ত ভারতবর্ষে বাসা বাঁধিয়াছে। উহাকে আর ভয় করিয়া কি হইবে? ভেরাভলের হাওয়া কি সুন্দর! (সাহেব গ্রাম হইতে দূরে সমুদ্রতটে প্রাসাদ-তুল্য তাঁবুতে বাস করেন।) লোকের খোলা হাওয়ায় বাস করা শেখা চাই।"

এই দার্শনিক তত্ত্ব-উপদেশের উপর আর কোনও তর্ক চলে না। সাহেব সেরাস্তাদারকে বলিলেন—"মিঃ গান্ধী যাহা বলিতেছেন মনে রাখিও, আর উকিল-মক্কেলের যদি বিশেষ অসুবিধা হয় তবে আমাকে জানাইও।"

সাহেব ত খোলা মনে যাহা উপযুক্ত ভাবিতেছেন তাহাই করিতেছেন। কিন্তু কাঙ্গাল ভারতবর্ষের অসুবিধার কথা তিনি কি বুঝিবেন? ভারতবর্ষের সুবিধা-অসুবিধা, ভাল-মন্দ অভ্যাস, প্রচলিত প্রথা ইত্যাদির কি তিনি বুঝিবেন? মোহর লইয়া যাহার কারবার, পাই-এর খবর কি সে বুঝিতে পারে? খুব সদিচ্ছা থাকিলেও হাতি যেমন পিপীলিকার প্রয়োজন বুঝিতে পারে না, তেমনি হাতির ন্যায় যাহার প্রয়োজন সেই ইংরাজ, পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র যাহার প্রয়োজন সেই ভারতবাসীর বিচার করিতে পারে না। তাহার জন্য আইন রচনা করিতেও পারে না।

এখন আসল কথায় ফিরিয়া আসা যাক।

উপরোক্ত সাফল্য পাওয়ার পরেও আমি কিছুকাল রাজকোটেই থাকিব ভাবিয়াছিলাম। এই অবসরে কেবলরাম একদিন আসিলেন। তিনি বলিলেন—"গান্ধী, তোমাকে এখানে থাকিতে দেওয়া হইবে না, তোমাকে বোম্বাই যাইতে হইবে।"

"কিন্তু আমার খাওয়া জুটিবে কোথা হইতে, আপনি কি খরচ চালাইবেন?"

"হা—হাঁ, আমিই তোমার খরচ চালাইব। তোমাকে বড় ব্যারিস্টার বলিয়া

কয়েকবার এখানে আনিব, আর দরখাস্ত ইত্যাদি লেখার কাজ তোমার ওখানে পাঠাইব। ব্যারিস্টারকে বড় করিয়া তোলা আর ছোট করিয়া দেওয়া আমাদের-- উকিলদেরই কাজ নয় কি? তোমার মূল্য কি তাহা তুমি জামনগরে ও ভেরাভল-এ দেখাইয়াছ। আমি সেজন্য নিশ্চিন্ত আছি। তুমি যে জনসেবার কাজ করিবে ইচ্ছা করিয়াছ, রাজকোটে থাকিয়া তাহা নষ্ট করিতে আমি দিব না। কবে যাইবে বল?"

"নাতাল হইতে আমার কিছু টাকা আসার কথা আছে, উহা পাইলে যাইব।"

দুই-এক সপ্তাহ মধ্যে টাকা আসিয়া পড়ায় আমি বোম্বাই গেলাম। 'পেইন, গিলবার্ট ও সায়নী'র আপিসে চেম্বার ভাড়া লইলাম ও স্থির হইয়া বসিলাম বলিয়া বোধ হইল।

২২

ধর্ম-সংকট

আপিস লইলাম, আর এদিকে গীরগামে বাসা করিলাম। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে স্থির থাকিতে দিলেন না। বাসা করার অল্পদিন পরেই আমার মেজ ছেলের কঠিন অসুখ হইল। তাহার টাইফয়েড হইয়াছিল। তাপমাত্রা নামিত না। প্রলাপ ছিল ও সান্নিপাতও দেখা দিল। এই রোগের পূর্বে সে একবার ছেলে-বেলায় বসন্ত রোগেও খুব ভুগিয়াছিল।

ডাক্তারের পরামর্শ লইলাম। ডাক্তার বলিলেন—"ঔষধে উহার বিশেষ কিছু হইবে না। উহাকে ডিম ও মুরগির সুরুয়া দেওয়া দরকার।"

তখন মণিলালের বয়স দশ বৎসর। তাহাকে আর কি জিজ্ঞাসা করিব? তাহার অভিভাবক বলিয়া আমাকেই কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। ডাক্তার পারসী, বড় ভালমানুষ ছিলেন। আমি বলিলাম—"আমরা সম্পূর্ণ নিরামিষাশী, সুতরাং আমার পক্ষে ঐ দুটি খাদ্যের একটাও দেওয়া সম্ভব নয়। আর কিছুর কথা বলিতে পারেন?"

ডাক্তার বলিলেন—"আপনার ছেলের জীবনের আশঙ্কা আছে। দুধ আর জল মিশাইয়া দিবেন। কিন্তু উহাতে তাহার পুরা পুষ্টি হইবে না। আপনি ত জানেন আমি অনেক হিন্দু পরিবারে চিকিৎসা করিয়া থাকি। ঔষধ বলিয়া

যাহা ইচ্ছা দিই, কেউ খাইতে আপত্তি করে না। আমার মনে হয়—যদি ছেলের উপর আপনি এখন এতটা কঠিন না হ'ন তাহা হইলেই ভাল হয়।"

"আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক এবং আপনি এই রকমই বলিবেন। কিন্তু আমার দায়িত্ব বড় বেশি। ছেলে যদি বড় হইত তাহা হইলে তাহার ইচ্ছা জানার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এখন এই বালকের পক্ষে আমাকেই কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। আমার মনে হয় যে, ধর্মের পরীক্ষা এই রকম সময়েই হয়। ভাল-মন্দ জানি না, কিন্তু আমার ধর্ম-বিশ্বাস এই যে, মানুষের মাংসাদি খাইতে নাই। বাঁচিয়া থাকার চেষ্টার একটা সীমা আছে। বাঁচিয়া থাকার জন্যও আমরা কতকগুলি কাজ করিতে পারি না। আমার ও আমার নিজের লোকের জন্য, ধর্মের মর্যাদাই এমন সময়েও মাংস ইত্যাদি খাওয়া নিষেধ করিতেছে। আপনি যে প্রকার বলিলেন সে প্রকার বিপদও যদি হয়, তবে আমি নিরুপায়। কিন্তু আপনার কাছে একটি নিবেদন আছে। আপনার ব্যবস্থা অনুযায়ী ত চলিব না। এই ছেলের নাড়ীর ও বুকের অবস্থা আমার বুঝিতে পারার মত জ্ঞান নাই। তবে আমার জল-চিকিৎসা কিছু জানা আছে। আমি সেই চিকিৎসা করিব ঠিক করিতেছি। যদি আপনি মাঝে মাঝে আসিয়া মণিলালের শরীরের অবস্থা দেখেন ও আমাকে বলেন তাহা হইলে উপকৃত হইব।"

ডাক্তার আমার অসুবিধা বুঝিতে পারিলেন এবং আমার অনুরোধ অনুযায়ী মণিলালকে দেখিতে আসিতে স্বীকার করিলেন।

যদিও মণিলালের বিচার বিবেচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করা সম্ভব ছিল না, তথাপি আমি তাহাকে ডাক্তারের সঙ্গে যে কথা হইয়াছিল তাহা বলিলাম ও তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে বলিল—"তুমি জল-চিকিৎসাই কর। আমি ডিম ও সুরুয়া খাইব না।"

এই কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আমি ইহাও জানিতাম যে, যদি আমি ঐ দুটি জিনিস তাহাকে খাওয়াইতে চাহিতাম, তবে খাওয়াইতে পারিতাম।

আমি ডাঃ ক্যুনের চিকিৎসা-পদ্ধতি জানিতাম। পরীক্ষাও করিয়াছিলাম। রোগের মধ্যে উপবাসের একটা বড় প্রয়োজন আছে ইহাও বুঝিতাম। ক্যুনের নিয়মানুযায়ী তাহাকে কোমর পর্যন্ত স্নান করাইতে আরম্ভ করিলাম। তাহাকে জলের টবে তিন মিনিটের বেশি রাখিতাম না। তিন দিন কেবল কমলালেবুর রসের সঙ্গে জল মিশাইয়া খাইতে দিলাম।

জ্বরের তাপ কমে না। রাত্রে কখন কখন প্রলাপ বকে। ১০৪° ডিগ্রি

পর্যন্ত উত্তাপ উঠে। "যদি ছেলে না বাঁচে তবে লোকে কি বলিবে? দাদাই বা কি বলিবেন? অন্য ডাক্তারকে ডাকা হইল না কেন? কবিরাজ দেখানো হইল না কেন? ছেলেদের উপর নিজের খেয়াল চালাইবার বাপ-মার কি অধিকার আছে?"—এই প্রকার ভাবনা একবার হয়, আবার বিরুদ্ধ ভাবনাও আসে। "নিজের বেলা যা করিয়া থাক ছেলের বেলাও তাই কর। ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন। তোমার জল-চিকিৎসার উপর বিশ্বাস আছে, ঔষধের উপর নাই। ডাক্তার জীবন দান করিতে পারে না। তাহার পক্ষেও এই চিকিৎসা করা পরীক্ষা করাই। জীবন-সূত্র একমাত্র ঈশ্বরের হাতে আছে। ঈশ্বরের নাম লইয়া, তাঁহার উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া তুমি চল। তোমার নিজের পথ হইতে বিচ্যুত হইও না।"

মনে এইপ্রকার চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছিল। রাত্রি হইল। আমি মণিলালের পাশেই শয্যায় শুইয়াছিলাম। আমি তাহাকে ভিজা কাপড় দিয়া জড়াইয়া রাখা স্থির করিলাম এবং উঠিয়া একখানা চাদর লইয়া ঠাণ্ডাজলে ভিজাইলাম। অবশেষে চাদরখানা নিঙড়াইয়া লইয়া উহা দ্বারা মণিলালের পা হইতে গলা পর্যন্ত জড়াইলাম। তাহার উপর দুইটা পুরু কম্বল চাপা দিলাম। মাথার উপর ভিজা তোয়ালে দিলাম। গা যেন গরম লোহার মত পুড়িয়া যাইতেছিল। শরীর একেবারে শুষ্ক। ঘামমাত্রও ছিল না।

আমি খুব পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম। মণিলালের কাছে তাহার মাকে রাখিয়া আমি আধ ঘণ্টার জন্য চৌপাটিতে বেড়াইয়া হাওয়া খাইতে ও শান্তি পাওয়ার চেষ্টায় গেলাম। রাত তখন প্রায় দশটা। লোক চলাচল কমিয়া গিয়াছিল। কে যায় না যায় খেয়াল ছিল না। আমি চিন্তা-সমুদ্রে ডুবিয়াছিলাম। হে ঈশ্বর! এই ধর্ম-সংকটে তুমি আমাকে রক্ষা কর। রাম রাম মুখে বলিতেছিলাম। একটু পরেই ফিরিলাম। বুক দুর-দুর করিতেছিল। যখন ঘরে প্রবেশ করিলাম তখনই মণিলাল বলিয়া উঠিল—"বাবা, ফিরিয়াছ?"

"হাঁ বাপ।"

"কম্বল হইতে আমাকে বাহির করিয়া লও—জ্বলিয়া গেলাম যে।"

"ঘাম হইতেছে কি?"

"ঘামে ভিজিয়া গিয়াছি, আমাকে এইবার বাহির করিয়া লও বাবা।"

মণিলালের কপালে হাত দিয়া দেখিলাম। কপালে মুক্তাবিন্দুর মত ঘাম দেখা দিয়াছে। তাপ কমিতেছিল। আমি ঈশ্বরের কৃপা স্মরণ করিলাম।

"মণিলাল তোমার তাপ কমিতেছে। আর একটু ঘামিতে দাও না?"

"না বাবা, এখন আগুন হইতে আমাকে টানিয়া লও, আবার একবার না হয় দিও।"

আমার ধৈর্য আসিয়াছিল, কথা বলিয়া বলিয়া কিছু সময় কাটাইলাম। কপাল হইতে ঘাম গড়াইয়া পড়িতেছিল। আমি চাদর খুলিয়া লইলাম, শরীর পুঁছিয়া দিলাম, তারপর বাপ-বেটা একসঙ্গেই শুইয়া পড়িলাম। দুইজনেই খুব ঘুমাইলাম।

সকালে দেখিলাম—মণিলালের জ্বর অনেক কমিয়া গিয়াছে। জল দেওয়া দুধ ও ফলের উপর চল্লিশ দিন কাটিল। আমি নির্ভয় হইলাম। জ্বর অবিরাম ধরনের ছিল, কিন্তু চিকিৎসা-সাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। আজ আমার ছেলেদের মধ্যে মণিলালের শরীর সকলের অপেক্ষা মজবুত।

কে বলিবে কেমন করিয়া সে আরাম হইয়াছিল? ঈশ্বরের কৃপা, অথবা জল-চিকিৎসা, অথবা অল্পাহার ও শুশ্রূষা—কিসে আরোগ্য হইয়াছিল আজ কে তাহা বলিবে? যে যার শ্রদ্ধানুযায়ী ইহার জবাব দিবে। আমি ত জানিতাম, ঈশ্বর আমার মুখ রাখিয়াছিলেন এবং আজ পর্যন্তও তাহাই মনে করি।

২৩

দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া এসো

মণিলাল ত ভাল হইল। কিন্তু আমি দেখিলাম গীরগামের বাসাটা ভাল না। সেঁতসেঁতে ছিল, ভাল আলো আসিত না। সেইজন্য রেবাশংকর ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বোম্বাই-এর কোনও পাড়ায় খোলা জায়গায় বাংলো ভাড়া লওয়া স্থির করিলাম। বান্দরা, সান্তাক্রুজ ইত্যাদি স্থানে ঘুরিলাম। বান্দরায় কোতলখানা * ছিল বলিয়া আমাদের কাহারও পছন্দ হইল না। ঘাটকোপার ইত্যাদি স্থান সমুদ্র হইতে দূরে। সান্তাক্রুজে একটা সুন্দর বাংলো পাইলাম। সেইখানে আসিলাম এবং স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়া সুরক্ষিত হইলাম বলিয়া মনে হইল। চার্চ-গেট স্টেশনে যাওয়ার জন্য প্রথম শ্রেণীর মাসিক টিকিট করিলাম। প্রথম শ্রেণীতে অনেক সময় আমি একাই যাইতাম বলিয়া অভিমান হইত—একথা স্মরণ আছে। অনেক সময় বান্দরা হইতে চার্চ-গেট পর্যন্ত থ্রু-ট্রেনে যাওয়ার জন্য বান্দরা পর্যন্ত হাঁটিয়াই গিয়াছি।

*Slaughter house—গো-মেষাদি মানুষের আহারের জন্য হত্যা করার স্থান।

ব্যবসা যেমন চলিবে ভাবিয়াছিলাম, তার চেয়ে ভালই চলিতে লাগিল। দক্ষিণ আফ্রিকার মক্কেলেরা এখানে আমাকে কিছু কিছু কাজ দিতেন। তাহা হইতে খরচ সহজেই উঠিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইল।

হাইকোর্টের কাজ এখনো কিছু পাইতাম না। ঐ সময় 'মুট' (আলোচনা বা বিতর্ক) চলিতেছিল, আমি সেখানে যাইতাম। কিন্তু উহাতে যোগ দেওয়ার সাহস ছিল না। আমার মনে আছে, উহাতে জমিয়াৎরাম নানাভাই প্রধানতঃ যোগ দিতেন। অন্য নতুন ব্যারিস্টারেরা যেমন যায় আমি তেমনি হাইকোর্টে মামলা শুনিতে যাইতাম। সেখানে যাহা শিখিতাম তাহা অপেক্ষা বেশি উপভোগ করিতাম—মুক্ত প্রবাহিত সমুদ্রের হাওয়া, আর ঝিমানো। অন্য সঙ্গীদেরও ঝিমাইতে দেখিতাম। সেইজন্য লজ্জাও হইত না। আমি দেখিয়াছিলাম যে, ওখানে ঝিমানোটাই ফ্যাশান।

হাইকোর্টের লাইব্রেরী ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হইল। সেখানে নতুন নতুন লোকেদের সহিত পরিচয় হইতে লাগিল। আমার মনে হইল অল্পদিনের মধ্যেই আমি হাইকোর্টে কাজ করিতে পারিব। এই ভাবে এই দিক হইতে আমার ব্যবসা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম।

অন্য দিকে গোখলের চক্ষু আমার উপর নিয়তই ছিল। তিনি সপ্তাহে দুই তিনবার আমার চেম্বারে আসেন এবং আমার খবরাখবর নেন। নিজের বিশেষ বন্ধুদের কখন কখন সঙ্গে লইয়া আসেন। তাঁহার কার্য-পদ্ধতির সঙ্গে আমাকে পরিচিত করেন। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই ঈশ্বর স্থির রাখিতে দেন নাই বলা যায়। যখন আমি ধীরে-সুস্থে বসিয়া যাওয়া স্থির করিয়াছি ও কতকটা স্বস্তি পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, তখনই দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে তার আসিল—"চেম্বারলেন এখানে আসিতেছেন, আপনার আসা চাই।" আমি তার করিলাম—"আমার যাওয়ার খরচ পাঠাইবেন, যাইতে প্রস্তুত আছি।"

আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, এক বছরের মধ্যেই ফিরিয়া আসিতে পারিব। তাই সান্তাক্রুজের বাড়িটা রাখা ও সেখানে ছেলেপিলেদের থাকাই ভাল মনে করিলাম।

আমি তখন ভাবিতাম যে, যেসব যুবক দেশে রোজগার করিতে পারে না অথচ এদিকে সাহস আছে, তাহাদের পক্ষে দেশের বাহিরে যাওয়াই ভাল। সেইজন্য আমার সঙ্গে চার-পাঁচজনকে লইয়া গেলাম। তাঁহাদের মধ্যে মগনলাল গান্ধীও ছিলেন।

গান্ধী পরিবারটা বড়—আজও বড়ই আছে। আমার এই মত ছিল যে, আলাদা হইয়া যে থাকিতে চায় তাহার স্বতন্ত্র হইয়া থাকাই ভাল। আমার পিতা অনেকের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে রাজবাড়ির চাকরিতে। আমি কিন্তু মনে করিতাম, যদি কেউ এই চাকরি হইতে বাহির হইয়া আসে তবে তাহাই ভাল। আমার অবশ্য তাহাদের চাকরি পাইতে কোন সাহায্য করার সামর্থ্য ছিল না। শক্তি যদি থাকিত তবুও ইচ্ছা করিতাম না। আর সেই জন্যই যদি কেউ স্বাবলম্বী হয় তবে তাহা ভাল বলিয়াই মনে হইত।

তারপর আমার আদর্শ যখন উচ্চতর হইয়াছিল (আমি উচ্চতর বলিয়াই মনে করি) তখন আবার সেই যুবকদের আমার আদর্শের দিকে টানিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে মগনলাল গান্ধীকেই ইচ্ছামত পরিচালনা করিতে গিয়া সর্বাপেক্ষা বেশি সাফল্য পাইয়াছিলাম। কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনা ভবিষ্যতে করিব।

ছেলেপিলেদের সঙ্গে বিচ্ছেদ, বাঁধা ঘর ভাঙ্গা, নিশ্চিত অবস্থা হইতে অনিশ্চিতে প্রবেশ—এ সকল মুহূর্তের জন্য ব্যথিত করিয়াছিল। কিন্তু আমি ত অনিশ্চিতের মধ্যে জীবন যাপন করিতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই জগতে ঈশ্বর, অর্থাৎ সত্য ছাড়া আর কিছুই যখন নিশ্চয় নয়, তখন অন্য নিশ্চয়তার দিকে দৃষ্টি দেওয়াই অন্যায়। আমাদের আশেপাশে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি, যাহা কিছু ঘটিতেছে, এ সকলই অনিশ্চিত, সকলই ক্ষণিক। তাহারই ভিতরে এক পরমতত্ত্ব নিশ্চিত রূপ লইয়া অদৃশ্য রহিয়াছে। যদি তাহার ক্ষণিক দর্শনও পাওয়া যায়, যদি তাহার উপর শ্রদ্ধা রাখা যায়, তবেই জীবন সার্থক হয়। তাহারই অনুসন্ধান পরম পুরুষার্থ।

আমি ডারবানে একদিনও আগে পৌঁছিয়াছিলাম বলা যায় না। মিঃ চেম্বারলেনের কাছে ডেপুটেশন যাওয়ার তারিখ পর্যন্ত স্থির হইয়াছিল। আর ইহাও স্থির হইয়াছিল যে, তাঁহার কাছে পড়ার জন্য আরজি আমাকেই লিখিতে হইবে এবং আমাকে ডেপুটেশনের সঙ্গেও যাইতে হইবে।

চতুর্থ ভাগ

১

বিপুল শ্রম কি পণ্ড হইল

মিস্টার চেম্বারলেন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড অর্থ (সাড়ে বাহান্ন কোটি টাকা) লইতে আসিয়াছিলেন। আর ইংরেজদের এবং সম্ভব হয়ত বোয়ারদের মন হরণ করিতে আসিয়াছিলেন। এইজন্য ভারতীয় প্রতিনিধিরা যে জবাব পাইয়াছিলেন, তাহাতে আন্তরিকতার আভাস ছিল না। তিনি বলিলেন—"আপনারা ত জানেন যে, দায়িত্বশালী সংস্থার উপর ইম্পিরিয়াল গভর্নমেণ্টের নামমাত্রই হাত আছে। আপনাদের অভিযোগ সত্য বলিয়াই মনে হয়। আমার দ্বারা যাহা সম্ভব তাহা আমি করিব। কিন্তু আপনারা যতটা পারেন এখানকার শ্বেতাঙ্গদের সুনজরে থাকিবার চেষ্টা করিবেন।"

প্রতিনিধিরা জবাব শুনিয়া দমিয়া গেলেন। আমিও হতাশ হইলাম। আমি বুঝিলাম, আবার নতুন করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। সঙ্গীদিগকেও সে কথা বুঝাইলাম।

প্রকৃতপক্ষে চেম্বারলেনের জবাব মন্দ ছিল না। গোলমেলে কথা না বলিয়া তিনি সোজা কথাই বলিয়াছিলেন। মিষ্টি কথায় তিনি আমাদিগকে সমঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, "তোমার আমার মধ্যে তরবারির সম্পর্ক।"

কিন্তু আমাদের কাছে তলোয়ার কোথায়? আমাদের কাছে তলোয়ারের আঘাত সহ্য করার মত দেহ থাকে ত তাহাই ভাগ্য বলিয়া মানিব।

মিঃ চেম্বারলেনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ থাকার কথা। দক্ষিণ আফ্রিকা ত একটা ছোট প্রদেশ নয়। ইহাকে একটা দেশ—এমনকি একটা মহাদেশও বলা যায়। অনেকগুলি দেশ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। যদি কন্যাকুমারী হইতে শ্রীনগর ১৯০০ মাইল হয়, তবে ডারবান হইতে কেপ্‌টাউন ১১০০ মাইলের কম নয়। এই মহাদেশ মিঃ চেম্বারলেনকে ঘূর্ণি বেগে ঘুরিতে হইবে। তিনি ট্রান্সভাল রওনা হইলেন। আমাকে এখন মোকদ্দমা তৈরি করিয়া দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু প্রেটোরিয়ায় কেমন করিয়া পৌছিব? আমার সেখানে সময়মত পৌছিতে হইলে যে পাস (Permit) আবশ্যক, তাহা নিজেদের লোক দিয়া পাওয়ার উপায় ছিল না।

যুদ্ধের পরে ট্রান্সভাল যেন উজাড় হইয়া গিয়াছিল। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার জিনিস ছিল না, পরার কাপড় ছিল না, খালি ও তালাবন্ধ দোকানগুলি তখনও ভর্তি হইতে এবং খুলিতে বাকি ছিল। এ কাজ ধীরে ধীরে চলিতেছিল। যেমন যেমন দোকানগুলি ভরিয়া উঠিতেছিল, সেই সেই মত যাহারা ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহাদের ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দেওয়া হইতেছিল। এজন্য প্রত্যেক ট্রান্সভালবাসীকেই পাস লইতে হইল। শ্বেতাঙ্গদের চাওয়া মাত্রই পাস মিলিত। ভারতীয়দেরই হইল মুশকিল।

লড়াইয়ের জন্য ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে অনেক আমলা ও সিপাহী দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা সেখানে বসবাস করিতে চায়, তাহাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্ট অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। একটা নতুন বিভাগ (ডিপার্টমেণ্ট) সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যও তাহাই। গভর্নমেণ্টের এই ইচ্ছা কর্মচারীরা সহজেই মানিয়া লইলেন। কর্মচারীরা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বশতঃ এক নতুন বিভাগও সৃষ্টি করিলেন—এই বিষয়ে তাঁহাদের যোগ্যতাও ছিল যথেষ্ট। যদি নিগ্রোদের জন্য ভিন্ন বিভাগ থাকে, তবে ভারতবাসীর জন্যই বা তাহা থাকিবে না কেন ? যুক্তিটি ঠিক বলিয়া গণ্য হইল। তাই আমি পৌছিবার পূর্বেই এই নতুন বিভাগ খোলা হইয়াছিল ও ধীরে ধীরে তাহা নিজের জালও বিস্তার করিতেছিল। যাহারা ফিরিতেছিল ইচ্ছা করিলে পূর্বের কর্মচারীই তাহাদের সকলকে পাস দিতে পারিতেন। কিন্তু এশিয়াবাসীদের জন্য তাঁহার গরজ কি ? যদি নতুন বিভাগের অনুমোদনে এই পাস দেওয়া হয়, তবে এই কর্মচারীর ঝুঁকিও কমে। কাজের বোঝাও কমে, ইহাই ছিল নতুন বিভাগ খোলার যুক্তি। আসলে কথাটা এই যে, নতুন বিভাগের কাজের আবশ্যক ছিল আর কর্মচারীদেরও টাকার আবশ্যক ছিল। যদি কাজ না থাকে, তবে নতুন বিভাগের আবশ্যকতা থাকে না এবং অবশেষে উহা উঠাইয়াও দিতে হয়। এইজন্যই এ কাজ তাঁহারা জোটাইয়া লইয়াছিলেন।

এই নতুন বিভাগে ভারতবাসীদিগকে দরখাস্ত করিতে হয়, আর জবাব পাইতে অনেক দিন চলিয়া যায়। এই জন্য ট্রান্সভাল যাইতে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদের জন্য অনেক দালাল জুটিয়া গেল। এই দালাল ও কর্মচারীরা মিলিয়া গরিব ভারতবাসীদের হাজার হাজার টাকা লুট করিয়াছে। আমাকে বলা হইয়াছিল যে, খাতির না থাকিলে পাসের হুকুম পাওয়া যায় না। খাতির

থাকা সত্ত্বেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে শত শত পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইয়াছে।

আমি আমার পুরাতন বন্ধু, ডারবানের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে গিয়া বলিলাম—"আপনি পাস দেওয়ার কর্মচারীর সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিন, এবং আমাকে পাস পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিন। আমি যে ট্রান্সভালে ছিলাম তাহা ত আপনি জানেন।" তিনি তখনই মাথায় টুপি দিয়া আমার সঙ্গে আসিলেন ও আমার পাস-এর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমার যাওয়ার ট্রেন ছাড়ার মাত্র এক ঘণ্টা বাকি ছিল। আমি মাল-পত্র গোছাইয়া রাখিয়াছিলাম। এই উপকারের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডারকে ধন্যবাদ দিয়া আমি প্রিটোরিয়া যাওয়ার জন্য রওনা হইলাম।

অসুবিধার ভিতর দিয়াও আমি ঠিক মত আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। আরজি পেশ করিলাম। ডারবানে ভারতবাসীদের তাঁদের প্রতিনিধিদের নাম পূর্বেই পেশ করিতে হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল—একথা মনে পড়ে না। কিন্তু এখানে নতুন বিভাগ চালু হইয়াছিল। তাঁহারা প্রতিনিধির নাম প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রিটোরিয়ার ভারতবাসীরা খবর পাইয়াছিলেন যে, কর্তৃপক্ষ আমাকে প্রতিনিধিদের ভিতর স্থান দিতে রাজী নন।

এই দুঃখদায়ক অথচ রহস্যময় কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

২

এশিয়ার আমদানি আমলাতন্ত্রী ব্যবস্থা

নতুন বিভাগের কর্মচারীরা বুঝিতেই পারিলেন না যে, আমি কেমন করিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়াছি। তাঁহাদের কাছে যে সকল ভারতবাসী যাতায়াত করে, তাহাদিগকে তাঁহারা কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। কিন্তু সে বেচারারাই বা কি জানে? কর্মচারীরা অনুমান করিল যে, আমি পূর্বের পরিচয়ের খাতিরে, পাস না লইয়াই প্রবেশ করিয়াছি। তাহা যদি হইয়া থাকে তবে তাহারা আমাকে কয়েদ দিতে পারিবে।

বড় একটা যুদ্ধ হইয়া গেলে সাধারণতঃ রাজকর্মচারীদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা কিছুকালের জন্য দেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তাহাই হইয়াছিল। শান্তিরক্ষার জন্য এক আইন পাস হইয়াছিল। তাহার এক শর্ত ছিল যে, যদি

কেউ বিনা পাসে ট্রান্সভালে প্রবেশ করে তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেল দেওয়া যায়। এই শর্ত অনুসারে আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পরামর্শ হইল। কিন্তু আমার কাছে পাস দেখিতে চাওয়ার সাহস কাহারও হইল না।

কর্মচারীরা ডারবানে তার পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা যখন তারের জবাবে জানিলেন যে আমি পাস লইয়াই আসিয়াছি, তখন তাঁহারা নিরাশ হইলেন। কিন্তু এই নিরাশায় তাঁহারা পরাজয় স্বীকার করার লোক নন। আমি আসিয়া পড়িয়াছি ঠিক, কিন্তু মিঃ চেম্বারলেনের কাছে আমাকে যাইতে দেওয়া-না-দেওয়ার উপায় তাঁহাদের হাতেই আছে।

তাঁহারা প্রথমে প্রতিনিধিদের নাম লইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বর্ণবিদ্বেষ ত যেখানে সেখানে ছিলই। কিন্তু এখন ভারতবর্ষের ন্যায় নোংরা ও প্রচ্ছন্ন ব্যবহারের দুর্গন্ধও পাইতে লাগিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণ বিভাগ প্রজার কল্যাণের জন্যই। সেইজন্য সেখানে কর্মচারীদের মধ্যে একপ্রকার সরলতা ও নম্রতা দেখা যায়। ইহার সুফল কালো চামড়ার লোকেরাও অল্পবিস্তর পাইত। এখন ইহার মধ্যে এশিয়াসুলভ আবহাওয়া প্রবেশ করায় (এশিয়া হইতে আগত কর্মচারীদের জন্য) সেখানেও এশিয়ার মতই জো-হুকুমী, তেমনি চক্রান্ত প্রভৃতি নোংরামিও প্রবেশ করিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় খানিকটা প্রজার অধিকার বর্তমান ছিল। এইবার সেখানে এশিয়া হইতে আমলাতন্ত্রের নবাবশাহী আসিয়া উপস্থিত হইল। এশিয়াতে ত প্রজার অধিকার নাই-ই, বরঞ্চ প্রজার উপর অধিকার আছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে শ্বেতাঙ্গরা ঘর তৈরী করিয়া বাস করিতেছিল। এই জন্য তাহারা সেখানকার প্রজা ছিল এবং বিভাগীয় কর্মচারীদের উপর তাহাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিও ছিল। এই অবস্থায় এশিয়া হইতে অবাধ আমলাতন্ত্রের আমদানি করা হয়। ফলে ভারতীয়দের অবস্থা জাঁতির মধ্যে সুপারির মত হইল।

আমাকেও এই আমলাতন্ত্রী অধিকারের ভাল রকম পরিচয় পাইতে হইয়াছিল। প্রথমে আমার উপর এই বিভাগের কর্তার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার তলব আসিল। কর্তাটি সিংহল হইতে আসিয়াছিলেন। 'তলব আসিল' বলায় অতিশয়োক্তি মনে হইতে পারে। সেইজন্য আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। আমাকে কোনও পত্র দেওয়া হয় নাই। ভারতীয় নেতাদের মাঝে মাঝে এশিয়া সম্পর্কিত কর্মচারীদের কাছে যাইতে হইত। এই নেতাদের মধ্যে পরলোকগত শেঠ তৈয়ব হাজী খানমহম্মদও একজন ছিলেন। তাঁহাকে ঐ

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"গান্ধী কে? সে কেন আসিয়াছে?"

তৈয়ব শেঠ জবাব দিলেন—"তিনি আমাদের পরামর্শ-দাতা, তাঁহাকে আমরা ডাকিয়া আনিয়াছি।"

সাহেব বলিলেন—"আমরা সকলে এখানে তবে কি করিতে আছি? আমরা কি তোমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারি না? গান্ধীর এখানে কোন্ দরকারটা আছে?"

তৈয়ব শেঠ যথাশক্তি এই আঘাতের উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন—"আপনারা ত আছেনই। কিন্তু গান্ধী কি আমাদেরই একজন নন? তিনি আমাদের ভাষা জানেন, তিনি আমাদিগকে বুঝিতে পারেন। আপনারা ত চাকুরে (আমলা)।"

সাহেব হুকুম করিলেন—"গান্ধীকে আমার কাছে লইয়া আসিও।"

তৈয়ব শেঠ ইত্যাদির সঙ্গে আমি গেলাম। চেয়ার আর কোথা হইতে জুটিবে? আমাদের সকলকেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

সাহেব আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"ভাল, আপনি এখানে কি কাজে আসিয়াছেন?"

আমি জবাব দিলাম—"আমার ভাইয়েরা আমাকে ডাকিয়াছে বলিয়া আমি পরামর্শ দিতে আসিয়াছি।"

"কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, আপনার এখানে আসার অধিকার নাই? আপনি যে পাস পাইয়াছেন তাহা ভুল করিয়া আপনাকে দেওয়া হইয়াছে। আপনাকে এখানকার বাসিন্দা বলিয়া ধরা যায় না। আপনাকে ত ফিরিয়া যাইতেই হইবে। আপনার মিঃ চেম্বারলেনের কাছেও যাওয়া হইবে না। এখানকার ভারতবাসীদের দেখাশোনা করার ভার আমার বিভাগের উপরই দেওয়া আছে। এখন যাইতে পারেন।"

এই কথা বলিয়া সাহেব আমাকে বিদায় করিলেন, আমাকে জবাব দেওয়ার অবকাশও দিলেন না।

কিন্তু আমার অন্য সঙ্গীদিগকে তিনি আটকাইলেন। ধমকাইয়া পরামর্শ দিলেন—আমাকে যেন ট্রান্সভাল হইতে বিদায় করা হয়। একটা নতুন, কঠিন ও অপ্রত্যাশিত অবস্থা আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

৩

তেতো ঢোক গেলা

এই অপমানে আমার বড় দুঃখ হইল। কিন্তু পূর্বে যেমন করিয়া অপমান সহ্য করিয়াছি, তেমনি করিয়া শক্ত হইয়া রহিলাম। এই অপমান গ্রাহ্য না করিয়া উহাতে উদাসীন থাকিয়া যাহা আমার কর্তব্য মনে হয় তাহাই করিব বলিয়া স্থির করিলাম।

পূর্বোক্ত কর্মচারীর স্বাক্ষরসহ একটি চিঠি আসিল। তাহাতে লেখা ছিল যে, মিঃ চেম্বারলেন ডারবানে মিঃ গান্ধীর সহিত দেখা করিয়াছেন। সেই হেতু এখন তাঁহার নাম প্রতিনিধি-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

সঙ্গীদের কাছে এই পত্র অসহ্য মনে হইল। তাঁহারা ডেপুটেশন লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাহার করারই পরামর্শ দিলেন। আমি তাঁহাদিগকে আমাদের সম্প্রদায়ের বিশ্রি অবস্থার কথা বুঝাইয়া দিলাম। বলিলাম, যদি আপনারা মিঃ চেম্বারলেনের কাছে না যান, তবে এখানে কোনও অসুবিধা নাই—এই রকমই বোঝা যাইবে। সুতরাং যা বলার আছে তাহা লিখিয়া দিতেই হইবে, আর সে লেখাও তৈরি হইয়াছে। এখন আমিই পড়ি, কি আর কেউ পড়ে—তাহাতে কি আসে যায়? মিঃ চেম্বারলেন ত আর আলোচনা করিবেন না! আমার যে অপমান হইয়াছে তাহা আপনাদের হজম করিতে হইবে।

আমার বলা শেষ হইতে না হইতেই তৈয়ব শেঠ বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু আপনার অপমানে সম্প্রদায়েরই অপমান ত? আপনি আমাদেরই প্রতিনিধি, ইহা কেমন করিয়া ভুলিব?"

আমি বলিলাম—"সে কথা ঠিক। কিন্তু সম্প্রদায়কেও এই অপমান হজম করিতে হইবে। আমাদের কাছে আর দ্বিতীয় কোনো উপায় আছে কি?"

তৈয়ব শেঠ বলিলেন—"যাহা হওয়ার হইবে। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া নতুন অপমান কেন সহ্য করিব? খারাপ ত আমাদের হইয়াই আছে, আমাদের কি অধিকারই বা আছে?"

এই তেজস্বিতা আমার কাছে ভাল লাগিল। কিন্তু তাহা ব্যবহার করা যায় না ইহাও আমি জানিতাম। সম্প্রদায়ের অসমর্থতার অনুভব আমার ছিল। সেইজন্য আমি সঙ্গীদের আমার পরিবর্তে পরলোকগত ভারতীয় ব্যারিস্টার জর্জ গডফ্রেকে লইয়া যাইতে পরামর্শ দিলাম।

মিঃ গডফ্রে ডেপুটেশনের নায়ক হইলেন। আমার সম্বন্ধেও মিঃ চেম্বারলেন কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। "একই লোকের কথা পুনরায় শোনা অপেক্ষা নতুন লোকের কথা শোনা খুবই ভাল"—ইত্যাদি বলিয়া তিনি ক্ষত আরোগ্যের চেষ্টা করিয়াছিল।

কিন্তু ইহাতে সম্প্রদায়ের এবং আমার কাজ বাড়িল, শেষ হইল না। গোড়া হইতে পুনরায় আরম্ভ করিতে হইল। "আপনার কথাতেই আমাদের সম্প্রদায় লড়াইএ অংশ লইয়াছিল। কিন্তু পরিণাম ত এই হইল।"—কেউ কেউ এই প্রকার উপহাসের বাণও আমার উপরে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু উপহাসে আমার কিছু হইল না। আমি বলিলাম—"আমি যে পরামর্শ দিয়াছিলাম সে জন্য আমার অনুতাপ নাই। যুদ্ধে অংশ লইয়া যে আমরা ঠিকই করিয়াছি, ইহা এখনো আমি মানি। আমরা ঐ কাজ করিয়া নিজেদের কর্তব্য পালন করিয়াছি, তাহার ফল আপাতদৃষ্টিতে না হয় না-ই পাইলাম। কিন্তু শুভ কার্যের ফল যে শুভ, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গত ঘটনার বিচার করা অপেক্ষা এখন আমাদের কি কর্তব্য, তাহা বিচার করাই ভাল—একথা আপনারা ভাবিয়া দেখিবেন।"

কথাটা অপর সকলে মানিয়া লইলেন।

আমি বলিলাম—"ঠিক ভাবে দেখিতে গেলে যে কাজের জন্য আমাকে আনিয়াছিলেন তাহা শেষ হইয়াছে, বলা যায়। সুতরাং আপনারা হয়তো আমাকে ফিরিবার নির্দেশ দিবেন। কিন্তু আমার দ্বারা যাহা করা সম্ভব তাহা করার জন্যই আমার পক্ষে এখনও ট্রান্সভাল পরিত্যাগ করা সঙ্গত হইবে না বলিয়াই আমি মনে করি। এখন আর 'নাতাল' হইতে নয়, পরন্তু এই স্থান হইতেই কাজ চালানো দরকার। এক বৎসরের মধ্যে দেশে না ফিরিবার সংকল্প ত করিতেই হইবে। তাহা ছাড়া এইখানেই আমার ওকালতির সনদও লওয়া চাই। এই নতুন বিভাগের সহিত বোঝাপড়া করার শক্তি আমার আছে। যদি বোঝাপড়া না করা হয়, তবে ভারতীয় সম্প্রদায় ত লুণ্ঠিত হইবেই, এ সম্প্রদায়কে এই স্থান হইতে বহিষ্কৃতও হইতে হইবে। সম্প্রদায়ের প্রতি হীন ব্যবহারও প্রতিদিনই বাড়িতে থাকিবে। মিঃ চেম্বারলেন আমার সহিত দেখা করিলেন না, সরকারী কর্মচারীটি আমার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। এ সমস্ত অপমানকর সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্প্রদায়ের যে অপমান ভবিষ্যতের গর্ভে জমা আছে, তাহার তুলনায় এ সকল কিছুই নয়।

এস্থানে কুকুরের মত থাকিতে হইবে ইহা সহ্য করা যায় না।"

এইরূপে আমি কাজ আরম্ভ করিলাম। প্রিটোরিয়া ও জোহানেসবর্গবাসী ভারতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অবশেষে জোহানেসবর্গে আপিস করিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম।

ট্রান্সভালে আমার ওকালতির সনদ পাওয়ার সম্বন্ধে আশঙ্কা অবশ্যই ছিল। কিন্তু উকিল-মণ্ডল হইতে আমার আরজির বিরুদ্ধতা না হওয়ায় বড় আদালত আমার আরজি মঞ্জুর করিলেন।

ভারতীয়দের উপযুক্ত স্থানে আপিস পাওয়া মুশকিল ছিল। মিঃ রীচের সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় ছিল। সেই সময় তিনি সেখানে একজন ব্যবসাদার ছিলেন। তাঁহার পরিচিত বাড়ি-সংগ্রাহকের মারফতে আমি ভাল জায়গায় আপিস-বাড়ি পাইলাম ও ওকালতি আরম্ভ করিয়া দিলাম।

৪

ক্রমবর্ধমান ত্যাগ-বৃত্তি

ট্রান্সভালে ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রাপ্য অধিকারের জন্য কিরকম ভাবে লড়িতে হইয়াছিল, এবং এশিয়া সম্পর্কিত বিভাগের কর্মচারীর সঙ্গে কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, সে কথা বর্ণনার পূর্বে আমার জীবনের অন্য দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যকতা আছে।

আজ পর্যন্ত আমি দুই রকম সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছি—পরমার্থ ও স্বার্থ। আমার পরমার্থের সঙ্গে স্বার্থের মিশ্রণ ছিল।

বোম্বাইয়ে যখন আপিস খুলিয়াছিলাম, তখন একজন জীবনবীমার দালাল আসিতেন। তাঁহার চেহারা সুন্দর ছিল। তাঁহার কথা মিষ্ট ছিল। ইনি পুরাতন বন্ধুর মতই আমার সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। বলিতেন—"আমেরিকাতে ত তোমার অবস্থায় সকল মানুষই নিজের জীবনের বীমা করে। তোমারও তেমনি করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সমস্ত স্থির করিয়া রাখা দরকার। জীবনের ভরসা ত কিছুই নাই। আমেরিকাতে আমরা বীমা করা ধর্ম বলিয়াই গণ্য করি। একটা ছোট রকমের পলিসি করার ইচ্ছাও কি আমি তোমার ভিতরে জাগাইতে পারিব না?"

এ পর্যন্ত কি দক্ষিণ আফ্রিকাতে, কি ভারতবর্ষে, কোথাও কোনও

দালালের কথাই আমি গ্রাহ্য করি নাই। আমার মনে হইত, বীমা করায় কতকটা ভীরুতা ও ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস আছে। কিন্তু এইবার আমি লালসায় পড়িলাম। সেই দালাল যখন কথা বলিতে থাকিত তখন আমার চোখের সামনে স্ত্রী ও ছেলেদের চেহারা ভাসিয়া উঠিত। নিজেকে বলিতাম—"তুমি ত নিজের স্ত্রীর গহনা প্রায় সমস্তটাই বেচিয়া ফেলিয়াছ। যদি তোমার কিছু হয়, তবে তার ও ছেলেদের পালন করার ভার ত সেই গরিব ভাইয়ের উপরেই ফেলিবে, যে ভাই নিজের মহত্ত্বশতঃ পিতার স্থান লইয়াছেন। কিন্তু কাজটা ত ঠিক হইবে না।" এই ধরনে নিজের মনের সঙ্গে যুক্তি করিয়া আমি দশ হাজার টাকার পলিসি করিলাম।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার বসবাসের সঙ্গে আমার মতও পরিবর্তিত হইল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিপদকালে আমি যে যে পথ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা ঈশ্বর সাক্ষী রাখিয়াই। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে কতদিন কাটিবে, সে বিষয়ে আমার কোনও ধারণা ছিল না। আমার এই মনে হইল যে, আমি আর ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে পারিব না। সুতরাং আমার পরিবারকে সঙ্গেই রাখা দরকার। তাহাদের ভরণ-পোষণও দক্ষিণ আফ্রিকা হইতেই হওয়া চাই। তাহাদের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা আর এখন উচিত হইবে না। এইরূপ বিচার করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই জীবনবীমা পলিসি আমার কাছে দুঃখদায়ক হইয়া উঠিল। বীমা-দালালের ফাঁদে পড়িয়াছিলাম বলিয়া আমার লজ্জা হইল। "দাদা যদি পিতৃতুল্য হয়, তবে ছোট ভাইয়ের বিধবাকে ভার বলিয়া গণ্য করিবে এ কেমন কথা? পালন-কর্তা তুমিও নও, ভাইও নন, পালন-কর্তা ঈশ্বর। বীমা করাইয়া তুমি তোমার পুত্রদের পরাধীন করিয়াছ। তাহারা কেন স্বাবলম্বী হইবে না? অসংখ্য দরিদ্রের ছেলেপিলের কি অবস্থা হয়? তুমি নিজেকে তাহাদেরই একজন বলিয়া কেন গণ্য করিবে না?"

এইপ্রকার চিন্তাধারা চলিতে লাগিল। কিন্তু তখনকার মত সে চিন্তাকে গুরুত্ব দিলাম না। এবারকার দেয় বীমার টাকা দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে দিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ আছে।

কিন্তু এই চিন্তার প্রবাহে বাহির হইতেও উত্তেজনা পাইলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথমবার ভ্রমণকালে আমি খ্রীষ্টীয় প্রভাবে আসিয়া ধর্ম সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলাম। এইবারে থিয়োসফিস্টদের প্রভাবে আসিলাম। মিঃ রীচ থিয়োসফিস্ট ছিলেন। তিনি আমাকে জোহানেসবর্গ সোসাইটির সহিত

সম্বন্ধ-যুক্ত করিলেন। আমি তাহার সভ্য অবশ্য হইলাম না। আমার মতভেদ ছিল। তাহা হইলেও থিয়োসফিস্টদিগের প্রত্যেক গূঢ় প্রসঙ্গে আমি ছিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিদিন ধর্ম-চর্চা করিতাম। তাঁহারা পুস্তক পাঠ করিতেন। তাঁহাদের মণ্ডলেও আমাকে কিছু বলিতে হইত। থিয়োসফিতে ভ্রাতৃ-ভাব বিকশিত করা ও সম্প্রসারিত করাই মুখ্য বস্তু ছিল। এই বিষয়ে আমি খুব চর্চা করিতাম এবং যখন একমতাবলম্বী সভ্যদের মধ্যে আচরণের প্রভেদ হইত দেখিতাম, তখন তাহার সমালোচনাও করিতাম। এই সমালোচনার প্রভাব আমার উপর ভাল রকমই হইয়াছিল। আমি আত্ম-নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

৫

আত্ম-নিরীক্ষণের পরিণাম

১৮৯৩ সালে আমি খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাই। তখন আমি কেবল জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থী ছিলাম। খ্রীষ্টান বন্ধুগণ আমাকে বাইবেল শুনাইতেন, বুঝাইতেন এবং যাহাতে উহা আমি গ্রহণ করি তাহার চেষ্টা করিতেন। আমি নম্রভাবে ও নির্বিকার ভাবে তাঁহাদের শিক্ষা শুনিতাম ও বুঝিতাম। এই অবস্থায় আমি যথাশক্তি হিন্দু-ধর্ম অভ্যাস করিতে ও অপর ধর্ম বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। ১৯০৩ সালে এই স্থিতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইল। থিয়োসফিস্ট বন্ধুগণ অবশ্য আমাকে তাঁহাদের সমিতিতে টানিতে ইচ্ছা করিতেন, কিন্তু সে কেবল হিন্দু হিসাবে আমার কাছ হইতে কিছু পাওয়ার জন্য। থিয়োসফিস্টদের বইতে হিন্দু-ধর্মের ছায়া ও তাহার প্রভাব খুবই ছিল। সেই হেতু এই ভাইয়েরা মনে করিতেন যে, আমি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিব। আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছিলাম যে আমার সংস্কৃত জ্ঞান সামান্য মাত্র। আমি হিন্দুদের প্রাচীন ধর্ম-গ্রন্থ সংস্কৃতে পড়ি নাই, অনুবাদ হইতেও আমার পড়া খুবই কম। তাহা হইলেও তাঁহারা সংস্কার ও পুনর্জন্ম মানিতেন বলিয়া আমার কাছে অল্পস্বল্প সাহায্য পাওয়া যাইবে—এইরকম মনে করিতেন। আমি 'বৃক্ষশূন্য দেশে এরণ্ড বৃক্ষের' ন্যায় হইলাম। কাহারও সঙ্গে বিবেকানন্দের রাজযোগ, কাহারও সঙ্গে মতিলাল নভু ভাইয়ের রাজযোগ, পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এক বন্ধুর সঙ্গে পাতঞ্জল যোগ-দর্শন পড়িতাম। অনেকের সঙ্গেই গীতা পাঠ আরম্ভ হইল। 'জিজ্ঞাসু-মণ্ডল' নামে একটি ছোট রকমের সমিতি গঠন

করিলাম। নিয়মিতভাবে পড়াশোনা আরম্ভ হইল। গীতার উপর আমার প্রেম ও শ্রদ্ধা পূর্ব হইতেই ছিল। এখন গভীরভাবে প্রবেশ করার আবশ্যকতা দেখিলাম। আমার কাছে গীতার দুই-একখানা অনুবাদ ছিল। উহার সাহায্যে মূল সংস্কৃত বুঝিবার চেষ্টা করিলাম এবং প্রত্যহ একটি অথবা দুইটি শ্লোক মুখস্থ করিতে লাগিলাম।

প্রাতঃকালে দাঁতন করার ও স্নান করার সময়টা এই শ্লোক মুখস্থ করার জন্য ব্যবহার করিতাম। দাঁতনে পনের মিনিট ও স্নানে বিশ মিনিট লাগিত। ইংরেজী রীতিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাঁতন করিতাম। সামনের দেওয়ালে গীতার শ্লোক লিখিয়া আটকাইয়া দিতাম ও আবশ্যকমত দেখিতাম ও মুখস্থ করিতাম। মুখস্থ করা শ্লোক পরে স্নানের সময় পাকা হইয়া যাইত। ইহার মধ্যে পূর্বেকার শ্লোকগুলি প্রত্যহই একবার করিয়া স্মরণ করিয়া লইতাম। (এমনি করিয়া তের অধ্যায় পর্যন্ত মুখস্থ করিয়াছিলাম বলিয়া মনে আছে।) কিন্তু অন্যান্য কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্লোক মুখস্থের কাজে বাধা পড়িল। তারপর যখন সত্যাগ্রহের জন্ম হইল, তখন সেই শিশুর লালনপালনের জন্যই আমার সমস্ত বিচার-বিবেচনার সময় কাটিতে লাগিল। আর তাহা আজও কাটিতেছে— এ কথা বলা যায়।

এই গীতাপাঠের প্রভাব আমার সহাধ্যায়ীদের উপর কি রকম হইয়াছিল তাঁহারাই তাহা জানেন। আমার পক্ষে ত পুস্তকখানি আচার-আচরণের এক মহান পথ-প্রদর্শক হইয়া উঠিল। ঐ পুস্তকখানি আমার ধর্মসম্বন্ধীয় বিশ্বকোষ-গ্রন্থ বা অভিধানের মত হইয়া উঠে। অজানা ইংরেজী শব্দের অর্থের জন্য আমি যেমন ইংরেজী শব্দকোষ দেখিয়া থাকি, তেমনি আচরণে কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে, গীতা হইতেই তাহা পরিষ্কার ও সহজ করিয়া লইতাম।

অপরিগ্রহ, সমভাব প্রভৃতি শব্দ আমাকে পাইয়া বসিল। সমভাব কেমন করিয়া বিকশিত হয়, কেমন করিয়া তাহার প্রকাশ ঘটে? অপমানকারী কর্মচারী, ঘুষ-গ্রহণকারী কর্মচারী, মিছামিছি বিরোধকারী, বিগত দিনের সঙ্গী এবং যাঁরা অনেক উপকার করিয়াছেন, এই রকম সজ্জনের মধ্যে প্রভেদ নাই— এ কি রকম? অপরিগ্রহ কেমন করিয়া পালন করা যায়! দেহ যে আছে ইহাও কি কম পরিগ্রহ? স্ত্রী-পুত্রাদি যদি পরিগ্রহ নহে—তবে কি? বইর আলমারিগুলি কি খালি করিয়া ফেলিব? ঘর খালি করিয়া ফেলিয়া ও সম্পদ ত্যাগ করিয়া কি তীর্থ-ধর্ম করিব? তৎক্ষণাৎ জবাব পাইলাম, ঘর খালি না

করিলে তীর্থধর্ম হয় না। ইংলিশ আইন আমার সাহায্য করিল। স্নেলের আইনের সিদ্ধান্ত স্মরণে আসিল। 'ট্রাস্টী', 'ন্যাসরক্ষক' বা 'অছি' শব্দের অর্থ গীতাপাঠের ফলেই বিশেষভাবে বুঝিলাম। আইনশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা বাড়িল। উহাতে আমি ধর্ম দেখিতে পাইলাম। ট্রাস্টীর কাছে যদি কোটি টাকাও থাকে তাহার এক পয়সাও যেমন তাহার নিজের নয়, মুক্তি-অভিলাষীর আচরণও তেমনি হইবে—একথা আমি গীতা হইতে বুঝিলাম। অপরিগ্রাহী হইতে হইলে (যাহার কোনও ধন-সম্পদ নাই), সমভাবী হইতে হইলে, হৃদয়ের পরিবর্তন আবশ্যক—ইহা আমি আলোর মত স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। রেবা-শংকর ভাইকে লিখিয়া পাঠাইলাম যে, বীমার পলিসি যেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বীমার জন্য কিছু ফেরত পাওয়া যায় ত ভাল, যদি না পাওয়া যায় ত খারাপ পয়সা বরবাদ গিয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। পুত্রদের ও স্ত্রীর রক্ষা, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই করিবেন। পিতার সমান বড় ভাইকে লিখিলাম—"এ পর্যন্ত ত আমার নিকট যাহা বাঁচিত তাহা আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। এখন হইতে আমার আশা ত্যাগ করিবেন। যাহা বাঁচিবে তাহা এখানকার সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যই ব্যয়িত হইবে।"

কথাটা আমি তাড়াতাড়ি করিয়া দাদাকে বুঝাইতে পারি নাই। প্রথমে তিনি শক্ত কথায় তাঁহার প্রতি আমার কর্তব্য বুঝাইলেন। পিতা অপেক্ষা আমার জ্ঞান অধিক নাই। তিনি যেমন কুটুম্বদের ভরণপোষণ করিতেন আমারও তেমনি করা উচিত ইত্যাদি। আমি তদুত্তরে বিনয়পূর্বক জানাইলাম যে, পিতা যে কার্য করিয়াছেন আমিও তাহাই করিতেছি। কুটুম্ব শব্দের অর্থ একটু সম্প্রসারিত করিলেই আমার গৃহীত পথ বুঝিতে পারিবেন।

আমার আশা তিনি ছাড়িয়া দিলেন। চিঠিপত্র লেখা প্রায় বন্ধ করার মত করিলেন। ইহাতে আমার দুঃখ হইল। কিন্তু যাহা আমি ধর্ম বলিয়া মনে করিতেছিলাম, তাহা ত্যাগ করার দুঃখ আরও বেশি। তাই আমি ছোট দুঃখ সহ্য করিলাম। ইহা সত্ত্বেও দাদার প্রতি আমার ভক্তি নির্মল ও প্রবল রহিল। দাদার যে দুঃখ হইয়াছিল তাহা তাঁহার ভালবাসা হইতেই উৎপন্ন। আমার পয়সা অপেক্ষা আমার সদাচরণ সম্বন্ধেই তাঁহার অধিক দৃষ্টি ছিল।

জীবনের শেষদিকে দাদার মনের পরিবর্তন হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যা হইতে তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, আমি যে পথ লইয়াছি তাহাই ঠিক ও ধর্মসঙ্গত। তিনি আমাকে একটি অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী পত্র লিখিয়া-

ছিলেন। যদি পিতা পুত্রের কাছে ক্ষমা চাহিতে পারেন, তবে তিনিও আমার কাছে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। ইচ্ছামত পথে পরিচালনা করার জন্য, তাঁহার পুত্রদের আমার কাছে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য নিজেও অধীর হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আসিতে তার করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। তাঁহার পুত্র সম্বন্ধেও তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি দেশেই মারা যান। পুত্রদের মধ্যে তাহাদের পূর্ব জীবনের ধারাই চলিতেছিল। তাহাদের পরিবর্তন হইল না। আমি তাহাদিগকে আমার কাছে টানিয়া আনিতে পারিলাম না। ইহাতে তাহাদের দোষ নাই। স্বভাবকে কে পরিবর্তন করিতে পারে? বলবান সংস্কারকে কে নাশ করিতে পারে? আমরা যদি মনে করি যে, আমাদের নিজেদের যে পরিবর্তন হইয়াছে, যে বিশ্বাস আছে, তাহা আমাদের আশ্রিত ও সাথীদেরও হইতে হইবে, তবে তাহা মিথ্যা। মা-বাপ হওয়ার দায়িত্ব কি কঠিন তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতে কতক বুঝিতে পারা যায়।

৬

নিরামিষ আহারের জন্য ত্যাগ

জীবনে যেমন ত্যাগের ও সাদাসিধাভাবে থাকায় মনোভাব বাড়িতে লাগিল, যেমন ধর্ম-জাগৃতি সম্প্রসারিত হইতে লাগিল, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নিরামিষ আহার ও তাহার প্রচারের ইচ্ছাও ক্রমবর্ধমান হইয়া উঠিল। প্রচারকার্যের একটিমাত্র পথ আমি জানি। তাহা হইতেছে—নিজে আচরণ করিয়া ও আচরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া।

জোহানেসবর্গে এক নিরামিষ আহারের হোটেল ছিল। ক্যুনের জল-চিকিৎসায় বিশ্বাসী একজন জারমান ইহা চালাইতেন। সেখানে আমি যাতায়াত আরম্ভ করিলাম এবং যত ইংরাজ বন্ধুকে সেখানে লইয়া যাইতে পারিতাম, লইয়া যাইতাম। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, হোটেল দীর্ঘদিন চলিবে না। জারমানটির অর্থের অভাব লাগিয়াই আছে। আমি যতটা পারিতাম সাহায্য করিতাম, কিছু পয়সাও খোয়াইয়াছিলাম। অবশেষে উহা বন্ধ হইয়া গেল। অনেক থিয়োসফিস্টই নিরামিষাশী, কেউবা পুরা কেউবা অর্ধেক। এই সমিতিতে এক দুঃসাহসী মহিলা ছিলেন। দুঃসাধ্য কাজের প্রতি তাঁহার প্রবল

আসক্তি ছিল। তিনি জমকালো এক নিরামিষ আহার-গৃহ খুলিলেন। এই মহিলার কলাবিদ্যার শখ ছিল, খরচার হাত বেশ ছিল এবং হিসাবের জ্ঞান বিশেষ ছিল না। তাঁহার বন্ধুসংখ্যাও ছিল অনেক। প্রথমতঃ ছোট রকমেই তিনি কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি উহা বড় করা ও বড় বাড়িতে লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন এবং আমার সাহায্য চাহিলেন। সে সময় তাঁহার হিসাবপত্রের জ্ঞানের কোন খবর আমি লই নাই। তাঁহার লাভ-লোকসানের হিসাব (এস্টিমেট) ঠিকই আছে ধরিয়া লইয়াছিলাম। আমার কাছে টাকার সুবিধা ছিল। অনেক মক্কেলের টাকা আমার কাছে থাকিত। তাঁহাদের মধ্যে একজনের অনুমতি লইয়া তাঁহার টাকা হইতে প্রায় এক হাজার পাউণ্ড (১৫০০০৲ টাকা) তাঁহাকে দিলাম। এই মক্কেল বিশাল-হৃদয় এবং বিশ্বাসী ছিলেন। প্রথম এগ্রিমেণ্টে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদেরই একজন। তিনি বলিলেন—"ভাই, আপনার ইচ্ছা হয় ত টাকা দিয়া দিবেন। আমি কিছু জানি না। আমি ত আপনাকেই জানি।" তাঁহার নাম বদ্রী। তিনি সত্যাগ্রহে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে জেলেও যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার ঐ প্রকার সম্মতির উপর আমি মহিলাটিকে টাকা ধার দিয়াছিলাম। দুই-তিন মাসেই আমি বুঝিলাম যে, সে টাকা আর ফেরত পাওয়া যাইবে না। এত বড় লোকসান দেওয়ার শক্তি আমার ছিল না। আমার দ্বারা ঐ টাকার অন্যরূপ ব্যবহার হইতে পারিত। টাকা ফিরিয়া পাওয়া গেল না। কিন্তু বিশ্বাসী বদ্রীর টাকা খোয়া যায় কি করিয়া ? সে ত আমাকেই জানিত। ঐ টাকা আমিই পূরণ করিলাম।

এক মক্কেল বন্ধুকে ঐ টাকার কথা বলিয়াছিলাম। তিনি আমাকে মিষ্ট কথায় গালি দিয়া কহিলেন—"ভাই, (দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমি মহাত্মা হই নাই, এমন কি বাপু বা বাবাও ছিলাম না। মক্কেল বন্ধুটি আমাকে 'ভাই' বলিয়াই ডাকিতেন) এ কাজ তোমার করা উচিত হয় নাই। আমরা তো তোমার উপর নির্ভর করিয়াই চলি। ঐ টাকা তুমি ফিরিয়া পাইবে না। বদ্রীকে তুমি অবশ্যই বাঁচাইবে, আর নিজের টাকা খোয়াইবে। কিন্তু এই রকমে তোমার সংস্কার-কার্যে সকল মক্কেলের টাকা যদি দিতে থাক, তবে মক্কেলরা ত মরিবেই, তুমিও ভিখারী হইয়া ঘরে বসিবে। তোমার জনসাধারণের জন্য কাজও বন্ধ হইয়া যাইবে।"

সৌভাগ্যবশতঃ এই বন্ধুটি বাঁচিয়া আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে অথবা

অন্তত্র আমি তাঁহার অপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ ব্যক্তি আর দেখি নাই। কাহাকেও যদি তিনি মনে মনে সন্দেহ করিয়া থাকেন এবং পরে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারই ঐরূপ করা দোষের হইয়াছে, তবে তৎক্ষণাৎ তিনি সেই ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাহিয়া নিজের আত্মাকে সাফ করিয়া ফেলেন। তাঁহার দেওয়া এই শিক্ষা আমার নিকট উচিত বোধ হইল। বদ্রীর টাকা আমি পূরণ করিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু যদি ঐ রকম আরও হাজার পাউণ্ড তখন খোয়া যাইত তাহা হইলে তাহা পূরণ করার শক্তি আমার আদৌ হইত না এবং আমাকে ঋণ করিতেই হইত। এইরূপ কাজ জীবনে আর কখনো করি নাই এবং ঘটনাটির প্রতি আমার মনে সর্বদাই একটা বিরক্তির ভাব রহিয়াছে। আমি দেখিলাম যে, কাহারও সংস্কার করিবার জন্যও নিজের শক্তির বাহিরে যাওয়া উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি ইহাও বুঝিতে পারিলাম যে, ধারের কারবারের দ্বারা আমি গীতার নিষ্কাম কর্ম করার মুখ্য শিক্ষার অনাদর করিয়াছি। আলোকস্তম্ভের উপরকার আলোক যেমন দূর হইতেই কোথায় বিপদ তাহা দেখাইয়া সতর্ক করিয়া দেয়, এই ভুল আমাকে তেমনি ভাবে সতর্ক করিয়া দিতেছে।

নিরামিষ আহার প্রচারের জন্য এই প্রকার অর্থ উৎসর্গ করার কল্পনা আমার ছিল না। ইহা যেন আমাকে দিয়া জোর করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করাইয়া লইয়াছিল।

৭

মাটি ও জলপ্রয়োগ চিকিৎসা

জীবনে সাদাসিধা ভাব বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে, রোগের জন্য ঔষধ ব্যবহারের প্রতি আমার যে বিরাগ পূর্ব হইতে ছিল, তাহাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন আমি ডারবানে ওকালতি করিতেছিলাম, তখন ডাক্তার প্রাণজীবনদাস মেহতা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। ঐ সময় আমি বাতে ও দুর্বলতায় কখন কখন ভুগিতেছিলাম। তিনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই আমি ব্যাধিমুক্ত হই। তাহার পর দেশে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আমার কোনও বড় রকমের অসুখ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু জোহানেসবর্গে আমার কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইত এবং সেজন্য মাথা ধরিত। জোলাপ লইয়া শরীর ঠিক রাখিতে হইত। উপযুক্ত পথ্য ত হামেশাই

করিতাম, কিন্তু তবুও আমি সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত হইতে পারি নাই। জোলাপ ব্যবহার হইতে মুক্তি পাইলে যে ভাল হয়, এ কথাটা সর্বদাই মনে হইত।

ম্যানচেস্টারের "নো ব্রেকফাস্ট এসোসিয়েশন" স্থাপনার বিষয় পড়িলাম। তাহার যুক্তি এই ছিল যে, ইংরাজেরা অনেক বারে এবং পরিমাণে অনেকটা করিয়া খায়, রাত বারোটা পর্যন্ত খাওয়া চলে। আর তাহারই ফলে তাহারা ডাক্তারের ঋণ শোধ করে। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে প্রাতঃকালের 'ব্রেকফাস্ট' খাওয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। ঐ কথা আমার সম্বন্ধে পুরোপুরি না বলা যাইতে পারিলেও আংশিক ভাবে বলা যায়—এই প্রকার মনে হইল। আমি তিনবার পেট ভরিয়া খাইতাম এবং অপরাহ্নে চা'ও খাইতাম। আমি কখনও অল্পাহারী ছিলাম না। নিরামিষ ও মশলাহীন আহার্য যতটা সুস্বাদু করা যায় তাহা করিতাম। ছ-সাতটা বাজার পূর্বে কদাচিৎ ঘুম হইতে উঠিলাম। এই অবস্থায় আমার মনে হইল যে, যদি সকালের আহার ত্যাগ করি তবে মাথাধরা হইতে অবশ্য মুক্তি পাইব। আমি সকালের খাওয়া ছাড়িয়া দিলাম। কতকটা কষ্ট অবশ্য হইয়াছিল, কিন্তু মাথাধরা সারিয়া গেল। ইহা হইতে আমি ধরিয়া লইলাম যে, আমার খোরাক প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি ছিল।

কিন্তু এই পরিবর্তন দ্বারা কোষ্ঠ-কাঠিন্যের ব্যাধি মিটিল না। কুনের কটি-স্নানের প্রয়োগ লইলাম। তাহাতে অল্প কিছু আরাম আসিল বটে, কিন্তু তেমন বিশেষ কোনও পরিবর্তন হইল না। ইতিমধ্যে সেই জারমান হোটেল-ওয়ালা অথবা অন্য কেউ আমার হাতে 'জস্ট'এর 'রিটার্ণ টু নেচার' বা 'প্রকৃতির দিকে ফেরো' নামক বইটি দিলেন। তাহাতে আমি মাটির প্রয়োগ সম্বন্ধে পড়িলাম। শুকনা ফল এবং টাটকা ফল যে মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য তাহা এই লেখক খুব সমর্থন করিয়াছেন। কেবল ফলাহারের উপর নির্ভর করা এই সময় গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করি নাই। কিন্তু মাটির ব্যবহার তখনই শুরু করিলাম। উহাতে আমার আশ্চর্য ফল হইল। চিকিৎসা এই রকম ছিল :—ক্ষেত হইতে সাফ কালো বা লাল মাটি লইয়া তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ ঠাণ্ডা জল দিয়া সাফ পুরানো পাতলা কাপড়ে বিছাইয়া পেটের উপর পুলটিসের মত লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ করা। এই ব্যাণ্ডেজ আমি রাত্রিতে শোওয়ার সময় বাঁধিতাম এবং সকালে আর হয়ত বা রাত্রেই ফেলিয়া দিতাম। তাহাতেই আমার কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হইল। তারপর হইতে আমার ও আমার অনেক সঙ্গীর উপর এই মাটির

চিকিৎসা প্রয়োগ করিয়াছি এবং কদাচিৎ কাহারও বেলায় নিষ্ফল হইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়। দেশে ফিরিয়া আসার পর মাটির চিকিৎসা এইরূপ নির্ভরতার সঙ্গে করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। পরীক্ষা করার জন্য এক জায়গায় স্থির হইয়া বসার মত অবসরও আমার হয় নাই। তাহা হইলেও মাটি ও জল দ্বারা চিকিৎসার বিষয়ে আমার শ্রদ্ধা বহুল অংশে প্রথমবারের মতই আছে। আজও কোন কোন ক্ষেত্রে আমি মাটির চিকিৎসার প্রয়োগ নিজের উপর করিয়া থাকি এবং প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে সঙ্গীদের পরামর্শ দিয়া থাকি। এ জীবনে দুইবার কঠিন পীড়া ভোগ করার পরও আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষের ঔষধ খাওয়ার কদাচিৎ আবশ্যকতা আছে। পথ্য, জল, মাটী ইত্যাদির ঘরোয়া চিকিৎসার দ্বারাই হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বইটি রোগ ভাল হইতে পারে। সর্বদা বৈদ্য, হাকিম ও ডাক্তারের নিকট দৌড়াইয়া এবং শরীরটাকে প্রচুর ঔষধ ও রসায়ন-পূর্ণ করিয়া মানুষ নিজের জীবনকাল খাটো করিয়া ফেলে। কেবল তাহাই নহে, মানুষ মনের উপর অধিকারও হারাইয়া ফেলে। সেইজন্য মনুষ্যত্বও হারায় এবং শরীরের স্বামী না হইয়া শরীরের গোলাম হয়।

রোগশয্যায় পড়িয়াই আমি ইহা লিখিতেছি বলিয়া কেউ যেন ইহা অগ্রাহ্য না করেন। আমার পীড়ার কারণ আমি জানি। আমার দোষের জন্যই যে আমি রোগে পড়ি, সে বিষয়েও আমার পুরাপুরি জ্ঞান ও বোধ আছে। এই প্রকার বোধ আছে বলিয়াই আমি ধৈর্য হারাইয়া ফেলি নাই। রোগকে আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করি এবং অনেক ঔষধ সেবন করার লালসা হইতে দূরে থাকি। আমি জানি, আমি আমার একরোখামি দ্বারা আমার ডাক্তার বন্ধুদের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহারা উদারতার সঙ্গে আমার জেদ সহ্য করেন এবং আমাকে ত্যাগ করেন না।

কিন্তু আমার এখনকার কথায় তখনকার কথা যেন চাপা না পড়ে। ইহা আমার ১৯০৪ সালের কথা।

আরো অগ্রসর হওয়ার পূর্বে পাঠককে কিছু সাবধান করা আবশ্যক। ইহা পড়িয়া যদি কেউ 'জস্টের' বই কেনেন, তবে তিনি যেন তাঁহার প্রত্যেক কথাই বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ না করেন। সকল লেখাতেই লেখকের অনেকাংশে একদেশদর্শিতা থাকে। প্রত্যেক বস্তুই নানা দিক হইতে দেখা যাইতে পারে, এবং সেই সেই দৃষ্টিতে সেই বস্তু সত্য হইলেও, প্রত্যেকটি একই সময় একই

অবস্থায় সত্য নয়। আবার অনেক বই বিক্রয়ের জন্য বা নামযশের জন্য লেখা হয় বলিয়া দোষ থাকিয়া যায়। ইহা স্মরণ রাখিয়া ঐ সকল বই পড়িতে হয় এবং বিচার করিয়া পড়িতে হয়। আর যদি কেউ উহার কোনও ব্যবস্থা কাযে প্রয়োগ করিতে চান, তবে তাহার পূর্বে হয় তাঁহার কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ লওয়া উচিত, নতুবা ধৈর্য সহকারে লিখিত বিষয় পড়িয়া উহা পরিপাক করিয়া তবে প্রয়োগ করা উচিত।

৮

সাবধানতা

আমার আত্মকথার প্রসঙ্গ পরের অধ্যায় পর্যন্ত স্থগিত রাখিয়া অন্য প্রসঙ্গ বলিতে হইতেছে। পূর্বের অধ্যায়ে জল-মাটির প্রয়োগ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাতে আমার আহারের বিষয়ও ছিল। ঐ বিষয় এখন কিছু লেখা উচিত মনে করি। বিষয়টি পুনরায় কথাপ্রসঙ্গে ভবিষ্যতেও আসিবে।

আহার ও সেই সম্পর্কে বিচার এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে করিব না। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজে প্রকাশিত এই বিষয় সম্পর্কিত আমার সমস্ত লেখা "স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়" (Guide to health) নামক পুস্তকে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। আমার ছোট ছোট বইয়ের মধ্যে এই বইখানা পশ্চিমে ও এদেশে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রসিদ্ধিলাভ করে। তাহার কারণ আমি আজ পর্যন্তও বুঝিতে পারি নাই। বইটি কেবল 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এর পাঠকদের জন্য লেখা হইয়াছিল। কিন্তু উহার সাহায্যে অনেক ভাই ও ভগ্নী নিজেদের জীবন পরিবর্তন করিয়াছেন এবং আমার সঙ্গে পত্রালাপ চালাইতেছেন। সেই জন্য ঐ বইটি সম্বন্ধে এখানে কিছু লেখা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

যদিও ঐ বইতে লিখিত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করার আবশ্যকতা আমি অনুভব করি নাই, তথাপি আমি ব্যবহারের বেলায় প্রয়োজন অনুসারে কিছু অদল-বদল করিয়াছি। পুস্তকের সকল পাঠক তাহা জানেন না। সেই সকল পরিবর্তনের বিষয় তাঁহাদিগকে এই সুযোগে জানানো দরকার।

আমার অন্যান্য বইর মতই এই বইখানাও আমি কেবল ধর্ম-ভাবনা হইতেই লিখিয়াছি। এই ধর্ম-ভাবনা হইতেই আজ পর্যন্ত আমি আমার প্রত্যেক কাজ

করিয়া আসিতেছি। তাহা হইলেও উহার কয়েকটি বিচার আমি আজ পর্যন্তও ব্যবহারে প্রয়োগ করিতে পারি নাই বলিয়া আমার দুঃখ আছে, আমার মনে লজ্জা আছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বাল্যকাল পর্যন্তই মাতার দুধ পান করা আবশ্যক। তাহার পরে অন্য দুধের আবশ্যকতা নাই। মানুষের খাদ্য বনজাত পাকা বা শুকনো ফল ছাড়া আর কিছু নহে। বাদাম প্রভৃতির বীজ হইতে এবং আঙুর প্রভৃতি ফল হইতে মানুষের শরীরের ও বুদ্ধির পূর্ণ পোষণ মিলিতে পারে। এই প্রকার খাদ্যের উপর যে থাকে তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্যাদি আত্মসংযম খুব সহজ বস্তু। 'মানুষ যেমন খায় তেমনি হয়' এই প্রবাদ বাক্যে যথেষ্ট সত্য আছে—এ কথা আমি ও আমার সঙ্গীরা অনুভব করিয়া থাকি।

এই বিচার উক্ত বইতে বেশ ভালভাবে সমর্থন করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া আমি উহার প্রয়োগের পরিপূর্ণতায় পৌঁছিতে পারি নাই। খেড়া জিলায় সিপাহী ভর্তির কাজ করিতে করিতে আমার পথ্যের ভুলে আমি মরিতে বসিয়াছিলাম। দুধ ব্যতীত বাঁচিয়া থাকিতে, আমি বহুবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছি। যেসব বৈদ্য, ডাক্তার, রসায়নবিদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তাঁহাদের সাহায্যে দুধের পরিবর্তে অন্য কিছু ব্যবহার করা যায় কিনা, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি। কেহবা মুগের জল, কেহবা মহুয়ার তেল, কেহবা বাদামের দুধের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল দ্রব্যই প্রয়োগ করিয়া আমি শরীরকে ক্লিষ্ট করিতেছিলাম। কিন্তু আমি উহাদের সাহায্যে রোগশয্যা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই।

বৈদ্যেরা আমাকে চরক ইত্যাদি হইতে শ্লোক শুনাইয়াছেন যে, ব্যাধি দূর করার জন্য খাদ্যাখাদ্যের বাধা নাই ও মাংসাদিও খাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এই প্রকার বৈদ্যের পক্ষে দুধের পরিবর্তে শরীর রক্ষার উপযোগী অন্য কোনও বস্তুর সন্ধান দেওয়া সম্ভবপর নহে। যে চিকিৎসার 'বিফ-টি' (গোমাংসের রস হইতে চা) এবং ব্রাণ্ডি মদের স্থান আছে, তাহাতে দুধের পরিবর্তে অন্য যে বস্তুর সাহায্যে শরীর রক্ষা করা চলে, তাহার নির্দেশ কি প্রকারে মিলিবে? গাভী বা মাহষের দুধ ত পান করিতেই পারিব না, কেন না আমি ব্রত লইয়াছিলাম। ব্রতের জন্য দুধ মাত্রই ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ব্রত লওয়ার সময় আমার মনের সামনে গো-মাতা ও মহিষ-মাতাই ছিল, এই জন্য আমি বাঁচিবার জন্য যেমন-তেমন করিয়া মনকে ফুসলাইলাম। ব্রতের কথার শব্দগত মানে মাত্র

পালন করিয়া আমি ছাগলের দুধ খাওয়া স্থির করিলাম। ছাগ-মাতার দুধ খাওয়ার সময় আমি আমার ব্রতের আত্মার হত্যা করিলাম। জানিয়া-শুনিয়াই দুধ খাইলাম। আমাকে 'রাউলাট অ্যাক্ট' লইয়া যুঝিতে হইবে, এই মোহ আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাহা হইতেই বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল এবং সেই জন্য জীবনে যাহা একটা মহাপরীক্ষা বলিয়া গণ্য করিয়াছিলাম, তাহা বন্ধ হইল।

খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ নাই। আত্মা আহার করে না এবং পান করে না। যাহা পেটে যায় তাহাতে তাহার লাভ-ক্ষতি নাই। কিন্তু যে বাক্য ভিতর হইতে বাহির হয় তাহাতেই লাভ ক্ষতি হয় ইত্যাদি যুক্তি আমি জানি। ইহাতে তথ্যাংশ আছে। কিন্তু যুক্তির কথা না মানিয়া এখানে আমার দৃঢ় বিশ্বাসের কথা বলিতেছি। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলিতে চায়, যাহার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করার ইচ্ছা আছে, এমন সাধক ও মুক্তি-অভিলাষীর পক্ষে কোন্ বাক্য বলিতে হইবে ও কোন বাক্য ত্যাগ করিতে হইবে, কোন্ ভাব গ্রহণ করিতে হইবে ও কোন্ ভাব বর্জন করিতে হইবে, তাহা যেমন বিচার করিয়া স্থির করা আবশ্যক, খাদ্য সম্বন্ধেও ঠিক ততটাই বিচার করিয়া, কোন্ খাদ্য ত্যাগ করিতে হইবে, আর কোন্ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

কিন্তু যে বিষয়ে আমি নিজেই অকৃতকার্য হইয়াছি, ব্যর্থ হইয়াছি, সে বিষয়ে অপরকে আমার যুক্তির উপর চলিতে আমি পরামর্শ দিতে পারি না। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদিগকে আমি সে পথ গ্রহণে নিষেধও করিতে চাই। সেই হেতু এই বইর উপর নির্ভরশীল সমস্ত ভাই-ভগ্নীকে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি। দুধ ত্যাগ করা যদি সর্বাংশে লাভজনক বলিয়া মনে হয়, অথবা অভিজ্ঞ বৈদ্য বা ডাক্তার যদি পরামর্শ দেন, তবেই দুধ ত্যাজ্য। নচেৎ কেবল আমার বইর কথার উপর নির্ভর করিয়া কেউ যেন দুধ ত্যাগ না করেন। এখন পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা এই যে, যাহার হজমশক্তি দুর্বল হইয়াছে, অথবা যে শয্যাগত হইয়াছে, তাহার পক্ষে দুধ ব্যতীত হালকা অথচ পুষ্টিকর খাদ্য আর কিছু নাই।

এই অধ্যায় পাঠ করার পর কোনও বৈদ্য, ডাক্তার, হাকিম বা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ অন্য কোনও ব্যক্তি যদি দুধের পরিবর্তে দুধের মত পুষ্টিকর ও পাচক কোনও ভেষজ বস্তুর বিষয়, বই পড়িয়া নহে—ব্যবহারিক অনুভবের ফলেজানেন, তবে সেকথা আমাকে জানাইলে আমার উপকার করা হইবে।

৯

শক্তিমানের সম্মুখীন

এখন এশিয়াটিক বিভাগের কর্মচারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। এশিয়া সম্পর্কিত কর্মচারীদের মুখ্য ও বৃহৎ স্থান ছিল জোহানেসবর্গ। তাঁহারা মনে করিতেন যে, ভারতীয়, চীনা ইত্যাদির রক্ষণের জন্য নয়, পরন্তু তাহাদের ভক্ষণের জন্যই তাঁহারা সেখানে আছেন। আমার নিকট রোজ এই মর্মে অভিযোগ আসিত যে—"যাহার ট্রান্সভালে ফিরিয়া আসার বাস্তবিক দাবি আছে সে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, অথচ যাহার কোনও দাবি নাই, সে এক-একশ' পাউণ্ড ঘুষ দিলেই আসিবার অনুমতি পাইতেছে। ইহার প্রতিকার তুমি যদি না কর তবে কে করিবে?" কথাটা আমারও ঠিক মনে হইল। যদি এই অন্যায় ব্যবস্থা দূর করিতে না পারি, তবে আমার ট্রান্সভালে বাস করা বৃথা।

আমি সাক্ষী সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। অনেকগুলি সাক্ষ্য জমিল। এইবার আমি পুলিস কমিশনারের কাছে গেলাম। তাঁহার ভিতরে দয়া ও ন্যায়ের ভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। আমার কথা পাল্টাইয়া ফেলিয়া দেওয়ার বদলে তিনি ধৈর্য ধরিয়া শুনিলেন এবং আমাকে সাক্ষ্য দেখাইতে বলিলেন। সাক্ষীদিগকে নিজেই তিনি পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল। কিন্তু আমি জানিতাম আর তিনিও জানিতেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে শ্বেতাঙ্গ জুরির দ্বারা শ্বেতাঙ্গ অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া মুশকিল। তিনি বলিলেন—"তবুও আমরা চেষ্টা ত করিব। দোষীদিগকে জুরি ছাড়িয়া দিবে এই ভয়ে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে না—ইহা ঠিক নয়। আমি তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিব। আমি চেষ্টারও ক্রটি করিব না—একথা আপনাকে দিতেছি।"

আমার আশ্বাসের আবশ্যক ছিল না। অনেক কর্মচারীর উপরেই সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে আমার নিকট তেমন অকাট্য প্রমাণ ছিল না। যে দুইজনের সম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ ছিল না সেই দুইজনের উপর ওয়ারেণ্ট বাহির করা হইল।

আমার চলা-ফেরা লুকানো ছিল না। আমি যে প্রায় রোজই পুলিস কমিশনারের নিকট যাইতেছি তাহা অনেকেই দেখিয়াছিলেন। এই দুই কর্মচারীরও ছোট বড় চর ছিল। তাহারা আমার আপিসের উপর পাহারা রাখিত এবং আমার যাতায়াতের খবর সেই আমলাদিগকে দিত। এখানে

একথাও বলা দরকার যে, এই কর্মচারীদ্বয়ের প্রতি সকলের ঘৃণা এতই গভীর ছিল যে, বেশি চর পাওয়াও তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদি ভারতবাসীরা ও চীনারা আমাকে সাহায্য না করিত, তবে ইহাদিগকে কখনও গ্রেপ্তার করা যাইত না।

এই দুইজনের মধ্যে একজন ফেরার হইল। পুলিস কমিশনার বাহিরে ওয়ারেণ্ট পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিলেন। মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। সাক্ষীও ভালই ছিল। তাহা হইলেও এবং একজন যে ফেরার হইয়াছিল তাহা সত্ত্বেও জুরির নিকট সাক্ষ্য দেওয়ার পর উভয়েই খালাস পাইল।

আমি খুব নিরাশ হইলাম। পুলিস কমিশনারও দুঃখিত হইয়াছিলেন। ওকালতি ব্যবসার প্রতি আমার ধিক্কার উপস্থিত হইল। বুদ্ধির প্রয়োগে দোষ ঢাকা হইতেছে দেখিয়া বুদ্ধির উপরেই বিরাগ আসিল।

এই দুই কর্মচারীর অপরাধ এতই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল যে, তাহারা খালাস পাইলেও গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কাজে রাখিতে পারিলেন না। উভয়েই বরখাস্ত হইল এবং এশিয়া সম্পর্কিত বিভাগটাও কতকটা সাফ হইল। সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন ধৈর্য আসিল, সাহসও দেখা দিল।

আমার প্রতিষ্ঠা বাড়িল, আমার ব্যবসাও বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়ের যে শত শত পাউণ্ড ঘুষে যাইত তাহাও অনেকটা বাঁচিল। সব বাঁচিল এমন কথা বলা যায় না। অসৎ লোকেরা তবুও ব্যবসা চালাইতেছিল। তবে সৎ লোকেরা সততা বজায় রাখিতে পারিতেছিল—একথা বলা যায়।

আমি বলিতে পারি যে, এই কর্মচারীরা অত্যন্ত অধম হইলেও তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভাব আমার কিছুই ছিল না। আমার এই স্বভাব তাহারাও জানিত এবং যখন তাহারা দুরাবস্থায় পড়িয়া আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসিল, তখন আমি সাহায্যও করিয়াছিলাম। জোহানেসবর্গের মিউনিসিপ্যালিটিতে আমি যদি বিরোধ না করি তবে তাহাদের চাকরি মিলিবে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয়। তাহাদের এক বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করে এবং তাহাদের চাকরি পাওয়ার সাহায্য করিতে আমি প্রতিশ্রুত হই। তাহাদের চাকরি হইয়াছিল।

এই ঘটনার প্রভাব এই হইল যে, যে-সকল শ্বেতাঙ্গের সংস্পর্শে আমি আসিতাম তাহারা আমার সম্বন্ধে নির্ভয় হইতে লাগিল এবং যাঁহাদের বিভাগে গিয়া আমাকে অনেক সময় লড়িতে হইত, কড়া কথা বলিতে হইত, তাঁহারা

তাহা সত্ত্বেও আমার সহিত মধুর সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। এই প্রকার আচরণ যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা আমার সে-সময় সম্যক উপলব্ধি ছিল না। এই ব্যবহারের ভিতর সত্যাগ্রহের বীজ ছিল, ইহা অহিংসারই অঙ্গ-বিশেষ—একথা আমি পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

মানুষ ও তাহার কাজ—এই দুই ভিন্ন বস্তু। ভাল কাজের প্রতি অনুরাগ এবং মন্দ কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ হওয়া উচিত। ভালই হোক আর মন্দই হোক, কাজের যে কর্তা তাহার প্রতি ভাল কাজের জন্য শ্রদ্ধা এবং মন্দ কাজের জন্য দয়ার ভাব রাখা সঙ্গত। একথা বোঝা সহজ হইলেও ব্যবহারের সময় ইহার খুবই কম প্রয়োগ হয়। আর সেইজন্যই এই জগতে বিদ্বেষের বিষ ছড়াইয়া পড়ে।

সত্যের অনুসন্ধানের মূলে এই অহিংসা আছে। আমি ইহা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করিতেছি যে, যদি অহিংসার ব্যবহার না হয় তবে সত্য লাভ হয় না। তন্ত্র বা ব্যবস্থার সঙ্গে ঝগড়া শোভা পায়। কিন্তু যদি তন্ত্রী বা ব্যক্তির সঙ্গে ঝগড়া করা হয় তবে তাহা নিজের সঙ্গেই ঝগড়া করার তুল্য হয়। কেন না সকলেই একই সূত্রে গ্রথিত, সকলেই একই ঈশ্বরের সন্তান। ব্যক্তির মধ্যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। ব্যক্তির অনাদরে বা তিরস্কারে সেই শক্তিরই অনাদর করা হয় এবং তাহাতে যেমন সেই ব্যক্তির ক্ষতি হয়, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সারা জগতেরও ক্ষতি হয়।

১০

পুণ্যস্মৃতি ও প্রায়শ্চিত্ত

আমার জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে যে, যার দ্বারা আমি অনেক ধর্মের ও অনেক জাতির সঙ্গে গভীর পরিচয়ে আসিতে পারিয়াছি। এই সকল অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা বলা যায় যে, আমি আত্মীয় এবং অনাত্মীয়, দেশী ও বিদেশী, সাদা ও কালো, হিন্দু ও মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান, পারসী কি ইহুদির মধ্যে ভেদ রাখি নাই। আমি এ কথা বলিতে পারি যে, আমার হৃদয় এই প্রকার ভেদ রাখিতেই অপারগ। এই বস্তুকে আমার সম্বন্ধে একটা গুণ বলিয়া মানি না। কেন না এই অভেদ ভাব বিকাশ করিতে আমাকে কোনও প্রচেষ্টা করিতে হয় নাই। উহা আমার প্রকৃতিগত। এই তুলনায়

আমি দেখি যে—অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ ইত্যাদি গুণ বিকশিত করার জন্য, আমাকে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতে হইতেছে এবং সেই চেষ্টার সম্পর্কে আমার পরিপূর্ণ সচেতনতা রহিয়াছে।

যখন আমি ডারবানে ওকালতি করিতাম তখন অনেক সময় আমার সঙ্গে আমার কেরানীরাও বাস করিতেন। তাঁহারা হিন্দু বা খ্রীষ্টান ছিলেন, অথবা যদি প্রদেশ অনুসারে ধরা যায় তবে গুজরাটী বা মাদ্রাজী ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে ভেদ-ভাব উপস্থিত হওয়ার কথা আমার স্মরণ নাই। তাঁহাদিগকে আমি পরিবার-ভুক্ত বলিয়া মনে করিতাম ও যদি আমার স্ত্রীর দিক হইতে উহাতে কোনও বাধা আসিত তবে তাঁহার সঙ্গে লড়িতাম। একজন কেরানী খ্রীষ্টান ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা পঞ্চম অর্থাৎ অস্পৃশ্য জাতীয় ছিলেন। আমাদের ঘরের গঠনপ্রণালী ইউরোপীয় ধরনের ছিল। কামরায় নর্দমা ছিল না—থাকার দরকারও নাই, একথা আমি মানি। সেই জন্য প্রত্যেক কামরাতেই প্রস্রাব করার জন্য পাত্র রাখা হইত। উহা সাফ করার কাজ চাকরদের ছিল না, আমাদের স্বামী-স্ত্রীরই ঐ কাজ ছিল। কেরানীদিগের মধ্যে যাহারা নিজদিগকে বাড়ির লোক মনে করিত তাহারা নিজ নিজ প্রস্রাবের পাত্র সাফ করিত সত্য, কিন্তু এই অস্পৃশ্য বংশের কেরানীটি নূতন আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রস্রাবের পাত্র আমাদেরই সাফ করা উচিত বলিয়া মনে করিলাম। অন্যের বাসন ত কস্তুরবা-ই সাফ করিতেন। কিন্তু এইবার অস্পৃশ্যের প্রস্রাব সাফ করার বেলায় ঘটনাটি তাঁহার সহ্যের সীমার বাহিরে গেল। আমাদের মধ্যে কলহ হইল। আমি সাফ করিব ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না, আর নিজেরও সাফ করা কঠিন। আমি আজও দেখিতেছি—কস্তুরবা বাসন হাতে করিয়া তাঁহার রক্তবর্ণ চক্ষুর দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন, তাঁহার চক্ষু হইতে মুক্তা-ফলের ন্যায় অশ্রু-বিন্দু ঝরিতেছে।

কিন্তু আমি যেমন প্রেম-পরায়ণ তেমনি নিষ্ঠুর স্বামী ছিলাম। আমি নিজেকে তাঁহার শিক্ষক বলিয়া মনে করিতাম এবং আমার অন্ধ প্রেমের বশীভূত হইয়া সকল রকমে তাঁহাকে জ্বালাতন করিতাম। কেবল বাসন উঠাইয়া লওয়াতেই আমার সন্তোষ হইল না। তিনি হাসিমুখে লইয়া গেলে তবেই আমার সন্তোষ হইত। এইজন্য আমি দুই কথা উচ্চৈঃস্বরে শুনাইয়া দিলাম। "এই ঝকমারি আমার ঘরে চলিবে না" বলিয়া আমি হুঙ্কার দিয়া উঠিলাম।

এই বাক্য তীরের ন্যায় তাঁহাকে বিঁধিল।

স্ত্রীও চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"তাহা হইলে তোমার ঘর তোমারি থাকুক, আমি চলিয়া যাই।"

আমি আত্মবিস্মৃত হইলাম। দয়ার বিন্দুমাত্রও আমার ভিতর অবশিষ্ট রহিল না। আমি তাঁহার হাত ধরিলাম। সিঁড়ির সামনেই বাহিরে যাওয়ার দরজা ছিল। আমি সেই নিরুপায় অবলাকে ধরিয়া দরজা পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গেলাম। দরজা অর্ধেক খুলিলাম।

চোখ দিয়া তাঁহার গঙ্গা-যমুনার ধারা বহিয়া যাইতেছিল; কস্তুরবা বলিলেন—"তোমার ত লজ্জা নাই, আমার আছে। একটু লজ্জিত হও। আমি বাহিরে গিয়া কোথায় যাইব? এখানে ত আমার মা-বাপ নাই যে, তাঁহাদের কাছে আশ্রয় লইব। আমি মেয়েমানুষ বলিয়াই তোমার লাথি খাইয়াও আমাকে থাকিতে হইবে। এখন তোমার সরম আসুক, দরজাটা বন্ধ কর। কেহ দেখে ত দুইজনের একজনেরও পক্ষে তাহা শোভন হইবে না।"

আমার মুখ লাল রহিল, কিন্তু সত্যই লজ্জিত হইলাম। দরজা বন্ধ করিলাম। স্ত্রী যদি আমাকে ছাড়িতে না পারেন, তবে আমিই বা তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? আমাদের মধ্যে কলহ বহুবার ঘটিয়াছে এবং পরিণামও তাহার প্রত্যেকবারেই শুভ হইয়াছে। পত্নীই তাঁহার অদ্ভুত সহ্যশক্তি দ্বারা জয়লাভ করিতেন।

এই বর্ণনা আমি এখন নির্বিকার ভাবে করিতে পারিতেছি, কেন না এই ঘটনা আমার জীবনের অতীত যুগের। আজ আমি মোহান্ধ পতি নই, শিক্ষকও নই। আজ ইচ্ছা করিলে কস্তুরবা আমাকে ধমকাইতে পারেন। আজ আমরা পরীক্ষিত বন্ধু। একে অন্যের প্রতি অনাসক্ত হইয়া একত্র বাস করিতেছি। আমার অসুখের সময় ইনি নিঃস্বার্থ সেবা করিয়া আসিতেছেন।

উপরের ঘটনা ১৮৯৮ সালে ঘটিয়াছিল। তখন ব্রহ্মচর্য পালন সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিতাম না। সে-সময় এ জ্ঞানও আমার স্পষ্ট ছিল না যে, পত্নী সহধর্মিণী, সহচারিণী এবং সুখ-দুঃখেরই সঙ্গী। তখন ভাবিতাম, পত্নী ভোগের সামগ্রী। পতির আজ্ঞা যাহাই হোক তাহাই পালন করিবার জন্য সৃষ্ট। তাই ঐ রকম আচরণও করিতাম।

১৯০০ সাল হইতে আমার এই ধারণার গভীর পরিবর্তন হয়। ১৯০৬ সালে এই পরিবর্তন শেষ পরিণামে পৌঁছে। যথাস্থানে এ বিষয়ের আলোচনা করিব। এখানে এই পর্যন্ত জানানোই যথেষ্ট যে, ক্রমে ক্রমে যেমন প্রবৃত্তির তাড়না হইতে আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আমার সংসার নির্মল, শান্ত ও সুখী হইয়াছে এবং আজও হইতেছে।

এই পুণ্যময় স্মৃতি হইতে কেহ যেন একথা মনে না করেন যে, আমরা আদর্শ দম্পতি, অথবা আমার ধর্ম-পত্নীর কোনও দোষ নাই, অথবা আমাদের উভয়ের আদর্শ একই। কস্তুরবার কোনও স্বতন্ত্র আদর্শ আছে কিনা বেচারা তাহাও জানেন না। হয়ত আমার সকল আচরণ তাঁহার আজিও পছন্দ হয় না। এ বিষয়ে আমি কদাপি চর্চা করি না, করিয়া লাভ নাই। তাঁহার শিক্ষা তাঁহার পিতা-মাতা দেন নাই, আর সময়মত আমিও দিই নাই। কিন্তু তাঁহার ভিতর একটা গুণ বহুল পরিমাণে আছে যাহা অন্য সকল হিন্দু স্ত্রীর মধ্যেই কম বেশি থাকে। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, আমার পদানুসরণ করিয়া চলাই তিনি তাঁহার জীবনের সার্থকতা মনে করেন; এবং পবিত্র জীবন যাপন করার চেষ্টায় তিনি আমাকে কখনো বাধা দেন না। ইহাতেই বুদ্ধি-বৃত্তিতে আমাদের উভয়ের ভিতর অনেক প্রভেদ থাকিলেও, আমাদের জীবন সন্তোষময়, সুখী ও ঊর্ধ্বগামী হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।

১১

ইংরাজদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়

এই অধ্যায় লিখিতে বসিয়া মনে হইতেছে, আমার এই আত্মকথা সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেমন করিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহার রীতিও পাঠকদিগকে জানানো আবশ্যক।

যখন এই আত্মকথা লিখিতে আরম্ভ করি, তখন লেখার ধারা সম্বন্ধে আমার কোনও একটা সুনিশ্চিত পরিকল্পনা ছিল না। কোন বই, রোজ-নামচা বা কাগজপত্র লইয়া আমি এই অধ্যায়গুলি লিখিতেছি না। লিখিবার সময় অন্তর্যামী আমাকে যেমন চালাইতেছেন আমি তেমনি লিখিতেছি,—একথা বলা যায়। যে শক্তি আমাকে পরিচালনা করিতেছে তাহা অন্তর্যামীরই, একথা আমি বলিতে পারি কিনা তাহাও আমি নিশ্চয়পূর্বক জানি। কিন্তু অনেক

দিন হইতে আমি যে কাজই করিতেছি—সে কাজ যত বড়ই হোক বা যত ছোটই হোক—যদি বিচার করিয়া দেখা যায় তবে একথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, এ সমস্ত কাজই অন্তর্যামী প্রেরিত।

অন্তর্যামীকে আমি দেখি নাই, আমি তাঁহাকে জানিও না। ঈশ্বর সম্বন্ধে জগতের শ্রদ্ধাকে আমি আমার আপনার করিয়া লইয়াছি। এই শ্রদ্ধা কোনও রকমে পরিত্যাগ করিতেও পারা যায় না। সেই জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া অনুভবরূপে জানিতেছি। তাহা হইলেও তাঁহাকে অনুভবরূপে জানিতেছি বলাতেও সত্যের উপর একপ্রকার আঘাত করা হয়। তাঁহাকে শুদ্ধরূপে প্রকাশ করার শব্দ আমার ভাণ্ডারে নাই—এই কথা বলাই সর্বতোভাবে সঙ্গত। এই অদৃশ্য অন্তর্যামীর আদেশের বশবর্তী হইয়া আমি এই কাহিনী লিখিতেছি—ইহাই আমার স্বীকৃতি।

পূর্বের অধ্যায়টি যখন আমি আরম্ভ করি তখন শিরোনামায় তাহার নাম দিয়াছিলাম—"ইংরাজদের সঙ্গে পরিচয়।" কিন্তু লিখিতে গিয়া আমি দেখিলাম যে, ঐ পরিচয় সম্পর্কে লিখিতে হইলে যে পুণ্যস্মৃতির কথা পূর্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি তাহাও লেখা আবশ্যক। সেই জন্য পূর্ব অধ্যায়ে তাহা লিখিয়া বর্তমান অধ্যায়টি লিখিতে হইতেছে এবং পূর্বের অধ্যায়ের শিরোনামও বদলাইতে হইয়াছে।

কিন্তু এই অধ্যায়টি লিখিতে গিয়াও নতুন ধর্ম-সংকট উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজদের পরিচয় দিতে গিয়া কি বলিব, আর কি না বলিব, তাহাও একটা জটিল সমস্যা। যাহা প্রাসঙ্গিক তাহা না বলিলে সত্যে মলিনতা স্পর্শ করে। কিন্তু যেখানে এই আত্মকথা লেখাই প্রাসঙ্গিক কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে, সেখানে কি প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক—তাহা স্থির করিয়া ন্যায্য বিষয়টি মাত্র লেখাও সহজ নহে।

আত্মকথা মাত্রই যে ইতিহাস হিসাবে অসম্পূর্ণ এবং আত্মকথা লেখাও যে কঠিন—সে কথা আমি পূবেই পড়িয়াছিলাম। আজ সে কথার অর্থ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতেছি। এই "সত্যের প্রয়োগে" বা আত্মকথার মধ্যে যাহা আমার স্মরণ আছে, তাহার সমস্ত কথাই যে আমি লিখিতেছি না—তাহা আমি জানি। কিন্তু সত্য দেখাইবার জন্য আবার কোন্ কথাটা রাখা দরকার এবং কোন্ কথাটা বাদ দেওয়া দরকার তাহাই কি জানি? যে সাক্ষী একতরফা বলে ও অর্ধেক কথা বলে, সে সাক্ষীর মূল্য বিচারালয়ে

কতটুকু ? যে অধ্যায়গুলি লিখিত হইয়াছে, কেউ যদি সেই অধ্যায়গুলির উপরও জেরা করিতে আরম্ভ করেন, তবে হয়ত অনেক নতুন আলোকের রেখা তিনি তাহাদের উপর ফেলিতে পারিবেন। আবার কেউ যদি গায়ে পড়িয়া চর্চা করার জন্ম সমালোচকের দৃষ্টিতে প্রশ্ন করেন, তবে আমার উক্তির ভিতর হইতে অনেক ফাঁকি ধরিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে অহঙ্কার অনুভব করাও অসম্ভব নহে !

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া এইভাবে বিচার করিতেছি এবং ভাবিতেছি যে, এই অধ্যায়গুলি লেখা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত কিনা। কিন্তু যে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে, উহা নীতিসঙ্গত নহে—একথা যে পর্যন্ত স্পষ্ট না হইবে, সে পর্যন্ত তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে, ইহাই সাধারণ রীতি। এই যুক্তি অনুসারে যে পর্যন্ত অন্তর্যামীর আদেশ আমার লেখা বন্ধ করিয়া না দেয়, সে পর্যন্ত অধ্যায়গুলি লিখিয়াই যাইব—এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি।

এই আত্মকথা সমালোচকদের সন্তুষ্ট করার জন্ম লিখিতেছি না। আমার এই আত্মকথা লেখাও আমার পক্ষে সত্যেরই পরীক্ষা বিশেষ। আমার সঙ্গীদের এই আত্মকথা হইতে কিছু আশ্বাস-বাক্য মিলিবে—ইহা লেখার তাহাও একটা কারণ। তাঁহাদের সন্তোষের জন্যই এই আত্মকথা লেখা আরম্ভ হয়। স্বামী আনন্দ ও জেরাম দাস যদি আমার উপর চাপ না দিতেন, তবে ইহা কদাচ আরম্ভ হইত না। সেই হেতু যদি লেখাতে কোনও দোষ হইয়া থাকে তবে তাঁহারাও উহার অংশীদার।

এখন শিরোনামার বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি। যেমন আমি ভারত-বাসীদিগকে আমার ঘরে আত্মীয়ের ন্যায় রাখিতেছিলাম, তেমনি ইংরাজ-দিগকেও রাখিতেছিলাম। আমার এই ব্যবহার সম্পর্কে, আমার সঙ্গে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা সকলেই যে অনুকূল মত পোষণ করিতেন, তাহা নহে। তবুও আমি জেদ করিয়াই তাঁহাদিগকে রাখিতাম। সকলকে রাখার ব্যাপারে যে আমি বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছি, একথাও বলা যায় না। কাহারও কাহারও সম্পর্কে আমাকে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। তবে সে অভিজ্ঞতা ত দেশী-বিদেশী উভয়ের বেলাতেই হইয়াছে। কটু অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এবং বন্ধুদের অসুবিধা হইয়াছে, কষ্ট হইয়াছে জানিয়াও আমার স্বভাব আমি বদলাই নাই, এবং বন্ধুরাও ঐ সকল উদারভাবে সহ্য করিয়াছেন। নূতন নূতন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যখন

আমার কোনও বন্ধুর কষ্ট হইয়াছে তখন তাঁহাকে সেজন্য দোষ দিতেও আমি দ্বিধা করি নাই। আমার এই অনুভব যে, কোনও ঈশ্বরবিশ্বাসী মনুষ্যের পক্ষে নিজের মধ্যে অবস্থিত ঈশ্বরকে সকলের মধ্যেই যেমন দেখা চাই, তেমনি সঙ্গীদের সঙ্গে নির্লিপ্ত হইয়া থাকিবার শক্তিও অর্জন করা চাই। অযাচিত অবসর যখন আসে, তখন তাহা হইতে দূরে না সরিয়া, নূতন নূতন সম্পর্কে বাঁধা পড়িয়াও রাগ-দ্বেষ রহিত হইয়া থাকার দ্বারাই এই শক্তি বিকশিত হইতে পারে।

এইজন্য যখন বুয়ার-বৃটিশ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল তখন আমার ঘর লোকে পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও, জোহানেসবর্গ হইতে আগত দুই ইংরাজকে আমি গৃহে স্থান দিয়াছিলাম। দুইজনেই থিয়োসফিস্ট ছিলেন। তাঁহাদের একজনের নাম ছিল কিচন। ইঁহার প্রসঙ্গ ভবিষ্যতে আসিবে। এই বন্ধুদের সঙ্গে বসবাসের জন্য আমার ধর্ম-পত্নীকে অনেক চোখের জল ফেলিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ আমার জন্য তাঁহার অদৃষ্টে চোখের জল ফেলা অনেকবার ঘটিয়াছে। এতটা ঘনিষ্ঠভাবে বিনা পর্দায় ইংরাজদের নিজের ঘরে রাখা এই আমার প্রথম। ইংলণ্ডে আমি ইংরাজদের ঘরে থাকিয়াছি সত্য; কিন্তু সেখানে তাঁহাদের অধীনেই আমাকে থাকিতে হইত, এবং সেখানে থাকা অনেকটা হোটেলে থাকার মতই ছিল। এখানে তাহার উন্টা ব্যবস্থা। এই বন্ধুরা আত্মীয় হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সর্বাংশে ভারতবর্ষীয় ধরন-ধারণই অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ঘরের বাহ্যিক সাজসজ্জা ইংরেজী ঢং-এর হইলেও ভিতরের ধরন, আহার ইত্যাদি মুখ্যতঃ ভারতবর্ষীয় ছিল। তাঁহাদিগকে রাখাতে কতকগুলি অসুবিধা হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ আছে। তাহা হইলেও একথা বলিতে পারি যে, ঐ দুই ব্যক্তি ঘরের অন্য লোকের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। জোহানেসবর্গে এই প্রকার সম্পর্ক পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

১২
ইংরাজদের সঙ্গে পরিচয়

জোহানেসবর্গে একসময় আমার কেরানীর সংখ্যা চারজন হয়। তাহারা কেরানী হইলেও আমার পুত্রের স্থানই অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু চারজনেও তখন আমার কাজ চলিত না। টাইপিং না হইলে ত চলেই না। টাইপিং-এর

কিছু জ্ঞান এক আমারই ছিল। এই চারজনের মধ্যে দুইজনকে টাইপিং শিখাইলাম কিন্তু ইংরেজী জ্ঞান কাঁচা হওয়ায় তাহাদের টাইপিং কখনো ভাল হইত না। আর ইহাদের মধ্যে একজনকে আমার হিসাবপত্র রাখার জন্য তৈরি করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। নাতাল হইতে আমার পছন্দমত কাউকে আনাইয়া লওয়া যায় নাই। কেন না পাস ছাড়া কোন ভারতবাসীকেই জোহানেসবর্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। নিজের সুবিধার জন্য আমলাদারদের কৃপা-প্রার্থী হইতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

আমি অসুবিধায় পড়িলাম। কাজ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, যতই খাটি না কেন, আমার ওকালতির ও সাধারণের জন্য কাজ শেষ করিয়া উঠিতে পারা একা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইংরাজ পুরুষ বা স্ত্রী কেরানী যদি পাওয়া যায় তবে আমি লইব না, এরূপ সংকল্প আমার ছিল না। কিন্তু কালা মানুষের কাছে সেখানকার গোরারা কি চাকরি করিতে রাজী হইবে? আমার আশঙ্কা ছিল সেখানে।

তবু আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে মনস্থ করিলাম। আমি একজন টাইপ-রাইটিং-এজেন্টকে জানিতাম। তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম, 'কালা' মানুষের কাছে চাকরি করিতে অসুবিধা বোধ না করে এমন কোনও ভাল মহিলা বা পুরুষ টাইপিস্ট যদি পাওয়া যায় তবে যেন আমাকে তিনি সংবাদ দেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে মহিলা-শর্টহ্যাণ্ড টাইপিস্ট অনেক আছেন। সেইরূপ একজন লোক দেওয়ার চেষ্টা করিবেন বলিয়া এজেন্টটি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তার পরেই মিস ডিক নাম্নী এক স্কচ কুমারীকে তিনি আমার পাছে পাঠাইয়াও দিলেন। মহিলাটি স্কটল্যাণ্ড হইতে কেবল নতুন আসিয়াছেন। যেখানে শুদ্ধ ভাবে চাকরি করা যায় সেই স্থানেই কাজ লইতে ইনি প্রস্তুত ছিলেন এবং তাঁহার শীঘ্রই কাজ পাওয়ার আবশ্যকতা ছিল। মহিলাটি এক মুহূর্তেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার ভারতবাসীর অধীনে কার্য করিতে অসুবিধা হইবে না?"

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"মোটেই না।"

"তোমার বেতন কি চাই?"

"সাড়ে সতের পাউণ্ড কি আপনি বেশি মনে করেন?"

"আমি যে রকম আশা করি, সে রকম কাজ তোমার দ্বারা যদি হয় তবে উহা

মোটেই বেশি বলিয়া মনে করি না। কখন তুমি কাজে যোগ দিতে পারিবে ?"

"আপনার ইচ্ছা হইলে, এই মুহূর্তেই।"

আমি খুব সন্তুষ্ট হইলাম ও তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আমার সামনে বসাইয়া চিঠি লেখাইতে শুরু করিলাম।

ইনি আমার কেরানী ছিলেন না। অনতিবিলম্বেই ইনি আমার কন্যা অথবা ভগ্নীর স্থান গ্রহণ করিয়া বসিলেন। আমাকে কখনো তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে হয় নাই। আমাকে ক্বচিৎ তাঁহার কাজে ভুল ধরিতে হইয়াছে। এক এক বারে হাজার পাউণ্ডের হিসাব তাঁহার হাতে পড়িত ও উহার খাতাপত্র রাখিতে হইত। তিনি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসপাত্রী ছিলেন এবং আরো বিশেষ কথা এই যে, তিনি তাঁহার গোপনতম মনোভাবও আমাকে জানাইতে দ্বিধা করিতেন না। স্বামী পছন্দ করার সময়ও তিনি আমার পরামর্শ লইয়াছিলেন। কন্যাদান করার সৌভাগ্যও আমি পাইয়াছিলাম। যখন মিস ডিক মিসেস ম্যাকডোনাল্ড হইয়া গেলেন তখন তাঁহার ত আর আমার কাছে থাকা চলে না। তিনি বিদায় লইলেন। কিন্তু তবু বিবাহ হওয়ার পরও, ভিড়ের সময় আমি তাঁহার দ্বারা অনেক কাজ করাইয়া লইয়াছি।

আপিসে এখন একজন স্থায়ী শর্টহ্যাণ্ড রাইটারের দরকার ছিল। একজন পাওয়া গেল। এই মহিলার নাম মিস শ্লেশিন। তাঁকে আমার কাছে লইয়া আসিয়াছিলেন মিঃ কলেনবেক। ইঁহার সঙ্গে ভবিষ্যতে পাঠকের পরিচয় হইবে। এই মহিলা এক হাইস্কুলে শিক্ষকের কাজ করিতেন। আমার কাছে যখন আসিলেন তখন তাঁহার বয়স সতের বৎসর হইবে। তাঁহার কতকগুলি বিচিত্রতায় মিঃ কলেনবেক ও আমি হার মানিতাম। তিনি চাকরি করিতে আসেন নাই, আসিয়াছিলেন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে। তাঁর ভিতরে কণামাত্রও বর্ণ-বিদ্বেষ ছিল না এবং তিনি কাউকে গ্রাহ্যও করিতেন না। তিনি অপমানকে একটুকুও ডরাইতেন না এবং নিজের মনে যাহার সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা বলিয়া ফেলিতে সংকোচবোধ করিতেন না। এই স্বভাবের জন্য আমি কতবার মুশকিলে পড়িয়াছি। কিন্তু তাঁহার অপকট স্বভাবই আবার সকল মুশকিল দূরও করিত। তাঁহার ইংরেজী জ্ঞান আমার অপেক্ষা বেশি মনে করিতাম বলিয়া এবং তাঁহার দায়িত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস হওয়ায়, তাঁর টাইপ করা অনেক কাগজ আমি পুনরায় না পড়িয়াই স্বাক্ষর করিতাম।

তাঁহার ত্যাগবৃত্তি অসাধারণ ছিল। বহুদিন পর্যন্ত আমার কাছ হইতে

প্রতি মাসে তিনি মাত্র ৬।৭ পাউণ্ড হিসাবে লইতেন এবং কখনও ১০ পাউণ্ডের বেশি লইতে পারেন নাই। আমি যদি বেশি লইতে বলিতাম তবে আমাকে ধমকাইয়া বলিতেন—"আমি বেতনের জন্য এখানে থাকিতেছি না, আমার তোমার সঙ্গ ও কাজ ভাল লাগে এবং তোমার আদর্শ আমার ভাল লাগে, সেইজন্যই এখানে আছি।" আমার কাছ হইতে একবারমাত্র তিনি প্রয়োজন বশতঃ ৪০ পাউণ্ড লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও ধার-স্বরূপে। গত বৎসর সে টাকাও তিনি পরিশোধ করিয়াছেন।

তাঁহার ত্যাগবৃত্তি যেমন তীব্র ছিল, তেমনি ছিল তাঁহার সাহস। স্ফটিকের ন্যায় পবিত্র এবং ক্ষত্রিয়কেও লজ্জা দেয় এমন যে দুই-চারিজন বীর রমণীর সঙ্গে মিশিবার সৌভাগ্য আমি পাইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে এই বালিকাকে আমি একজন বলিয়া গণ্য করি। আজ তিনি বড় হইয়াছেন। প্রৌঢ়া কুমারী হইয়াছেন। আজ তাঁহার মানসিক অবস্থার পুরা খবর আমার জানা নাই, কিন্তু আমার অনুভবের মধ্যে এই বালিকার কথা একটি পুণ্যস্মৃতি রূপে জাগিয়া আছে। সেই জন্য তাঁর সম্পর্কে আমি যাহা জানি তাহা না লিখিলে সত্যদ্রোহী হইব।

কাজের বেলা তিনি দিনরাতের ভেদ জানিতেন না। অর্ধরাতে বা মধ্যরাতে যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হইত, সেখানেই তিনি যাইতেন। যদি সঙ্গে কাহাকেও পাঠাইবার কথা বলিতাম তবে জ্বলিয়া উঠিতেন। হাজার হাজার বিশালকায় হিন্দুস্থানীও তাঁহাকে মায়ের মত দেখিত এবং তাঁহার কথা মানিয়া চলিত। যখন আমরা সকলে জেলে ছিলাম, দায়িত্ববান পুরুষ বড় কেহ বাহিরে ছিল না, তখন তিনি একাই ঐ লড়াই সামলাইয়া চালাইয়াছিলেন। লাখো টাকার হিসাব তাঁহার হাতে, সমস্ত পত্র ব্যবহারের কাজ তাঁহার হাতে, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'ও তাঁহারই হাতে; এই প্রকার অবস্থা হইয়াছিল। তবুও তিনি পরিশ্রান্ত হন নাই।

মিস শ্লেশিনের বিষয় লিখিতে গিয়া আমার কথার শেষ হইবে না। সুতরাং গোখলের প্রশংসাপত্র উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। গোখলে আমার সকল সহকর্মীর সঙ্গেই পরিচয় করিয়াছিলেন। পরিচয়-ফলে অনেকের উপরেই তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সকলের সম্বন্ধে মতামতও প্রকাশ করিয়াছেন। আমার সকল ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান সহকর্মীর মধ্যে এই মিস শ্লেশিনকে তিনি প্রধান স্থান দিয়াছিলেন। "এমন ত্যাগ, এমন পবিত্রতা,

'এমন নির্ভীকতা এবং এমন কুশলতা আমি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিয়াছি। আমার দৃষ্টিতে তোমার সঙ্গীদের মধ্যে মিস শ্লেশিন প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছেন।"

১৩
'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'

ইউরোপীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা বলা এখনও আমার শেষ হয় নাই। কিন্তু তাহার পূর্বে আরও দুই-তিনটি দরকারী বিষয় সম্পর্কে বলা আমি আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাহা হইলেও একজনের পরিচয় এইখানেই দিতে হইতেছে। মিস ডিককে লওয়াতেই আমার কাজ সম্পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন হইতেছিল না; আমাকে সাহায্য করিবার জন্য আরও লোকের প্রয়োজন ছিল। মিঃ রিচের বিষয় আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে আমার বেশ ভাল পরিচয় ছিল। তিনিই এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ছিলেন। সেখান হইতে বাহির হইয়া আমার অধীনে আর্টিকেল ক্লার্ক হইতে তাঁহাকে আমি পরামর্শ দিই। উহা তাঁহার কাছে ভাল লাগে। সুতরাং তিনি আসিয়া আমার আপিসে ভর্তি হইলেন। আমার কাজের বোঝা হালকা হইল।

এই সময়ে শ্রীমদনজিৎ 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' বাহির করিতে মনস্থ করিয়া আমার পরামর্শ ও সাহায্য চাহিলেন। পত্রিকা প্রকাশ করার বিষয়ে আমি সম্মতি দিলাম। ১৯০৪ সালে এই কাগজ বাহির হইল। শ্রীমনসুখলাল নাজর ইহার সম্পাদক হইলেন, কিন্তু সম্পাদকের সত্যিকার বোঝা আসিয়া পড়িল আমারই উপরে। আমার অদৃষ্টে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দূর হইতে কাগজ চালাইবার ভার পড়িয়াছে। শ্রীমনসুখলাল নাজর যে কাগজ পরিচালনা করিতে পারিতেন না এমন নয়। দেশে থাকিতে তাঁহাকে সংবাদপত্রের কাজ খুবই করিতে হইত। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার জটিল প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে আমার উপস্থিতিতে তিনি লিখিতে সাহস করিলেন না। আমার বিচারশক্তির উপর তাঁহার অতিরিক্ত বিশ্বাস ছিল। এইজন্য যে সমস্ত বিষয়ের উপরে মন্তব্য করা দরকার, সেই সমস্ত বিষয়ের উপর লিখিয়া পাঠাইবার ভার তিনি আমার উপর প্রদান করিয়াছিলেন।

এই কাগজখানা সাপ্তাহিক ছিল—আজও তাহাই আছে। প্রথমে উহা

গুজরাটী, হিন্দী, তামিল ও ইংরেজীতে বাহির হইত। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, তামিল ও হিন্দু বিভাগ নামমাত্র আছে। উহা দ্বারা সম্প্রদায়ের সেবা হইতেছে না। তাহা ছাড়া ঐ বিভাগ রাখাতে মিথ্যা আচরণেরও আভাস আছে। সেই জন্ম তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আমি শান্তিলাভ করিলাম।

এই কাগজে আমার টাকা দিতে হইবে, এ কল্পনা আমার ছিল না। কিন্তু অল্প সময়েই আমি দেখিলাম যে, আমি টাকা না ঢালিলে কাগজ চলিবে না। কাগজের আমি সম্পাদক না হইলেও উহার লেখার জন্ম সমস্ত দায়িত্ব যে আমার, সেকথা সকল ভারতবাসী ও শ্বেতাঙ্গরা জানিয়া গিয়াছিল। যদি কাগজ না বাহির হইত তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু কাগজ বাহির হইয়া তারপর বন্ধ হইয়া গেলে সম্প্রদায়ের অপমান হইবে এইরূপ আমার মনে হইতে লাগিল।

আমি উহাতে টাকা ঢালিতে লাগিলাম ও শেষে এমন হইল যে, আমার যাহা কিছু বাঁচিত, সে সমস্ত টাকাই উহাতে যাইত। এক সময়ের কথা আমার মনে আছে। তখন প্রতি মাসে ৭৫ পাউণ্ড (১১২৫৲ টাকা) করিয়া পাঠাইতে হইত।

কিন্তু এতদিন পরেও আমার মনে হয় যে, ঐ কাগজ ভারতীয় সম্প্রদায়ের ভালই সেবা করিয়াছে। উহা হইতে পয়সা উপার্জন করার কথা কাহারও ভুলেও মনে হইত না।

আমার হাতে যতদিন ঐ কাগজ ছিল ততদিন আমার জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার মধ্যেও সেই পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। আজও যেমন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'নবজীবন' আমার জীবনের কতক অংশের প্রতিচ্ছবি, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নও' তেমনি ছিল। প্রতি সপ্তাহে আমি আমার হৃদয় উহাতেই ঢালিয়া দিতাম এবং আমি সত্যাগ্রহের যে রূপ দেখিতাম তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম।

জেলে যে সময় ছিলাম সে সময় বাদ দিলে, দশ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৪ সাল পর্যন্ত 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এর এমন এক সংখ্যাও হয়ত পাওয়া যাইবে না যাহাতে আমার লেখা নাই। ঐ সকল লেখাতে এমন একটা শব্দের কথাও আমার স্মরণ হয় না যাহা আমি বিচার না করিয়া, ওজন না করিয়া ব্যবহার করিয়াছি, যাহা কেবল লোককে খুশি করার জন্ম ব্যবহার করিয়াছি। অথবা জানিয়া বুঝিয়া অতিশয়োক্তির জন্ম ব্যবহার করিয়াছি। আমার কাছে এই কাগজখানা সংযম শিক্ষা করার বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল। উহা বন্ধুদের আমার

সিদ্ধান্ত জানাইবার মাধ্যম ছিল। সমালোচকেরাও সমালোচনা করার মত ইহাতে বিশেষ কিছু পাইতেন না। বস্তুতঃ আমি জানি 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এর লেখায় সমালোচকের নিজের কলমই সংযত করার আবশ্যক হইত। এই কাগজখানা না হইলে সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম চালানো যাইত না। ইহার পাঠকগণ এই সংবাদপত্রকে নিজের কাগজ বলিয়াই মনে করিত এবং ইহার ভিতর দিয়া লড়াইয়ের ও দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থার প্রকৃত বাস্তব চিত্র পাইতেন।

তা ছাড়া এই কাগজের ভিতর দিয়া আমি মানুষের বিচিত্র স্বভাবের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সম্পাদক ও গ্রাহকের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ এবং পবিত্র সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার দিকে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পাঠকেরা হৃদয় খুলিয়া আমার কাছে পত্র লিখিতেন। এরূপ চিঠি আমি অজস্র পাইতাম। তীক্ষ্ণ, কটু, মধুর নানা রকমের লেখাই আমার কাছে আসিত। সেইগুলি পাঠ করা, বিচার করা, উহা হইতে সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া জবাব দেওয়া আমার পক্ষে ভাল শিক্ষাক্ষেত্র হইয়াছিল। এইরূপে আমি সম্প্রদায়ের সমস্ত কথা ও ভাবনা সম্পর্কে এমন অভিজ্ঞতা লাভ করিতাম যে, মনে হইত যেন সে সমস্তই কানে শুনিতেছি। ইহাতে সম্পাদকের দায়িত্ব সম্বন্ধেও আমি ভাল রকমের জ্ঞান অর্জন করিতে-ছিলাম। তাহা ছাড়া ইহার দ্বারা সম্প্রদায়ের উপর আমার প্রভাব যেরূপভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতেই ভবিষ্যতের সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম সুনিয়ন্ত্রিত, সুন্দর ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সেবা-ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই যে সংবাদপত্র চালাইতে হয়, ইহা আমি 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এর প্রথম মাসের পরিচালনাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সংবাদপত্র একটা প্রচণ্ড শক্তি। উচ্ছৃঙ্খল জলপ্রবাহ যেমন গ্রামকে গ্রাম ডুবাইয়া দেয়, শস্য ধ্বংস করিয়া ফেলে, তেমনি উচ্ছৃঙ্খল লেখার স্রোতও ধ্বংসকারী। যদি উচ্ছৃঙ্খল লেখা বাহিরের শাসনে সংযত হয় তবে তা উচ্ছৃঙ্খলতা অপেক্ষাও অধিক বিষ ছড়ায়। ভিতর হইতে যে শাসন আসে তাহাতেই শুভ হয়, কল্যাণ হয়।

এই বিচারপদ্ধতি যদি সত্য হয়, তবে দুনিয়ার কয়খানা সংবাদপত্র এই বিচারের কষ্টিপাথরে টিকিতে পারে? কিন্তু কে সেই অকর্মণ্য কাগজগুলির প্রচার বন্ধ করিতে পারে? কেই বা বিচার করিয়া বলিবে যে, কোন্ সংবাদপত্রটা অকাজের? কাজ ও অকাজ সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে। তাহা হইতেই লোককে নিজের পছন্দ অনুসারে ভাল-মন্দ বাছিয়া লইতে হইবে।

১৪

"কুলী লোকেশন" বা অস্পৃশ্য বস্তী

শ্রেষ্ঠ সমাজসেবা যাহারা করে সেই মেথর, ধাঙ্গড় প্রভৃতিকে আমরা হিন্দুরা অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি ও তাহাদিগকে গ্রামের বাহিরে ভিন্ন করিয়া রাখি। গুজরাটে ঐরকম অস্পৃশ্যদের বাসস্থানকে 'ঢেড়বড়ো' বলে এবং লোকে এইসব বস্তীর নাম লইতেও ঘৃণাবোধ করে। খ্রীষ্টান ইউরোপ এককালে ইহুদীদিগকে এমনি অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করিত। তাহাদের জন্য যে অস্পৃশ্য বস্তী ছিল তাহাকে 'ঘেটো' বলিত। ঐ 'ঘেটো' শব্দটাই তাহারা খারাপ বলিয়া মনে করিত। তেমনি আজ আমরা ভারতবর্ষীয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্পৃশ্য হইয়া আছি। এণ্ডরুজের আত্মত্যাগ ও শাস্ত্রীর যাদুবিদ্যার সোনার কাঠি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগকে শুদ্ধ করিবে কিনা এবং পরিণামে আমরা অস্পৃশ্য না হইয়া সভ্য বলিয়া গণ্য হইব কিনা তাহা ভবিষ্যতে বুঝা যাইবে।

ইহুদীরা নিজদিগকে ঈশ্বরের অনুগৃহীত এবং অপর কেহ অনুগৃহীত নয় এইরূপ মনে করিত এবং এই অপরাধের শাস্তি তাহারা বিচিত্র রীতিতে এমন কি অন্যায় রীতিতেই পাইয়াছে। প্রায় সেই রকমেই ভারতবাসীরা নিজদিগকে সভ্য ও আর্য মনে করিয়া, নিজেদের অপর এক অঙ্গকে প্রাকৃত অনার্য বা অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই পাপের ফল বিচিত্র রীতিতে এবং অন্যায় রীতিতে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ভোগ করে। তাহাদের মুসলমান এবং পারসী প্রতিবেশিগণও যে এই দণ্ড ভোগ করেন, তাহার কারণ এরাও একই দেশের লোক এবং গায়ের রংও তাঁহাদের একরূপ। অন্ততঃ ইহাই আমার অভিমত।

এই অধ্যায়ে যে 'লোকেশন' সম্বন্ধে বলা হইবে, তাহার মানে এতক্ষণ পাঠকেরা হয়ত কিছু বুঝিয়াছেন। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় 'কুলী' নামে পরিচিত ছিলাম। হিন্দুস্থানে কুলী শব্দের অর্থ ত 'মজুর'। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় এই শব্দটি পঞ্চম (মেথর ধাঙ্গড়) ইত্যাদি তিরস্কারবাচক শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে যে স্থান 'কুলী'দের থাকার জন্য আলাদা করিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে তাহাকে "কুলী লোকেশন" বলে। এই রকম জোহানেসবর্গেও ছিল। যে সকল স্থানে 'লোকেশন' ছিল তাহাতে ভারতীয়দের মালিকী স্বত্ব হইত না—এখনো নাই। জোহানেসবর্গের এই 'লোকেশনে'

জমির জন্য প্রতি বৎসরই নতুন পাট্টা লইতে হইত। এইস্থানে ভারতীয়দের বসতি অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে বসানো হইত। লোকের বসতি বাড়িলেও এই 'লোকেশনে'র স্থান বাড়ানো হইত না। এই 'লোকেশনে'র পায়খানা কোনও রকমে সাফ করা ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির তরফ হইতে কোন প্রকারেরই দেখাশুনা করা হইত না। যেখানে এইরূপ ব্যবস্থা, সেখানে রাস্তা ও রাস্তার বাতিই বা কেন থাকিবে? আর যেখানে লোকের শৌচাদি সম্বন্ধেই দেখা-শুনার কথা মিউনিসিপ্যালিটি দরকার বোধ করিত না, সেখানে সাফ করার কাজই বা কেমন করিয়া হইবে?

যেসব ভারতবাসী এই বস্তীতে বাস করিত, তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য ও দেখাশুনার ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে একান্তভাবেই অপরিহার্য ছিল। জঙ্গলকে কল্যাণভূমি করিতে পারে, ধূলা হইতে ধান উৎপাদন করিতে পারে এমন কৃতীকর্মী ভারতবাসী যদি সেখানে গিয়া বাস করিত, তবে ইতিহাস অন্যরূপ হইত। কিন্তু দুনিয়ায় এ ধরনের লোককে কখনো বিদেশে গিয়া ক্ষেত চষিতে দেখা যায় না। সাধারণ লোকই ধন এবং সুখের জন্য বিদেশে গিয়া চাষের কাজ করে। ভারতবর্ষ হইতেও প্রধানতঃ নিরক্ষর, গরিব, দীন-দুঃখী মজুরেরাই দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিল। ইহাদিগকে পদে পদে রক্ষা করার আবশ্যকতা হয়। ইহাদের পশ্চাতে যে সকল ব্যবসায়ী বা অন্য শিক্ষিত ভারতবাসী সেখানে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যাও ছিল মুষ্টিমেয়।

মিউনিসিপ্যালিটির সাফাই করার বিভাগের অমার্জনীয় অবহেলার জন্য ও ভারতীয়দের অজ্ঞতার জন্য 'লোকেশনে'র অবস্থা স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়া খুবই খারাপ ছিল। উহাকে পরিচ্ছন্ন করার অণুমাত্র চেষ্টাও স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে করা হয় নাই। অথচ নিজের অবহেলা হইতে উৎপন্ন এই অপরিচ্ছন্নতাকে নিমিত্ত করিয়াই, 'লোকেশন'টিকে উচ্ছেদ করার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি কৃতসংকল্প হইলেন এবং জমিগুলি অধিকার করার জন্য গভর্নমেণ্ট হইতে আইনও পাস করিয়া লইলেন। আমি যে সময় জোহানেসবর্গে গিয়া বসিয়াছিলাম, ইহাই তখনকার ঘটনা।

জমিতে বাসিন্দাদের নিজ স্বত্ব ছিল। সুতরাং উচ্ছেদ করিতে হইলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাহাদিগকে অর্থও দেওয়া দরকার। তাই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ আদালত বসিয়াছিল। মিউনিসিপ্যালিটি যে ক্ষতিপূরণ

দিতে প্রস্তুত, যে তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার না করিবে—আদালত যাহা ধার্য করিবে তাহাই সে পাইবে। মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ধার্য টাকা অপেক্ষা যদি আদালত অধিক ধার্য করে তবে আদালতের খরচা মিউনিসিপ্যালিটিকে দিতে হইবে—এই রকম আইন ছিল।

প্রায় সকল বাসিন্দাই আমাকেই তাহাদের দাবি দেখার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল। এই ব্যাপার হইতে আমার রোজগার করার ইচ্ছা ছিল না। আমি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলাম, যদি তোমাদের মামলায় জিত হয় তবে মিউনিসিপ্যালিটি হইতে যে খরচা পাওয়া যাইবে আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব। তাহা ছাড়া মামলায় তোমাদের হারই হোক আর জিতই হোক আমাকে প্রতি মোকদ্দমায় দশ পাউণ্ড হিসাবে দিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহা হইতে অর্ধেক টাকা আমি গরিবদের জন্য হাসপাতাল অথবা সর্বজনীন কোন কাজের জন্য আলাদা করিয়া রাখিয়া দিব। স্বভাবতই তাহারা ইহাতে খুব খুশি হইয়াছিল। প্রায় ৭০টা মামলার মধ্যে একটাতে মাত্র হারিয়াছিলাম। ইহাতে ফী বাবদ আমার অনেক টাকা হাতে আসে। কিন্তু তখন ত 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' টাকার দাবি আমার উপর লাগিয়াই ছিল। তখন পর্যন্ত ১৬০০ পাউণ্ড (২৪০০০ টাকা) উহাতে চলিয়া গিয়াছিল—ইহা আমার স্মরণ আছে।

এই সকল মোকদ্দমায় আমার খুবই পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। মক্কেলের ভিড় ত আমার পাশে লাগিয়াই থাকিত। ইহাদের অধিকাংশই উত্তর ভারতের বিহার ইত্যাদি স্থানের ও দক্ষিণ ভারতের তামিল তেলেগু প্রদেশের লোক। ইহারা প্রায় সকলেই চুক্তিবদ্ধ মজুর হইয়া আসিয়াছিল এবং চুক্তির শেষে স্বাধীনভাবে উপার্জন করিতেছিল।

নিজেদের দুঃখকষ্টের প্রতিকারের জন্যই ইহারা একটি মণ্ডল বা সমিতি গঠন করে। স্বাধীন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মণ্ডল হইতে এই মণ্ডল ভিন্ন ছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন খুব মুক্তহৃদয়, উদারচিত্ত ও চরিত্রবান ব্যক্তিও ছিলেন। মণ্ডলের সভাপতির নাম ছিল শ্রীজেরামসিং এবং সভাপতি না হইলেও সভাপতির মতই আর একজন ছিলেন শ্রীবদ্রী। উভয়েরই দেহান্ত হইয়াছে। উভয়ের নিকট হইতেই আমি খুব সাহায্য পাইয়াছি। শ্রীবদ্রীর পরিচয় আমি খুব ভাল রকমই পাইয়াছিলাম। তিনি সত্যাগ্রহে সর্বাগ্রভাবে ছিলেন। ইঁহাদের এবং অন্যান্য বন্ধুদের মারফতে আমি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষের অসংখ্য অধিবাসীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। কেবল তাঁহাদের উকিল নয়,

আমি তাঁহাদের ভাইও হইয়াছিলাম এবং তাঁহাদের তিনপ্রকার দুঃখেরই অংশীদার হইয়াছিলাম। শেঠ আবদুল্লা আমাকে গান্ধী বলিয়া ডাকিতে অস্বীকার করেন। কে আমাকে 'সাহেব' বলিবে বা মনে করিবে? তাই তিনি খুব প্রিয় একটি নাম বাহির করিলেন। তিনি আমাকে 'ভাই' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নামই আমার শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিল। এখনো চুক্তি-মুক্ত ভারতীয়দের কেউ যখন আমাকে 'ভাই' বলিয়া ডাকে তখন তাহা আমার খুবই ভালো লাগে।

১৫

মড়ক—১

'কুলী লোকেশন'-এর মালিকানা মিউনিসিপ্যালিটির হইলেও, তখনই সেখান হইতে ভারতীয়দের সরাইয়া দেওয়া হয় নাই। তাহাদের অন্য সুবিধামত জায়গা দেওয়ার কথা হইতেছিল। কিন্তু এইরূপ জায়গা মিউনিসিপ্যালিটি তৎক্ষণাৎ ঠিক করিতে না পারায়, সেই নোংরা 'লোকেশন'-এই ভারতীয়দিগকে থাকিতে হইয়াছিল। ঐ 'লোকেশন'এর এখন দুইটা পরিবর্তন হইল। ভারতীয়েরা মালিকের পরিবর্তে স্বাস্থ্য বিভাগের ভাড়াটিয়া হইল ও উহার নোংরা আবহাওয়া আরও বিষাক্ত হইয়া উঠিল। যখন ভারতবাসীরা মালিক ছিল, তখন ইচ্ছায় না হোক, আইনের ভয়েও স্থানটাকে তাহাদের কতকটা সাফ রাখিতে হইত। এখন স্বাস্থ্য বিভাগ মালিক; সুতরাং আর কাহারও ভয় রহিল না। বাড়িগুলিতে ভাড়াটিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল ও তাহার সঙ্গে বৃদ্ধি পাইল ময়লা ও অব্যবস্থা।

এই অবস্থা চলিতেছিল এবং ভারতীয়েরা অসুবিধায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় কালো প্লেগ হঠাৎ তাহাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। এই প্লেগ মারাত্মক। ইহাতে ফুসফুস আক্রান্ত হইত। ইহা 'বিউবনিক' প্লেগ অপেক্ষাও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

সৌভাগ্যবশতঃ এ মড়কের কারণ এই 'লোকেশন' নহে। জোহান্সবর্গের আশেপাশে অনেক সোনার খনি আছে, তাহারই একটায় এই কালো প্লেগ দেখা দেয়। সেখানে প্রধানতঃ নিগ্রোরাই কাজ করিত। তাহাদিগকে পরিচ্ছন্ন রাখার ভার কেবল শ্বেতাঙ্গ মালিকদের উপরেই ছিল। এই খনির এক

অংশে কতকগুলি হিন্দুস্থানীও কাজ করিতেছিল। তাহাদের ২৩ জনের হঠাৎ ছোঁয়াচ লাগে ও একদিন সন্ধ্যায় ভয়ঙ্কর প্লেগ লইয়া 'লোকেশন'-এ নিজেদের থাকার জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই সময় ভাই মদনজিৎ 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এর গ্রাহক করিবার জন্য ও চাঁদা আদায় করিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি 'লোকেশন'এ ঘুরিতে ছিলেন। তাঁহার মধ্যে নির্ভীকতা গুণ খুব ছিল। এই পীড়িতেরা তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল, তাহাদের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি পেন্সিলে লিখিয়া এক চিঠি আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার ভাবার্থ এই :—

"এখানে হঠাৎ কালো প্লেগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। আপনার এই মুহূর্তেই এখানে আসিয়া কিছু করা দরকার। না হইলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হইবে। শীঘ্র আসুন।"

একখানি খালি বাড়ি পড়িয়া ছিল। ভাই মদনজিৎ নির্ভয়ে তালা ভাঙ্গিয়া তাহার দখল নেন। এই পীড়িতদিগকে তাহাতেই রাখিয়াছিলেন। আমি আমার সাইকেলে চড়িয়া 'লোকেশন'-এ পৌঁছিলাম। সেখানে হইতে টাউন ক্লার্ককে অবস্থা জানাইয়া চিঠি পাঠাইলাম এবং কি অবস্থায় ঘর দখল করা হইয়াছে তাহাও জানাইলাম। ডাক্তার উইলিয়াম গডফ্রে জোহানেসবর্গে ডাক্তারি করিতেন। তাঁহার কাছে খবর পৌঁছিতেই তিনি ছুটিয়া আসিলেন ও এই পীড়িতদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ২৩ জন রোগীর জন্য তিনজনের শুশ্রূষা যথেষ্ট নয়।

আমার অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস রহিয়াছে যে, যদি মন শুদ্ধ হয়, তবে সংকটে পড়িলে উপযুক্ত লোক ও ব্যবস্থা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার আপিসে কল্যাণদাস, মোহনলাল এবং আরো দুইজন হিন্দুস্থানী ছিল। সেই দুইজনের নাম এখন মনে নাই। কল্যাণদাসকে তাহার বাপ আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সহৃদয় ও একনিষ্ঠ সুশৃঙ্খল সেবক আমি সেখানে কমই দেখিয়াছি। সৌভাগ্যবশতঃ কল্যাণদাস তখন ব্রহ্মচারী ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে বিপদসংকুল কোনও কাজ দিতে কখনও আমার সংকোচ বোধ হইত না। আর মোহনলালকে আমি জোহানেসবর্গেই পাইয়াছিলাম। সেও কুমার ছিল বলিয়া আমার মনে পড়ে। এই চারজন কেরানী সাথী বা পুত্র যাই বলা যাক না কেন—তাহাদিগকে বলি দিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম। কল্যাণদাসকে আর কি জিজ্ঞাসা করিব? অপর সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেই তাঁহারা প্রস্তুত

হইয়া গেলেন। "তুমি যেখানে, আমরাও সেখানে" এই সংক্ষেপ ও মিষ্ট জবাব তাঁহারা দিলেন।

মিঃ রিচের পরিবার ছিল বড়। তিনি নিজে ঝাঁপাইয়া পড়িতে তৈরি হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে বারণ করিলাম। তাঁহাকে এই সংকটে টানিবার জন্য আমি মোটেই তৈরি ছিলাম না, আমার সাহসও ছিল না। তবে তিনি বাহিরের সমস্ত কাজ করিতেন।

শুশ্রূষাকারীদের পক্ষে এই এক রাত্রি বড় ভয়ানক ছিল। আমি অনেক রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছি কিন্তু প্লেগের রোগীর শুশ্রূষা করার অবসর কখনো পাই নাই। ডাক্তার গডফ্রের সাহস আমাদিগকে নির্ভয় করিয়া ফেলিল। রোগীদিগের সেবা করার বেশি কিছু ছিল না। যাহা ছিল, তাহা কেবল ঔষধ খাওয়ানো, আশ্বাস দেওয়া, জল-টল দেওয়া, আর তাহাদের মলমূত্রাদি সাফ করা।

এই চার যুবকের স্ফূর্তি, শ্রম ও নির্ভীকতায় আমার আনন্দের সীমা ছিল না। ডাক্তার গডফ্রের নিঃশঙ্কতা বুঝিতে পারি, মদনজিৎকে বুঝিতে পারি, কিন্তু এই যুবকদের! রাত্রি যেমন তেমন করিয়া কাটিল। আমার স্মরণ আছে সে রাত্রিতে কোনও রোগী মরে নাই।

এই প্রসঙ্গ যেমন করুণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ও আমার দৃষ্টিতে ধর্মময়। সেইজন্য এই প্রসঙ্গে আরও অন্ততঃ দুইটি অধ্যায় দেওয়া আবশ্যক।

১৬

মড়ক—২

মিউনিসিপ্যালিটির 'লোকেশন' বাড়ি ঐ প্রকারে রোগীদের দ্বারা দখল করার জন্য টাউন ক্লার্ক আমাদের কাছে উপকৃত হইয়াছেন—একথা স্বীকার করিয়া একটি পত্রদ্বারা জানাইলেন—"ঐ অবস্থায় হঠাৎ রোগীদের ব্যবস্থা করার মত উপায় আমার কাছে ছিল না। আপনার যাহা সাহায্য চাই জানাইবেন এবং সেজন্য যা করা যাইতে পারে টাউন কাউন্সিলার সাধ্যমত তাহা করিবেন।" যাহা ঘটিয়াছে তাহা হইতে সাবধান হইয়া মিউনিসিপ্যালিটি অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিলেন না।

দ্বিতীয় দিন একটা খালি গুদাম তাঁহারা আমাদের দিলেন এবং সেইস্থানে

রোগীদের লইয়া যাইতে বলিলেন। উহা সাফ করার ভার মিউনিসিপ্যালিটি লইতে পারিলেন না। বাড়িটা অপরিষ্কার ছিল। আমরা গিয়া উহা সাফ করিলাম। খাটিয়া ইত্যাদি জিনিসপত্র সহানুভূতিপরায়ণ ভারতবাসীদের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া, তখনকার কাজ চালাইবার মত হাসপাতাল খাড়া করা হইল। মিউনিসিপ্যালিটি একজন নার্স (শুশ্রূষাকারিণী) পাঠাইলেন এবং তাঁহার সহিত ব্র্যাণ্ডির বোতল ও রোগীদের জন্য অন্যান্য জিনিসপত্রও পাঠাইলেন। ডাক্তার গডফ্রে যেমন ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তেমনি রহিলেন।

শুশ্রূষাকারিণীর রোগীদের স্পর্শ করিতে হয়। নার্স নিজেও তাদের স্পর্শ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইনি স্বভাবতই দয়ালু প্রকৃতির। কিন্তু যাহাতে বিপদের সংস্পর্শে আসিতে না হয় তাহার জন্যই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

রোগীদের মাঝে মাঝে ব্র্যাণ্ডি খাওয়ানোর নির্দেশ ছিল। নার্স রোগ-সংক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য আমাদিগকেও কিছু কিছু ব্রাণ্ডি খাওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং নিজেও খাইতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের মধ্যে ব্রাণ্ডি খায় এমন কেউ ছিল না। আমার ত রোগীদের ব্র্যাণ্ডি দেওয়ার ইচ্ছা হইল না। ডাক্তার গডফ্রের অনুমতি লইয়া, যাহারা ব্র্যাণ্ডি না খাইতে ও মাটির প্রলেপ লাগাইতে স্বীকার করিয়াছিল, এমন তিনজনের মাথায় ও বুকের ব্যথা-স্থানে মাটির ব্যাণ্ডেজের প্রলেপ লাগাইলাম। এই তিনজন রোগীর ভিতর দুইজন বাঁচিল, বাকি সকল রোগীরই দেহান্ত হইল। বিশজন রোগী ত সেই গুদামেই মারা যায়।

মিউনিসিপ্যালিটি অন্যান্য ব্যবস্থা করিতেছিলেন। জোহানেসবর্গ হইতে সাত মাইল দূরে একটি 'লেজারেটো' অর্থাৎ সংক্রামক রোগের হাসপাতাল ছিল। সেইখানে তাঁবু খাড়া করিয়া এই দুইজন রোগীকে তাঁহারা লইয়া গেলেন। আর যদি নতুন কেউ প্লেগে আক্রান্ত হয় তবে তাহাকেও সেইখানে লওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। আমরা এই কাজ হইতে মুক্ত হইলাম। অল্পদিনেই আমরা সংবাদ পাইলাম যে, সেই ভালমানুষ নার্সটিরও প্লেগ হইয়াছিল এবং তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। কেন যে সেই রোগীরা বাঁচিয়াছিল, আর কেন যে আমাদিগকেও রোগ স্পর্শ করে নাই, তাহা কেউ বলিতে পারে না। তবে ইহার পর মাটির প্রয়োগের উপর আমার শ্রদ্ধা এবং ঔষধ হিসাবে ব্র্যাণ্ডির উপর আমার অশ্রদ্ধা আরও বাড়িল। আমি জানি যে, এই শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা কোন বিশেষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কিন্তু আমার উপর তখন যে ছাপ পড়িয়াছিল এবং যাহা

আজ অবধিও চলিয়া আসিতেছে, তাহা আমি ধুইয়া ফেলিতে পারি না। সেইজন্ত এই প্রসঙ্গে উহার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

এই প্লেগ দেখা দেওয়ার পরই আমি সংবাদপত্রে এক কড়া চিঠি লিখি। তাহাতে আমি 'লোকেশন' হাতে লওয়ার পর সমস্ত অব্যবস্থার জন্য ও এই প্লেগের জন্ম মিউনিসিপ্যালিটিকেই দায়ী করি। সেই পত্রের জন্তই আমি মিঃ হেনরী পোলককে পাইয়াছিলাম। আর সেই পত্রই, পরলোকগত জোসেফ ডোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের অন্যতম কারণ।

পূর্বের এক অধ্যায়ে আমি জানাইয়াছি যে, খাওয়ার জন্য আমি এক নিরামিষ ভোজনালয়ে যাইতাম। সেইখানে মিঃ আলবার্ট ওয়েস্টের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমার সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় এই ভোজনালয়ে তাঁহার দেখা হইত। মিঃ ওয়েস্ট এক ছোট ছাপাখানার অংশীদার ছিলেন। তিনি সংবাদপত্রে প্লেগ সম্পর্কে আমার লিখিত পত্রখানি পড়িয়াছিলেন ও আমাকে খাওয়ার সময় হোটেলে না দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আমি ও আমার সঙ্গী সেবকেরা প্লেগের সময় একরকম কিছু খাইতাম না। অনেক দিন হইতে আমার ধারণা ছিল যে, মড়ক আরম্ভ হইলে পেট যত কম ভারী থাকে ততই ভাল। এইজন্য আমি বিকালে খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলাম। দুপুরের খাওয়া ও লোকের সঙ্গে মেলামেশা হইতে দূরে থাকিবার জন্য, কেউ আসিবার পূর্বে খাইয়া আসিতাম। ভোজনালয়ের মালিকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁহাকে আমি বলিয়া দিয়াছিলাম যে, আমি মড়কের রোগীর সেবা করিতেছি। সেইজন্য অপরের সঙ্গে যতটা পারি কম কাছাকাছি আসিতে চাই।

আমাকে হোটেলে দেখিতে না পাওয়ার দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে, খুব ভোরে যখন আমি বেড়াইতে বাহির হওয়ার জন্য তৈরি হইতেছিলাম, তখন মিঃ ওয়েস্ট আমার দরজায় ঘা দিলেন। বাহির হইতেই তিনি বলিলেন— "তোমাকে হোটেলে না দেখিয়া আমি ভয় পাইয়াছিলাম। ভাবিতেছিলাম— তোমার কিছু হয় নাই ত! সেইজন্তই এসময় তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। আমার দ্বারা কোনও সাহায্য যদি হইতে পারে তবে বলিও। আমি রোগীদের শুশ্রূষা করার জন্ত প্রস্তুত আছি। তুমি ত জান যে, নিজের পেট ভরাইবার ভার ব্যতীত আমার উপর আর কোনও দায়িত্ব নাই!"

আমি মিঃ ওয়েস্টকে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম এবং এক মিনিটও বিবেচনার সময় না লইয়া বলিলাম, "তোমাকে নার্সের কাজের জন্য আমি লইব না। যদি আর রোগী না হয়, তবে আমার কাজ দুই-এক দিনেই চুকিয়া যাইবে। তবে আর একটি কাজ আছে সত্য।"

"কি সে কাজ?"

"তুমি ডারবানে গিয়া 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' প্রেসের ব্যবস্থার ভার লইবে? মদনজিৎ ত এখন এইখানেই কাজে আটকা পড়িয়াছেন। সেখানে কারুর যাওয়া আবশ্যক। তুমি যদি যাও, তবে আমার ওদিককার চিন্তা হাল্কা হইয়া যায়।"

মিঃ ওয়েস্ট জবাব দিলেন, "আমার হাতে ছাপাখানা আছে তাহা ত তুমি জান। যাওয়ার জন্য আমি অনেকটা তৈরি আছি। চূড়ান্ত জবাব বিকালে দিলে হয় না? বেড়াইতে বাহির হইয়া সেই সময় কথা বলিব।"

আমি খুশি হইলাম। সেই দিন সন্ধ্যায় কিছু কথাবার্তা হইল। স্থির হইল—মিঃ ওয়েস্টকে প্রতি মাসে দশ পাউণ্ড বেতন ও ছাপাখানায় যদি কোনও লাভ হয় তবে তাহার একটা অংশ দেওয়া হইবে। মিঃ ওয়েস্ট টাকার জন্য যাইতেছিলেন না। সেইজন্য তাঁহার নিকট বেতনের প্রশ্ন একটা প্রশ্নই ছিল না। দ্বিতীয় দিন রাত্রির মেলে মিঃ ওয়েস্ট তাঁর বাকি পাওনা আদায়ের ভার আমার উপর দিয়া, ডারবান যাওয়ার জন্য রওনা হইলেন। সেই হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিলেন।

বিলাতের লাউথের (লিংকনশায়ার) এক কৃষক-পরিবারের ছেলে মিঃ ওয়েস্ট। স্কুলে সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত। নিজের পরিশ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতার স্কুলে শিক্ষিত, শুদ্ধ, সংযমী, ঈশ্বরভীরু, সাহসী, পরোপকারী ইংরাজ বলিয়া আমি মিঃ ওয়েস্টকে বরাবর জানিয়াছি। তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের পরিচয় পরবর্তী অধ্যায় সমূহে বর্ণনা করা হইবে।

১৭

'লোকেশন' ভস্মীভূত

আমি ও আমার সঙ্গীরা 'লোকেশন'এর পীড়িতদের শুশ্রূষার কাজ হইতে যেমন মুক্ত হইলাম, তেমনি মড়ক হইতে উৎপন্ন অন্য কাজ আসিয়া মাথার উপর চাপিয়া পড়িল।

'লোকেশন'এর স্থিতি সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যালিটি অবহেলা করিলেও শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের জন্য ২৪ ঘণ্টাই সজাগ থাকিত। তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য টাকা খরচ করিতে তাহার কৃপণতা ছিল না এবং এখন মড়ক যাহাতে আর ছড়াইয়া না পড়ে তাহার জন্য জলের ন্যায় টাকাও ঢালিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়দের প্রতি ব্যবহারে আমি মিউনিসিপ্যালিটির খুবই দোষ দেখিয়াছি। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে এই উদ্বেগের জন্য আমি মিউনিসিপ্যালিটিকে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবং এই শুভ চেষ্টায় আমার দ্বারা যতটা সাহায্য হইতে পারে, তাহা দিতে প্রস্তুত বলিয়া জানাইলাম। আমার বিশ্বাস, আমি যদি উহাকে ঐ প্রকার সাহায্য না করিতাম, তবে মিউনিসিপ্যালিটিকে মুশকিলে পড়িতে হইত, বন্দুক ব্যবহার করিতে হইত, এবং নিজের সংকল্প অনুসারে কাজ করিতে গিয়া হয়ত ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কোনও অন্যায় তাহাকে করিতে হইত।

কিন্তু সে সকল কিছু করিতে হয় নাই। ভারতীয়দের আচরণে মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীরা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পক্ষে কাজও ঢের সহজ হইয়া গিয়াছিল। মিউনিসিপ্যালিটির নির্দেশ অনুযায়ী চলার জন্য ভারতবাসীদের উপর আমার সমস্ত প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছিলাম। এই নির্দেশ পালন করা তাহাদের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু একজনও আমার কথা অমান্য করিয়াছে এমন মনে হয় না।

'লোকেশন' হইতে যাহাতে কেউ বিনা হুকুমে বাহির না হইতে পারে অথবা প্রবেশ না করিতে পারে সেজন্য চারিদিকে পাহারা বসিয়াছিল। কিন্তু আমার সঙ্গীদের ও আমার যাতায়াতের খোলা হুকুম ছিল। মিউনিসিপ্যালিটি সংকল্প করেন যে, 'লোকেশন'বাসী সকলকে জোহানেসবর্গ হইতে তের মাইল দূরবর্তী খোলামাঠে তাঁবু খাটাইয়া তিন সপ্তাহের জন্য বাস করিতে হইবে এবং 'লোকেশন' জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে। তাঁবু খাটাইয়া নতুন গ্রাম বসাইতে, সেখানে খাদ্যাদি দ্রব্য লইয়া যাইতে কয়েকদিন প্রয়োজন। আর সেই জন্যই কয়েক দিনের জন্য পাহারা বসানো আবশ্যক ছিল।

লোকে খুব ভীত হইয়া পড়ে। তবে আমি তাহাদের কাছে থাকায় আশ্বাস পাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেক গরীব নিজেদের টাকাপয়সা ঘরের ভিতর পুঁতিয়া রাখিত। এখন তাহা খুঁড়িয়া তুলিতে হইল। তাহাদের ব্যাঙ্ক ছিল না। ব্যাঙ্কের ব্যবহার তাহারা জানিত না। আমি তাহাদের

ব্যাঙ্ক হইলাম। আমার কাছে টাকাপয়সার স্তূপ হইল। এই কাজের জন্য আমার পারিশ্রমিক লওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কষ্টেসৃষ্টে আমি এই কাজের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলাম।

আমার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার ভাল রকমেরই পরিচয় ছিল। তাঁহার কাছে সমস্ত টাকা পাঠাইতে হইবে—একথা তাঁহাকে জানাইলাম। ব্যাঙ্কগুলি তামা ও রূপার মুদ্রা জমা লওয়ার জন্য বড় রাজী নয়। তার উপর মড়কের স্থান হইতে আনা টাকাপয়সা স্পর্শ করিতে কেরানীদের দ্বিধা হওয়ারও আশঙ্কা ছিল। ম্যানেজার আমার সকল অসুবিধা দূর করিয়া দিলেন। টাকাপয়সাগুলি বীজাণুনাশক জলে ধুইয়া ব্যাঙ্কে পাঠানো স্থির হইল। আমার স্মরণ হয়, এই সময় প্রায় ৬০,০০০ পাউণ্ড (নয় লক্ষ টাকা) ব্যাঙ্কে রাখা হইয়াছিল। যাহাদের কাছে কিছু বেশি পরিমাণ টাকা আছে, তাহাদের আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা সুদে ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত রাখিবার পরামর্শ দিলাম। এবং তাহারা আমার সে পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ফলে তাহাদের কাহারও কাহারও ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অভ্যাস হইয়াছিল।

জোহানেসবর্গের কাছেই ক্লিপস্প্রুট ফার্ম নামে জায়গা আছে। সেইখানে 'লোকেশন'বাসীদের স্পেশাল ট্রেনে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার খরচা মিউনিসিপ্যালিটিই বহন করিয়াছিল। এই তাঁবুর গ্রাম দেখিতে সিপাহীদের ছাউনির মত হইয়াছিল। লোকের এই রকমে থাকার অভ্যাস নাই বলিয়া মানসিক দুঃখ কিছু হইয়াছিল সত্য, ও খানিকটা নূতন-নূতনও ঠেকিতেছিল, কিন্তু সত্যকারের অসুবিধা কিছু ভুগিতে হয় নাই।

আমি প্রতিদিন একবার বাইসাইকেলে চড়িয়া সেখানে যাইতাম। তিন সপ্তাহকাল খোলা হাওয়ায় থাকিয়া লোকের স্বাস্থ্যও অবশ্যই ভাল হইয়াছিল। আর মানসিক দুঃখ ত প্রথম ২৪ ঘণ্টা যাইতে না যাইতেই ভুলিয়া গিয়াছিল। তারপর তাহারা আনন্দে থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি যখনই গিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি ভজন-কীর্তন, আমোদ-আহ্লাদ চলিতেছে।

আমার স্মরণ আছে যে, তাহারা যেদিন 'লোকেশন' খালি করিয়া চলিয়া যায়, তাহার পরদিনই উহা ভস্মীভূত করা হয়। উহা হইতে একটা জিনিসও বাঁচাইবার চেষ্টা মিউনিসিপ্যালিটি করে নাই। এই কারণেই বাজারে মিউনিসিপ্যালিটির নিজের যে কাঠের গোলা ছিল, তাহার সমস্ত কাঠও

পোড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে তাহার প্রায় দশ হাজার পাউণ্ড লোকসান হইয়াছিল। বাজারে মরা ইন্দুর পাওয়াই এই চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কারণ। অজস্র টাকা যেমন খরচ হইয়াছিল, ফলে তেমনি মড়ক আর বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। শহর নির্ভয় হইয়াছিল।

১৮

পুস্তকের যাদুমন্ত্র

এই মড়কের জন্য, গরিব ভারতবাসীদের উপর আমার প্রভাব, আমার ব্যবসা ও আমার দায়িত্ব বাড়িল। ইউরোপীয়ানদের মধ্যে আমার যে পরিচয় বাড়িয়া চলিয়াছিল উহাও এই ব্যাপারে এত ঘনিষ্ঠ হইল যে, তাহাতে আমার নৈতিক দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গেল।

ওয়েস্টের মতই পোলকের সঙ্গেও আমার পরিচয় নিরামিষ ভোজন-গৃহেই হয়। আমি যে টেবিলে বসিতাম তাহা হইতে একটু দূরে এক টেবিলে একদিন এক নবযুবক আহার করিতেছিলেন। তিনি আমার সহিত কথা বলার জন্য নিজের নাম পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে আমার টেবিলে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করিলাম। তিনি আসিলেন।

"আমি 'ক্রিটিক' কাগজের সহকারী সম্পাদক। আপনার মড়ক সম্বন্ধে পত্র পড়িয়াছি, তাহার পর আপনার সহিত দেখা করার আমার খুব ইচ্ছা হইয়াছে। আজ আমার সেই সুযোগ হইয়াছে।"

মিঃ পোলকের অকপট ভাবে আমি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম। সেই রাতে আমাদের পরস্পর পরিচয় হইয়া গেল এবং জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের ধারণার ভিতর যে খুব সমতা আছে তাহাও বুঝিতে পারিলাম। সাদাসিধা জীবনযাত্রা তাঁহার পছন্দ ছিল। তাঁহার বুদ্ধিতে যদি কিছু ভাল লাগে তবে তদনুযায়ী আচরণ করার ক্ষমতা তাঁহার আশ্চর্য রকমের ছিল। নিজের জীবনে তিনি কতকগুলি পরিবর্তন ত একেবারে হঠাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন।

'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' খরচ বাড়িয়াই যাইতেছিল। ওয়েস্টের প্রাথমিক রিপোর্টই আমাকে ভয় পাওয়াইবার মত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"আপনি যেমন বলিয়াছেন এ কাজে তেমন লাভ নাই, আমি ত লোকসান দেখিতেছি।

হিসাবপত্রের অব্যবস্থা আছে, ধারবাকি অনেক আছে, তাহা আদায় হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। অনেক পরিবর্তন করিতে হইবে। কিন্তু লাভ নাই বলিয়াই যে কাজ ছাড়িয়া দিব, তাহা নয়।"

লাভ নাই বলিয়া ওয়েস্ট কাজ অনায়াসেই ছাড়িয়া দিতে পারিতেন, আমিও তাঁহাকে কোনও দোষ দিতে পারিতাম না। কেবল তাহাই নয়, উপযুক্ত প্রমাণ বিনা ঐ কাজকে লাভজনক বলার জন্য আমাকে তিনি দোষও দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আমাকে কখনো একটা কড়া কথাও শোনান নাই। আমার মনে হয় যে, এই নতুন অনুভব হইতে ওয়েস্ট আমার সম্বন্ধে এই ধারণা করিয়াছিলেন যে, আমি অল্পেতেই বিশ্বাস করিয়া ফেলি। মদনজিতের কথায় কোনও প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়াই আমি ওয়েস্টকে লাভের কথা বলিয়াছিলাম। আমার মনে হয়, যাঁহারা সাধারণের কাজ করেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করিয়া যাহা নিজে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে তাহাই বলা উচিত। সত্যের পূজারীর ত খুবই সাবধান হওয়া আবশ্যক। কোনও বিষয়ে পুরা অনুসন্ধান না করিয়া সে বিষয় সম্বন্ধে অপরের বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়ায় সত্যের উপর আঘাত করা হয়। আমার দুঃখ হয় যে, ইহা জানিয়াও তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করিয়া কাজ করিয়া লওয়ার ইচ্ছায় আমার প্রকৃতিগত অভ্যাসকে এখনও সম্পূর্ণ সংশোধন করিতে পারি নাই। শক্তির অপেক্ষা অধিক কাজ করার লোভের পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। এই লোভ হইতে আমি গোলে পড়ি ও আমার অপেক্ষা সাথীদিগকে আরও বেশি গোলমালে ফেলি।

ওয়েস্টের এই পত্র পাইয়া আমি নাতাল রওনা হইলাম। পোলক ত আমার সমস্ত কথাই জানিতেন। আমাকে তুলিয়া দিতে তিনি স্টেশনে আসিয়াছিলেন। "এই পুস্তক রাস্তায় পড়ার উপযুক্ত, ইহা পড়িয়া দেখিবেন, আপনার নিশ্চয় ভাল লাগিবে"—এই বলিয়া রাস্কিনের 'আনটু দিস লাস্ট' (Unto this last) নামক বইখানা তিনি আমার হাতে দিয়া গেলেন।

পুস্তকখানা পড়িতে লইয়া দেখিলাম উহা আর রাখিতে পারা যায় না। উহা আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইল। জোহানেসবর্গ হইতে নাতাল ২৪ ঘণ্টার মত রাস্তা। ট্রেন সন্ধ্যাবেলায় ডারবান পঁহুছে। সেখানে পঁহুছিয়া সারারাত ঘুম আসিল না। পুস্তকের প্রদর্শিত আদর্শ কার্যতঃ গ্রহণ করার জন্য কৃতনিশ্চয় হইলাম।

ইহার পূর্বে রাস্কিনের কোনও বই আমি পড়ি নাই। বিদ্যাভ্যাসকালে আমি পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে কিছুই পড়ি নাই বলা যায়। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার পরও খুব কমই পড়িয়াছি। এমন কি আজও একথা বলা যায় যে, আমার পুস্তকের জ্ঞান খুবই কম। এই অনায়াসলব্ধ বা বাধ্যতামূলক সংযম দ্বারা আমার ক্ষতি হয় নাই বলিয়াই আমি মনে করি। যে অল্পস্বল্প পুস্তক পড়িয়াছি তাহা আমি ভালরকম হৃদ্গত করিয়াছি একথা বলা যায়। এই সব বইর মধ্যে, এই Unto this last আমার জীবনে তখন-তখনই, মহৎ পথ গ্রহণ করার মত উপযুক্ত মানসিক পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল। পরে আমি বইটির অনুবাদ করিয়াছিলাম ও তাহার নাম দিয়াছিলাম 'সর্বোদয়'।

যে সমস্ত গভীর বিশ্বাস আমার হৃদয়ে নিহিত ছিল, এই বইটিতে আমি তাহারই কতকগুলির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেইজন্য এই বইটি আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং উহার নির্দেশ অনুযায়ী আচরণও আমাকে দিয়া করাইয়া লইয়াছিল। নিজের ভিতর যেসব ভাবনা সুপ্ত থাকে, তাহা জাগ্রত করার শক্তি যে ধারণ করে, সে-ই কবি। সকলের উপর সকল কবির সমান প্রভাব হয় না। কেন না সকলের সকল ভাবনা এক রকমে গঠিত হয়।

'সর্বোদয়ে'র সিদ্ধান্ত আমি এই রকম বুঝিয়াছি :—

১। সকলের ভালতেই নিজের ভাল রহিয়াছে।

২। উকিল ও নাপিতের কাজের মূল্য একই রকম হওয়া চাই, কেন না জীবিকা উপার্জনের অধিকার উভয়েরই সমান।

৩। সাধারণ মজুর ও কৃষকের জীবনই আদর্শ জীবন।

প্রথম বিষয়টি আমি জানিতাম। দ্বিতীয়টি আমি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতাম, তৃতীয়টির বিষয় আমি ভাবিই নাই। প্রথমটির ভিতর যে অপর দুইটি সিদ্ধান্তই রহিয়াছে, ইহা 'সর্বোদয়' পড়ার পর আমার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইল। সকাল হইলেই আমি ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আচরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম।

১৯

ফিনিক্স আশ্রমস্থাপনা

সকালে আমি প্রথমেই মিঃ ওয়েস্টের সঙ্গে কথা বলিলাম। আমার উপর 'সর্বোদয়' যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা শুনাইলাম ও প্রস্তাব করিলাম যে, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'কে কোনও এক কৃষিক্ষেত্রস্থ বাটীতে লইয়া যাইব। সেখানে সকলেই খাওয়া-পরার জন্য একই রকম উপার্জন করিবে, সকলেই নিজের জন্য চাষ করিবে এবং যে সময় বাঁচিবে তাহা 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'এর জন্য ব্যয় করিবে। ওয়েস্ট এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। স্থির হইল— প্রত্যেকেই নিজের নিজের খরচা সব চাইতে যত কমে হয় তাই করিবেন। সকলেরই মাসিক বৃত্তি তিন পাউণ্ড ধরা হইল। সাদা-কালোর ভেদ রাখা হইবে না।

প্রেসে প্রায় দশজন লোক কাজ করিত। প্রথমতঃ, জঙ্গলে গিয়া বাস করিতে সকলে প্রস্তুত কিনা, দ্বিতীয়তঃ, সকলে একরকম খাওয়া-পরার যোগ্য রোজগার করিতে রাজী কিনা, ইহাই প্রশ্ন ছিল। আমরা ইহাও স্থির করিলাম যে, এই শর্তে যে রাজী নয়, সে নিজের বেতন পাইবে এবং ক্রমে ক্রমে যাহাতে ঐ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে পারে সেই আদর্শ গ্রহণ করিবে।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি কর্মীদের সঙ্গে কথা আরম্ভ করি। শ্রীমদনজিৎ ইহা আদৌ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি নিঃসংশয়ে বলিলেন যে, যাহাতে তাঁহার সমস্ত দেহ-মন ঢালিয়া দিয়াছেন তাহা এক মাসের মধ্যেই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' চলিবে না, প্রেসও চলিবে না, আর কর্মীরাও পলাইয়া যাইবে। আমার ভাইপো শ্রীছগনলাল গান্ধী এই প্রেসে কাজ করিত। মিঃ ওয়েস্টের কাছে প্রস্তাব করার সময়েই আমি তাহার কাছেও ঐ প্রস্তাব করি। তাহাকে পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত। সে বাল্যকাল হইতে আমার শিক্ষাধীনে থাকিতে ও কাজ করিতে পছন্দ করিত। আমার উপর তাহার গভীর বিশ্বাস ছিল। সে কোনও যুক্তিতর্ক না করিয়াই স্বীকৃত হইল ও আজ পর্যন্তও আমার সঙ্গেই আছে।

তৃতীয় ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দ স্বামী নামে একজন মেশিনম্যান। সেও রাজী হইল। বাকি সকলে যদিও এক সংস্থা-বাসী হইল না, তথাপি প্রেস যেখানেই

লইয়া যাই, সেখানেই তাহারা যাইতে রাজী হইল। কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তায় দুইদিনের বেশি লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ডারবানের নিকট কোনও রেল স্টেশনের কাছে এক খণ্ড জমি চাই বলিয়া আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলাম। জবাবে ফিনিক্সের জমির প্রস্তাব আসিল। আমি ও মিঃ ওয়েস্ট উহা দেখিতে গেলাম। সাতদিনের মধ্যে ২০ একর (৬০ বিঘা) জমি লইলাম। উহাতে একটা ছোট ঝরণা ছিল। কয়েকটা লেবু ও আমের ঝাড় ছিল। এই জমির সংলগ্ন ৮০ একরের আরও এক খণ্ড জমি ছিল। উহাতে কিছু গাছ ও একটা ভাঙ্গাঘর ছিল। এই জমিখণ্ডও অল্পদিন পরে খরিদ করিলাম। দুই খণ্ড জমির জন্য দাম পড়িল ১০০০ পাউণ্ড।

শেঠ পারসী রুস্তমজী আমাকে এই ধরনের দুঃসাহসিক কাজের প্রশ্রয় দিতেন। আমার এই ব্যবস্থা তাঁহার মনঃপূত হইল। একটা বড় গুদামের করগেট টিন ও গৃহ নির্মাণের অন্য জিনিসপত্র যা তাঁর কাছে ছিল, তা তিনি বিনামূল্যে দিলেন। তারপর বাড়ি তৈরির কাজ আরম্ভ করিলাম। কয়েকজন ভারতীয় ছুতার ও রাজমিস্ত্রী লড়াইয়ের সময় আমার সঙ্গে ছিল। তাহাদের ডাকিয়া আনিলাম। এক মাসের মধ্যে ঘর তৈরি হইয়া গেল। ঘরটি ৭৫ ফুট লম্বা ও ৫০ ফুট চওড়া ছিল। মিঃ ওয়েস্ট প্রভৃতি শারীরিক বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও উহাদের সঙ্গে কাজে লাগিয়া গেলেন।

ফিনিক্সে খুব ঘাস ছিল। আর লোকের ঘড়বাড়ি আদৌ ছিল না। সেই জন্য সাপের উপদ্রব ও ভয় ছিল। প্রথমে সকলেই তাঁবু খাটাইয়া থাকিত। প্রধান ঘরখানা তৈরি হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সব জিনিসপত্র গাড়ি করিয়া সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। ডারবান ও ফিনিক্সের মধ্যে ১৪ মাইল ব্যবধান। ফিনিক্স স্টেশন হইতে আধ মাইল দূরে অবস্থিত।

মাত্র এক সংখ্যা 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' 'মার্কারি' প্রেসে ছাপাইতে হইয়াছিল। আমার সঙ্গে যে সকল আত্মীয় ও বন্ধু ভারতবর্ষ হইতে সেখানে গিয়াছিলেন ও ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার মতে আনিতে ও ও ফিনিক্সে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাঁহারা সকলেই টাকা রোজগারের জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে বোঝানো মুশকিল ছিল। তবুও অনেককে বুঝাইয়া রাজী করিয়াছিলাম। তাঁহাদের সকলের মধ্যে আমি শ্রীমগনলাল গান্ধীর নাম বিশেষ করিয়া বলিতেছি; কেন না আর যাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছিলাম, তাঁহারা অল্পদিন ফিনিক্সে

থাকিয়া আবার উপার্জনে লাগিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীমগনলাল গান্ধী* নিজের ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সেই যে আসিয়াছেন, সেই হইতেই আমার সঙ্গে রহিয়াছেন। তিনি নিজের বুদ্ধিবলে ত্যাগশক্তিতে ও অনন্ত ভক্তিতে আমার আধ্যাত্মিক পরীক্ষাক্ষেত্রে আমার মূল সঙ্গীদের মধ্যে প্রধান পদ লইয়া আছেন এবং স্বয়ং শিক্ষিত কারিগর বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন।

এই প্রকারে ১৯০৪ সালে ফিনিক্সের স্থাপনা হয়। এবং বহু বিড়ম্বনা সত্ত্বেও ফিনিক্স-সংস্থা ও 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' আজও টিকিয়া আছে। এই সংস্থার আরম্ভের সময়কার বিপদ ও বাসিন্দাদের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আলোচনার যোগ্য। উহা অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

২০

প্রথম রাত্রি

ফিনিক্স হইতে প্রথম সংখ্যার 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' বাহির করা সহজে সম্ভব হয় নাই। দুটি বিষয়ে সাবধান হওয়ার খেয়াল আমার না হইলে, এক সংখ্যা এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিত অথবা বিলম্বে বাহির হইত। এই সংস্থায় এঞ্জিন দ্বারা প্রেস চালাইবার ব্যবস্থা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। যেখানে কৃষিকাজ হাতেই করা হইবে, সেখানে ছাপার কাজও হাতে-চালানো যন্ত্র দ্বারা করাই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা সম্ভবপর না হওয়ায় ওখানে একটা তৈল-চালিত এঞ্জিন লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু এই এঞ্জিন যদি বিগড়ায়, তবে তখনকার কাজ চালাইবার অন্য কোনও ব্যবস্থা রাখিতে পারিলে ভাল হয়, এই প্রস্তাব আমি মিঃ ওয়েস্টকে দিয়াছিলাম। সেইজন্য তিনি হাতে চালাইবার জন্যও একটা চাকা লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন ও তার দ্বারা ছাপার মেশিন যাতে চালানো যায়, সে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাগজের আকার দৈনিক পত্রের মত ছিল। বড় যন্ত্র যদি বিগড়ায় তবে তাহা শীঘ্র মেরামত হইতে পারে, এমন সুবিধা সেখানে ছিল না। তাহা হইলে কাগজ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা। এই আশঙ্কায় কাগজের আকার বদলাইয়া সাধারণ সাপ্তাহিকের মত করা হইয়াছিল—যেন অসুবিধা

* গত ১৯২৮ সালে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

উপস্থিত হইলে ছোট ট্রেডল মেশিনেও কিছু ছাপানো যায়। প্রথম প্রথম 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' প্রকাশের পূর্বরাত্রিতে ছোট বড় সকলকেই জাগিতে হইত। পাতা ভাঁজ করার কাজে ছোট বড় সকলকেই লাগিত। উহা রাত্রি দশটা-বারোটায় শেষ হইত। কিন্তু প্রথম রাত্রির কথা ভুলিবার নয়। ছাপাইবার ব্যবস্থা সব সম্পূর্ণ, কিন্তু এঞ্জিন চলে না। এঞ্জিন বসাইবার ও চালাইবার জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার আনা হইয়াছিল। তিনি ও মিঃ ওয়েস্ট অক্লান্তপরিশ্রম করিয়াও এঞ্জিন চালাইতে পারিলেন না। সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে নিরাশ হইয়া জলভরা চোখে আমার কাছে আসিয়া মিঃ ওয়েস্ট বলিলেন—"এঞ্জিন আজ আর চলিতেছে না, সুতরাং এই সপ্তাহের কাগজ সময়মত বাহির করার কোনও আশা নাই।"

"যদি তাই হয় তবে আমরা নাচার। কিন্তু তাহাতে চোখের জল ফেলিবার কারণ নাই। এখনো যদি কিছু করার থাকে তবে তাই করা যাক। সে হাতচাকার কি হইল?" এই বলিয়া আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম।

মিঃ ওয়েস্ট বলিলেন—"হাতচাকা চালাইবার লোক আমাদের কাছে কোথায়? আমরা যাহারা আছি তাহাদের দ্বারা চাকা চলিবে না। উহা চালাইবার জন্য এক-একবারে চার-চারজন লোক চাই। আমাদের লোক সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ছুতারের কাজ শেষ হইতে তখনও বাকি ছিল। সেইজন্য ছুতারেরা তখনও বিদায় হয় নাই। তাহারা ছাপাখানাতেই শুইয়া থাকিত। তাহাদিগকে দেখাইয়া আমি বলিলাম—"কিন্তু এই সকল মিস্ত্রী আছে, ইহাদের কথা কি বল? আজ এই কাজের জন্য ইহারা ও আমরা সকলে সারারাত জাগিব। আমার মনে হয় এই কর্তব্যই বাকি আছে।"

"মিস্ত্রীদের উঠাইতে ও তাহাদের সাহায্য চাহিতে আমার সাহস হয় না। আর আমাদের লোকেরা সত্যসত্যই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।"

আমি বলিলাম, "এটা আমার কাজ।"

"যদি সম্ভব হয় তবে আপনি ব্যবস্থা করুন।"

আমি মিস্ত্রীদিগকে জাগাইয়া তাদের সাহায্য চাহিলাম। বেশি বলিতে হইল না। তারা বলিল—"এমন সময় যদি আমরা কাজে না লাগি, তবে আমরা কেমন মানুষ? আপনারা আরাম করুন, আমরা চাকা চালাইতে

জানি। এতে আমাদের তেমন মেহনত হয় না।"

ছাপাখানার লোকেরা ত তৈরি ছিলই।

মিঃ ওয়েস্টের আনন্দের সীমা রহিল না। উহারা কাজ আরম্ভ করিয়া দিলে, তিনি ভজন আরম্ভ করিয়া দিলেন। মিস্ত্রীদের এক দলের পর অপর দলের কাজ করিবার ব্যবস্থা আমি করিয়া দিলাম। কাজ চলিতে লাগিল। প্রাতে ৭টা বাজে। আমি দেখিলাম, কাজ শেষ হইতে তখনও ঢের বাকি। মিঃ ওয়েস্টকে বলিলাম,—"এখন ইঞ্জিনিয়ারকে জাগানো যায় না? দিনের আলোতে যদি চেষ্টা করে, আর যদি এঞ্জিন চলে, তবে সময়মত কাজ শেষ হইবে।"

ওয়েস্ট ইঞ্জিনিয়ারকে উঠাইয়া দিলেন। সে তখনই উঠিয়া এঞ্জিন-ঘরে চলিয়া গেল। এবার চেষ্টা করিতেই এঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করিল। প্রেস আনন্দের কলরবে ভরিয়া উঠিল। এ কেমন করিয়া হইল? রাত্রিতে এত পরিশ্রম করাতেও এঞ্জিন চলিল না। আর এখন যেন কোন দোষই ছিল না এমনি ভাবে চালানো মাত্রই চলিতে লাগিল?

মিঃ ওয়েস্ট অথবা ইঞ্জিনিয়ার জবাব দিলেন,—"ইহার উত্তর দেওয়া মুশকিল। যন্ত্রেরও, মনে হয়, আমাদের মতই বিশ্রাম দরকার এবং সেইজন্য এতক্ষণ হয়ত এঞ্জিনটি ঐরকম অবস্থায় ছিল।"

আমি মনে করি, এই এঞ্জিন না চলার ভিতর দিয়া আমাদের সকলের পরীক্ষাই হইতেছিল। আর এখন ঠিকভাবে চলায় শুদ্ধভাবে খাটার শুভ ফলই আমরা পাইয়াছিলাম।

কাগজ নিয়মমত স্টেশনে পৌঁছিল ও সকলে নিশ্চিন্ত হইল।

এই আগ্রহের পরিণামে কাগজে যে নিয়মমত বাহির হওয়াই চাই, সকলের মনে এই ভাব জাগ্রত হইল। ইহাতে ফিনিক্সে শ্রম করার একটা আবহাওয়াও গড়িয়া উঠিল। এই সংস্থায় ইহার পর এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন ইচ্ছাপূর্বক এঞ্জিন চালানো বন্ধ করিয়া দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে হাতে চালাইয়াই কাগজ বাহির করা হইয়াছে। ফিনিক্সের ঐ সময়টাই শ্রেষ্ঠতম নৈতিক উন্নতির কাল ছিল বলিয়া আমি মনে করি।

২১

পোলক ঝাঁপ দিলেন

ফিনিক্সের মত সংস্থা স্থাপন করিয়া আমি তাহাতে অল্প সময়ই বাস করিতে পারিয়াছি, এ দুঃখ আমার বরাবর রহিয়া গিয়াছে। স্থাপনায় সময় আমার কল্পনা ছিল আমি নিজেও ঐখানেই থাকিব, আমার জীবিকা ঐ স্থান হইতেই উপার্জন করিব। ফিনিক্সে থাকিয়া যে সেবা করা যায় তাহাই করিব ও ফিনিক্সের সফলতাকেই আনন্দে গণ্য করিব। কিন্তু এই সংকল্প কাজে পরিণত করিতে পারি নাই। আমার অভিজ্ঞতায় আমি ইহা অনেকবার দেখিয়াছি যে, নিজের ইচ্ছার কোথাও না কোথাও ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমার অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, যেখানে সত্যের সাধনা ও উপাসনা রহিয়াছে, সেখানে আমাদের ইচ্ছার অনুরূপ বা ইচ্ছার বিপরীত ফল হইলেও তাহার পরিণাম অশুভ হয় না। কতবার যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাহার চেয়ে অনেক ভাল ফল হইয়াছে। ফিনিক্স সম্বন্ধে এই অনভীপ্সিত পরিণাম হওয়ায় ও ফিনিক্স যে অপ্রত্যাশিত রূপ লইয়াছিল তাহাতে অশুভ হয় নাই, একথা আমি নিশ্চয়পূর্বক বলিতে পারি; তবে সর্বাংশে ভাল হইয়াছিল কিনা একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আমরা কেবল শারীরিকে পরিশ্রম করিয়াই দিনাতিপাত করিব এই ধারণায় ছাপাখানার আশেপাশে প্রত্যেক অধিবাসীর জন্যই তিন একর করিয়া জমির প্লট রাখিয়া দিয়াছিলাম। আমার জন্য এমনি একটি প্লট নির্দিষ্ট ছিল। ঐ সকল স্থানে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও টিনের ঘর করিতে হইয়াছিল। ইচ্ছা ছিল যে, চাষীদের পক্ষে যা মানায় তেমনি মাটি ও খড়ের ঘর করা, অথবা ইটের দেওয়ালের উপর পাতার ছাউনি দেওয়া। তাহা হইতে পারে নাই। তাহাতে ব্যয় পড়িত বেশি ও সময়ও অনেক বেশি লাগিত। সকলে তাড়াতাড়ি গৃহী হইতে ও কাজে লাগিয়া পড়িতে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল।

সম্পাদক বলিয়া শ্রীমনসুখলাল নাজরকেই ধরা হইত। তিনি এই ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। তাঁহার থাকার স্থান ডারবানেই রহিল। ডারবানে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'এর একটি ছোট শাখা আপিস ছিল।

কম্পোজ করার জন্য বেতনভোগী লোক ছিল। দেখা গিয়াছিল যে, ছাপার কাজের মধ্যে সব চাইতে বেশি সময় লাগে অথচ সব চাইতে সোজা

কাজ হইতেছে কম্পোজ করা। এই জন্য দৃষ্টি ছিল, যাহাতে সকল অধিবাসী ঐ কাজটি শিখিয়া লয়। তাই যে উহা জানিত না, সেও শিখিতে লাগিল। আমি ঐ কাজে শেষ পর্যন্ত একেবারে সকলের চাইতে বোকা ছিলাম এবং শ্রীমগনলাল গান্ধী সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহা আমি বরাবর মনে করিয়া আসিয়াছি যে, শ্রীমগনলাল নিজে ভিতরের শক্তির খবর রাখিতেন না। ছাপাখানার কাজ তিনি পূর্বে কখনো করেন নাই, তবুও তিনি তাড়াতাড়ি ভাল কম্পোজিটার হইয়া গেলেন ও কেবল তাহাই নয়, অল্প সময়ের মধ্যেই ছাপাখানার সকল কাজই ভালভাবে আয়ত্ত করিয়া আমাকে আশ্চর্য করিয়া দিলেন।

ওখানকার কাজে তখনো স্থিতি আসে নাই। ঘরগুলি তৈরি শেষ হয় নাই। এই অবস্থাতেই নবগঠিত পরিবারকে সেখানে রাখিয়া আমি জোহানেস-বর্গে ফিরিলাম। সেখানকার কাজ দীর্ঘদিনের জন্য ফেলিয়া রাখিতে পারি, এরকম অবস্থা ছিল না।

জোহানেসবর্গে আসিয়া এই মহা পরিবর্তনের কথা মিঃ পোলককে বলিলাম। নিজের দেওয়া বইটি হইতে এক মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কি সেখানে কোনও কাজে লাগিতে পারি না?"

আমি বলিলাম—"আপনি অবশ্যই সেখানকার কাজের মধ্যে থাকিতে পারেন। ইচ্ছা করেন ত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তও হইতে পারেন।"

মিঃ পোলক জবাব দিলেন—"আমাকে যদি গ্রহণ করেন তবে আমি প্রস্তুত আছি।"

এই দৃঢ়তায় আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মিঃ পোলক 'ক্রিটিক'-এর কাজ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য মালিককে এক মাসের নোটিস দিলেন এবং ঐ সময় পার হইলে ফিনিক্সে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিশুক স্বভাবের জন্য সকলের হৃদয় অধিকার করিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল না। তিনি আত্মীয়ের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। সহজ জীবন-যাপন তাঁহার মজ্জাগত ছিল। সেইজন্য ফিনিক্সের জীবনধারা তাঁর কাছে একটুকুও নতুন বা কঠিন লাগে নাই। স্বাভাবিক ও রুচিকর হইয়াছিল।

আমি কিন্তু তাঁহাকে সেখানে দীর্ঘ সময় রাখিতে পারি নাই। মিঃ রিচ বিলাত গিয়া আইন শিক্ষা শেষ করার সংকল্প করিলেন। একা আমি আপিসের সমস্ত কাজ করিতে পারিব, এ সম্ভব ছিল না। সেইজন্য আমি মিঃ পোলকের

কাছে এই আপিসে থাকার ও উকিল হওয়ার জন্য প্রস্তাব দিলাম। ভাবিয়াছিলাম, কিছুদিন পরে আমরা দুজনেই ফিনিক্সে বাস করিব। কিন্তু এ কল্পনা আর কাজে পরিণত হয় নাই।

মিঃ পোলকের স্বভাবে এমন একটা সরলতা ছিল যে, যাঁর উপর তিনি একবার বিশ্বাস স্থাপন করিতেন, তাঁর সঙ্গে যুক্তি-তর্ক না করিয়া তাঁর ইচ্ছানুসারে চলিবারই চেষ্টা করিতেন। মিঃ পোলক আমাকে লিখিলেন—"আমার কাছে এ জীবন ভালই লাগিতেছে। আমি এখানে বেশ সুখেই আছি। এই সংস্থাকে আমরা বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিব এরূপ আশাও আছে। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে, আমি সেখানে গেলে আমাদের আদর্শ সফলতার দিকে বেশি অগ্রসর হইবে, তবে আমি এস্থান ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছি।" এই চিঠি পাইয়া আমি সুখী হইলাম। মিঃ পোলক ফিনিক্স ছাড়িয়া জোহানেসবর্গে আসিলেন এবং আমার আপিসে উকিলের সহকারীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

এই সময় একজন স্কচ থিয়োসফিস্টকে আমি আইন পরীক্ষার জন্য তৈরি হইতে সাহায্য করিতেছিলাম। তাঁহাকে আমি মিঃ পোলকের অনুসরণ করিতে নিমন্ত্রণ করিলাম ও তিনিও নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার নাম মিঃ ম্যাকিণ্টায়ার।

এইরূপে ফিনিক্সের আদর্শ শীঘ্র শীঘ্র গ্রহণ করিবার লক্ষ্যের ভিতর দিয়াই, আমি এই আদর্শের বিরোধী জীবনে আরো গভীরভাবে ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম। যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্যরকম না হইত, তাহা হইলে সরল জীবনযাত্রা পরিহার করিয়া আমি যে মোহজালেই জড়াইয়া পড়িতাম তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ধারণার অতীত ভাবেই আমিও আমার আদর্শ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। কিরূপে, তাহা বর্ণনা করার পূর্বে আরও কয়েকটি অধ্যায় লেখা প্রয়োজন।

২২

"রাম যারে রাখে"

শীঘ্র দেশে যাওয়ার আশা, অথবা দেশে গিয়া স্থির হইয়া বসার আশা আমি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। আমি ত আমার স্ত্রীকে এক বৎসরের সময় দিয়া বলিয়াছিলাম—উহার পরই ফিরিয়া আসিব। বৎসর শেষ হইয়া গেল। আমার

ফেরার সম্ভাবনা তখনও বহুদূরে। সেইজন্য ছেলেপিলেদের লইয়া আসাই স্থির করিলাম।

ছেলেপিলে আসিল। তাহাদের মধ্যে আমার তৃতীয় পুত্র রামদাসও ছিল। সে স্টীমারের কাপ্তেনের সঙ্গে খুব মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার সঙ্গে খেলিতে গিয়া তাহার হাত ভাঙ্গে। কাপ্তেন তাহার খুবই যত্ন লইতেন। ডাক্তার হাড় ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। যখন সে জোহানেসবর্গ পৌঁছে, তখন তাহার হাত ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় রুমাল দিয়া গলায় ঝোলানো ছিল। স্টীমারের ডাক্তার পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, এই আঘাত কোনও ডাক্তারকে দিয়া চিকিৎসা করানো উচিত।

এই সময় আমি বিশেষভাবে জল-মাটি চিকিৎসার পরীক্ষা করিতেছিলাম। আমার হাতুড়ে বিদ্যার উপর আমার যেসব মক্কেলের বিশ্বাস ছিল তাহাদের উপর আমি মাটি ও জল চিকিৎসার প্রয়োগ করিতাম। রামদাসের বেলায় অন্য আর কি হইবে? তখন রামদাসের বয়স আট বৎসর ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমি তোমার জখম ভাল করার জন্য যাহা করিব তাহাতে ভয় পাইবে না ত?" রামদাস হাসিয়া আমাকে পরীক্ষা করার সম্মতি দিল। যদিও এই বয়সে ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা তাহার ছিল না, তথাপি ডাক্তার ও হাতুড়ের মধ্যে ভেদ সে ভাল রকমেই জানিত। তাহা হইলেও সে আমার পরীক্ষার পদ্ধতি জানিয়া এবং আমাকে বিশ্বাস করিয়া নির্ভয়ে থাকিল।

কাঁপিতে কাঁপিতে আমি তাহার ব্যাণ্ডেজ খুলিলাম, জখম সাফ করিলাম ও পরিষ্কার মাটির পুলটিস দিয়া, পূর্বে যেমন বাঁধা ছিল সেইরূপ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম। এই রকম প্রতিদিন আমি জখম সাফ করিতাম ও মাটির পুলটিস লাগাইতাম। এক মাসে জখম একেবারে আরোগ্য হইয়া গেল। কোনও দিন কোনও বিঘ্ন হয় নাই এবং দিনে দিনে জখম আরাম হইতেছিল। ডাক্তারের মলম দিলেও আরোগ্য হইতে এই সময়ই লাগিত—একথা স্টীমারের ডাক্তারও বলিয়াছিলেন।

এইরূপে ঘরোয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশ্বাস ও উহা প্রয়োগ করার মত সাহস আমার বাড়িল। পরীক্ষার ক্ষেত্র ইহার পর আমি খুব বাড়াইয়া দিলাম। জখম, জ্বর, অজীর্ণ, কামলা ইত্যাদি রোগে মাটি, জল ও উপবাস দ্বারা চিকিৎসা ছোট বড় স্ত্রী-পুরুষের সকলেরই করিতে লাগিলাম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলও হইলাম। তাহা হইলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় এ বিষয় আমার যে সাহস ছিল,

আজ তাহা নাই। অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি দেখিতেছি যে, ইহাতে বিপদ আছে।

আমার মাটি-চিকিৎসার সাফল্য প্রমাণ করার জন্য আমি এই পরীক্ষার বর্ণনা করিতেছি না। কোনও রকম পরীক্ষাতেই সর্বাংশে সফল হইয়াছি, এমন দাবি আমি করিতে পারি না। ডাক্তারেরাও এই দাবি করিতে পারেন না। তাহা হইলেও ইহা বলিতে হয় যে, যদি কোনও নতুন অপরিচিত পরীক্ষা করিতে হয় তবে তাহা নিজের উপরই আরম্ভ করা সঙ্গত। এই প্রকার হইলে সত্য শীঘ্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহার প্রয়োগকারীকে ঈশ্বর রক্ষা করেন।

জল-মাটির চিকিৎসা পরীক্ষায় যেমন বিপদ ছিল, ইউরোপীয়দের সঙ্গে নিকট-আত্মীয়তাতেও সেইরকম বিপদ ছিল। পার্থক্য ছিল কেবল ইহার প্রকৃতির। কিন্তু এই শেষোক্ত বিপদের কথা আমি কখনো ভাবিও নাই।

মিঃ পোলককে আমার সঙ্গে বাস করার জন্য নিমন্ত্রণ জানাইলাম এবং আমরা আপন ভায়ের মত থাকিতে লাগিলাম। যে মহিলার সঙ্গে মিঃ পোলকের বিবাহ স্থির ছিল, তাঁহার সঙ্গে কয়েক বৎসর হইতে বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যখন সময় হইবে তখন বিবাহ করিবেন। আমার স্মরণ হয় যেন মিঃ পোলক কিছু অর্থ-সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাস্কিনের পুস্তকের সঙ্গে আমার অপেক্ষা তাঁহার অনেক পূর্বেই পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের জন্যই রাস্কিনের সিদ্ধান্ত পুরাপুরি ভাবে তিনি কাজে লাগাইতে পারিতেছিলেন না। আমি যুক্তি দিলাম যে, "যাহার সঙ্গে হৃদয়ের মিল হইয়াছে তাহার সঙ্গে কেবল টাকার অভাবে বিচ্ছিন্ন থাকা সঙ্গত নহে। যদি দারিদ্র্য প্রতিবন্ধক হয় তবে ত গরীবের বিবাহই করা হয় না। তা ছাড়া এখন আপনি আমার সঙ্গে আছেন। এখন ত সংসার-খরচের প্রশ্নই নাই। আপনার শীঘ্র বিবাহ করাই আমি সঙ্গত মনে করি।"

মিঃ পোলকের সঙ্গে আমাকে কখনো দুইবার যুক্তি-তর্ক করিতে হয় নাই। তিনি তখনই আমার যুক্তি গ্রাহ্য করিয়া লইলেন। ভাবী মিসেস পোলক বিলাতে ছিলেন। তাঁর কাছে পত্র লিখিলেন। তিনিও সন্তুষ্ট হইলেন ও কয়েক মাসের মধ্যেই বিবাহ করার জন্য জোহানেসবর্গে আসিয়া পৌঁছিলেন।

বিবাহের কোনও খরচই ছিল না। বিবাহের জন্য কোনও বিশেষ পোশাকও তৈরি করা হইল না। ইঁহাদের ধর্মানুষ্ঠানেরও আবশ্যক ছিল না। মিসেস

পোলক জন্মিয়াছিলেন খ্রীষ্টানের ঘরে, আর পোলক ছিলেন ইহুদী। উভয়ের মধ্যে যে সাধারণ ধর্ম তাহা নীতিধর্ম ছিল।

এই বিবাহ-প্রসঙ্গে একটা মজার কথা লিখিতেছি। ট্রান্সভালে শ্বেতাঙ্গদের বিবাহের রেজিস্ট্রী যে কর্মচারী করেন তিনি কালাদের বিবাহ রেজেস্ট্রী করেন না। এই বিবাহে মিত-বর ছিলাম আমি। কোন শ্বেতাঙ্গ মিত্র অনায়াসেই মিত-বর রূপে পাওয়া যাইত, কিন্তু মিঃ পোলক তাহা সহ্য করার লোক ছিলেন না। সেইজন্য আমরা তিনজন রেজিস্ট্রারের নিকট হাজির হইলাম। আমি যে বিবাহে মিত-বর সে বিবাহে উভয় পক্ষই যে শ্বেতাঙ্গ একথা রেজিস্ট্রার কি করিয়া জানিবেন? তাই তিনি অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া বিবাহ মুলতুবী রাখিতে চাহিলেন। পরদিন নাতালের নববর্ষের বন্ধ। বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থার পর এই রকমে রেজিস্ট্রী করার তারিখ বদলানো সকলের অসহ্য বোধ হইল। বড় ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনিই এই বিভাগের কর্তা ছিলেন। আমি এই দম্পতিকে লইয়া তাঁহার সম্মুখে হাজির হইলাম। তিনি হাসিয়া আমাকে চিঠি দিয়া দিলেন। এই রকমে বিবাহ রেজিস্ট্রী হইল।

আজ পর্যন্ত যে সব শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আমার সঙ্গে থাকিতেন তাঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর পূর্ব পরিচিত লোক। এখন এক অপরিচিতা ইংরাজ-মহিলা পরিবারভুক্ত হইলেন। ইঁহাদের সঙ্গে আমার নিজের কখনো কোনও বিরোধ হইয়াছে এমন কথা স্মরণ নাই। আমার পত্নীর সঙ্গে মিসেস পোলকের যদি কখনো কোনরূপ মনোমালিন্য হইয়া থাকে, তবে তাহাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তেমন মনোমালিন্য একান্ত সুনিয়ন্ত্রিত এক জাতীয় পরিবারের ভিতরেও হইয়া থাকে। এখানে একথাও বলিয়া রাখা দরকার যে, আমার পরিবার ছিল বিভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত একটি পরিবারের মত। তাহাতে সকল রকমের, সকল মনোবৃত্তির লোককেই গ্রহণ করা হইত। বস্তুতঃ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় এ কেবল মনের কল্পনা। আমরা সকলেই একই পরিবারের।

মিঃ ওয়েস্টের বিবাহের কথাও এইখানেই সারিয়া লই। জীবনের এই সময়টায় ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে আমার বিচার পূর্ণতা লাভ করে নাই। সেই জন্য তখন আমার কাজ ছিল কুমার বন্ধুদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা। তাই মিঃ ওয়েস্ট তাঁহার পিতামাতাকে যখন দেখিতে দেশে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বিবাহ করিয়া ফিরিবার পরামর্শ দিলাম। ফিনিক্সে আমাদের সকলেরই বাড়ি, আর আমরা সকলেই চাষী হইয়া বসিতেছি। সেইজন্য বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ভয়ের বিষয় ছিল না।

মিঃ ওয়েস্ট, লিস্টার নামক স্থান হইতে এক সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসিলেন। এই কন্যার আত্মীয়েরা লিস্টারের এক বড় জুতার কারখানায় কাজ করিতেন। মিসেস ওয়েস্টও কিছুকাল জুতার কারখানায় কাজ করিয়া-ছিলেন। তাঁহাকে আমি সুন্দরী বলিয়াছি, কেন না আমি তাঁহার গুণের পূজারী। সত্যকার সৌন্দর্য গুণই নয় কি! মিঃ ওয়েস্ট নিজের শাশুড়ীকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধা এখনো জীবিত আছেন। তাঁহার কর্মশক্তি এমন ছিল, এবং তাঁহার স্বভাব এমন মধুর ও হাসিখুশি পূর্ণ ছিল যে, তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের সকলের লজ্জা পাওয়ার কথা।

যেমন আমি অবিবাহিত বন্ধুদিগকে বিবাহ দেওয়াইতেছিলাম, তেমনি ভারতীয় বন্ধুদেরও নিজের আত্মীয়-পরিবার লইয়া আসিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছিলাম। কাজেই ফিনিক্স ছোট একটা গ্রামের মত হইয়া পড়িল। সেখানে পাঁচ-সাত ঘর ভারতীয় পরিবার বাস করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের পরিবার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

২৩

গৃহস্থালিতে পরিবর্তন ও শিশুশিক্ষা

ডারবানেই গৃহস্থালীর ব্যবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। সেখানে মোটা টাকা খরচ হইলেও ধরন সাদাসিধা ছিল। কিন্তু জোহানেসবর্গে সর্বোদয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যবস্থার আগাগোড়া পরিবর্তন হইয়া গেল।

ব্যারিস্টারের বাড়ি যতটা সাদাসিধা রাখা যায় তাহাই করা হইল। তাহা হইলেও আসবাবপত্র কিছু রহিল। নতুবা চলে না। পরিবর্তন বাহির হইতে বেশি হইল ভিতরের। প্রত্যেক কাজ নিজের হাতে করার ইচ্ছা বাড়িয়াছিল। বালকদিগের দ্বারাও হাতের কাজ করানো আরম্ভ করিলাম। বাজার হইতে রুটি না কিনিয়া কুনের প্রথা অনুসারে বিনা খামিরায় হাতে রুটি তৈরি করিতে আরম্ভ করিলাম। এই রুটি মিলের আটায় হয় না। তা ছাড়া মিলের আটা ব্যবহার করা অপেক্ষা হাতের পেষাই আটাতে সাদাসিধা ভাব ও পুষ্টিকর দ্রব্য অনেক বেশি আছে এইরূপ মনে করি। এইজন্য হাতে চালাইবার একটি চাক্কিও সাত পাউণ্ড খরচ করিয়া খরিদ করিলাম। উহার চাকাটা ভারি ছিল। একজনের পক্ষে চালানো কঠিন ছিল, কিন্তু দুইজনে উহা সহজেই চালাইতে

পারিত। এই জাঁতা আমি, মিঃ পোলক ও ছেলেরা সাধারণতঃ চালাইতাম। কখনো কখনো কস্তুরবাও আসিতেন, যদিও ঐ সময়টা সাধারণতঃ তাঁহাকে রান্না করার জন্য নিযুক্ত থাকিতে হইত। যখন মিসেস পোলক আসিলেন তখন তাঁহাকেও ঐ কাজে লাগাইলাম। এই শ্রম ছেলেদের পক্ষে খুব ভাল হইয়াছিল। কখনো এই কাজ কি অন্য কোনও কাজ তাহাদের দ্বারা জোর করিয়া করানো হয় নাই। বরঞ্চ তাহারা সহজ আনন্দদায়ক খেলা মনে করিয়াই এসব কাজ করিত। ক্লান্ত হইয়া পড়িলেই তাহাদের কাজ ছাড়িয়া দিবার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু কে জানে কেন এই বালকেরা এবং পরে যাহাদের সহিত পরিচয় করিব তাহারা কেউই আমাকে ফাঁকি দেয় নাই। সাধারণতঃ সহিষ্ণু ছেলেই আমার ভাগ্যে জুটিত এবং যে কাজ করিতে দেওয়া হইত অনেকেই তা বুদ্ধি সহকারে করিত। "আর পারি না" এমন কথা এই সময়ের অল্প ছেলেই আমাকে বলিয়াছে।

বাড়ি পরিষ্কার করার জন্য কেবল একজন চাকর ছিল। সেও পরিবারের একজনের মত হইয়াই থাকিত এবং ছেলেরা তাহার কাজে পুরা ভাগ লইত। পায়খানা সাফ করার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির লোক আসিত। কিন্তু পায়খানার ঘর সাফ করা এবং উহার বসিবার স্থান সাফ করার কাজ চাকরকে দিতে মন উঠিত না। তাহারা মনেও করিত না যে, ঐ কাজ তাহাদের। এই কার্য আমরা নিজেরাই করিতাম ও ইহাতে বালকেরা শিক্ষা পাইত। ইহার পরিণাম হইয়াছিল এই যে, আমার একটি ছেলেও প্রথম হইতেই পায়খানা সাফ করিতে কষ্টবোধ করিত না ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম সহজেই তাহাদের আয়ত্ত হইয়াছিল। জোহানেসবর্গে কোনও পীড়া বড় ছিল না। তবে যদি কেউ পীড়িত হইতেন তবে সেবার কাজ বালকদের ছিল, আর তাহারাও খুশি হইয়া এই কাজ করিত।

তাহাদের অক্ষরজ্ঞান বিষয়ে আমি উদাসীন ছিলাম একথা বলিতে পারি না। তবে উহা ত্যাগ করিতেও আমার সংকোচ ছিল না। এই অসম্পূর্ণতার জন্য আমার ছেলেরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে। বস্তুতঃ তাহারা কয়েকবার নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশও করিয়াছে। এ বিষয়ে কতক অংশে আমাকে আমার নিজের দোষ স্বীকার করিতে হয়—একথা মানি। তাহাদিগকে পুঁথিগত বিদ্যা দেওয়ার ইচ্ছা আমার খুবই ছিল—চেষ্টাও করিতাম। কিন্তু এই কাজে সব সময় কোনও না কোন বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইত। এই

রকমে ঘরে আর দ্বিতীয় কোনও প্রকার লেখা-পড়ার ব্যবস্থা না হওয়ায় তাহাদিগকে আমি আমার সঙ্গে হাঁটাইয়া আপিসে লইয়া যাইতাম। আপিস আড়াই মাইল দূরে ছিল। ইহাতে সকাল সন্ধ্যায় তাহাদের ও আমার কম করিয়া পাঁচ মাইল হাঁটার শ্রম হইত। রাস্তায় চলিতে চলিতে কিছু শিখাইবার চেষ্টা করিতাম, তাহাও যদি আমার সঙ্গে আর কেউ না থাকিত তবে। আপিসে তাহারা মক্কেল ও মুহুরীদের সংস্পর্শে আসিত। কিছু যদি পড়িতে দেওয়া হইত তবে পড়িত। বাজারে সামান্য কিছু খরিদ করিতে হইলেও তাহা করিত। সকলের বড় হরিলাল ভিন্ন আর সব ছেলেই এই রকমে গড়িয়া উঠিয়াছে। হরিলাল দেশে রহিয়া গিয়াছিল। যদি আমি তাহাদের পুস্তক পাঠে সাহায্য করিবার জন্য এক ঘণ্টা করিয়াও সময় দিতে পারিতাম তবে তাহাদিগকে আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে বলা যাইত। ঐ আগ্রহ আমি করি নাই, এজন্য আমার ও তাহাদের দুঃখ রহিয়া গিয়াছে। সকলের বড় ছেলে এ বিষয়ে তাহার অভিযোগ অনেকবার আমার কাছে এবং প্রকাশ্যভাবে করিয়াছে। অন্যেরা হৃদয়ের উদারতাবশতঃ ঐ ত্রুটি অনিবার্য বুঝিয়া ক্ষমা করিয়াছে। এই অসম্পূর্ণতার জন্য আমার অনুশোচনা নাই। আর যদি থাকেও তবে তাহা এইমাত্র যে, আমি আদর্শ পিতা হই নাই। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাদের পুঁথি-পড়া বিদ্যার বলিদান আমার অজ্ঞতাবশতঃ হয়ত হইয়াছে, কিন্তু সৎভাবে আমি যাহা সেবা-কার্য বলিয়া বুঝিয়াছি এ বলিদান হইয়াছে তাহারই কাছে। তাহাদের চরিত্র গড়িয়া তোলার জন্য আমি কোনও ত্রুটি করি নাই। চরিত্রগঠন প্রত্যেক মা-বাপের পক্ষে অনিবার্য ও বাধ্যতামূলক কাজ বলিয়া আমি মনে করি। আমার চেষ্টা সত্ত্বেও আমার ঐ ছেলেদের চরিত্রে যে ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ত্রুটির প্রতিবিম্ব—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সন্তান যেমন পিতামাতার আকৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে, তাহাদের গুণ-দোষও তেমনি পাইয়া থাকে। আশপাশের প্রভাব অনেক পরিবর্তন করে সত্য, তবুও সন্তানেরা যে বাপ-দাদার নিকট হইতে তাহাদের চরিত্রের মূলধন পায় ইহাও সত্য। এই রকম দোষের উত্তরাধিকার লাভ করিয়াও কত ছেলে নিজেকে বাঁচাইয়া লয়—ইহাও আমি দেখিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, পবিত্রতা আত্মার সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধযুক্ত গুণ। ইহাই আত্মার চমৎকারিত্ব।

মিঃ পোলক ও আমার মধ্যে ছেলেদের ইংরেজী শিখানো লইয়া কতবার তীব্র বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। আসলে আমি এই বিশ্বাস করি যে, ভারতীয়

মা-বাপ যদি ছেলেদের বাল্যকাল হইতেই ইংরেজী ভাষায় কথা বলায়, তবে তাহারা উহাদের প্রতি এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। আমি এ পর্যন্ত বিশ্বাস করি যে, ঐরূপ করিলে ছেলেরা নিজের দেশের ধর্মীয় ও মানসিক উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় এবং সেই পরিমাণ দেশের ও জগতের সেবা করার অযোগ্য হয়।

এই রকম বিশ্বাস থাকার জন্য আমি সব সময়ে ইচ্ছা করিয়াই ছেলেদের সঙ্গে গুজরাটীতে কথা বলিতাম। মিঃ পোলকের ইহা ভাল লাগিত না। আমি বালকদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতেছি, এই রকম তাঁহার যুক্তি ছিল। ইংরেজীর ন্যায় ব্যাপক ভাষা ছেলেরা যদি বাল্যকাল হইতে শিখিয়া লয়, তবে জগতে জীবনযাত্রার দৌড়ে তাহারা অনেকটা পথ আগাইয়া যায়—এই রকম কথা তিনি আমাকে আগ্রহভরে ভালবাসিয়া বুঝাইতেন। এই যুক্তি আমি গলাধঃকরণ করিতে পারিতাম না। আমার স্মরণ নাই যে, অবশেষে আমার উত্তরই তিনি মানিয়া লইয়াছেন, অথবা তিনি আমার জিদ দেখিয়া শান্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর প্রায় বিশ বৎসর গিয়াছে। তাহা হইলেও আমার ঐ সিদ্ধান্ত পরবর্তী অভিজ্ঞতায় আরও দৃঢ় হইয়াছে। সেইজন্য একদিকে যেমন আমার পুত্রেরা বইর বিদ্যায় কাঁচা রহিয়া গিয়াছে, অপরদিকে তবুও মাতৃভাষায় সাধারণ জ্ঞান সহজেই পাইয়াছে। তাহাতে দেশের এই লাভ হইয়াছে যে, তাহারা এখন নিজ দেশে বিদেশীর ন্যায় নাই। দুইটি ভাষার সঙ্গে পরিচয় তাহাদের সহজেই হইয়াছিল। একটা বড় ইংরাজ সমাজের সহবাসে তাহারা ছিল ও এমন দেশে ছিল যেখানে ইংরেজীই প্রধান কথিত ভাষা। সেইজন্য তাহারা ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছিল।

২৪

জুলু বিদ্রোহ

ঘর করিয়া বসিয়াছি—একথা যখন মনে করিলাম, তখন দেখিলাম ঘর করা আমার অদৃষ্টে নাই। জোহানেসবর্গেই যখন সব ঠিকঠাক করিয়া বসিলাম তখন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। নাতালে জুলু বিদ্রোহের সংবাদ পড়িলাম। আমার জুলুদের সঙ্গে কোন শত্রুতা ছিল না। জুলুরা একজন ভারতবাসীরও ক্ষতি করে নাই। তাহাদের বিদ্রোহ করার ক্ষমতা সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ ছিল।

কিন্তু ইংরাজ রাজত্বকে তখন আমি জগতের কল্যাণকামী রাজত্ব বলিয়া মানিতাম। আমার এ বিশ্বাস ও অনুরাগ হৃদয়ের বস্তু ছিল। সুতরাং সে রাজত্বের বিনাশ আমি ইচ্ছা করিতাম না। সেই জন্যেই বল ব্যবহার করার নীতি-অনীতি সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত, আমাকে আমার সংকল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারিল না। নাতালে যদি বিপদ আসে সেজন্য নাতালে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিরক্ষা বাহিনী ছিল, এবং বিপদের সময় উহাতে আরো লোক লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমি পড়িলাম যে, এই স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী বিদ্রোহ দমনের জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

আমি নিজেকে নাতালবাসী বলিয়া গণ্য করিতাম এবং নাতালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধও ছিল। সেইজন্য আমি গভর্নরকে লিখিলাম যে, যদি আবশ্যক হয় তবে আহতদের শুশ্রূষার জন্য ভারতীয় দল লইয়া আমি যাইতে প্রস্তুত আছি। গভর্নর তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া জবাব দিলেন। আমি অনুকূল জবাব পাওয়ার অথবা এত শীঘ্র জবাব পাওয়ার আশা করি নাই। তবুও পত্র লিখিবার পূর্বে আমি সব গোছাইয়া রাখিয়াছিলাম। এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম যে, গভর্নরের তরফ হইতে যদি আহ্বান আসে, তবে জোহানেসবর্গের বাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিব। মিঃ পোলক আর একটা ছোট বাড়ি লইয়া থাকিবেন, আর কস্তুরবা ফিনিক্সে যাইয়া থাকিবেন। এই ব্যবস্থায় কস্তুরবার পূর্ণ সম্মতি পাইয়াছিলাম। আমার এই ধরনের কাজে তিনি কোনও দিন বাধা দিয়াছেন এমন স্মরণ হয় না। গভর্নরের জবাব পাইতেই আমি বাড়ির মালিককে রীতি অনুযায়ী বাড়ি ছাড়িয়া দিব বলিয়া এক মাসের নোটিস দিলাম। কতক জিনিসপত্র ফিনিক্সে গেল, কতক মিঃ পোলকের নিকট রহিল।

ডারবান পঁহুছিয়াই আমি জনসাধারণের কাছে লোকের জন্য আবেদন জানাইলাম। বেশি লোকের দরকার ছিল না। আমরা ২৪ জন তৈরি হইলাম। ইহাদের মধ্যে আমাকে বাদ দিয়া ৪ জন গুজরাটী ছিল, বাকি লোক ছিল এগ্রিমেণ্ট-মুক্ত মাদ্রাজী এবং একজন পাঠান।

মর্যাদা দেওয়ার জন্য ও যাহাতে কাজের সুবিধা হয় সেজন্য সেখানকার প্রথা অনুযায়ী চিকিৎসা-বিভাগের প্রধান কর্তা আমাকে "সার্জেণ্ট মেজরে"র সামরিক পদ দিলেন এবং আমার পছন্দমত অপর তিনজনকে 'সার্জেণ্ট' ও একজনকে 'করপোরাল' পদ দিলেন। পোশাক সরকার হইতেই পাওয়া গেল। এই দল ছয় সপ্তাহকাল সর্বদা সেবা করিয়াছিল বলা যায়।

বিদ্রোহের স্থানে পৌঁছিয়া আমি দেখি যে, ইহাকে বিদ্রোহ বলা যায় না। বিপক্ষের কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। বিদ্রোহ বলার কারণ এই যে, এক জুলু সর্দার জুলুদের উপর স্থাপিত নতুন কর না দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়াছিল, এবং যে সার্জেণ্ট কর আদায় করিতে গিয়াছিল তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছিল। যাহা হউক আমার হৃদয় জুলুদের তরফেই ছিল। আমরা হেডকোয়ার্টারে পৌঁছিলে যখন আমাদের উপর আহত জুলুদের সেবা করার ভার পড়িল, তখন আমি সন্তুষ্ট হইলাম। ডাক্তার কর্মচারী আমাদিগকে স্বাগত করিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন—"কোনও শ্বেতাঙ্গ এই আহতদের শুশ্রূষা করিতে রাজী হয় না। আমি একা কি ব্যবস্থা করিব? উহাদের ক্ষতস্থান পচিয়া উঠিয়াছে। এখন তোমরা আসিয়াছ, ঈশ্বর দেখিতেছি নির্দোষ লোকগুলির উপর কৃপা করিয়াছেন।" এই বলিয়া আমাকে ব্যাণ্ডেজ, জীবাণুনাশক জল ইত্যাদি দিলেন ও তিনি রোগীদিগের নিকট লইয়া গেলেন। রোগীরা আমাদিগকে দেখিয়া খুশি হইয়া গেল। শ্বেতাঙ্গ সিপাহীরা জালের অপর পাশ হইতে আমাদিগকে দেখিয়া, আমরা যাহাতে উহাদের ঘা সাফ করা বন্ধ করি তাহার চেষ্টা করিতেছিল। আমরা তাহাদের কথা না শোনায় তাহারা বিরক্ত হয় ও জুলুদের প্রতি এমন অশ্রাব্য খারাপ কথা বলে যে কানে পীড়া বোধ হয়।

ধীরে ধীরে এই সিপাহীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং তাহারা আমাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা বন্ধ করে। এই বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন কর্ণেল স্পার্কস ও কর্ণেল ভায়লী। তাঁহাদের সঙ্গে আমার ১৮৯৬ সালে খুব বিরোধ হইয়াছিল। তাঁহারা আমার এই কাজ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। নিজেরা আমাকে ডাকিয়া লইয়া উপকার স্বীকার করিলেন। আমাকে জেনারেল মেকেঞ্জীর কাছে লইয়া গেলেন ও তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

ইঁহারা পেশাদার সিপাহী একথা যেন পাঠক মনে না করেন। কর্ণেল ভায়লী খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। কর্ণেল স্পার্কস এক কসাইখানার নামজাদা মালিক ছিলেন। জেনারেল মেকেঞ্জী নাতালের খ্যাতনামা কৃষিক্ষেত্র-স্বামী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন এবং সামরিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

যে রোগীদের আমাদের শুশ্রূষা করিতে হইতে, তাহারা লড়াইতে জখম

হইয়াছে একথাও যেন কেউ না মনে করেন। ইহাদের কতক ছিল সন্দেহবশে ধৃত কয়েদী। ইহাদিগকে জেনারেল চাবুক খাওয়ার সাজা দিয়াছিলেন। সেই চাবুকের ঘা, শুশ্রূষার অভাবে পাকিয়া উঠিয়াছিল। আর অন্য ভাগে ছিল সেই সব জুলু যাহারা মিত্র ছিল। এই মিত্রপক্ষীয়েরা মিত্রতার চিহ্ন পরিধান করা সত্ত্বেও তাহাদিগকে ভুল করিয়া সিপাহীরা ঘায়েল করিয়াছিল।

ইহা ছাড়া আমাকে শ্বেতাঙ্গ সিপাহীদের জন্যও ঔষধ রাখা ও ঔষধ দেওয়ার ভার দেওয়া হইয়াছিল। ডাক্তার বুথের ছোট হাসপাতালে আমি এই কাজ বৎসরকাল শিক্ষা লইয়াছিলাম, সেইজন্য এই কাজ আমার পক্ষে খুব সহজ ছিল। এই কার্যে অনেক শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় হয়।

লড়াইতে নিযুক্ত বাহিনী কোনও এক জায়গায় বসিয়া থাকিত না। যেখান হইতে বিপদের খবর আসিত সেইখানেই দৌড়াইয়া যাইত। অনেকে ত ঘোড়সওয়ারই ছিল। আমাদের ছাউনি হেডকোয়ার্টার হইতে উঠিয়া গেল এবং আমাদিগকে তাহাদের পিছনে পিছনে ডুলিগুলি বাঁধিয়া লইয়া চলিতে হইল। দুই-তিনবার ত একদিনেই ৪০ মাইল মার্চ করিতে হয়। কিন্তু যেখানেই যাই না কেন—ভগবানকে ধন্যবাদ যে, তাঁহার অভিপ্রেত কাজ ছাড়া অন্য কোনও কাজ আমাদিগকে করিতে হয় নাই। যে জুলু মিত্রেরা ভুলে আহত হইত তাহাদিগকেই আমাদের ডুলিতে তুলিয়া লইয়া ছাউনিতে পঁহুছিতে হইত ও সেখানে তাহাদের শুশ্রূষা করিতে হইত।

২৫

হৃদয় মন্থন

জুলু বিদ্রোহে আমার অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল এবং অনেক চিন্তা করার অবকাশ পাইয়াছিলাম। বুয়ার যুদ্ধে গিয়াও যুদ্ধের ভয়ঙ্করত্ব আমার কাছে তত স্পষ্ট হয় নাই, যতটা এই জুলু বিদ্রোহে হইয়াছিল। এ ত যুদ্ধ নয়, এ কেবল মানুষ শিকার করা হইতেছিল। এই রকম অনুভব কেবল আমার নয়, আমি যে সকল ইংরাজের সহিত কথাবার্তা বলিয়াছি তাহাদেরও হইয়াছিল দেখিয়াছি। প্রাতঃকালেই সৈন্যেরা গ্রামের মধ্যে গিয়া পটকা ফাটানোর মত বন্দুকের আওয়াজ করিত ; আমরা দূর হইতে শুনিতে পাইতাম। এই আওয়াজ আমার কানে বড় বিষম বাজিত। আমি এই ব্যথা দায়ে পড়িয়া সহ্য করিতাম।

আমাদের হাতে পড়িয়াছিল জুলুদেরই সেবা করার কাজ। আমরা যদি এই কার্যভার না লইতাম, তবে এই সেবা যে কেহই করিত না, তাহা আমি দেখিতে পারিতেছিলাম। ইহাতেই আমার আত্মা শান্ত হইত।

এখানে বসতি খুবই কম ছিল। দূরে দূরে পাহাড় ও খাদ, তাহার মধ্যে মধ্যে এই সরল ও তথাকথিত জংলী জুলুদের বসতি। ইহা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এই দৃশ্য গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল। মাইলের পর মাইল জনশূন্য স্থানের উপর দিয়া কোনও আহত জুলুকে বহন করিয়া যখন আমাদিকে যাইতে হইত, তখন আমি চিন্তায় ডুবিয়া যাইতাম।

এইখানেই ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে আমার ধারণা পরিপক্ক হয়। আমার সঙ্গীদের সঙ্গেও এ বিষয় আমি কিছু আলোচনা করি। ব্রহ্ম-দর্শনের জন্য ব্রহ্মচর্য যে অনিবার্য বস্তু, তাহা তখনও আমার কাছে ধরা পড়ে নাই। ব্রহ্মচর্য যে সেবার জন্য আবশ্যক তাহাই আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার মনে হইল যে, এই প্রকারের সেবার কাজ ত আমার কাছে ক্রমশই বেশি করিয়া আসিবে। আর যদি আমি ভোগবিলাসে, সন্তান উৎপাদনে ও তাহাদের পোষণে মগ্ন থাকি, তাহা হইলে আমার দ্বারা সম্পূর্ণ সেবা হইয়া উঠিবে না। আমি ত দুই নৌকায় পা দিয়া চলিতে পারিব না। যদি এই সময় আমার স্ত্রী গর্ভবতী থাকিতেন, তবে নিশ্চিন্ত মনে এই সেবায় আমি কি ঝাঁপ দিয়া পড়িতে পারিতাম? ব্রহ্মচর্য পালন না করিলে পরিবার প্রতিপালন ও জনসেবা—এই দুইটি মানুষের পক্ষে পরস্পরবিরোধী বস্তু হইয়া পড়ে। বিবাহিত হইয়াও ব্রহ্মচর্য পালন করিলে, পরিবার প্রতিপালন কাজ সমাজ-সেবার বিরোধী হয় না। এইপ্রকার ভাবের বশীভূত হইয়া আমি ব্রত লওয়ার জন্য কতকটা অধীর হইয়া পড়িলাম। আমার মনে এক প্রকারের আনন্দ আসিল, আমার উৎসাহ বাড়িল। কল্পনায় আমার সেবাক্ষেত্র খুব বিশাল করিয়া ফেলিলাম। এই রকম যখন মনের মধ্যে বিচার চলিতেছিল ও শরীরে ক্লেশ চলিতেছিল তখনই সংবাদ আসিল যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং আমাদের দল ভাঙ্গিবার হুকুম পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় দিনে আমরা ঘরে ফিরিবার আদেশ পাইলাম ও তারপর অল্প-দিনেই সকলে নিজ নিজ ঘরে ফিরিলাম। ইহার পর অল্প সময়ের মধ্যে গভর্নর উক্ত সেবার জন্য আমাকে সম্মান জানাইয়া নিজে পত্র দিয়াছিলেন।

ফিনিক্সে আসিয়াই আমি আনন্দের সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের কথা শ্রীছগনলাল, শ্রীমগনলাল, মিঃ ওয়েস্ট প্রভৃতিকে বলি। সকলের কাছে কথাটা ভাল লাগিল।

সকলেই উহার আবশ্যকতা স্বীকার করিল। কিন্তু সকলের কাছে উহা পালন করা বড় কঠিন বলিয়া বোধ হইল। কয়েকজন পালন করিতে চেষ্টা করার সাহস করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেউ কেউ সফল হইয়াছেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

আমি এই ব্রত লইয়া ফেলিলাম যে, এখন হইতে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করিব। এই ব্রত কত মহৎ ও উহা পালন করা কত কঠিন তাহা আমি সে সময় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু উহা পালন করা যে কঠিন তাহা আমি আজ পর্যন্তও অনুভব করিতেছি। উহার মহত্ত্ব দিন দিন বেশি করিয়া দেখিতেছি। ব্রহ্মচর্য ব্যতীত জীবন আমার কাছে নীরস ও পশুজীবনের মত লাগে। পশুরা স্বভাবতই অসংযত। মানুষের মনুষ্যত্ব হইতেছে, স্বেচ্ছায় সংযমের বশীভূত হওয়া। ব্রহ্মচর্যের যে স্তুতিবাদ ধর্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পূর্বে আমার কাছে অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেই সকলই ঠিক কথা। যত দিন যাইতেছে ততই বুঝিতে পারিতেছি যে, সেসব কথা অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত।

যে ব্রহ্মচর্যের শক্তি এত অদ্ভুত, সে ব্রহ্মচর্য সহজ নয় বা উহা কেবল শারীরিক বস্তু নয়। শারীরিক সংযম দ্বারা ব্রহ্মচর্যের আরম্ভ মাত্র হয়। কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মচর্যে বিচারের মলিনতাও থাকা সম্ভব নহে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মচারীর স্বপ্নেও বিকারযুক্ত বিচার হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত বিকারযুক্ত স্বপ্ন দেখা সম্ভব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য অনেক দূরে রহিয়াছে এইরূপ মানিতে হইবে।

আমাকে কায়িক ব্রহ্মচর্য পালন করিতেই ভীষণ কষ্ট করিতে হইয়াছে। এতদিনে একথা বলিতে পারি যে, সে সম্বন্ধে এখন আমি নির্ভয় হইয়াছি। কিন্তু আমার বিচারশক্তির উপর আমার যে জয়লাভ করা আবশ্যক তাহা আমি এখনো পাই নাই। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিতেছি—এরকম মনে হয় না। কেমন করিয়া কোথা হইতে, নিজের অনিচ্ছায় বিকারযুক্ত বিচার আমার উপর যে আসিয়া পরে তাহা আজও জানিতে পারি নাই।

চিন্তাকে সংযত করার চাবি যে মানুষের কাছেই আছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আর এই চাবি প্রত্যেককেই নিজের মধ্যে খুঁজিয়া লইতে হয়, এই সিদ্ধান্তে আমি এখন পৌঁছিয়াছি। মহাপুরুষেরা আমাদের জন্য তাঁহাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পথ-প্রদর্শক। কিন্তু তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও পূর্ণ বস্তু নয়। সম্পূর্ণতা কেবল ঈশ্বর-প্রসাদের মধ্যেই আছে।

সেইজন্য ভক্তেরা নিজেদের তপশ্চর্যা-লব্ধ সেই রামনামাদি মন্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন। এই মন্ত্র তাঁহাদের নিজদিগকে পবিত্র করিয়াছে। সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া বিচারশক্তির উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করা যায় না। এই শিক্ষাই সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকে রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণভাবে পালনের চেষ্টার দ্বারা আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, ইহার সত্যতা তাহার ভিতর দিয়াই আমার কাছে ধরা পড়িয়াছে। আমার অন্তরের সেই সংগ্রামের অল্প-বিস্তর ইতিহাস পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আসিবেই। এই অধ্যায়ের শেষে কেবল এইটুকুই বলিয়া রাখি যে, আমার উৎসাহবশতঃ প্রথমে আমার কাছে ব্রতপালন সহজই লাগিয়াছিল। ব্রত লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি একটা পরিবর্তন করিয়া ফেলিলাম। পত্নীর সঙ্গে এক শয্যায় বা একান্ত থাকা ত্যাগ করিলাম। যে ব্রহ্মচর্য ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ১৯০০ সাল হইতে পালন করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাই ব্রতরূপে ১৯০৬ সালের মধ্যভাগ হইতে এইরূপে আরম্ভ হইল।

২৬

সত্যাগ্রহের জন্ম

জোহানেসবর্গে যেসব ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল, তাহার জন্য সত্যাগ্রহ অবলম্বন করার উদ্দেশ্যেই আমার এইপ্রকার আত্মশুদ্ধি (ব্রহ্মচর্য ব্রতগ্রহণ) হইয়াছিল কিনা কে বলিতে পারে। আজ আমি দেখিতেছি যে, সেদিনকার ব্রহ্মচর্য ব্রত লওয়ার পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত প্রধান ঘটনাই আমাকে অলক্ষিতে ঐদিনের সেই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই তৈরি করিতেছিল।

সত্যাগ্রহ শব্দের উৎপত্তি হওয়ার পূর্বেই সত্যাগ্রহের আদর্শের উৎপত্তি হইয়াছিল। সত্যাগ্রহের উৎপত্তির সময়েও এ জিনিসটা যে কি, আমি নিজেও তাহার পরিচয় পাই নাই। গুজরাটী ভাষাতেও আমরা ইংরেজী "প্যাসিভ রেজিস্টান্স" শব্দ দ্বারা উহাকে পরিচিত করিতেছিলাম। যখন শ্বেতাঙ্গদের এক সভায় আমি দেখিলাম যে, 'প্যাসিভ রেজিস্টান্স' শব্দের সংকীর্ণ অর্থ করা হইয়া থাকে, উহা দুর্বলের অস্ত্র বলিয়াই কল্পিত, উহাতে দ্বেষ থাকিতে পারে, উহার অন্তিম স্বরূপ হিংসায় প্রকট হইতে পারে, তখন ঐ সকল অস্বীকার করিয়া ভারতবাসীদের লড়াইয়ের প্রকৃত স্বরূপ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইয়াছে। সেইজন্য ভারতীয়দের এই লড়াইয়ের প্রকৃত স্বরূপ চিত্রিত করার নিমিত্ত নতুন শব্দ-সৃষ্টি

করা আবশ্যক হইয়া পড়িল।

তেমন নতুন শব্দ কি হইবে তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। তাই 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'এর পাঠকদের কাছে একটা নাম বাছিয়া দিবার জন্ত নামমাত্র পুরস্কারের কথা ঘোষণা করিলাম। এই প্রতিযোগিতার ফলে সৎ+আগ্রহ মিলাইয়া 'সদাগ্রহ' শব্দ সৃষ্টি করিয়া মগনলাল গান্ধী পাঠাইয়া দিলেন। তিনিই পুরস্কার পাইলেন। কিন্তু 'সদাগ্রহ' শব্দকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করার জন্ত আমি একটি 'য'-ফলা মধ্যে দিয়া "সত্যাগ্রহ" এই গুজরাটি শব্দ সৃষ্টি করিলাম ও এই নামেই এই লড়াই পরিচিত হইতে লাগিল।

এই লড়াইয়ের ইতিহাস আমার দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনের, বিশেষ করিয়া আমার জীবনে সত্যের প্রয়োগের ইতিহাস বলা যায়। এই ইতিহাসের অধিকাংশই য়েরোড়া জেলে লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম ও বাকিটা বাহিরে আসিয়া শেষ করি। উহার সমস্তটা 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে "দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভালজী গোবিন্দজী দেশাই 'কারেণ্ট থট'-এর জন্ত তাহার ইংরেজী অনুবাদ করিতেছেন। ভবিষ্যতে উহা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করিতেছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার প্রধান প্রধান পরীক্ষার সমস্ত কথা, যাঁহার ইচ্ছা হয় এই গ্রন্থ হইতেই তিনি জানিতে পারিবেন। গুজরাটী (আত্মকথার) পাঠকের মধ্যে যাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস পড়া হয় নাই, তাঁহাকে উহা দেখিয়া লইবার পরামর্শ দিতেছি। অতঃপর পরবর্তী আর কয়েকটি অধ্যায়ে উক্ত ইতিহাসের অন্তর্গত মুখ্য কথাভাগ বাদ দিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার জীবনের যে অল্পস্বল্প ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ রহিয়া গিয়াছে, তাহাই সন্নিবিষ্ট করিব ভাবিতেছি। তাহার পরেই আমার ভারতবর্ষে সত্যের পরীক্ষার প্রসঙ্গ পাঠকগণের কাছে উপস্থাপিত করিব। সেই জন্ত সত্যের প্রয়োগের প্রসঙ্গ অবিচ্ছিন্ন রাখার নিমিত্ত, দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস জানিয়া লওয়া আবশ্যক।*

* 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহে'র বাংলা অনুবাদ রচনাসম্ভারের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে।

২৭

আহারে অধিকতর পরীক্ষা

আমার এক চিন্তা ছিল—মন, বাক্য ও দেহ—এগুলির দ্বারা কেমন করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করা যায়। সত্যাগ্রহ যুদ্ধের জন্য কেমন করিয়া অধিক হইতে অধিকতর সময় বাঁচানো যায়। অধিকতর আত্মশুদ্ধি কেমন করিয়া হয়—ইহাই ছিল দ্বিতীয় চিন্তা। এই দুই চিন্তার জন্য খাদ্য সম্বন্ধে অধিক সংযম এবং অধিক পরিবর্তন করার প্রেরণা আসিল।

আমার জীবনে অল্পাহার এবং উপবাস অনেকখানি স্থান লইয়াছে। যাহাদের বিষয়-বাসনা আছে তাহাদের মধ্যে জিহ্বার স্বাদ ভাল রকমেই থাকে। আমার নিজের বিষয়েই এই কথা বলিতেছি। জননেন্দ্রিয় ও স্বাদেন্দ্রিয়কে দমন করার জন্য আমাকে অনেক বিড়ম্বনা ও বাধা সহ্য করিতে হইয়াছে। আজও ঐ উভয়ের উপর পুরাপুরি জয়লাভ করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি দাবি করিতে পারি না। আমি নিজেকে অত্যাহারী মনে করিতাম। বন্ধুরা যাহাকে আমার ভিতর সংযম বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাকে কদাচ আমি সংযম মনে করি নাই। যতটা সংযম আমি রাখিয়াছি ততটা যদি না রাখিতে পারিতাম, তবে আমি পশুরও অধম হইয়া যাইতাম এবং কবে নষ্ট পাইতাম। আমার দোষ আমি ঠিক দেখিতে ও ধরিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আমি তাহা দূর করার জন্য খুব চেষ্টা করিতাম এবং সেইজন্যই আমি এত বৎসর পর্যন্ত এই শরীরকে টিকাইয়া রাখিতে পারিয়াছি এবং তাহার দ্বারা কাজও আদায় করিতে পারিয়াছি।

এই রকম জ্ঞান হওয়ার জন্য এবং অনুকূল সঙ্গ অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়ার জন্য আমি একাদশীতে ফলাহার অথবা উপবাস পালন করিতাম। জন্মাষ্টমী ইত্যাদি অন্য তিথিও পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু সংযমের দৃষ্টিতে আমি ফলাহার এবং অন্নাহারের মধ্যে বেশি ভেদ দেখিতে পাইলাম না। যে রসাস্বাদ আমরা সাধারণ খাদ্যাদিতে পাইয়া থাকি, সেই রসাস্বাদই ফলাহারেও পাওয়া যায় ও অভ্যাস হইয়া গেলে উহা হইতে অধিক রসাস্বাদও পাওয়া যায়। সেই হেতু পালনীয় তিথিতে সম্পূর্ণ উপবাস অথবা একবার মাত্র আহার আমি অধিক শ্রেষ্ঠ গণ্য করিতাম। আর যদি প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত হইত, তবে সেজন্য আমি পুরা উপবাসই পালন করিতাম।

আমি ইহাও দেখিলাম যে, শরীর খুব হালকা হওয়ায় রসাস্বাদ বাড়িল, ক্ষুধা খুব বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিলাম যে, উপবাসাদি যতটা সংযমের সাধন, ততটা ভোগেরও সাধন হইতে পারে। এই সত্য সমর্থন করে এমন অনেক অভিজ্ঞতা আমার নিজেরও হইয়াছে এবং অন্যেরও হইয়াছে, এরূপ দেখিয়াছি। আমার শরীর সুস্থ ও সক্ষম রাখার জন্য এবং প্রধানতঃ সংযম শিক্ষা করার জন্য, রসাস্বাদন জয় করিতে হইয়াছিল। সেই জন্য, আহার্য বস্তুর ও তাহার পরিমাণের অদল-বদল করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই আস্বাদ আমার পিছনে পিছনে লাগিয়াই ছিল। যে বস্তু ত্যাগ করিতাম ও তাহার পরিবর্তে যাহা গ্রহণ করিতাম, তাহাতেই নতুন এবং অধিকতর রস পাইতাম।

আমার এই খাদ্য পরীক্ষায় জনকয়েক সঙ্গী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মিঃ হারমান কলেনবেক ছিলেন প্রধান। তাঁহার পরিচয় দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ ইতিহাস গ্রন্থে আমি দিয়াছি বলিয়া পুনরায় এখানে দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি প্রত্যেক উপবাসে ও একবেলা আহারে অথবা অন্য খাদ্য-পরিবর্তনে আমার সঙ্গী হইতেন। যখন লড়াই ভাল রকম চলিতেছিল তখন আমি তাঁহার বাড়িতেই থাকিতাম। আমরা উভয়েই আমাদের খাদ্য-পরিবর্তনের আলোচনা করিতাম এবং নতুন পরিবর্তনে পুরাতন অপেক্ষা অধিক রস পাইতাম। তখন এই আলোচনা ভালই লাগিত। উহাতে যে কোন অন্যায় ছিল তাহা মনে হইত না। অভিজ্ঞতার দ্বারা শিখিয়াছি যে, এই রকম রস-চর্চা অসঙ্গত। অর্থাৎ রসের জন্য না খাইয়া কেবল শরীর রক্ষার জন্য খাওয়াই উচিত। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যখন শরীর দ্বারা আত্মার দর্শনের জন্য কাজ করে, তখন রস শূন্যবৎ হইয়া যায় ও তখন সেই ইন্দ্রিয় স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হয়—ইহা বলা যায়।

ইন্দ্রিয়ের এই স্বাভাবিকতা পাওয়ার জন যতই পরীক্ষা করা হোক না কেন, কিছুই যথেষ্ট নহে এবং উহা করিতে যদি শরীরকেও আহুতি দিতে হয়, তবে তাহাও আমাদের তুচ্ছ গণ্য করিতে হইবে। ইদানীং এই ভাবের বিপরীত স্রোতই চলিয়াছে। যে শরীর একদিন বিনষ্ট হইবে সেই শরীরকে সুন্দর দেখানোর জন্য, তাহার আয়ুষ্কাল বাড়াইবার জন্য, আমরা অনেক প্রাণীহত্যা করিতেছি, এবং তাহার দ্বারা শরীর ও আত্মা উভয়কেই হনন করিতেছি। এক রোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগ-সুখের জন্য, অনেক নতুন রোগ উৎপন্ন করিতেছি। আর এই ক্রিয়া যে নিজের চোখের সম্মুখেই চলিতেছে

তাহা দেখিয়াও দেখি না।

আহার সম্বন্ধে পরীক্ষার কথা বর্ণনা করিবার জন্য কিছু স্থান লওয়া স্থির করিয়াছি। এই কথাগুলি যাহাতে বুঝিতে পারা যায়, সেজন্য সেই আহার্য-বিষয়ক পরীক্ষার উদ্দেশ্য এবং তাহার পশ্চাতে যে বিচার-বোধ রহিয়াছে, তাহা দেখানোও আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

২৮

পত্নীর দৃঢ়তা

কস্তুরবার তিনবার কঠিন অসুখ হয় ও জীবন-সংশয় দেখা দেয়। আর তিনবারই তিনি ঘরোয়া চিকিৎসায় বাঁচিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রথমটির সময় সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চলিতেছিল। তাঁহার বারংবার রক্তস্রাব হইত। একজন ডাক্তার-বন্ধু অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দিয়াছিলেন। অনেক দ্বিধার পরে তিনি উহাতে সম্মত হন। শরীর খুবই ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার ক্লোরোফর্ম না করিয়াই অস্ত্র করিলেন। অস্ত্র করার সময় খুব ব্যথা পাইয়াছিলেন, কিন্তু যে ধৈর্যের সহিত কস্তুরবা এই ব্যথা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাতেও আমি আশ্চর্য হইয়া যাই। অস্ত্র-ক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। ডাক্তার ও তাঁহার স্ত্রী কস্তুরবার খুব শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

এই ঘটনা ডারবানে ঘটিয়াছিল। দুই কি তিন দিন পরে ডাক্তার আমাকে নিশ্চিন্তমনে জোহানেসবর্গে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আমি চলিয়া গেলাম। অল্পদিন পরেই সংবাদ আসিল যে, কস্তুরবার শরীর মোটেই ভাল না। বিছানায় উঠিয়া বসার শক্তিও নাই। একবার মূর্ছাও গিয়াছিলেন। ডাক্তার জানিতেন যে, আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কস্তুরবাকে ঔষধের সহিত মদ অথবা মাংস খাইতে দেওয়া যায় না। ডাক্তার আমাকে জোহানেসবর্গে টেলিফোন করিলেন—"আপনার স্ত্রীকে মাংসের সুরুয়া অথবা 'বীফ্ টী' দেওয়ার প্রয়োজন দেখিতেছি। আমাকে অনুমতি দিন।"

আমি উত্তর দিলাম—"আমার দ্বারা এই অনুমতি দেওয়া চলিবে না। কিন্তু কস্তুরবা এ বিষয়ে স্বাধীন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার মত অবস্থা থাকে ত জিজ্ঞাসা করিবেন। আর তিনি যদি খাইতে চাহেন তবে অবশ্যই উহা দিবেন।"

"রোগীকে এসময় আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারিব না। আপনার নিজেরই

এখানে আসা আবশ্যক। আমার যাহা সঙ্গত মনে হয় তাহা খাইতে দিতে যদি স্বাধীনতা না দেন, তবে আপনার স্ত্রীর জন্য আমি দায়ী নই।"

আমি সেই দিনই ডারবানের ট্রেন ধরিয়া ডারবানে পৌঁছিলাম। ডাক্তার সংবাদ দিলেন—"আমি সুরুয়া খাওয়াইয়াই আপনাকে টেলিফোন করিয়াছিলাম।"

"ডাক্তার, ইহাকে ত আমি ধোঁকা দেওয়া বলি।"

"চিকিৎসা করার সময় আমি ধোঁকা-টোকা বুঝি না। বস্তুতঃ আমরা, ডাক্তারেরা, এমন সময় রোগীকে ও তাহার আত্মীয়কে ঠকানোই পুণ্য বলিয়া মনে করি। আমার ধর্ম যেমন করিয়া পারি রোগীকে বাঁচানো।"—ডাক্তার দৃঢ়তার সহিত এই জবাব দিলেন।

আমার বড়ই দুঃখ হইল। আমি শান্ত রহিলাম। ডাক্তার লোক ভাল ছিলেন এবং তিনি আমার বন্ধু। তিনি এবং তাঁহার পত্নী আমার খুব উপকার করিয়াছেন। কিন্তু এরকম ব্যবহার আমি সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলাম না।

"ডাক্তার, এখন সাফ করিয়া বলুন আপনি কি করিতে চান? আমার পত্নীকে তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া কখনও মাংস খাইতে দিব না। উহা না খাইলে যদি তাঁহার মৃত্যু হয় তাহাও সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

ডাক্তার বলিলেন—"ওসব ফিলজফি আমার ঘরে চলিবে না। আপনার স্ত্রীকে যদি আমার চিকিৎসাধীনে রাখেন, তবে মাংস বা যাহাই খাওয়ানো দরকার মনে করিব তাহা অবশ্যই খাওয়াইব। যদি ইহা না করিতে দেন, তবে আপনি আপনার স্ত্রীকে লইয়া যান। আমার ঘরে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে মরিতে দিতে পারিব না।"

"তাহা হইলে আপনি কি এই কথাই বলিতেছেন যে, আমার স্ত্রীকে এখনই লইয়া যাইব?"

"আমি কি আপনাকে লইয়া যাইতে বলিতেছি? আমি বলিতেছি—আমার চিকিৎসার উপর কোনও রকম হাত দিতে পারিবেন না। আমার ও আমার স্ত্রীর দ্বারা যতটা হয় তাহা করিব এবং আপনি ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু এই সোজা কথাটা যদি বুঝিতে না পারেন, তবে নাচার হইয়া বলিতে হইবে যে, আপনার স্ত্রীকে আমার ঘর হইতে লইয়া যান।"

আমার মনে হয় যে, সেই সময় আমার সঙ্গে আমার এক ছেলে ছিল। তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইয়া বলিল—"মাকে ত মাংস দেওয়া যায় না।"

তারপর আমি কস্তুরবার নিকটে গেলাম। তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করাও দুঃখদায়ক ছিল। আমি তাঁহাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। তিনি দৃঢ়তার সহিত জবাব দিলেন—"আমার দ্বারা মাংসের সুরুয়া খাওয়া চলিবে না। মানবজন্ম বারে বারে হয় না। তোমার কোলে আমি মরিয়া যাই ভাল, কিন্তু আমার এই দেহ যেন অপবিত্র করা না হয়।"

আমি যতদূর বুঝাইবার বুঝাইলাম ও বলিলাম—"তুমি আমার সংকল্প অনুসরণ করিতে বাধ্য নও। আমার পরিচিত ভারতীয়দের ভিতরেও কতজন ঔষধের জন্য মাংস ও মদ খাইয়াছে।"

কিন্তু তিনি এতটুকুও না টলিয়া বলিলেন—"আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও।"

আমি খুব সন্তুষ্ট হইলাম। লইয়া যাইতে ভয় পাইতেছিলাম, তবুও লইয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। ডাক্তারকেও আমার স্ত্রীর সংকল্পের কথা বলিলাম। ডাক্তার রাগ করিয়া বলিলেন—"বেচারীকে এ রকম কথা বলিতে আপনার লজ্জা হইল না? আমি ত আপনাকে বলিয়াছি যে, আপনার স্ত্রীর অবস্থা এখান হইতে লইয়া যাওয়ার মত নয়। এতটুকুও ঝাঁকুনি সহ্য করার শক্তি তাঁহার নাই। রাস্তাতেই যদি তাঁহার প্রাণ যায় তাহাতে আমি আশ্চর্য হইব না। তবুও আপনি যদি জেদ করিয়া না মানেন, তবে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। যদি সুরুয়া না দিতে দেন, তবে আমার এখানে একরাত্রি রাখার ঝক্কিও আমি লইতে পারিব না।" টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। স্টেশন দূরে ছিল। ডারবান হইতে ফিনিক্স রেলে, তারপর রেলস্টেশন হইতে প্রায় আড়াই মাইল রাস্তা যাইতে হয়। ঝক্কি খুবই ছিল। তবে ঈশ্বর সহায় আছেন বলিয়া মানিয়া লইলাম। ফিনিক্সে একজনকে পূর্বেই পাঠাইয়া দিলাম। ফিনিক্সে আমাদের 'হ্যামক' ছিল। হ্যামক কাপড়ের তৈরি একরকম ঝোলা। উহার দুই দিক বাঁশে বাঁধিয়া লইলে রোগী উহাতে আরামে ঝুলিয়া থাকিতে পারে। মিঃ ওয়েস্টকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, হ্যামক, এক বোতল গরম দুধ, এক বোতল গরম জল ও লোক লইয়া যেন তিনি স্টেশনে আসেন।

যখন ট্রেনের সময় হইল তখন রিকশা আনাইলাম আর তাহাতেই এই ভয়ঙ্কর পীড়িতাবস্থায় স্ত্রীকে লইয়া রওনা হইলাম। পত্নীকে আমার সাহস দেওয়ার দরকার ছিল না বরং তিনিই আমাকে সাহস দিতে ছিলেন—"আমার কিছুই

হয় নাই, তুমি চিন্তা করিও না।"

তাঁহার দেহ অস্থিচর্মসার হইয়াছিল, ওজন ছিল না। কিছু দিন হইতে খাওয়া ছিল না। ট্রেনের কামরা পর্যন্ত বিশাল লম্বা প্লাটফরমের উপর দিয়া যাইতে হইত, রিকশা সেখানে যাইতে পারে না। আমি তাঁহাকে কোলে করিয়া কামরা পর্যন্ত লইয়া গেলাম। ফিনিক্সে সেই ঝোলা আসিয়াছিল। তাহাতে রোগীকে আরামে লইয়া গেলাম। সেখানে গিয়া কেবল জলচিকিৎসায় ধীরে ধীরে তাঁহার শরীর ভাল হইতে লাগিল।

ফিনিক্সে পৌছার দুই-তিন দিন পরে এক স্বামীজি আসিলেন, তিনি আমার জেদের কথা শুনিয়াছিলেন। দয়াপরবশ হইয়া আমাদের দুইজনকে বুঝাইতে আসিলেন। আমার মনে আছে যে, যখন স্বামীজি আসিতেন তখন মণিলাল ও রামদাসও হাজির হইত। স্বামীজি মাংসাহারের নির্দোষতার উপর ব্যাখ্যান চালাইতেন। মনুস্মৃতির শ্লোক আওড়াইতেন। পত্নীর সম্মুখে এই রকম কথাবার্তা আমার ভাল লাগিত না, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কথা চলিতে দিতাম। আমার মাংসাহারের মত সম্পর্কে মনুস্মৃতির প্রমাণ অপ্রমাণের আবশ্যকতা ছিল না। সে সকল শ্লোকই আমি জানিতাম। আমি জানিতাম, এক পক্ষ আছেন যাঁহারা উহাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। আর যদি উহা প্রক্ষিপ্ত না-ই হয়, তবুও নিরামিষাহার সম্বন্ধে আমার বিচার স্বাধীনভাবেই গঠিত হইয়া গিয়াছিল। কস্তুরবার শ্রদ্ধাতেই তাঁহারও কাজ চলিয়া যাইত। সে বেচারী শাস্ত্রের প্রমাণ কি জানে? তাঁহার কাছে পিতা-পিতামহের আচরণই ধর্ম ছিল। পিতার ধর্মের উপর ছেলেদের বিশ্বাস ছিল, সেইজন্য উহারা তাঁহার সহিত কথাবার্তায় মজা উপভোগ করিত। অবশেষে এই কথাবার্তা কস্তুরবা এই বলিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন :—

"স্বামীজী, আপনি যাহাই বলুন আমার মাংসের সুরুয়া খাইয়া ভাল হওয়ার দরকার নাই। আপনার পায়ে পড়ি, আমার মাথার ব্যথা ধরাইয়া দিবেন না। আর যদি কথা বলিতে হয়, তবে ছেলেদের বাপের সঙ্গে পরে বলিবেন। আমার এই কথা আপনাকে জানাইয়া দিলাম।"

২৯

ঘরোয়া সত্যাগ্রহ

১৯০৮ সালে আমার প্রথম জেলের অভিজ্ঞতা হয়। তাহাতে আমি দেখি জেলে যেসব নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহা সংযমী অথবা ব্রহ্মচারীর স্বেচ্ছায় পালন করা উচিত। যেমন—কয়েদীদিগকে সূর্যাস্তের পূর্বেই, পাঁচটার মধ্যেই খাইতে হয়। ভারতীয় ও নিগ্রো কয়েদীদের কফি দেওয়া হয় না। আর দরকার হয়ত খাদ্যের সঙ্গে লবণ খাইতে পারে। স্বাদের জন্য ত তাহাদের কোন দ্রব্যই খাওয়া নয়। যখন আমি জেলের ডাক্তারের কাছে ভারতীয়দের জন্য "কারী পাউডার" বা মশলার গুঁড়া চাহিয়াছিলাম, এবং রান্নার সময়েই লবণ দিতে বলিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"এখানে ত তোমরা সুস্বাদু দ্রব্য খাইতে আস নাই। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া মশলার কোনই আবশ্যক নাই। আর স্বাস্থ্যের দিক দিয়া নুন আলাদাই খাওয়া হোক, অথবা রান্নার সময়ই দেওয়া হোক—একই কথা।"

অনেক মেহনৎ করিয়া অবশেষে ঐ নিয়মের পরিবর্তন করাইতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু কেবল সংযমের দৃষ্টিতে বিচার করিলে, ঐ দুই সংযম ভালই ছিল। জোর করিয়া করানো সংযম কাজের নয়, কিন্তু স্বেচ্ছায় এই সংযম করিলে খুবই ভাল ফল দেয়। সেইজন্য জেল হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এই পরিবর্তন করিলাম। তখন যতটা পারা যায় চা খাওয়া বন্ধ করিলাম ও সন্ধ্যার পূর্বে আহারের অভ্যাস করিলাম আজ উহা স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।

আবার এমন এক ব্যাপার হইল, যাহাতে নুনও ত্যাগ করিলাম এবং প্রায় দশ বৎসর পর্যন্ত একটানা এই অবস্থা চলিয়াছিল। আহার সম্বন্ধে কতকগুলি বইতে পড়িয়াছি যে, লোকের নুন খাওয়ার দরকার নাই। বরঞ্চ না খাইলেই স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে লাভ আছে। ব্রহ্মচারীর উহাতে লাভই হইবে—এইরূপ আমি বুঝিয়াছিলাম। যাহাদের শরীর দুর্বল তাহাদের ডালও খাইতে নাই—এই রকম পড়িয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু আমি উহা তৎক্ষণাৎ ছাড়িতে পারি নাই। ঐ দুইটা জিনিসই আমার প্রিয় ছিল।

অস্ত্র করার পর কিছুদিন কস্তুরবার রক্তস্রাব বন্ধ ছিল। কিন্তু পরে খুব বৃদ্ধি পায়। উহা কিছুতেই থামিত না। ঠাণ্ডা জলের চিকিৎসাতেও কিছু হইল না। আমার জল-চিকিৎসার উপর পত্নীর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, তবে

খারাপও বলিতেন না। আমার অন্য যে সব চিকিৎসা করার ছিল তাহাতে যখন কোনও ফল হইল না, তখন তাঁহাকে লবণ ও ডাল ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু অনেক মিনতি করা সত্ত্বেও এবং আমার কথার সমর্থনের জন্য পুস্তক পড়িয়া শুনানো সত্ত্বেও, তিনি তাহা মানিলেন না। শেষে বলিলেন —"তোমাকে যদি কেহ নুন ও ডাল ছাড়িতে বলে তবে তুমিও ছাড়িবে না।" আমার দুঃখ হইল, আনন্দও হইল। আমার প্রেম তাহার উপর বর্ষণ করার সুযোগ পাইলাম। সেই আনন্দে আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম—"তুমি ভুল মনে করিয়াছ, আমার যদি অসুখ হয়, আর চিকিৎসক ঐ জিনিস, কি আরও কিছু ছাড়িতে বলে, তবে অবশ্যই ছাড়িব। কিন্তু সে কথা যাক্। ডাক্তারের নিষেধ ছাড়াই আমি এক বছরের জন্য লবণ ও ডাল ছাড়িয়া দিলাম। তুমি ছাড় আর না ছাড় সে আলাদা কথা।"

পত্নীর বড়ই অনুতাপ হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আমাকে মাফ কর। তোমার স্বভাব জানিয়াও আমি কেনই বা একথা তোমাকে বলিতে গেলাম। এখন আমি আর নুন ও ডাল খাইব না—কিন্তু তুমি তোমার কথা ফিরাইয়া লও। ইহাতে আমাকে বড়ই শাস্তি দেওয়া হইবে।"

"তোমার লবণ ও ডাল ছাড়িয়া দেওয়া খুব ভাল। আমার বিশ্বাস উহাতে তোমার উপকারই হইবে। কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা একবার লইয়াছি তাহা আর ফিরাইব না। আমার ত লাভই হইবে। যে কারণেই হোক সংযম পালন করিলে লাভই হইয়া থাকে। তুমি সেজন্য অনুরোধ করিও না। আমার দিক হইতে ইহাতে আমার পরীক্ষাই হইতেছে। এই যে দুটি জিনিস ছাড়িতে সংকল্প করিলাম, তাহাতে তোমার সাহায্য যেন পাই।"

ইহার পর আমাকে অনুরোধ করার কিছুই ছিল না। "তুমি বড়ই জেদী, কাহারও কথাই শোন না।"—এই কথা বলিয়া কস্তুরবা খুব চোখের জল ফেলিয়া শান্ত হইলেন।

ইহাকে আমি সত্যাগ্রহ বলিয়া পরিচয় দিতে চাই। ইহাই আমার জীবনের অন্যতম মধুর স্মৃতি।

ইহার পর কস্তুরবার শরীর খুব ভাল হইল। ইহা নুন ও ডাল খাওয়া বন্ধ করাই জন্যই হোক, অথবা আংশিক সেজন্যই এবং আংশিক তাঁহার ত্যাগবৃত্তি হইতে আহারে ছোট-বড় নানা পরিবর্তনের জন্যই হোক, অথবা স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করানোর জন্য তাঁহার উপর আমার কড়া দৃষ্টি রাখার জন্যই হোক, কিংবা

উপরিউক্ত ঘটনায় মানসিক আনন্দ বশতঃই হোক্—কেন যে হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কস্তুরবার অসুখ সারিল, রক্তস্রাব বন্ধ হইল ও "বৈদ্যরাজ" বলিয়া আমার খ্যাতি বাড়িল।

আমার নিজের উপর এই দুটি জিনিস ত্যাগের প্রভাব খুব ভাল হইয়াছিল। উহা ত্যাগ করার পর নুনের জন্য বা ডালের জন্য ইচ্ছাও রহিল না। এক বৎসর ত দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। ইন্দ্রিয়-সমূহের শান্তভাব বেশি অনুভব করিতে লাগিলাম, আর সংযম বাড়াইবার জন্য মন দৌড়াইয়া চলিতে লাগিল। বছর শেষ হওয়ার পরেও, নুন ও ডাল খাওয়া বন্ধ দেশে আসার পূর্ব পর্যন্ত চলিয়াছিল। মাত্র একবার, বিলাতে ১৯১৪ সালে নুন ও ডাল খাইতে হইয়াছিল। সে কথা এবং দেশে ফিরিয়া আসার পর ঐ দুটি জিনিস আবার কেমন করিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সে কথা পরে হইবে।

নুন ও ডাল ছাড়িয়া দেওয়ার পরীক্ষা আমি অন্য সঙ্গীদের উপরও ভাল-রকমেই করিয়াছিলাম এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় উহার পরিণাম ভালই হইয়াছিল। চিকিৎসকের দৃষ্টিতে এই দুটি জিনিস সম্পর্কে দুটি মত আছে। কিন্তু সংযমের দৃষ্টিতে উভয় বস্তু ত্যাগের মধ্যে যে লাভ আছে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। ভোগী ও সংযমীর আহার্য ভিন্ন রকম ও তাহাদের পথ ভিন্ন রকম হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য পালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া যদি ভোগীর জীবনধারা লওয়া যায় তবে ব্রহ্মচর্য রাখা কঠিন, এমন কি কখন কখন তাহা অসম্ভব হইয়াই দাঁড়ায়।

৩০

সংযমের দিকে

কস্তুরবার অসুখের জন্য যে আহারে কতকগুলি পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বের অধ্যায়ে বলিয়াছি। কিন্তু এখন দিনের পর দিন ব্রহ্মচর্যের দৃষ্টিতে আহারের পরিবর্তন হইতে লাগিল।

ইহার মধ্যে প্রথম পরিবর্তন হয় দুধ খাওয়া বন্ধ করা। দুধ যে ইন্দ্রিয় বিকার উপস্থিতকারী বস্তু, তাহা আমি প্রথমে রায়চাঁদ ভাইয়ের নিকট হইতে বুঝিয়াছিলাম। নিরামিষ সম্বন্ধে ইংরেজী পুস্তক পড়িয়া সেই বিচার আরো দৃঢ় হয়। কিন্তু যতদিন ব্রহ্মচর্য ব্রত লই নাই ততদিন পর্যন্ত দুধ ছাড়িবই এরকম স্থির করিতে পারি নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দুধের যে আবশ্যকতা নাই, একথা

আমি বহুদিন হইতে বুঝিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ ছাড়িয়া দেওয়া যায়, ইহা এমন বস্তু নয়। ইন্দ্রিয়-দমনের জন্য দুধ ছাড়া যে আবশ্যক, একথা যখন আমার অনুভূতিতে ধরা পড়িতেছিল, সেই সময়েই গোয়ালারা কি প্রকার প্রাণঘাতী কষ্ট গরু-মহিষকে দেয়, সে সম্বন্ধে কিছু লেখা কলিকাতা হইতে আমার কাছে আসে। এই সব লেখার প্রভাব চমৎকার হইল। আমি এই বিষয়ে মিঃ কলেনবেকের সঙ্গে আলোচনা করিলাম।

যদিও মিঃ কলেনবেকের পরিচয় আমি সত্যাগ্রহের ইতিহাসে দিয়া রাখিয়াছি, এবং পূর্বের অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক ভাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছি, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে দুই এক কথা এখানে বলিব। তাঁহার সহিত আমার হঠাৎ পরিচয় হয়। তিনি মিঃ খানের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে যে বৈরাগ্য প্রবৃত্তি রহিয়াছে, মিঃ খানের নিকট তাহা ধরা পড়ে এবং সেইজন্য তিনি আমার সহিত মিঃ কলেনবেকের পরিচয় করাইয়া দেন। যখন পরিচয় হইল, তখন তাঁহার শখ ও খরচের বহর দেখিয়া আমি ভড়কাইয়া গেলাম। কিন্তু প্রথম পরিচয়েই তিনি আমাকে ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। তাহা হইতে ভগবান বুদ্ধের ত্যাগের কথা সহজেই উঠিল। এই কথার পর আমাদের ত্যাগ বিষয়ে কথা বাড়িয়াই চলিল। এই আলোচনার ফলে তিনি স্থির করিলেন যে, আমি যেরকম চলিতেছিলাম তিনিও সেই রকম ভাবেই চলিবেন। তিনি একা লোক ছিলেন। কেবল নিজের জন্য বাড়িভাড়া ছাড়া প্রতি মাসে তাঁহার প্রায় ১২০০ টাকার উপর খরচ হইত। এই অবস্থা হইতে ক্রমে তিনি এমন সাদাসিধা চালে আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাসিক খরচ ১২০ টাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ঘরসংসার ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর এবং প্রথমবার জেল হইতে ফিরিয়া আসার পর আমি তাঁহার সঙ্গেই থাকিতে আরম্ভ করি। সে সময় আমাদের উভয়ের জীবনযাত্রার পদ্ধতি বেশ কঠোর রকমের ছিল।

আমাদের এই একত্র বাসকালে দুধের বিষয় এইরূপ চর্চা হইত। মিঃ কলেনবেক প্রস্তাব করিলেন—"দুধের সম্বন্ধে ত আমরা অনেকবার কথাবার্তা বলিয়াছি, তবে আমরা দুধ ছাড়িয়া দিই না কেন? ইহার আবশ্যকতা তো নাই।" আমি এই অভিপ্রায়ে আনন্দ-মিশ্রিত বিস্ময় বোধ করিলাম। প্রস্তাবটি আমার কাছে খুব ভাল লাগিত এবং আমি উহা অনুমোদন করিলাম। এ ঘটনা টলস্টয়-ফার্মে ১৯১২ সালে ঘটিয়াছিল।

এইটুকু ত্যাগেই শান্তি হইল না। দুধ ত্যাগ করার সংকল্পের অল্পকাল পরেই

কেবল ফলাহার করার সংকল্প করিলাম। আমাদের এই ফলাহার' মানে, যে সকল ফল খুবই সস্তা তাহারই উপরে নির্ভর করা। দীন-দরিদ্র যেভাবে জীবন-যাপন করে, আমরা সেইরূপ গরীবের জীবন-যাপন করা স্থির করিলাম। ফলাহারে আমরা খুব সুবিধাই পাইয়াছিলাম। ফলাহারে বড় একটা উনুন জ্বালাইবার দরকার হয় না। কাঁচা চীনাবাদাম, কলা, খেজুর ও জলপাইয়ের তেল—ইহাই আমাদের সাধারণ খাদ্য হইয়া পড়িল।

ব্রহ্মচর্য-পালনেচ্ছুদের প্রতি এইস্থানে এক সাবধানবাণী উচ্চারণ করার আবশ্যকতা আছে। যদিও আমি ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে আহার ও উপবাসের নিকট-সম্বন্ধ দেখিয়াছি, তবুও এটা নিশ্চিত যে, ব্রহ্মচর্যের মুখ্য আশ্রয় মনের উপর। পাপ মন উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হয় না। খাদ্যের সরলতা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। মনের ময়লা বিচার দ্বারা, ঈশ্বর-ধ্যান দ্বারা এবং ঈশ্বর-প্রসাদ দ্বারাই দূর হয়। কিন্তু মন আবার শরীরের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ-যুক্ত, বিকারগ্রস্ত মন বিকার-দানকারী খাদ্যই খুঁজিয়া বেড়ায়। বিকারগ্রস্ত মন অনেক প্রকার স্বাদের ভোগ করিতে চায়। তারপর সেই আহার ও ভোগের প্রভাব মনের উপর হয়। সেইজন্য ও সেই পরিমাণে খাদ্যাদির উপর সংযম রাখার ও নিরাহারের আবশ্যকতা অবশ্যই আছে। বিকার-গ্রস্ত মন শরীরের উপর ও ইন্দ্রিয়সমূহের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে না। তাহার পরিবর্তে মন শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহেরই বশবর্তী হয়। সেইজন্য শরীরের পক্ষে শুদ্ধ ও সর্বাপেক্ষা কম-বিকারী আহার্যের প্রয়োজন আছে এবং প্রসঙ্গতঃ নিরাহারের ও উপবাসাদিরও আবশ্যকতা আছে। যদি বলা যায় যে, সংযমীর পক্ষে আহার্যের মর্যাদা ও উপবাসাদির আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলে যেমন ভুল করা হইবে, তেমনি আবার আহারের বিচার এবং উপবাসই সর্বস্ব মানিলেও সমান ভুল হইবে। আমার অভিজ্ঞতা আমাকে ইহাই শিখাইয়াছে যে, যখন মন সংযমের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তখন আহারের সংযম ও উপবাস খুব সাহায্য করে। উহাদের সাহায্য ব্যতীত মনের নির্বিকারত্ব লাভ অসম্ভব।

৩১

উপবাস

দুধ ও অন্নাহার ত্যাগ করিয়া ফলাহারের পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম। সেই অবকাশে সংযমের জন্য উপবাসও আরম্ভ করিলাম। মিঃ কলেনবেকও যোগ দিলেন। পূর্বে যে উপবাস করিতাম তাহা কেবল স্বাস্থ্যের দিক দিয়া উপকারের জন্য। দেহ-প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্যও যে উপবাস করার আবশ্যকতা আছে, তাহা একজন বন্ধুর প্রেরণায় বুঝিলাম। বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম বলিয়া এবং মাতা কঠিন ব্রতপালনকারিণী ছিলেন বলিয়া, একাদশী ইত্যাদি ব্রত দেশে থাকিতে পালন করিতাম। তবে সে কেবল দেখাদেখি অথবা পিতামাতাকে সুখী করার জন্যই করিতাম। ঐ সকল ব্রত হইতে কিছু লাভ হয় কিনা বুঝিতাম না। লাভ হয় না—ইহাই মানিতাম। সেই বন্ধুটি ঐ সকল উপবাস পালন করেন বলিয়া এবং আমার ব্রহ্মচর্য ব্রতে সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া, আমি তাঁহার অনুকরণ আরম্ভ করিলাম এবং একাদশীর দিনে উপবাস করিব স্থির করিলাম। সাধারণতঃ লোকে একাদশীর দিনে দুধ ও ফল খাইয়া একাদশী করিয়া থাকে। ফলাহারের যে উপবাস তাহা ত আমি প্রতিদিনই পালন করিতেছিলাম। সেইজন্য আমি কেবল জল ছাড়া আর কিছুই না খাইয়া উপবাস আরম্ভ করিলাম।

উপবাস আরম্ভের সময়টা শ্রাবণ মাস ছিল। সেই বৎসর রমজান ও শ্রাবণ মাস একসঙ্গে পড়িয়াছিল। গান্ধী পরিবারে বৈষ্ণব ব্রতের সঙ্গে শৈব ব্রতেরও অনুষ্ঠান হইত। আত্মীয়েরা যেমন বৈষ্ণব মন্দিরে যাইতেন, তেমনি শৈব মন্দিরেও যাইতেন।

শ্রাবণ মাসে পরিবারের কেউ কেউ প্রতি বৎসরই 'প্রদোষ' * পালন করিতেন। আমিও এই শ্রাবণ মাস পালন করা স্থির করিলাম।

এইসব গুরুতর প্রয়োগ টলস্টয়-ফার্মে আরম্ভ হইয়াছিল। সেইখানে বন্দী সত্যাগ্রহী পরিবারের দেখাশোনার জন্য মিঃ কলেনবেক ও আমি থাকিতাম। উহাদের মধ্যে বালক ও যুবক ছিল। তাহাদের জন্য একটা স্কুল ছিল। এই যুবকদের মধ্যে ৪।৫ জন মুসলমান ছিল। তাহাদের ইসলামের নিয়মপালন করিতে আমি সাহায্য করিতাম ও উৎসাহ দিতাম। নামাজ ইত্যাদির সুবিধা করিয়া দিয়াছিলাম। আশ্রমে পারসী এবং খ্রীষ্টানও ছিল। ইহাদের সকলকেই

* সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাসে থাকা।

নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী চলিতে উৎসাহিত করাই নিয়ম ছিল। এইজন্য মুসলমান যুবকদের আমি রোজা রাখিতে উৎসাহ দিলাম। আমার ত প্রদোষই পালন করিতে হইত। আমি হিন্দু, পারসী ও খ্রীষ্টানদেরও মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিতে বলি। সংযমের কাজে সকলেরই যোগ দেওয়া প্রশংসনীয়—এইরূপ আমি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। সকল আশ্রমবাসীই আমার প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিল। হিন্দু ও পারসী যুবকগণ মুসলমানদের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিত না, করার আবশ্যকতাও ছিল না। মুসলমানেরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করিত ও সেইজন্য আর সকলে তাহার পূর্বেই খাইয়া লইত, যাহাতে মুসলমানদের তাহারা পরিবেশন করিতে ও তাহাদের জন্য ভাল খাবার তৈরি করিয়া দিতে পারে। মুসলমানেরা সূর্যোদয়ের পূর্বে খাইতেন। অন্য সম্প্রদায়-ভুক্তদের এই ভোজনে যোগ দিতে হইত না। আবার মুসলমানেরা দিনে জলও খাইতেন না। কিন্তু আর সকলের ইচ্ছামত জল খাওয়ায় বাধা ছিল না।

এই প্রয়োগের একটা ফল এই হইল যে, উপবাস ও একাহারের মহত্ত্ব সকলেই বুঝিতে লাগিলেন। একের প্রতি অন্যের উদারতা ও প্রেমভাবও বাড়িল। আশ্রমে নিরামিষাহারের নিয়ম ছিল। এই নিয়ম আমার মনের দিকে চাহিয়া সকলে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা এখানে ধন্যবাদের সঙ্গে স্বীকার করিব। রোজার সময় মুসলমানের পক্ষে মাংসাহার ত্যাগ ভাল না লাগারই কথা—কিন্তু নূতন যুবকদের মধ্যে কেউ আমার কাছে সে বিষয়ে কখনও কোন অভিযোগ করে নাই। তাহারা আনন্দের সঙ্গে ও তৃপ্তির সঙ্গে নিরামিষাহার করিত। আশ্রমের পক্ষে অশোভন না হয়, হিন্দু বালকেরা তাহাদের জন্য এই রকম সুস্বাদু রান্না করিয়া দিত।

আমার উপবাস বর্ণনা করিতে গিয়া এই অবান্তর বিষয় আমি ইচ্ছাপূর্বকই আনিয়াছি। কেন না এই মধুর প্রসঙ্গ আমি অন্য স্থানে বর্ণনা করিতে পারিব না। তাহা ছাড়া এই বিষয়ান্তরের ভিতর দিয়া আমার এক অভ্যাসের বর্ণনাও আমি দিয়া ফেলিয়াছি। যখন কোনও ভাল কাজ আমি করিতেছি বলিয়া আমার মনে হয়, তখন আমার সঙ্গে যাহারা থাকে তাহাদিগকে উহার সহিত যুক্ত করিতে চেষ্টা করি। এই উপবাস ও একাহারের প্রয়োগ উহাদের পক্ষে নূতন। তবুও প্রদোষ ও রমজানের উপলক্ষে আমি উহাদিগকে সেদিকে টানিয়াছিলাম।

এই ভাবে আশ্রমে সংযমের আবহাওয়া সহজেই বৃদ্ধি পাইল। অন্য উপবাস ও

একাহারে আশ্রমের বাসিন্দারা একত্র মিশিতে লাগিল। ইহাতে পরিণাম শুভ হইয়াছিল বলিয়াই আমি মনে করি। সংযমের প্রভাব সকলের হৃদয়ের উপর কতটা হইয়াছিল, অন্য সকল বিষয়ের সংযমের পক্ষে উপবাসাদি কতটা অংশ লইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া আমি বলিতে পারি না। কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক দিয়া এবং মানসিক দিক দিয়া আমার উপর ইহার প্রভাব খুব ভাল হইয়াছিল— ইহাই আমার অভিজ্ঞতা। তাহা হইলেও উপবাসাদির এই প্রভাব সকলের উপরেই হইবে, এমন একটা অনিবার্য নিয়ম যে নাই তাহা আমি জানি। ইন্দ্রিয়সংযমের ইচ্ছায় উপবাস করিলে, তবেই ভোগের বিষয় ত্যাগ করার পক্ষে সেই উপবাসের প্রভাব পড়ে। কোনও কোনও বন্ধুর অভিজ্ঞতায় আবার ইহাও ধরা পড়িয়াছে যে, উপবাসের শেষে ভোগের ইচ্ছা ও স্বাদের ইচ্ছা তীব্রতর হয়। সেইজন্য উপবাসকালে ভোগের ইচ্ছা দমন করার ও স্বাদ জয় করার ভাবনা সর্বদা থাকিলে তবে শুভফল আসিয়া থাকে। যাহার কোনও উদ্দেশ্য নাই, যাহাতে মন নাই, এমন শারীরিক উপবাসের ফলে বিষয়-বাসনা আটকাইবে এরূপ মনে করা একেবারে ভুল। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোক এই জায়গায় খুব বিচার করিবার বিষয়—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯

উপবাসীর (উপবাসকালে) বিষয় সকল শান্ত হয়। তাহার রস যায় না। রস ত ঈশ্বর-দর্শন হইতে, ঈশ্বর-প্রসাদ হইতেই শান্ত হয়।

এই হেতু উপবাসাদি সংযম-মার্গের এক সাধন রূপে আবশ্যক। কিন্তু উহাই সবটা নয়। যেখানে শরীরের উপবাসের সঙ্গে মনের উপবাস হয় না, সেখানে ছলনাই উপবাসের পরিণতি হয় এবং উহা ক্ষতিকারক হয়।

৩২

শিক্ষক রূপে

"দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ"এ যাহা উল্লেখ করা যায় না, অথবা অল্পমাত্র উল্লেখ করা যায়, সেই ধরনের কোন কোন বিষয় এই অধ্যায়ে লেখা হইতেছে। এই কথাটি যদি পাঠকেরা স্মরণ রাখেন, তবেই এই অধ্যায়ের সঙ্গে পূর্বাপর অধ্যায়-গুলির সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবেন।

টলস্টয়-কার্মে বালক-বালিকাদিগের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার আবশ্যকতা দেখা দেয়। আমার সঙ্গে হিন্দু, মুসলমান, পারসী ও খ্রীষ্টান বালক ছিল; আর কিছু হিন্দু বালিকাও ছিল। বিশেষ কারণে কোনও শিক্ষক রাখিতে অপারগ ছিলাম এবং রাখা আমি অনাবশ্যকও মনে করিতাম। অপারগ এই জন্য যে, যোগ্য ভারতীয় শিক্ষক দুষ্প্রাপ্য ছিল। আর যদি পাওয়াও যায়, তবে মোটা বেতন না হইলে জোহানেসবর্গ শহর হইতে ২১ মাইল দূরে কে আসে? আমাদের কাছে টাকারও সচ্ছলতা ছিল না। বাহির হইতে শিক্ষক আনা অনাবশ্যক মনে করিতাম, যেহেতু প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির উপর আমার আস্থা ছিল না। সত্যিকার শিক্ষাপদ্ধতি কি, সে বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়া সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করার ইচ্ছা ছিল। এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সত্যকার শিক্ষা পিতামাতার নিকট হইতেই হয় এবং বাহিরের সাহায্য খুব কম লওয়াই সঙ্গত। টলস্টয়-আশ্রম একটি পরিবার, আর সেখানে পিতারূপে আমি আছি। সেইজন্য এই যুবকদের শিক্ষার দায়িত্ব আমারই হাতে যথাশক্তি লওয়া উচিত বলিয়া মনে করিলাম।

এই কল্পনায় অনেক দোষ অবশ্যই ছিল। ছেলেরা আমার কাছে জন্মাবধি ছিল না। অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে লালিত হইয়াছে। সকলের ধর্মও এক ছিল না। এই অবস্থায় আমি বালক-বালিকাদের পিতা হইলে কেমন করিয়া তাহাদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করা হইবে?

কিন্তু আমি হৃদয়ের বিকাশকে ও চরিত্রগঠনকে বরাবরই প্রধান স্থান দিয়া আসিয়াছি। বয়স যতই ভিন্ন হোক না কেন, যে প্রকার আবেষ্টনের মধ্যেই বড় হোক না কেন, বালক-বালিকাদিগকে ঐ শিক্ষা দেওয়া যায়—এইরূপ বিচার করিয়া বালক-বালিকাদের সঙ্গে দিনরাত্রি পিতারূপে থাকা স্থির করিলাম। চরিত্রগঠন অন্য সকল শিক্ষার ভিত্তি বলিয়া আমি মানিতাম। সেই ভিত্তি যদি পাকা হয়, তবে বালকেরা অন্য সকল শিক্ষাই, অবকাশমত সাহায্য লইয়া, নিজেরাই গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবুও অক্ষরজ্ঞান যে এক-আধটুকু দেওয়া চাই—ইহা আমি বুঝিতাম। সেইজন্য আমি ক্লাস করিলাম ও তাহাতে মিঃ কলেনবেক ও শ্রীপ্রাগজী দেশাইয়ের সাহায্য লইলাম।

শরীর গঠন করার শিক্ষার আবশ্যকতা আমি বুঝিতাম। সে শিক্ষা তাহারা স্বভাবতই কাজের ভিতর দিয়া পাইত। আশ্রমে চাকর ছিল না। পায়খানা

সাফ হইতে আরম্ভ করিয়া রান্না করা পর্যন্ত সকল কাজ আশ্রমবাসীদেরই করিতে হইত। গাছপালা অনেক ছিল, তাহাদের যত্ন লইতে হইত। মিঃ কলেনবেকের কৃষির শখ ছিল। নিজে সরকারী আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে কিছুদিন শিক্ষা লইয়া আসিয়াছিলেন। রোজ নির্দিষ্ট সময়ে ছোট বড় সকলকেই (যাহারা রান্নাঘরের কাজে আছে তাহারা বাদে) বাগানে কাজ করিতে হইত। ইহাতে বালকেরাই বেশি কাজ করিত। বড় বড় গর্ত খোঁড়া, গাছ কাটা, বোঝা উঠানো ইত্যাদি কাজে তাহাদের শরীরের অনুশীলন ভাল ভাবেই হইত। উহাতে তাহারা আনন্দ পাইত এবং তাহাদের অন্য ব্যায়ামের বা খেলার আবশ্যক হইত না। কাজ করিত কেউ কেউ, অথবা কখনো কখনো সকলেই দুষ্টামি করিত, আলস্য করিত। অনেক সময় উহাতে আমি চোখ বুজিয়া থাকিতাম, আবার কখনও বা কঠিন হইয়া তাহাদের কাছ হইতে কাজ আদায় করিতাম। যাহাদের উপর কঠোর হইতাম, তাহারা তাহা পছন্দ করিত না, ইহাও আমি লক্ষ্য করিতাম। কিন্তু কেউ ঐ কঠোরতায় বিধোধিতা করিয়াছে—এমন স্মরণ হয় না। যখনই আমি কঠোর হইতাম, তখনই আমি তাহাদিগকে তাহার কারণ বুঝাইয়া দিতাম এবং তাহাদিগকে দিয়া স্বীকার করাইয়া লইতাম যে, কাজের সময় খেলা করার অভ্যাস ভাল নয়। তাহারাও তখনকার মত তাহা বুঝিত, কিন্তু পরক্ষণেই ভুলিয়া যাইত—এমনিভাবে চলিতেছিল। কিন্তু সে যাহাই হোক তাহাদের শরীর গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আশ্রমে অসুখ-বিসুখ কদাচিৎ হইত। জলবায়ু ছাড়া নিয়মিত আহার যে তাহার বড় একটা কারণ ছিল তাহা বলা যায়। জীবিকার্জনকেও আমি শরীরগঠন শিক্ষারই একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য করি। সকলকেই কোন না কোনও বৃত্তিকরী কাজ শিখাইবার চেষ্টা হইত। সেইজন্য মিঃ কলেনবেক এক মঠে গিয়া চটি জুতা তৈরি শিখিয়া আসিলেন। তাঁহার কাছ হইতে আমি শিখিয়াছিলাম। আর যে ছেলেরা এই কাজ শিখিতে চাহিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে শিখাইয়াছিলাম। মিঃ কলেনবেকের ছুতারের কাজে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল এবং আশ্রমে ছুতারের কাজ জানে এমন একজন সঙ্গীও ছিল। সেইজন্য ছুতারের কাজও কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত। রান্নার কাজ ত প্রায় সকলেই শিখিয়াছিল।

এ সকল কাজই বালকদিগের পক্ষে নূতন। বস্তুতঃ তাহাদের এসকল কাজ স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয় ছেলেরা যে শিক্ষা পাইত তাহা প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান মাত্র। টলস্টয়-ফার্মে প্রথম হইতেই এই নিয়ম

ছিল যে, যে কাজ কোনও শিক্ষক করিবেন না, সে কাজ বালকদের দিয়াও করানো হইবে না, এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করার জন্য একজন শিক্ষক থাকাই চাই। এইজন্য ছেলেরা আনন্দ করিয়া শিখিত।

চরিত্র ও অক্ষরজ্ঞান সম্বন্ধে পরে বলিতেছি।

৩৩

অক্ষর শিক্ষা

পূর্বের অধ্যায়ে কেমন ভাবে শরীরগঠন শিক্ষা এবং তার সঙ্গে কিছু হাতের কাজ শিখানোর ব্যবস্থা টলস্টয়-ফার্মে আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহার কতকটা আভাস দিয়াছি। যেমনটি হইলে আমার তৃপ্তি হইত ঠিক সেভাবে এই কাজ করিতে না পারিলেও তাহাতে মোটামুটি সফলতা পাইয়াছিলাম। কিন্তু অক্ষর-জ্ঞান দেওয়াই কঠিন ব্যাপার ছিল। আমার কাছে এজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। আমি যতটা সময় দিতে ইচ্ছা করিতাম ততটা সময়ও দিতে পারিতাম না—শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তত জ্ঞানও ছিল না। সারাদিন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। আর যে সময় একটু বিশ্রাম লওয়ার ইচ্ছা হয়, সেই সময়ই ক্লাস লইতে হইত। সেইজন্য আমাকে জোর করিয়া জাগিয়া থাকিতে হইত। সকালবেলা ক্ষেতের কাজে ও ঘরের কাজে সময় যাইত বলিয়া দুপুরের খাওয়ার পরই স্কুলের ক্লাস চলিত। ইহা ছাড়া আর কোনও অনুকূল সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

অক্ষরজ্ঞানের জন্য বড় জোর তিন ঘণ্টার বেশি সময় দেওয়া হইত না। ক্লাসে হিন্দী, তামিল, গুজরাটী ও উর্দু শিখাইতে হইত। প্রত্যেক বালককেই তার মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ ছিল। ইংরেজী সকলকেই শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার উপর গুজরাটী, হিন্দু বালকদের কিছু 'সংস্কৃত' এবং সকলকেই কিছু হিন্দী পড়ানো হইত। ক্লাসে সকলের জন্যই ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্ক সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তামিল ও উর্দু আমি পড়াইতাম।

আমি যেটুকু তামিল জানিতাম, তাহা স্টীমারে ও জেলে শিখিয়াছিলাম। পোপের "তামিল স্বয়ং-শিক্ষক" বইখানা ছাড়া আর কোনও বই হইতে তামিল শিখিবার সুযোগ আমার হয় নাই। উর্দু লিপির জ্ঞান স্টীমারে পাইয়াছিলাম,

সেইটুকুই। আর খাস ফারসী আরবী শব্দের জ্ঞান, যতটুকু মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হইয়া পাইয়াছিলাম কেবল ততটুকু; সংস্কৃত-জ্ঞান হাই স্কুল পর্যন্ত, গুজরাটীও স্কুলের বিদ্যা পর্যন্ত।

এই পুঁজি লইয়া আমাকে কাজ চালাইতে হইত। সাহায্য যাঁহারা করিতেন তাঁহারা আমার চাইতেও কম জানিতেন। দেশের ভাষার প্রতি আমার ভালবাসা, আমার শিক্ষাপদ্ধতির উপর আমার শ্রদ্ধা, বিদ্যার্থীদের অজ্ঞতা এবং তাহা হইতেও অধিক তাহাদের উদারতা আমাকে আমার কাজে সাহায্য করিত।

তামিল বিদ্যার্থীরা দক্ষিণ আফ্রিকাতেই জন্মিয়াছিল। সেইজন্য তামিল খুবই কম জানিত। তাহারা লিখিতে মোটেই জানিত না। এইজন্য তাহাদিগকে লিখিতে ও ব্যাকরণের মূল-তত্ত্ব শিখাইতে হইত। উহা সহজ ছিল। বিদ্যার্থীরা জানিত যে, তামিল কথাবার্তায় তাহারা আমাকে সহজেই হারাইয়া দিবে। তামিলভাষী কোন লোক যখন আমার সঙ্গে দেখা করিত, তখন বিদ্যার্থীরাই আমার দোভাষীর কাজ করিত। আমার ইহাতেই বেশ চলিয়া যাইত। কেন না আমি বিদ্যার্থীর কাছ হইতে আমার অজ্ঞতা ঢাকার চেষ্টা কখনও করি নাই। সকল বিষয়েই আমি যেমন ছিলাম, তাহারা তেমনি আমাকে জানিত। এইজন্য ভাষাজ্ঞানের প্রচুর দীনতা সত্ত্বেও, আমি তাহাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা কখনো হারাই নাই।

মুসলমান বালকদের উর্দু শিখাইবার কাজ খুব সহজ ছিল। তাহারা অক্ষর চিনিত। পড়ার জন্য তাহাদের আগ্রহ বাড়ানো ও তাহাদের অক্ষর শুদ্ধ করাই আমার কাজ ছিল।

ছেলেরা বেশির ভাগই নিরক্ষর। পূর্বে স্কুলে যায় নাই। শিখাইতে শিখাইতে আমি দেখিলাম, তাহাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার কাজ খুব কমই আছে। তাহাদের আলস্য দূর করা, নিজেদের মধ্যে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা এবং পাঠাভ্যাস পরীক্ষা করা—ইহাই যথেষ্ট। এই কাজেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম বলিয়া বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন বিষয়ের বিদ্যার্থীদের এক কামরাতেই বসাইয়া আমি কাজ চালাইয়া লইতে পারিতাম।

পাঠ্যপুস্তকের হুজুগের কথা যদিও যথেষ্ট শোনা যায়, তবু সে বিষয়ে আমার বিশেষ কোনও গরজ ছিল না। যে সকল বই ছিল, তাহাও যে খুব ব্যবহার হইয়াছে এমন আমার মনে হয় না। প্রত্যেক ছেলেকে

অনেকগুলি করিয়া বই দেওয়া আমি আবশ্যক মনে করি নাই। শিক্ষক নিজেই বিদ্যার্থীর পাঠ্যপুস্তক—এইরূপ আমার মনে হইত। শিক্ষকদেরও বই হইতে খুব বেশি কিছু শিখিবার আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার শিক্ষকেরা বই হইতে আমাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন, তাহার সামান্যই আমার মনে আছে। কিন্তু বই ছাড়া যাহা শিখাইয়াছেন তাহার এতটুকুও ভুলিয়া যাই নাই। বালকেরা কানে শোনা অপেক্ষা চোখে দেখিয়া সহজে শিখে। উহাতে অল্প পরিশ্রম হয় এবং অনেক বেশি জিনিস শিখিতে পারে। বালকদের আমি একখানা বইও পুরাপুরি পড়াইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। নানা বই হইতে আমি যাহা পড়িতাম প্রথমে তাহাই নিজে আয়ত্ত করিয়া, পরে নিজের ভাষায় বালকদের বলিতাম। আমার মনে হয়, উহা আজও তাহাদের স্মরণ আছে। পড়িয়া মনে রাখিতে তাহাদের কষ্ট হইত। আমি যাহা শুনাইতাম, তাহা মুখে মুখে তখনি বলিয়া আমাকে শুনাইতে পারিত। পড়া তাহাদের পক্ষে আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল। শুনাইবার সময় যদি শ্রান্তিবশতঃ বা অন্য কোন কারণে আমার কথা নীরস না হইত, তবে তাহারাও আগ্রহ সহকারে শুনিত। তাহাদের যে প্রশ্ন হইত তাহারই উত্তর দিতে গিয়া তাহাদের গ্রহণ-শক্তির পরিমাপ আমি পাইতাম।

৩৪

আত্মিক শিক্ষা

বিদ্যার্থীদের শরীর ও মনের শিক্ষা অপেক্ষা আত্মার শিক্ষা দেওয়ার সময়ই আমাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। আত্মার বিকাশের জন্য আমি ধর্মপুস্তকের উপর নির্ভর করিতাম না। প্রত্যেক বিদ্যার্থীর নিজ নিজ ধর্মের মূলতত্ত্ব জানা উচিত এবং নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত—এইরূপ আমি মনে করিয়াছি এবং সেই রকম জ্ঞান দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু উহাও আমি বুদ্ধি-বিকাশের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করি। টলস্টয়-আশ্রমের বালকদের শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করার পূর্ব হইতেই, আমি আধ্যাত্মিক শিক্ষা একটা আলাদা জিনিস বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আত্মার বিকাশ করা মানেই চরিত্রগঠন করা, ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ করা, আত্মজ্ঞান লাভ করা। এই জ্ঞান পাইতে বালকদের ভালরকম সাহায্য করা

দরকার। এই জ্ঞান না থাকিলে অন্য সকল জ্ঞান ব্যর্থ ও ক্ষতিকারক হয়—ইহাই আমি বিশ্বাস করি।

চতুর্থ আশ্রমে (অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস লইয়া) আত্মজ্ঞান পাওয়া যায়—এই প্রকার ভুল উক্তি আমার শোনা আছে। কিন্তু যাহারা চতুর্থ আশ্রমের জন্য এই অমূল্য বস্তু লাভ করা মুলতবী রাখিয়া দেয়, তাহারা কখনই আত্মজ্ঞান পায় না, এবং তাহারা বৃদ্ধ হইয়া অর্থাৎ কৃপা করার যোগ্য দ্বিতীয় বাল্যকাল পাইয়া পৃথিবীর ভাররূপে জীবন কাটায়। এই রকম ঘটনা সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত এই ভাষায় ১৯১১-১২ সালে আমি কখনো ব্যক্ত করিতে পারিতাম না। তথাপি আমার খুব স্মরণ আছে যে, আমার এখন যাহা সিদ্ধান্ত তখনও সেই ধারণাই ছিল।

আত্মিক শিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যায়? বালকদের দিয়া ভজন গাওয়াইতাম। তাহাদিগকে নীতি-বিষয়ক পুস্তক পড়িয়া শুনাইতাম, কিন্তু তাহাতে সন্তোষ পাইতাম না। যতই তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে লাগিলাম যে, এই জ্ঞান বই-এর ভিতর দিয়া দেওয়ার জিনিস নয়। শরীরগঠন শিক্ষা শারীরিক ব্যায়ামচর্চার দ্বারা দেওয়া যায়, বুদ্ধির শিক্ষা বুদ্ধিচর্চার দ্বারা দেওয়া যায়, তেমনি আত্মার শিক্ষা আত্মার চর্চা দ্বারাই দেওয়া যায়—আত্মার চর্চা শিক্ষকের ব্যবহার হইতেই লাভ করিতে পারা যায়। এইজন্য ছাত্ররা শিক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত থাকুক আর নাই থাকুক, শিক্ষকের সাবধান হইয়া থাকা দরকার। লঙ্কায় বসিয়া থাকিয়াও শিক্ষক নিজের আচরণ দ্বারা নিজের শিষ্যদের আত্মাকে প্রভাবিত করিতে পারেন। আমি যদি মিথ্যা বলি ও আমার শিষ্যদের সত্য কথা বলাইতে চেষ্টা করি তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। ভীরু শিক্ষক শিষ্যদের বীরত্ব শিক্ষা দিতে পারে না। ব্যভিচারী শিক্ষক শিষ্যদের সংযম কেমন করিয়া শিক্ষা দিবে? আমি দেখিলাম চারিদিকের যুবক-যুবতীদের সম্মুখে আমারই আদর্শ হইয়া থাকা আবশ্যক। এমনি করিয়া আমার ছাত্ররা আমার শিক্ষক হইল। আমার জন্য না হোক, তাহাদেরও জন্যও আমার সমস্ত আচরণ শুদ্ধ হওয়া চাই—এইপ্রকার আমি বুঝিলাম। টলস্টয়-আশ্রমে আমার যে অল্পবিস্তর সংযম-সাধনা হইয়াছিল, তাহার জন্য ঐ ছাত্র ও যুবক-যুবতীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আশ্রমের একটি যুবক বড়ই দুর্দান্ত ছিল—সে মিথ্যা কথা বলে। কাউকে গ্রাহ্য করে না, সকলের সঙ্গে লড়াই করিয়া চলে। একদিন সে বড় বেশি—

দুর্দান্তপনা করিল। আমি ভয় পাইলাম। বিদ্যার্থীদের কোনও দণ্ড দেওয়া হইত না। কিন্তু এই সময় আমার বড় রাগ হইল। আমি তাহার কাছে গিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে কোন কথাই শুনিল না। দেখিলাম সে আমার সঙ্গেও পাল্লা দিতে চায়। আমার কাছে একটা রুল পড়িয়া ছিল, তাহা আমি তুলিয়া লইয়া তাহার হাতের উপর এক ঘা বসাইয়া দিলাম। কিন্তু ঘা দিয়াই আমি কাঁপিতে লাগিলাম। সে ইহা দেখিল। এই আচরণ কোনও বিদ্যার্থী আমার কাছ হইতে কখনো পায় নাই। বিদ্যার্থীটি কাঁদিয়া উঠিল এবং আমার কাছে মাফ চাহিল। আঘাতে সে কাঁদে নাই। সে যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইত, তবে আমাকেই ঘা কয়েক লাগাইয়া দিতে পারিত, তাহার শরীরে এমন শক্তি ছিল। তাহার বয়স সতের বৎসর, গঠন মজবুত। রুলের ঘা লাগাইয়া আমার যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা সে দেখিতে পাইয়াছিল। এই ঘটনার পর সে আর কখনো আমার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। কিন্তু তাহাকে সেই রুলের ঘা দেওয়ার অনুতাপ আজও আমার রহিয়াছে। আমার বোধ হয়, তার কাছে সেদিন আমি আমার আত্মার পরিচয় দিই নাই। আমার ভিতরে যে পশু আছে তাহারই পরিচয় দিয়াছি।

আমি বরাবরই বালকদের দৈহিক শাস্তি দিয়া শিক্ষা দেওয়ার বিরোধী। একবার মাত্র আমার ছেলেদের মধ্যে একজনকে আমি প্রহার করিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ আছে। রুলের ঘা দিয়া সেদিন আমি ঠিক করিয়াছিলাম কিনা, তাহা আজও নির্ণয় করিতে পারি নাই। ঐ শাস্তির সঙ্গতি সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। কেন না, তাহাকে যখন প্রহার করিয়াছিলাম তখন আমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া দণ্ড দিতে চাহিয়াছিলাম। কেবল আমার ভিতরের দুঃখ দেখাইবার জন্যই যদি তাহাকে আঘাত করিতাম, তাহা হইলে ঐ দণ্ড উপযুক্ত গণনা করা যাইত। কিন্তু আমার ভিতরে মিশ্রিত ভাব ছিল। এই ঘটনার পরে আমি বিদ্যার্থীদের মনের পরিবর্তন করার খুব ভাল রীতি শিখিয়াছিলাম। সেই কলাবিদ্যা যদি উপরি-উক্ত ঘটনায় প্রয়োগ করা হইত তবে কি ফল হইত তাহা এখন বলিতে পারি না। ঐ যুবক এই ঘটনা তখনই ভুলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার যে খুব পরিবর্তন হইয়াছিল, একথা বলা যায় না। এই ব্যাপারের পর বিদ্যার্থীর প্রতি শিক্ষকের ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাল করিয়া বিচার করিতে আরম্ভ করিলাম। পরেও যুবকদের এই রকম

দোষ দেখা গিয়াছে, কিন্তু আমি দণ্ডনীতি প্রয়োগ করি নাই। ছাত্রদের আত্মিক জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টায় আমি নিজে আত্মার গুণ ভাল রকম বুঝিতে লাগিলাম।

৩৫

ভাল-মন্দের মিশ্রণ

টলস্টয়-ফার্মে মিঃ কলেনবেক এক প্রশ্ন আমার নিকট তুলিলেন। সেকথা তাহার পূর্বে আমি ভাবি নাই। আশ্রমের কতকগুলি ছোকরা বড় দুর্দান্ত ও খারাপ ছিল। কতকগুলি ছিল যাহারা নিষ্কর্মা, যাহারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই রকমের। তাহাদের সঙ্গেই আমার তিন ছেলেও থাকিত এবং আমার ছেলেদের মতই লালিত হইয়াছে এমন অন্য ছেলেও ছিল। মিঃ কলেনবেকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল ঐ ভবঘুরেদের দিকে, আর আমার ছেলেদের দিকে। একদিন তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আপনার এই ধরন-ধারণ আমার মোটেই বরদাস্ত হয় না। এই ছেলেগুলির সঙ্গে আপনার ছেলেরা যদি মিশে, তবে তাহাদের পরিণামও সুনিশ্চিত! এই কুসঙ্গের প্রভাবে তাহারাও বিগড়াইয়া যাইবে।"

সে সময় তাঁহার কথায় আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম কিনা আজ তাহা মনে নাই। তবে আমার জবাব আমার মনে আছে। আমি বলিলাম—"আমার ছেলেদের মধ্যে আর এই ভবঘুরেদের মধ্যে আমি কি করিয়া পার্থক্য করিব? এ পর্যন্ত উভয়ের জন্যই আমি সমান দায়ী আছি। এই ছেলেরা আমার আহ্বানে আসিয়াছে। আজ যদি যাওয়ার খরচা দিয়া ইহাদিগকে বিদায় দিই, তবে এখনি ইহারা জোহানেসবর্গে ফিরিয়া যাইবে এবং সেখানে যেমন পূর্বে ছিল, তেমনি করিয়া চলিতে থাকিবে। আমার এখানে থাকিয়া আমার উপর উহারা কতকটা কৃপা করিতেছে, উহারা এবং উহাদের অভিভাবকেরা এইরূপই মনে করে। এখানে আসাতে যে উহাদের অসুবিধা হইয়াছে তাহা আপনিও জানেন, আমিও জানি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার ধর্ম স্পষ্ট। উহাদের এইখানেই আমার রাখিতে হইবে। আমার ছেলেরাও উহাদের সঙ্গে থাকিবে। আমি কি আজ হইতেই আমার ছেলেদিগকে এই ভেদভাব শিক্ষা দিব যে, তাহারা উহাদের কতকগুলির

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? এইরকম বুদ্ধি তাহাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া ও তাহাদের কুপথে চালানো একই কথা। উহাদের সঙ্গে মিশিয়া বড় হইলে ভালমন্দের ভিতর প্রভেদ তাহারা নিজেরাই করিতে পারিবে। আপনি একথা কেন মানিবেন না যে, যদি আমার ছেলেদের মধ্যে সত্যসত্যই কোন গুণ থাকে, তবে তাহারই প্রভাব তাহাদের সাথীদের উপর পড়িবে? সে যাহাই হোক, উহাদিগকে এখানে রাখা ছাড়া আর কোনও পথ নাই। তাহাতে যদি কোনও বিপদ হয়, তবে তাহার সম্মুখীন হইতেই হইবে।"

মিঃ কলেনবেক মাথা নাড়িলেন।

এই পরীক্ষার পরিণাম খারাপ হইয়াছিল বলা যায় না। আমার ছেলেদের উহাতে কোনও ক্ষতি হইয়াছে ইহা আমি বিশ্বাস করি না। লাভ যে হইয়াছে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি। ছেলেদের ভিতরে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান যদি কিছু ছিল তাহা সর্বথা গেল। তাহারা সকলের সঙ্গে মিশিতে শিখিল। তাহারা অভিজ্ঞ হইল।

এইরকম অভিজ্ঞতার পর আমার ইহা মনে হইয়াছে যে, বাপ-মার নজর যদি বরাবর থাকে, তবে ভাল ছেলে, মন্দ ছেলের সঙ্গ করিলে এবং একত্র শিক্ষালাভ করিলেও তাহাতে ভাল ছেলেদের কোন হানি হয় না। নিজের ছেলেকে সিন্দুকে ভরিয়া রাখিলেই শুদ্ধ থাকে, আর বাহিরে ফেলিয়া দিলেই নষ্ট হয়, এমন ত কোনও নিয়ম নাই। হাঁ, একথা সত্য যে, যখন নানা রকমের বালক-বালিকার সঙ্গে ছেলেদের মিশিতে ও লেখাপড়া করিতে হয়, তখনই বাপ-মার পরীক্ষা হয়, তখন তাঁহাদের সাবধান থাকিতে হয়।

৩৬
প্রায়শ্চিত্তরূপ উপবাস

বালক-বালিকাদের ঠিক মত লালনপালন করা ও শিক্ষা দেওয়া যে কেমন কঠিন ও কত কঠিন, তাহার অভিজ্ঞতা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শিক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, তাহাদের সুখদুঃখের ভাগ লইতে হইয়াছিল, তাহাদের জীবনের গোপন কথা জানিতে হইয়াছিল এবং তাহাদের উচ্ছ্বসিত যৌবন-তরঙ্গকে সৎপথে পরিচালিত করিতে হইয়াছিল।

সত্যাগ্রহীরা জেল হইতে ছাড়া পাওয়ার পর টলস্টয়-ফার্মে অল্প লোকই রহিল। যাহারা ছিল তাহারা প্রধানতঃ ফিনিক্সবাসী। সেইজন্য আশ্রমে ফিনিক্সে লইয়া গেলাম। ফিনিক্সে আমার কঠিন পরীক্ষা হইল। টলস্টয়-আশ্রমবাসীরা ফিনিক্সে গেল, আমি জোহানেসবর্গে আসিলাম। জোহানেসবর্গে কিছুদিন থাকিতেই দুইজনের ভয়ঙ্কর অধঃপতনের সংবাদ পাওয়া গেল। সত্যাগ্রহের মহৎ যুদ্ধে যদি সাময়িক নিষ্ফলতা দেখা দিত, তাহাতে আমার মনে আঘাত লাগিত না। কিন্তু এই ঘটনা আমাকে বজ্রাঘাত করিল। আমি সেইদিনই ফিনিক্স যাওয়ার গাড়িতে রওনা হইলাম। মিঃ কলেনবেক আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি আমার নিদারুণ অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমাকে কিছুতেই একা যাইতে দিলেন না। অধঃপতনের খবর আমি তাঁহার নিকটেই পাইয়াছিলাম।

রাস্তায় যাইতে যাইতে আমার ধর্ম জানিয়া লইলাম অথবা জানিয়াছি এই রকম মনে করিলাম। আমার বোধ হইল যে, অভিভাবক অথবা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যাহারা থাকে, তাহাদের অধঃপতন হইলে তত্ত্বাবধায়কও অল্পবিস্তর দায়ী। ঐ ঘটনায় আমার দায়িত্ব আমার কাছে স্পষ্ট হইল। আমার পত্নী আমাকে সাবধান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি স্বভাবতই বিশ্বাসপরায়ণ বলিয়া ঐ সাবধানতা গ্রাহ্য করি নাই। আমার বোধ হইল যে, যদি এই অধঃপতনের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করি, তবে যাহারা পতিত হইয়াছে তাহারা আমার দুঃখ বুঝিতে পারিবে ও তাহা হইতে তাহাদের নিজের দোষ সম্পর্কে সচেতন হইবে ও তাহাতে কতকটা অপরাধ স্খালন হইবে। এইজন্য আমি ৭ দিনের উপবাস ও সাড়ে চার মাস একবেলা আহারের ব্রত লইলাম। মিঃ কলেনবেক আমাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হন নাই। অবশেষে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্যতা তিনি স্বীকার করেন এবং তিনিও আমার সঙ্গে ঐ ব্রত পালনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহার নির্মল প্রেমে আমি বাধা দিতে পারিলাম না। এই প্রকার স্থির করার পরেই আমি হালকা বোধ করিলাম, শান্ত হইলাম। দোষীদের উপরে ক্রোধের পরিবর্তে কেবল দয়াভাবই রহিল।

এমনি করিয়া ট্রেন হইতেই মন হালকা করিয়া আমি ফিনিক্সে পৌঁছিলাম। অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানার ছিল জানিয়া লইলাম। যদিও আমার উপবাসে সকলেরই কষ্ট হইল, তবু সেখানকার বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ হইল। পাপ করা কি

ভয়ঙ্কর তাহা সকলে জানিতে পারিল। ইহাতে বিদ্যার্থী, বিদ্যার্থিনী এবং আমার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা খুব নিবিড় ও সরল হইল।

এই উপবাসের অল্পকাল পরে আমার ১৪ দিন উপবাস করার ব্যাপার ঘটে। তাহার পরিণাম যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি ভাল হইয়াছিল।

অবশ্য ঘটনাটি হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় না যে, শিষ্যের প্রত্যেক দোষের জন্য গুরুর উপবাস করা আবশ্যক। কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি যে, কতকগুলি ঘটনায় এরূপ প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপবাসের অবকাশ অবশ্যই আছে। কিন্তু ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ভালমন্দ বিচার-বোধ এবং অধিকার থাকা চাই। যে শিক্ষক ও শিষ্যের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন নাই, যেখানে শিষ্যের দোষে শিক্ষকের সত্যিকার আঘাত বোধ হয় না, যেখানে শিক্ষকের প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধার ভাব নাই, সেখানে উপবাস নিরর্থক ও কখনও কখনও হানিকর হয়। এই উপবাসে ও অর্ধাশনের যোগ্যতা-বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু শিষ্যের দোষের জন্য শিক্ষক যে কম-বেশি পরিমাণে দায়ী, সে বিষয়ে আমার লেশমাত্রও সন্দেহ নাই।

সাত দিন উপবাস ও একাহার আমাদের কাহারও কঠিন বোধ হয় নাই। সেজন্য আমার কোন কাজ কম হয় নাই বা বন্ধ হয় নাই। এই সময়ে আমি কেবল ফলাহার করিয়াই ছিলাম। চৌদ্দ দিন উপবাসের শেষ দিকটা আমার খুবই ক্লেশকর হইয়াছিল, তখন আমি রামনামের মহত্ত্ব ও চমৎকারিত্ব পুরা বুঝিতাম না। এইজন্য দুঃখ সহ্য করার শক্তি কম ছিল। উপবাসকালে চেষ্টা করিয়া যথেষ্ট জলপান করিতে হয়, এই বাহ্যিক উপায়ের সন্ধান আমি জানিতাম না। সেই জন্যই এই উপবাসে কষ্ট হইয়াছিল। তাহা ছাড়া প্রথম উপবাস সুখে-শান্তিতে কাটিয়াছিল বলিয়া আমি চৌদ্দ দিন উপবাসের সময় কতকটা অসতর্ক হইয়াছিলাম। প্রথম উপবাসের সময় রোজই কুনের নির্দিষ্ট কটি-স্নান করিতাম। চৌদ্দ দিন উপবাসের সময় ২।৩ দিন পরেই উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। জলের স্বাদ ভাল লাগিত না ও জল খাইতে বমি আসিত। সেইজন্য খুব কমই জল খাইতাম। তাহাতে গলা শুখাইয়া যাইত, শরীর ক্ষীণ হইয়াছিল, এবং শেষের দিকটায় কেবল ধীরে ধীরে নিম্নস্বরেই কথা বলিতে পারিতাম। তাহা হইলেও লেখার কাজ শেষ দিন পর্যন্ত করিতে পারিয়াছিলাম। রামায়ণ ইত্যাদিও উপবাসের শেষ পর্যন্ত শুনিয়াছি। যদি কোনও প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার মত জানার আবশ্যক হইত তাহাও দিতে পারিতাম।

৩৭

গোখলের সঙ্গে দেখা করিতে

দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক স্মৃতি আমাকে বাদ দিয়া যাইতে হইতেছে। ১৯১৪ সালে যখন সত্যাগ্রহ যুদ্ধের শেষ হয়, তখন গোখলের ইচ্ছায় আমাকে ইংলণ্ড হইয়া দেশে ফিরিতে হয়। সেইজন্য জুলাই মাসে কস্তুরবা, মিঃ কলেনবেক ও আমি বিলাত রওনা হইলাম। সত্যাগ্রহের লড়াইয়ের সময় আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সেইজন্য সমুদ্রপথে যাইতেও তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটাইয়াছিলাম। কিন্তু এই তৃতীয় শ্রেণীতে ও দেশের তৃতীয় শ্রেণীতে অনেক পার্থক্য আছে। দেশের সমুদ্রগামী স্টীমারে বা রেলে শোওয়া-বসার জায়গাই হয় না। পরিচ্ছন্নতা হইবে কোথা হইতে! এখানে উপযুক্ত জায়গা ছিল, এবং তা বেশ পরিচ্ছন্ন ছিল। কোম্পানী আমাদের জন্য খুব সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। কেবল আমাদের ব্যবহারের জন্যই পায়খানা রিজার্ভ করিয়া চাবি আমাদিগকে দিয়াছিলেন। আমরা তিনজন ফলাহার করিতাম। সেইজন্য আমাদিগকে শুষ্ক ফল ও বাদাম দেওয়ার জন্য স্টীমারের খাজাঞ্চির উপর আদেশ ছিল। সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীকে ফলই দেওয়া হয় না, মেওয়া ত দূরের কথা। এই সব সুবিধার জন্য আমরা খুব শান্তিতে সমুদ্রপথে আঠার দিন কাটাইয়া দিয়াছিলাম।

এই ভ্রমণের কতকগুলি স্মৃতি জানাইবার যোগ্য। মিঃ কলেনবেকের দূরবীনের খুব শখ ছিল। এইজন্য তাঁহার কয়েকটা দামী দূরবীন ছিল। উহা লইয়া আমাদের মধ্যে রোজ কথা হইত। আমাদের আদর্শ—যে সাদাসিধা জীবনে আমরা পঁহুছিতে চাই, উহা তাহার অনুকূল নহে—এইরকম আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। একদিন আমাদের মধ্যে খুব তর্ক হইল। আমরা দুইজনে আমাদের কেবিনের জানালার পাশে দাঁড়াইয়াছিলাম।

আমি বলিলাম—"আমাদের মধ্যে এই তর্ক হওয়ার চাইতে এই দূরবীনটা যদি সমুদ্রে ফেলিয়া দেই এবং আর উহার কথাই না বলি তলে ভালই হয়!

মিঃ কলেনবেক তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—"ঠিক, ঐ ঝগড়ার জিনিসটা ফেলিয়া দিন।"

আমি বলিলাম—"আমি ফেলিয়া দিতেছি!"

তিনিও তেমনি পাল্টা উত্তর দিলেন—"আমি সত্যই বলিতেছি, নিশ্চিত ফেলিয়া দিন।"

আমি দূরবীন ফেলিয়া দিলাম। উহার দাম সাত পাউণ্ডের মত ছিল। কিন্তু উহার মূল্য উহার দামে নয়, উহার উপর মিঃ কলেনবেকের মোহই প্রকৃত মূল্য ছিল। তাহা হইলেও মিঃ কলেনবেক ওটার জন্য কখনও দুঃখ করেন নাই। আমাদের মধ্যে এই ধরনের ব্যাপার প্রায়ই হইত। উপরের ঘটনা তাহারই একটা নমুনা।

আমাদের মধ্যে রোজই এই রকম নূতন কিছু শিক্ষার বিষয় মিলিত। উভয়েই সত্যের অনুসরণ করিয়া চলিতে চাহিতাম। সত্যের অনুসরণ করার চেষ্টায় ক্রোধ, স্বার্থ, দ্বেষ ইত্যাদি সহজেই শান্ত হয়; যদি শান্ত না হয়, তবে সত্য লাভ হয় না। রাগ-দ্বেষপূর্ণ মানুষ সরল হইতে পারে, বাক্যে সত্যপালন করিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ সত্য পাইতে পারে না। শুদ্ধ সত্যের জ্ঞান যাহার হইয়াছে সে রাগ-দ্বেষ ইত্যাদির দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে।

উপবাস পূর্ণ করার পর বেশি দিন যাইতে না যাইতেই এই ভ্রমণ আরম্ভ করা হইয়াছিল। তখনও আমার শরীরের শক্তি পুরা ফিরিয়া আসে নাই। যাহাতে ঠিক মত খাইতে ও হজম করিতে পারি, সেইজন্য স্টীমারের সামনে ডেকে আমি রোজ পায়চারি করিয়া ব্যায়াম করিতাম। কিন্তু তাহাতে আমার পায়ের পেশিতে ব্যথা বেশি বোধ হইতে লাগিল। বিলাতে পঁহুছিয়া আমার পায়ের ব্যথা না কমিয়া, দেখিলাম যে উহা বাড়িয়াছে। বিলাতে ডাক্তার জীবরাজ মেহতার সঙ্গে পরিচয় হইল। তিনি উপবাস ও পায়ের ব্যথার বিষয় সব কথা শুনিয়া বলিলেন—"যদি আপনি কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম না লন, তবে আপনার পা বরাবরের জন্য অচল হইয়া যাওয়ার ভয় আছে।" এই সময় আমার জ্ঞান হইল যে, দীর্ঘ উপবাস যাহারা করিয়াছে তাড়াতাড়ি সামর্থ্য পাওয়ার লোভে তাহাদের বেশি করিয়া খাওয়া উচিত নয়। উপবাসের সময় অপেক্ষাও উপবাসের শেষে বেশি সাবধান থাকিতে হয়, বেশি সংযম রাখিতে হয়।

মাদিরায় (Madiera) সংবাদ পাইলাম মহাযুদ্ধ যে কোনও সময়ে আরম্ভ হইতে পারে। ইংলিশ চ্যানেলে পৌছিতে যুদ্ধ আরম্ভের সংবাদ পাইলাম। আমাদিগকেও আটকানো হইল। জলের নীচে স্থানে স্থানে মাইন পাতা হইয়াছিল। সেইজন্য সাউদাম্পটন পঁহুছিতে এক কি দুই দিন লাগিল। ৪ঠা আগস্ট যুদ্ধঘোষণা হইয়াছিল, আমরা ৬ই বিলাতে পৌছিলাম।

৩৮
যুদ্ধে যোগদান

বিলাতে পৌঁছিয়া খবর পাইলাম, গোখলে প্যারিসে রহিয়া গিয়াছেন। প্যারিসের সঙ্গে যাতায়াত বন্ধ। কবে তিনি ফিরিবেন তাহার ঠিকানা নাই। গোখলে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ফ্রান্সে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়া দেশেও ফিরিতে পারি না। আর কবে যে তিনি ফিরিবেন একথাও কেউ বলিতে পারে না।

ইতিমধ্যে কি করা যায়? এই যুদ্ধে আমার কর্তব্য কি? আমার জেলের সঙ্গী ও সত্যাগ্রহী পারসী সোরাবজী আড়াজনীয়া বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়িতে-ছিলেন। সত্যাগ্রহীদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই বিলাতে ব্যারিস্টার হইয়া, পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া গিয়া আমার স্থান লইবেন, এই কল্পনা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার খরচা ডাক্তার প্রাণজীবন দাস মেহতা পাঠাইতেন। তাঁহার সঙ্গে এবং তাঁহার মারফতে, ডাঃ জীবরাজ মেহতা প্রমুখ যাঁহারা বিলাতে পড়িতেছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে যুক্তি করি। বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের এক সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদের কাছে আমার সিদ্ধান্ত জানাইলাম। আমার মনে হইল যে, বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের এই যুদ্ধে নিজেদের অংশ পূরণ করা দরকার। ইংরাজ বিদ্যার্থীরা যুদ্ধে সেবা করার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতীয়েরা তাহাদের অপেক্ষা কম কিছু করিতে পারে না। এই যুক্তির বিরুদ্ধে সভাতে অনেক যুক্তি উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের ও ইংরাজদের অবস্থার মধ্যে, হাতি ও ঘোড়ার মধ্যে যেমন তফাত, তেমনি তফাত। একজন দাস, অপরে মালিক। এই অবস্থায় মালিকের প্রয়োজনের সময় দাস কেমন করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাকে সাহায্য করিতে পারে? দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদের ধর্ম, মালিকের দুর্দিনের সাহায্য লইয়া মুক্তি পাওয়া নয় কি? এই যুক্তির সঙ্গে সে সময় আমার মন সায় দিতে পারিল না। যদিও আমি ইংরেজ ও ভারতীয়দের অবস্থার প্রভেদ জানিতাম, তবুও তাহা যে ঠিক দাসত্ব—এরকম আমার মনে হইত না। আমার মনে হইত যে, ইংরেজ-পদ্ধতির দোষ অপেক্ষা কতকগুলি ইংরেজ কর্মচারীর দোষই বেশি এবং সে দোষ আমাদের ভালবাসা দ্বারাই দূর করিতে পারা যাইবে। যদি ইংরেজের হাত দিয়া ইংরেজের সাহায্যে

আমাদের অবস্থার সংস্কার সাধন করিতে হয়, তবে তাহাদের দুঃসময়ে সাহায্য দান করিয়া অবস্থার সংশোধন করা কর্তব্য। ইংরেজের রাজ্যশাসন পদ্ধতি দোষপূর্ণ হইলেও, আজ যেমন তাহা অসহ্য বোধ হইতেছে তখন ততটা অসহ্য লাগিত না। কিন্তু আজ যেমন ইংরেজের শাসনপদ্ধতির উপর হইতে আমার বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে বলিয়া আর আমি ইংরেজ-রাজ্য রক্ষার সাহায্য করিতে পারি না, সেদিনও তেমনি যাহাদের ইংরেজ-পদ্ধতি ও ইংরেজ কর্মচারীদের উপর হইতে বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারাই বা কি করিয়া ইংরেজদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন ?

তাঁহারা এই সময় প্রজার দাবি ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা ও প্রজার অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। ইংরেজের বিপদের সময় আমাদের দাবি উপস্থিত করা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই। লড়াইয়ের সময় নিজেদের অধিকারের দাবি মুলতবী রাখার সংযম রক্ষা করা আমি সভ্যতা ও দূরদৃষ্টির দিক হইতে আবশ্যক মনে করি। এইজন্য আমি আমার যুক্তির উপরই দৃঢ় রহিলাম এবং প্রস্তাব করিলাম যে, যাঁহারা যুদ্ধের কাজে ভর্তি হইবার জন্য নাম দিতে চাহেন, তাঁহারা যেন নাম দেন। নাম অনেকেই লেখাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে সকল প্রদেশের ও সকল ধর্মের লোক ছিল।

লর্ড ক্রুকে এই বিষয়ে পত্র লিখিলাম. এবং আহত সৈন্যদের শুশ্রূষা করার কাজের জন্য যদি শিক্ষা দেওয়া দরকার হয়, তবে সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আমার সঙ্গীরা প্রস্তুত আছেন জানাইয়া দিলাম। কতকটা দ্বিধার পর লর্ড ক্রু ভারতীয়দের এই সেবা গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন ও দুঃসময়ে সাম্রাজ্যকে সাহায্য করিতে তৈরি হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

যাঁহারা নাম দিয়াছিলেন, ডাক্তার ক্যান্টলীর অধীনে তাঁহারা আহতদের শুশ্রূষা করার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ছয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ করার মত একটা ছোট শিক্ষাক্রম স্থির ছিল তাহাতেই সমস্ত প্রাথমিক শুশ্রূষা শিক্ষা দেওয়া হইত। এই দলে প্রায় ৮০ জন ভর্তি হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজন-পাস করিতে পারেন নাই। যাঁহারা পাস করিলেন, তাঁহাদের জন্য সককার এখন কুচকাওয়াজ (ড্রিল) শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। কর্ণেল বেকারের হাতে এই দলের কুচকাওয়াজ শিক্ষা দেওয়ার ভার ছিল। তিনি এই দলের সর্দার হইলেন।

এই সময় বিলাতের দৃশ্য দেখার মত হইয়াছিল। লোকে আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া, সকলেই লড়াইয়ে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্যানুরূপ শক্তি নিয়োগ করিতেছিল। শক্তিমান যুবকেরা যুদ্ধের কৌশল শিখিতে লাগিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অশক্ত বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক প্রভৃতি কি করিবে? তাহারা যদি কাজ করিতে ইচ্ছা করে তবে কাজ তাহাদেরও ছিল। তাহারা লড়াইয়ে নিযুক্ত লোকদের জন্য কাপড়চোপড় সেলাই করিতে লাগিয়া গেল। সেখানে মহিলাদের 'লাইসিয়ম' নামে একটি ক্লাব আছে। তাহার সদস্যারা লড়াইয়ের জন্য আবশ্যকীয় পোশাক যতটা তৈরি করিতে পারেন, তাহা তৈরি করার ভার লইলেন। সরোজিনী দেবী তাহার সভ্যা ছিলেন। তিনি ইহাতে পুরাপুরি অংশ লইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি আমার সামনে কাপড়ের এক স্তূপ ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, যতটা পারি যেন সেলাই করাইয়া দিই। তাঁহার ইচ্ছামত আমি সমস্তই লইলাম এবং শুশ্রূষাকার্য শিক্ষা করিয়া যত সময় বাঁচিত, তাহাতে যতটা পারা যায়, বন্ধুদের সাহায্যে তৈরি করিয়াও দিয়াছিলাম।

৩৯

ধর্মে উভয়-সংকট

যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা কয়েকজন একত্রিতভাবে সরকারের নিকট নাম পাঠাইয়া দিয়াছি—এই খবর দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছিলে সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ দুটি টেলিগ্রাম আসিল। তাহার মধ্যে একখানা ছিল মিঃ পোলকের। তাহাতে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—"এই সিদ্ধান্ত তোমার অহিংসার সিদ্ধান্তের পরিপন্থী নয় কি?"

এই রকম টেলিগ্রাম পাওয়ার কতকটা আশঙ্কা আমি করিয়াছিলাম। এই বিষয়ে আমি "হিন্দ স্বরাজ্য" পুস্তকে আলোচনা করিয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় বন্ধুদের সঙ্গে এ আলোচনা সর্বদাই হইত। যুদ্ধের নীতিহীনতা আমরা সকলেই স্বীকার করিতাম। আমার আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আমি প্রতি-আক্রমণ করিতেও রাজী নহি। এরূপ অবস্থায় দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলিতেছে, এবং সে-যুদ্ধে কার কি দোষ-গুণ তাহাও যখন আমি জানি না, তখন আমি কি করিয়া যুদ্ধে যোগ দিতে পারি? বুয়ার যুদ্ধে আমি যে যোগ দিয়াছিলাম, সে

কথা বন্ধুরা জানিতেন। কিন্তু তাঁহারা মনে করিতেন যে, ঐ যুদ্ধের পর হয়ত আমার বিচারের পরিবর্তন হইয়াছে।

বস্তুতঃ যে সকল যুক্তি অনুসারে বুয়ার যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলাম, ঠিক সেই সকল যুক্তিই আমাকে এই যুদ্ধে যোগ দেওয়াইয়া ছিল। যুদ্ধে যোগ দিব, আবার অহিংসা পালন করিব—এমন যে হয় না সে ধারণা আমার কাছে একান্ত সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু ইহা যেমন স্পষ্ট দেখিতেছি, তেমনি অবস্থানুসারে কি কর্তব্য তাহা সকল সময় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় না। সত্যের পূজারীকে অনেক সময় অন্ধকারে পথ খুঁজিতে হয়।

অহিংসা ব্যাপক ধর্ম। আমাদের এই প্রাণ হিংসার প্রজ্বলিত আগুনে সমর্পিত। "জীব জীবের উপর জীবন ধারণ করে"—এই বাক্যের অর্থ বড় কম নয়। মানুষ বাহ্যিক ভাবে হিংসা না করিয়া ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। খাইতে পরিতে, উঠিতে বসিতে, প্রত্যেক কাজেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মানুষকে হিংসা করিতেই হইতেছে। সেই হিংসা হইতে মুক্ত হইতে যাহাদের চেষ্টা থাকে, যাহাদের ভাবনা কেবল করুণাময়, যাহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবনও নাশ করিতে চায় না, বরং যথাশক্তি তাহাকে বাঁচাইতে প্রয়াস করে, তাহারাই অহিংসার পূজারী। তাহাদের প্রবৃত্তিতে নিরন্তর সংযমের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের মধ্যে নিরন্তর করুণা বাড়িতে থাকে। কিন্তু কোনও দেহধারীই বাহ্য হিংসা হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

অহিংসার সঙ্গে একই স্তরে অদ্বৈত ভাবনা রহিয়াছে। যদি প্রাণীমাত্রই এক হয়, তবে একের পাপের প্রভাব অন্যের উপর হয়। সেদিক দিয়াও মানুষ হিংসা হইতে অস্পৃষ্ট থাকিতে পারে না। যে মানুষ সমাজে বাস করে, সে অনিচ্ছাতেও সমাজের হিংসার ভাগ গ্রহণ করে। যখন দুই জাতির ভিতর যুদ্ধ হয়, অহিংসার পূজারীর কাজ তখন সেই যুদ্ধ প্রতিহত করা। সে ধর্ম যে পালন করিতে না পারে, যাহার ভিতরে ঐরূপ বিরোধ করার শক্তি নাই, সে ব্যক্তি এই অক্ষমতার জন্যই যুদ্ধে যোগ দেয় এবং যোগ দিয়াও তাহা হইতে নিজেকে, নিজের দেশকে ও জগৎকে রক্ষা করিতে আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্ট করে।

ইংরেজ সাম্রাজ্যের সাহায্যে আমার অর্থাৎ আমার জাতির উন্নতি করিব এই ছিল আমার চিন্তা। আমি ইংলণ্ডে বসিয়াছিলাম, ইংলণ্ডের নৌ-বহর দ্বারা আমি সুরক্ষিত ছিলাম। সেই নৌ-বহরের শক্তির এই সুযোগ লইয়া আমি তাহাদের অন্তঃস্থ হিংসার সোজাসুজি অংশীদার হইয়াছি। সেইজন্য যদি আমাকে

সেই রাজ্যের সহিত সংস্রব রাখিতে হয়, যদি সেই রাজ্যের পতাকার নীচে থাকিতে হয়, তবে আমাকে যুদ্ধের বিরুদ্ধতা করিয়া, যে পর্যন্ত না সেই রাজ্যের যুদ্ধনীতি বদলায় সে পর্যন্ত (১) তাহার সহিত সত্যাগ্রহ শাস্ত্র অনুসারে অসহযোগ করিতে হয়; অথবা (২) সেই রাজশাসন অমান্য করার যোগ্য হইলে তাহা অমান্য করিয়া জেলের রাস্তা লইতে হয়, অথবা (৩) আমাকে সেই যুদ্ধ-প্রবৃত্তিতে যোগ দিয়া সহায়তার ভিতর দিয়াই, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি ও অধিকার লাভ করিতে হয়। প্রথমোক্ত দুই প্রকারের শক্তি আমার মধ্যে নাই। সেইজন্য আমার কাছে যুদ্ধে যোগ দেওয়াই একমাত্র পথ—ইহাই আমি বিশ্বাস করি।

বন্দুক লইয়া যে যুদ্ধ করে, আর যে তাহার সাহায্য করে, অহিংসার দৃষ্টিতে আমি সে দুইয়ের মধ্যে ভেদ জানি না। যে ব্যক্তি লুণ্ঠনকারীর দলে চাকরি করে, সে লুটই করুক, অথবা তাহাদের পাহারাই দিক, অথবা তাহাদের সেবাই করুক, ডাকাতির অপরাধে সেও লুণ্ঠনকারীদেরই সমান অপরাধী। এই ধরনের যুক্তিতে সৈন্যদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত ব্যক্তিও যুদ্ধের দোষ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না।

এই সকল যুক্তি মিঃ পোলকের টেলিগ্রাম আসিবার পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাঁহার তার পাইয়া উহার আলোচনা আবার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে করিলাম। যুদ্ধে যোগ দেওয়া আমি ধর্ম বিবেচনা করিয়াছিলাম, আর আজও যদি যুক্তি করি, তবুও উপরের যুক্তির মধ্যে দোষ দেখিতে পাই না। বৃটিশ রাজ্য সম্বন্ধে আমি তখন যে ধারণা পোষণ করিতাম সেই অনুসারেই আমি যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলাম, সেই হেতু তাহার জন্য আমার অনুতাপ নাই।

আমি জানি যে, আমার এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা আমার সকল বন্ধুর কাছে সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারি নাই। প্রশ্নটা সূক্ষ্ম। ইহাতে মতভেদের অবকাশ আছে। সেইজন্য যাঁহারা অহিংসা ধর্ম মানেন ও সূক্ষ্মভাবে উহা পালন করেন, তাঁহাদের সম্মুখে যতটা পারি স্পষ্ট করিয়া আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। প্রচলিত রীতি আছে বলিয়াই সত্যের উপাসক তদনুযায়ী কোন কাজ করে না। সে নিজের সিদ্ধান্ত জেদ করিয়া ধরিয়া রাখে না। সিদ্ধান্তে দোষ থাকিতে পারে, ইহা সকল সময়ই স্বীকার করে এবং যখন দোষ বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন যতই ক্ষতি হোক না কেন, তাহা স্বীকার করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে।

৪০

ছোটখাটো সত্যাগ্রহ

এইপ্রকার সিদ্ধান্তবশে, ধর্মজ্ঞানে আমি যুদ্ধে যোগ দিলাম সত্য, কিন্তু আমার ভাগ্যে সোজাসুজি যুদ্ধে যোগ দেওয়া ত হইলই না, পরন্তু এই সংকট-মুহূর্তে আমাকে সত্যাগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

আমি পূর্বেই লিখিয়াছি যে, আমাদের নাম গৃহীত হইলে এবং আমাদিগকে তালিকাভুক্ত করা হইলে পর, পুরা কুচকাওয়াজ শিখিবার জন্য আমরা একজন সামরিক কর্মচারীর অধীনস্থ হইয়াছিলাম। আমরা সকলেই বুঝিয়াছিলাম যে, এই কর্মচারী যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধেই আমাদের প্রধান, অন্যান্য বিষয়ে আমাদের দলের আমিই কর্তা। আমাদের সঙ্গীদের সম্বন্ধে দায়িত্ব যেমন আমার, তেমনি আমার প্রতি তাঁহাদেরও দায়িত্ব, অর্থাৎ আমার হাত দিয়াই ঐ কর্মচারীকে সকল কাজ করাইতে হইবে। কিন্তু প্রথম দিন হইতেই আমরা বুঝিলাম যে, তাঁহার অভিপ্রায় অন্য রকমের। সোরাবজী চতুর লোক। তিনি আমাকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন—"সাবধান হইবেন, লোকটা আমাদের উপর হুকুম চালাইতে চায় দেখিতেছি। কিন্তু তাহার হুকুম করার ত অধিকার নাই, আমাদের কেবল শিক্ষা দেওয়াই তাহার কাজ। তাহা ছাড়া আমাদের শিক্ষাদানের জন্য যে সকল ছোকরাকে সে আনিয়াছে, তাহারা পর্যন্ত আমাদের উপর হুকুম চালাইতে চায়।" এই যুবকেরা অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিল। তাহারা শিখাইতে মাত্র আসিয়াছিল এবং এক এক ব্যাচের কেবল শিক্ষা দেওয়ারই নেতা ছিল। আমিও দেখিলাম সোরাবজীর কথা ঠিক। আমি সোরাবজীকে শান্ত করিলাম ও এজন্য চিন্তা করিতে নিষেধ করিলাম। কিন্তু সোরাবজী পট করিয়া কোন কথা মানিয়া লওয়ার লোক ছিলেন না।

সোরাবজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আপনার ত ভোলা মন। আপনাকে ইহারা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ঠকাইবে। তারপর যখন আপনার চক্ষু খুলিয়া যাইবে তখন বলিবেন, চলো সত্যাগ্রহ করি। আর আমাদিগকে দুঃখে ফেলিবেন।"

আমি জবাব দিলাম—"আমার সঙ্গে থাকিলে কোনও দিন দুঃখ ছাড়া আর অন্য কিই বা পাইবেন? আমরা সত্যাগ্রহীরা ঠকিবার জন্যই কি জন্মি নাই? ঐ সাহেব আমাদিগকে ঠকায় ত ভাল। আপনাদিগকে কি আমি হাজারো

বার বলি নাই যে, যে ব্যক্তি ঠকায় শেষকালে সেই ঠকে ?"

সোরাবজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ঠিক কথা, আপনি ঠকিতেই থাকুন। কোনও দিন সত্যাগ্রহেই আপনি মারা যাইবেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মত লোকদেরও পিছনে পিছনে টানিয়া লইয়া যাইবেন।"

এই কথা মনে হইলে, পরলোকগত মিস হব হাউস, অসহযোগ সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছিলেন—"এই সত্যের জন্য কোন দিন আপনাকে ফাঁসিতে চড়িতে হইতেছে দেখিলেও আমি আশ্চর্য হইব না। ঈশ্বর আপনাকে সোজা রাস্তায় চালনা করুন ও আপনাকে রক্ষা করুন।"

সেই কর্মচারী নিযুক্ত হওয়ার আরম্ভকালেই সোরাবজীর সঙ্গে এইরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল। আরম্ভ আর শেষ হওয়ার মধ্যে বেশি দিন কাটে নাই। ইতিমধ্যেই আমার প্লুরিসি হইল। চৌদ্দ দিনের উপবাসের পর আমার শরীর মোটেই ভাল ছিল না। তাহার পর কুচকাওয়াজে আমাকে পুরাপুরি থাকিতে হইত। ইহা ভিন্ন অনেক দিন বাড়ি হইতে কুচকাওয়াজের স্থান পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে হইত। সে পথও দুই মাইল হইবে। এইরূপে অবশেষে আমাকে শয্যাগত হইতে হইয়াছিল।

এই অবস্থায় আমাকে আমাদের ক্যাম্পে যাইতে হইয়াছিল। সুতরাং অপর সকলকে ক্যাম্পে রাখিয়া আমি ঘরে ফিরিলাম। এইখানেই একটি সত্যাগ্রহের কারণ ঘটে।

কর্মচারী নিজের হুকুম চালাইতেছিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন যে, সকল বিষয়েই তিনি আমাদের কর্তা। নিজের প্রাধান্যের দৃষ্টান্তও তিনি কার্যতঃ দিলেন। সোরাবজী আবার আমার কাছে আসিলেন। তিনি নবাবী সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলিলেন—"সকল হুকুম আপনার হাত দিয়াই আসা চাই ; এখনো আমরা ট্রেইনিং ক্যাম্পে আছি। তবুও আমাদের উপর অসম্ভব সব হুকুম সমস্ত বিষয়েই দেওয়া হইতেছে। সেই যুবকদিগের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে অনেক সময়েই বিদ্বেষজনক পার্থক্য রাখা হইতেছে। ইহা সহ্য করা যায় না। ইহার প্রতিকার এখনই হওয়া চাই, নয়ত আমরা কাজ ছাড়িয়া দিব। এই সকল বিদ্যার্থী ও অন্য যাহারা কাজে আসিয়াছে, তাহারা কেউই অন্যায় হুকুম মানিবে না। আত্মসম্মানের জন্য যে কাজ লওয়া হইয়াছে

তাহাতে অপমান সহ্য করিতে পারা যাইবে না।"

আমি কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে গিয়া, যে সকল অভিযোগ পাইয়াছি তাহা তাঁহাকে শুনাইলাম। তিনি সমস্ত অভিযোগ আমাকে লিখিয়া জানাইতে বলিলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অধিকারের কথা বলিলেন। তিনি জানাইয়া দিলেন—"অভিযোগ আপনার হাত দিয়া আসিবে না, অভিযোগ তাহাদের সেকসনের পরিচালকের হাত দিয়া করিতে হইবে।"

আমি তদুত্তরে জানাইলাম—"আমি অধিকার খাটাইতে চাই না। সৈনিক রীতিতে ত আমি সাধারণ সিপাহী মাত্র। কিন্তু আমার দলের প্রধান বলিয়া, আমাকে তাহাদের প্রতিনিধিরূপে আপনার স্বীকার করা আবশ্যক।" আমার কাছে আর এক বিষয়ের অভিযোগ আসিয়াছিল, তাহাও তাঁহাকে শুনাইলাম। সে অভিযোগটি এই যে, সেকসন-পরিচালকদিগকে আমাদের দলের সম্মতি না লইয়া নিযুক্ত করা হইয়াছে, এবং সেজন্য বড়ই অসন্তোষ আরম্ভ হইয়াছে। আমি বলিলাম—"ইঁহাদিগকে সরাইয়া লইয়া, দলের নিজের সেকসন-পরিচালক পছন্দ করিয়া লওয়ার অধিকার দেওয়া দরকার।" আমার কথা তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি আমাকে শুনাইলেন—"সেকসন-পরিচালক মনোনয়নের কথা ত সৈনিক রীতির বিরুদ্ধ। যদি এই সেকসন-পরিচালকদিগকে সরাইয়া দেওয়া হয়, তবে আজ্ঞানুবর্তিতার চিহ্নও থাকিবে না।"

আমরা সভা করিলাম। সত্যাগ্রহের কঠোর পরিণামের বিষয় সকলকে বুঝাইলাম। প্রায় সকলেই সত্যাগ্রহের শপথ লইলেন। সভায় ইহাই নির্ধারিত হইল যে, যাঁহারা এখন সেকসন-পরিচালক আছেন, যদি তাঁহাদিগকে সরানো না হয়, যদি এই দলকে সেকসন-পরিচালক মনোনীত করিতে দেওয়া না হয়, তবে আমাদের দল কুচকাওয়াজে যাওয়া ও ক্যাম্পে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিবে।

আমি কমাণ্ডিং অফিসারকে এক পত্র লিখিয়া আমার গভীর অসন্তোষের কথা জানাইলাম। আমি জানাইলাম যে, আমি প্রভুত্ব খাটাইবার ইচ্ছা রাখি না, আমি সেবা করিতে ইচ্ছা করি এবং সেবার জন্যই এই বন্ধুদের এই কাজে নামাইয়াছি। আমি তাঁহাকে ইহাও জানাইলাম যে, বুয়ার যুদ্ধে আমি কোনও প্রভুত্বের পদ গ্রহণ করি নাই, তবুও কর্ণেল গলওয়ে ও আমার দলের মধ্যে কখনও কোনও তর্ক বা বিরোধ হয় নাই। এবং সেই কমাণ্ডিং অফিসার, আমার দলের ইচ্ছা আমার মারফতে জানিয়াই দল সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য করিতেন। আমার পত্রের সঙ্গে আমাদের দলের গৃহীত প্রস্তাবও এক খণ্ড পাঠাইলাম।

কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে এই পত্র দেওয়ার কোনও ফল হইল না। তিনি উল্টা ধরিয়া লইলেন যে, আমরা সভা করিয়া যে প্রস্তাব লইয়াছি তাহাতেই নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে।

অতঃপর আমি ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব স্টেটের কাছে এক পত্র দিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইলাম ও আমাদের সভার প্রস্তাবের নকলও পাঠাইয়া দিলাম।

তিনি আমাকে পত্রের উত্তরে জানাইলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা অন্য রকম ছিল। এখানে কমাণ্ডিং অফিসারের দলের সেকসন-পরিচালক নিয়োগ করার অধিকার আছে। তাহা হইলেও ভবিষ্যতে কমাণ্ডিং অফিসার আপনার অনুমোদন সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন।

অতঃপর আমাদের মধ্যে অনেক পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার বিষয় দিয়া কথা বাড়াইব না। তবে এটুকু না বলিলে চলে না যে, যে অভিজ্ঞতা আমরা রোজ পাই, এখানেও সেই রকমই হইয়াছিল। কমাণ্ডিং অফিসারের ধমকে ও কৌশলে আমাদের মধ্যে দলাদলি হইল। যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ভয়েই হোক, অথবা অনুরোধে পড়িয়াই হোক, প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া কমাণ্ডিং অফিসারের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এই সময় নেটলী হাসপাতালে অপ্রত্যাশিতভাবে বহুসংখ্যক আহত সিপাহী আসিয়া পড়িল। তাহাদের শুশ্রূষার জন্য আমাদের সমস্ত দলটার ডাক পড়িল। কমাণ্ডিং অফিসার যাঁহাদিগকে নিজের দিকে টানিয়া লইতে পারিয়াছিল, তাঁহারা নেটলী হাসপাতালে গেলেন। যাঁহারা গেলেন না, তাঁহারা ইণ্ডিয়া আপিসে গেলেন। আমি শয্যাশায়ী ছিলাম। দলের লোকেরা আমার সঙ্গে দেখা করিতেন। আণ্ডার-সেক্রেটারী মিঃ রবার্টস সেই সময় আমার কাছে যাতায়াত করিতেন। তিনি দেখা করিতে আসিলেন, ও যাঁহারা বাকি ছিলেন, তাঁহাদের নেটলী যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, যাঁহারা বাকি আছেন তাঁহারা ভিন্ন দল গঠন করিয়া যাইবেন। নেটলী হাসপাতালে তাঁহারা কেবল সেইখানকার কমাণ্ডিং অফিসারের অধীনে থাকিবেন। ইহাতে তাঁহাদের মানের কোন হানি হইবে না, সরকার সন্তুষ্ট হইবে এবং দলে দলে যে সকল আহত সৈন্য আসিয়া পড়িয়াছে তাহাদের সেবা করা হইবে। আমার সঙ্গীদের এবং আমার এই প্রস্তাব পছন্দ হইল এবং যাহারা রহিয়া গিয়াছিল তাহারাও নেটলী গেল। একা আমি বিছানায় পড়িয়া ভুগিতে লাগিলাম।

৪১
গোখলের উদারতা

বিলাতে আমার প্লুরিসি হওয়ার কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। এই অসুখের সময় গোখলে বিলাতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার কাছে মিঃ কলেনবেক ও আমি সর্বদা যাইতাম। অনেক সময় লড়াইয়ের কথা হইত। মিঃ কলেনবেকের জার্মাণীর ভূগোল নখাগ্রে ছিল এবং তিনি ইউরোপের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন বলিয়া গোখলেকে নকশা আঁকিয়া যুদ্ধের বিভিন্ন স্থান দেখাইয়া দিতেন।

যখন আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন আমার এই অসুখ আলোচনার এক বিষয়বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল। আমার আহার-সম্বন্ধীয় পরীক্ষা চলিতেছিল। সেই সময় আমার খোরাক ছিল চীনাবাদাম, কাঁচা ও পাকা কলা, লেবু, জলপাইয়ের তেল, বিলাতী বেগুন ও আঙ্গুর ইত্যাদি। দুধ, তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য, ডাল—এসব মোটেই খাইতাম না। আমার চিকিৎসা ডাঃ জীবরাজ মেহতা করিতেন। তিনি দুধ, ভাত ও রুটি ইত্যাদি খাওয়ার জন্য আমাকে বিশেষভাবে বলেন। নালিশ গোখলে পর্যন্ত গিয়া পঁহুছিল। ফলাহারের সম্বন্ধে আমার যুক্তি তিনি বড় মান্য করিতেন না। আরোগ্য হওয়ার জন্য ডাক্তার যাহা বলে তাহাই খাওয়াবার প্রতি তাঁহার আগ্রহ ছিল।

গোখলের ইচ্ছার সম্মান না দেওয়া আমার পক্ষে বড় কঠিন কাজ ছিল। তিনি যখন বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন তখন আমি চব্বিশ ঘণ্টা ভাবিবার সময় চাহিয়া লইলাম। মিঃ কলেনবেক ও আমি বাড়ি ফিরিলাম। এ বিষয়ে আমার কর্তব্য কি, সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে রাস্তায় আলোচনা করিলাম। তিনি আমার খাদ্য পরীক্ষার সঙ্গী ছিলেন। তাঁহার উহা ভাল লাগিত। কিন্তু আমার শরীর রক্ষার জন্য খাদ্যের পরীক্ষা যদি ত্যাগ করি তবে ঠিকই হইবে, এই রকম তাঁহার মনের ভাব দেখিলাম। এখন আমার নিজের অন্তরের ভাব খুঁজিয়া দেখা দরকার ছিল।

রাত্রি এই চিন্তায় কাটাইলাম। যদি এই পরীক্ষা পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে এ বিষয়ে আমার সমস্ত ধারণাও পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার ধারণায় কোনও ভুল আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। গোখলের কথা কতটা পালন করা আমার দরকার আর শরীর-রক্ষার জন্যই বা এই পরীক্ষা কতটা ত্যাগ করা দরকার, ইহাই ছিল প্রশ্ন। আমি অবশেষে স্থির করিলাম যে, এই প্রয়োগের

ভিতর যাহা কেবল ধর্মের জন্য করিতেছি তাহা রক্ষা করিয়া বাকি সমস্ত বিষয়েই ডাক্তারের কথামত চলিব। দুধ যখন ত্যাগ করিয়াছিলাম তখন তাহাতে ধর্মভাবই প্রধান ছিল। কলিকাতায় গাভী ও মহিষকে যে যন্ত্রণা দিয়া দুধ দোহান হয়, তাহার চিত্র আমার মনের সম্মুখে ছিল। আমার মনে হইত যে, যেমন মাংস মানুষের খাদ্য নয়, তেমনি কোনও জন্তুর দুধও মানুষের খাদ্য নয়। সেইজন্য দুধ ত্যাগের পরিবর্তন করিব না স্থির করিয়া আমি সকালে শয্যাত্যাগ করিলাম। এইরূপ স্থির করাতে আমার মন অনেক হালকা হইল। গোখলে কি ভাবিবেন, সেই ছিল ভয়। আমি যাহা স্থির করিয়াছি তাহা তিনি মানিয়া লইবেন—এমন বিশ্বাসও ছিল। সন্ধ্যাকালে 'ন্যাশনাল লিবারল ক্লাবে' তাঁহার সঙ্গে আমরা দেখা করিতে গেলাম। তিনি দেখা হওয়া মাত্রই প্রশ্ন করিলেন—"ডাক্তারের কথা শোনাই স্থির করিয়াছ ত?"

আমি নরম হইয়া জবাব দিলাম যে, আমি সমস্তই করিব, কেবল একটা বিষয়ে আপনি কিছু বলিবেন না। দুধ ও দুধের কোনও খাদ্য আর মাংস আমি খাইব না। উহা না খাইলে যদি শরীর যায়, তবে যাইতে দেওয়াই আমার ধর্ম এই রকম মনে হয়।

গোখলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহাই কি তুমি একেবারে নিশ্চয় করিয়া ফেলিয়াছ?"

"আমার সংকল্প বদলাইবার মত নয়। আমি বুঝিতেছি, ইহাতে আপনার দুঃখ হইবে, কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।" কতকটা দুঃখের সহিত অথচ গভীর ভালবাসার স্বরে গোখলে বলিলেন—"তোমার সংকল্প আমার পছন্দ হয় না। উহাতে আমি ধর্ম কিছু দেখি না। কিন্তু ইহা লইয়া জেদ করিব না।" এই বলিয়া ডাঃ জীবরাজ মেহতাকে বলিলেন—"এখন গান্ধীর উপর জোর করিবেন না। সে যাহা বলে তাহা মানিয়া লইয়া যাহা দেওয়া যায় তাহাই দিবেন।"

ডাক্তার খুশি হইলেন না, কিন্তু কি আর করিবেন! আমাকে মুগের ঝোল খাওয়ার পরামর্শ দিলেন, উহাতে কিছু হিংও দিতে বলিলেন। আমি স্বীকার করিলাম। দিনকতক উহা খাইলাম কিন্তু আমার ব্যথা উহাতে বাড়িল। উহাতে সুবিধা না হওয়ায় পুনরায় ফলাহার ধরিলাম। ডাক্তারও বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগ করিতেছিলেন, উহাতে কতকটা আরাম হয়। আমার খাওয়ার বাঁধাবাঁধিতে ডাক্তারের খুব অসুবিধা হইয়াছিল। ইতোমধ্যে অক্টোবর-নভেম্বর মাসের লণ্ডনের ধোঁয়া সহ্য করিতে না পারিয়া গোখলে দেশে ফিরিলেন।

৪২

রোগের কি করা যায় ?

প্লুরিসি (ফুসফুসের পীড়া) না সারাতে আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। আমার মনে হইল যে, ঔষধে ইহা সারিবার নয়, খাদ্যের কোন পরিবর্তনে বা বাহ্যিক কোনও ব্যবস্থায় হয়ত ভাল হইতে পারে।

ডাক্তার এলিনসনের সঙ্গে ১৮৯০ সালে আমার পরিচয় হইয়াছিল। তিনি খাদ্যের পরিবর্তন দ্বারা রোগের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাকে আনিয়া দেখাইলাম ও শরীরের অবস্থার কথা বলিলাম এবং দুধ খাইতে আমার আপত্তির কথা জানাইলাম। তিনি অমনি আমাকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন—"দুধের কোনও দরকার নাই। আমাকে ত তোমায় কিছুদিন তৈলাক্ত খাদ্য না দিয়াই রাখিতে হইবে।" এই বলিয়া প্রথমে আমাকে কাঁচা তরকারি ও ফল খাইয়া থাকিতে বলিলেন। কাঁচা তরকারির মধ্যে মূলা, পিঁয়াজ এবং ঐ জাতীয় জিনিস, আর ফলের মধ্যে প্রধানতঃ কমলালেবু খাইতে বলিলেন। তরকারি খুব কুঁচাইয়া অথবা পিষিয়া খাইতে হইত। আমি তিন দিন এই রকম চালাইলাম, কিন্তু কাঁচা তরকারি আমার সহ্য হইল না। এই ব্যবস্থা আমি পালন করিতে পারি শরীরের অবস্থা আমার সেইরূপ ছিল না। এবং উহাতে শ্রদ্ধাও ছিল না। ইহা ভিন্ন তিনি আমাকে চব্বিশ ঘণ্টাই জানালা খুলিয়া রাখিতে, রোজ ঈষৎ গরম জলে স্নান করিতে, বেদনার স্থানে তেল মালিশ করিতে ও আধ ঘণ্টা খোলা হাওয়ায় বেড়াইতে ব্যবস্থা দিলেন। এই সকলই আমার ভাল বোধ হইল। ঘরের জানালায় এমন ব্যবস্থা ছিল যে, তাহা একেবারে খুলিলে ঘরে বৃষ্টির জল ঢুকিয়া যায়। দরজার উপরকার বাতায়নও খোলা যাইতেছিল না। উহার কাঁচ ভাঙিয়া ফেলিলাম। এর ফলে সারা দিনরাত হাওয়া চলাচলের সুবিধা হইল। আর জানালা যতটা খুলিলে জলের ছাট না আসে ততটা খুলিয়া রাখিলাম।

এইসব করায় শরীর কতকটা সুস্থ হইল। কিন্তু আরোগ্য হইল না। কখন কখন লেডী সিসিলিয়া রবার্টস আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে ভাল পরিচয় ছিল। আমাকে দুধ খাওয়াতে তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইত। তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে 'মল্টেড মিল্কে'র কথা বলিয়াছিলেন এবং না জানিয়াই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, উহাতে কিছুমাত্র দুধ নাই। উহা

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত দুধের গুণ-যুক্ত কোনও পদার্থ। আমি জানিতাম যে, লেডী রবার্টস আমার ধর্ম-বিশ্বাসকে খুব সম্মান করিতেন। আমি ঐ 'মিল্ক' জলে গুলিয়া পান করিলাম। উহার স্বাদ আমার কাছে দুধের মত লাগিল। 'খাওয়াদাওয়া সারিয়া তারপর জাতি জিজ্ঞাসা করা'র মত, আমি দুধের স্বাদ পাওয়ার পর বোতলের লেবেলে পড়িয়া দেখিলাম উহা দুধই বটে। সেইজন্য একবার পান করিয়াই পরে ত্যাগ করিলাম। লেডী রবার্টসকে সংবাদ দিয়া জানাইলাম যে, তিনি এ বিষয়ে যেন মোটেই চিন্তা না করেন। তিনি অতি তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও তাঁর দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বন্ধু বোতলের লেবেল পড়েন নাই। লেডী রবার্টস বড় ভালমানুষ, আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলাম। তিনি এত কষ্ট করিয়া যাহা আমার জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যবহার করিতে না পারায় আমি ক্ষমা চাহিলাম। তাঁহাকে জানাইলাম যে, না জানিয়া দুধ খাওয়ায় আমার কোনও দুঃখ হইতেছে না এবং কোনও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।

লেডী রবার্টসের সম্বন্ধে অন্য সমস্ত মধুর স্মৃতির কথা এখানে আর উল্লেখ করিলাম না। এমন অনেকের স্মৃতির আমার মনে রহিয়াছে, বিপদে আপদে যাঁহারা আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন। এই সকল মধুর স্মৃতি আমাকে এই কথাই মনে করাইয়া দেয় যে, ঈশ্বর যখন দুঃখের তিক্ত ঔষধ দেন, তখন তাহার সহিত সুমিষ্ট অনুপানও দেন।

ডাক্তার এলিনসন যখন আমাকে দ্বিতীয়বার দেখিলেন, তখন তিনি অনেক বাঁধাবাঁধি কমাইয়া দিলেন। শরীরে চর্বি হওয়ার জন্য তিনি মেওয়া ইত্যাদি এবং মাখন অথবা জলপাইয়ের তেল খাইতে বলিলেন। কাঁচা তরকারি ভাল না লাগিলে, রান্না করিরা ভাতের সহিত খাইতে বলিলেন। পথ্যের এই পরিবর্তন আমার খুব ভাল লাগিল।

রোগ সম্পূর্ণ সারিল না। শুশ্রূষার আবশ্যকতা ছিল। আমি শয্যা ত্যাগ করিতে পারিতাম না। ডাক্তার মেহতা মাঝে মাঝে সংবাদ লইয়া যাইতেন। "আমার কথামত চলিলে আমি ভাল করিয়া দিব"—একথা তাঁহার মুখে সর্বদা লাগিয়াই ছিল।

এইরকম চলিতেছিল। ইত্যবসরে মিঃ রবার্টস একদিন আসিয়া পড়িলেন এবং আমাকে দেশে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। "এই অবস্থায় আপনি কখনো নেটলী হাসপাতালে যাইতে পারিবেন না। শীঘ্রই

দারুণ শীত পড়িবে; আমার খুব ইচ্ছা যে, আপনি এখন দেশে যান ও সারিয়া উঠুন। তখন পর্যন্তও যদি যুদ্ধ চলিতে থাকে, তবে সাহায্য করার অনেক সুযোগ আপনার হইবে। আর আপনি এখানেও যে সাহায্য করিয়াছেন তাহা কিছু কম নয়।"

আমি এই পরামর্শ মানিলাম ও দেশে ফেরার জন্য তৈরি হইলাম।

৪৩

দেশের পথে

মিঃ কলেনবেক আমার সঙ্গে আমাদের দেশে আসিবেন স্থির করিয়াই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় যুদ্ধের জন্য জার্মানদের উপর খুবই কড়া নজর ছিল। আমার সঙ্গে মিঃ কলেনবেক আসিতে পারিবেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। তাঁহার পাস পাওয়ার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। মিঃ রবার্টস তাঁহাকে পাস দিতে পারিলে খুশি হইতেন। তিনি সমস্ত কথা জানাইয়া বড়লাটকে তার করিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের সোজা জবাব আসিল—"আমরা দুঃখিত, কিন্তু এখন এইরকম কোনও ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত নহি।" এই জবাব যে সর্বথা যুক্তিযুক্ত তাহা আমি বুঝিলাম। মিঃ কলেনবেকের সঙ্গে বিচ্ছেদের দুঃখ আমার ছিল, কিন্তু আমার চাইতে তাঁহারই বেশি দুঃখ হইয়াছিল দেখিলাম। তিনি যদি ভারতবর্ষে আসিতে পারিতেন, তবে তিনি আজ চাষীর ও তাঁতির সাদাসিধা সুন্দর জীবন যাপন করিতে থাকিতেন। এখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার পুরাতন জীবন যাপন করিতেছেন এবং স্থপতির ব্যবসা চালাইতেছেন।

আমি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট না পাওয়ায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইতে হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কিছু শুকনো ফল আনিয়াছিলাম, তাহা সঙ্গে লইলাম; টাটকা ফল স্টীমারেই পাওয়া যাইত। ডাঃ মেহতা আমার বুক 'মিডে'র পলস্তারা দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং ব্যাণ্ডেজ রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি দুইদিন ঐ ব্যাণ্ডেজ সহ্য করিয়াছিলাম, তারপর অসহ্য হইলে অতি কষ্টে উহা খুলিয়া ফেলিয়া স্নানাদি করার সুবিধা পাইলাম। খাদ্য ছিল প্রধানতঃ শুকনা ও টাটকা ফল। শরীর প্রতিদিনই ভাল হইতে লাগিল। সুয়েজ খাল পর্যন্ত পৌঁছিতেই শরীর অনেক ভাল হইয়া গেল। যেমন যেমন শরীর একটু করিয়া ভাল হইতে

লাগিল, তেমন তেমন আমি খানিকটা করিয়া ব্যায়াম বেশি করিতে লাগিলাম। শুদ্ধ হওয়া এবং না-ঠাণ্ডা না-গরম জলবায়ুর জন্যই আমার শরীরের এই পরিবর্তন হইল বলিয়া মনে করি।

পূর্বের অভিজ্ঞতার জন্যই হোক, বা অন্য কারণেই হোক, ইংরেজ যাত্রী ও আমাদের মধ্যে যে পার্থক্য এখন দেখিলাম, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডে যাইতে তাহা দেখি নাই। সেখানেও ভেদ ছিল, কিন্তু এখানকার মত নয়। কোনও কোনও ইংরেজের সঙ্গে কথা হইত কিন্তু তাহাও দূর হইতে নমস্কার করার মত। হৃদয় হইতে উহার সাড়া ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকাতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার স্টীমারেও খোলা হৃদয় লইয়া মেলামেশা হইতে পারিত। এখানে ভেদ হওয়ার কারণ আমি এইরূপ বুঝি যে, এই স্টীমারের ইংরেজেরা মনে করেন, তাঁহারা রাজা আর ভারতীয়েরা তাঁহাদেরই কাছে পরাধীন। এই সংস্কার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কাজ করে।

এই আবেষ্টনীর মধ্য হইতে কখন ছুটি পাইব এবং কখন দেশে পৌঁছিব, আমার মন তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এডেন পঁহুছিতে কতকটা দেশে আসার ভাব আসিল। আমি এডেনবাসীদের বেশ জানিতাম। ভাই কেকোবাদ কাওয়াসজী দীনশা ডারবানে আসিয়াছিলেন। তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। অল্পদিনেই আমরা বোম্বাই পেঁাছিলাম। যে দেশে ফিরিতে ১৯০৫ সাল হইতেই আশা করিয়া আসিতে-ছিলাম, দশ বৎসর পর সেই দেশে ফিরিতে আমার বড়ই আনন্দ হইতেছিল। গোখলে আমার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ হইলেও তিনি এইজন্যই বোম্বাই আসিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে আসিয়া, তাঁহার ভালবাসার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া, আমি আমার দায়িত্ব হইতে ছুটি লওয়ার আশায় বোম্বাই পৌঁছিয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতা অন্য রকম ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

৪৪
ওকালতির স্মৃতি

ভারতবর্ষে আসার পর আমার জীবনের গতি কিভাবে চলিতে লাগিল, সে বিষয় বর্ণনার পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু কিছু কথা লিখিব। এই কথাগুলি ইচ্ছা করিয়াই ইতঃপূর্বে বাদ দিয়াছি। কয়েকজন উকিল বন্ধু ওকালতি করার সময়ের এবং ওকালতির কিছু কিছু স্মৃতি জানিতে চাহিয়াছেন। এই স্মৃতি এত বহুল যে, উহা লিখিতে গেলে একখানা বই লেখা হইয়া যায়। আমি এই আত্মকথা লিখিতে যতটুকু সীমার ভিতর থাকিব স্থির করিয়াছি, তাহার বাহিরে চলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু সত্যের প্রয়োগে যে সকল কথা আসিয়া পড়ে তাহার বর্ণনা অনুচিত হইবে না।

আমার যতদূর মনে আছে আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ওকালতিতে আমি কখনও অসত্যের প্রয়োগ করি নাই। আমার ওকালতির বেশির ভাগ সেবার জন্যই নিয়োজিত হইয়াছিল। আর সেজন্য কেবল খরচ ভিন্ন আর কিছুই লইতাম না। কত সময় নিজের পয়সা দিয়াও মামলার খরচ চালাইতে হইত।

আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার ওকালতি সম্বন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু বন্ধুগণ আরো বেশি জানিতে চান। তাঁহারা মনে করেন যে, আমি সত্য হইতে বিচ্যুত হই নাই—এমন ঘটনার অল্পস্বল্পও যদি আমি বর্ণনা করি, তবে তাহাতে উকিলদের উপকার হইবে।

উকিলের ব্যবসা মিথ্যার আশ্রয় না লইলে চালানো যায় না, এই কথাই ওকালতি পড়ার সময় শুনিতাম। কিন্তু মিথ্যা বলিয়া পয়সা লওয়া বা সম্মান অর্জন করা, এই উভয়ের কোনটির প্রতি আমার লোভ ছিল না। সুতরাং পড়ার সময়কার ঐ কথা আমার উপর কোন প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই পরীক্ষা অনেকবার হইয়াছে। আমি জানিয়াছি যে, বিরুদ্ধ-পক্ষের সাক্ষীদের মিথ্যা কথা শিখানো হইয়াছে। আর যদি আমি আমার মক্কেল বা সাক্ষীকে নামমাত্রও মিথ্যা বলিতে উৎসাহিত করি, তাহা হইলেই মোকদ্দমার জিত হয়। কিন্তু আমি এই প্রকার লোভ সকল সময়ই জয় করিয়াছি। কেবল একটা মাত্র মোকদ্দমার কথা মনে পড়ে। এই মোকদ্দমায় আমার জিত হওয়ার পর সন্দেহ হয় যে মক্কেল আমাকে মিথ্যা

মোকদ্দমা দিয়াছিল। আমার অন্তরে সর্বদা এই ভাব থাকিত যে, যদি মক্কেলের মামলা সত্য হয় তবে যেন জিত হয়, যদি মিথ্যা হয় তবে যেন হার হয়। মোকদ্দমায় হার-জিতের উপর নির্ভর রাখিয়া ফী নির্দিষ্ট করা হইত না। মোকদ্দমা হারিলেও আমার পারিশ্রমিক মাত্র লইতাম, জিতিলেও তাহাই লইতাম। মক্কেলদের বলিয়া দিতাম যে, যদি মিথ্যা হয় তবে আমার কাছে আসিও না। সাক্ষীদের শিখাইয়া দেওয়ার কাজ আমার কাছে প্রত্যাশা করিও না। অবশেষে এ সম্বন্ধে আমার এমন ধরনের খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল যে, মিথ্যা মোকদ্দমার মক্কেলরা আমার কাছে আসিতই না। বস্তুতঃ এমন মক্কেলও ছিল যাহারা তাহাদের সত্য মোকদ্দমাগুলিই আমার কাছে আনিত, আর যদি একটু মাত্রও মিথ্যা থাকিত, তাহা হইলে অন্য উকিলের কাছে লইয়া যাইত।

একবার এক ঘটনায় আমার খুব বড় রকমের পরীক্ষা হয়। এই মোকদ্দমা আমার সব চেয়ে ভাল মক্কেলের ছিল। মোকদ্দমাটি জটিল হিসাব সংক্রান্ত ও অনেক দিন হইতে চলিতেছিল। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ অনেক আদালতে চলিয়াছিল। অবশেষে ইহার হিসাব সম্বন্ধীয় অংশ কয়েকজন নামজাদা হিসাব-রক্ষক সালিসের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। সালিসের রায় অনুসারে আমার মক্কেলেরই জিত হয়। কিন্তু সালিসের হিসাবে একটা ছোট অথচ মারাত্মক ভুল ছিল। জমার দিকের একটা অঙ্ক ভুলক্রমে খরচের দিকে লেখা হইয়াছিল। বিরুদ্ধ-পক্ষ এই সালিসি রদ করার জন্য দরখাস্ত করে। মক্কেলের পক্ষে আমি জুনিয়র উকিল ছিলাম। আমার সিনিয়র উকিলকে ঐ ভুল দেখানো হইলে তিনি বলিলেন যে, সালিসের ভুল স্বীকার করিতে আমার মক্কেল বাধ্য নয়। বিরুদ্ধ-পক্ষের কোনও সুবিধা স্বীকার করিতে কোনও উকিল বাধ্য নয়—ইহাই তাঁহার স্পষ্ট অভিমত ছিল। কিন্তু আমি বলিলাম, ভুল স্বীকার করাই সঙ্গত। সিনিয়র উকিল বলিলেন—"এমন করিলে কোর্ট সমস্ত সালিসি রদ করিয়া দিবে, এরূপ আশঙ্কা আছে। এতখানি বিপদের ভিতর, কোনও বুদ্ধিমান উকিল তাহার মক্কেলকে ফেলে না। আমি এই ঝক্কি লইতে আদৌ রাজী নই। যদি মোকদ্দমার আবার নূতন শুনানি হয়, তাহা হইলে মক্কেলের কত খরচ হইবে বলা যায় না। আর পরিণামই বা কি হইবে তাহাও বলা যায় না।"

এই কথাবার্তার সময় মক্কেল উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম—"মক্কেল ও আপনার, দুইজনেরই এই ঝক্কি লইতে হয়। আপনি স্বীকার না করিলেও,

কোর্ট ঐ ভুলযুক্ত রায় ভুল জানিয়াও যে বহাল রাখিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? আর ভুল শুদ্ধ করিতে গিয়া যদি মক্কেলের ক্ষতিই হয়, তাহা হইলেই বা আপত্তি কি?"

প্রধান উকিল বলিলেন—"কিন্তু আমরা কেনই বা ভুল স্বীকার করিব?"

আমি জবাব দিলাম—"আমরা ভুল স্বীকার না করিলেও, কোর্ট নিজেই ভুল ধরিতে পারিবে না, অথবা বিরুদ্ধ-পক্ষ খেয়াল করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?"

সিনিয়র উকিল দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"তাহা হইলে আপনিই এই মোকদ্দমায় সওয়াল-জবাব (শেষ যুক্তি) কোর্টে করিবেন। ভুল স্বীকার করার শর্তে আমি ইহাতে হাজির হইতে প্রস্তুত নই।"

আমি নম্রভাবে বলিলাম—"যদি আপনি না দাঁড়ান, আর যদি মক্কেল ইচ্ছা করে, তবে আমি দাঁড়াইতে প্রস্তুত আছি। ভুল স্বীকার না করিলে, আমার দ্বারা এই মোকদ্দমা চালানো অসম্ভব।"

এই বলিয়া, আমি মক্কেলের দিকে তাকাইলাম। তিনি একটু মুশকিলে পড়িলেন। এই মোকদ্দমায় আমি প্রথম হইতেই ছিলাম। মক্কেলের আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। আমার স্বভাবও তিনি সম্পূর্ণরূপে জানিতেন। তিনি বলিলেন—"ভাল, তাহা হইলে আপনিই আদালতে দাঁড়াইবেন, ভুল স্বীকার করিবেন। হার যদি কপালে থাকে তবে হার হইবে। সত্যের দিকেই ঈশ্বর ত আছেন?"

আমি স্বীকৃত হইলাম। মক্কেলের কাছ হইতে আমি অন্য উত্তর আশা করি নাই। সিনিয়র উকিল আমাকে আর একবার সাবধান করিলেন এবং আমার জেদের জন্য আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিলেন।

আদালতে কি হইল তাহা পরে বলিতেছি।

৪৫

চালাকি

আমার পরামর্শ যে ঠিক, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই মোকদ্দমার ন্যায়বিচার পাওয়াইয়া দেওয়ার পক্ষে আমার সামর্থ্য সম্বন্ধে আমার খুবই সন্দেহ ছিল। এমন কঠিন মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টের সওয়াল

(argue) করা আমার পক্ষে খুবই বিপদজনক বোধ হইয়াছিল। সেইজন্য কম্পিতচিত্তে আমি বিচারকের সামনে সওয়াল করিতে দাঁড়াইলাম।

ঐ ভুলের কথার উল্লেখমাত্রেই একজন জজ বলিয়া উঠিলেন—"ইহাকে চালাকি বলে না?"

আমি অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া উঠিলাম। যেখানে চালাকির নামগন্ধও কিছু নাই, সেখানে চালাকির সন্দেহ করা অসহ্য বোধ হইল। 'প্রথম হইতেই যেখানে জজের মন বিরুদ্ধ হইয়াছে, সেখানে এমন কঠিন মোকদ্দমা কেমন করিয়া জিতিব?'—আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমি ক্রোধ দমন করিয়া শান্ত হইয়া জবাব দিলাম—"আমার আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, আপনি সবটা না শুনিয়াই আমার প্রতি চালাকির অপরাধ আরোপ করিলেন!"

"আমি আরোপ করি নাই। কেবল আশঙ্কার উল্লেখ করিলাম"—জজ বলিলেন।

"আপনার শঙ্কা আমার উপর দোষ আরোপ করার মতই লাগিতেছে। সবটা শুনিয়া যদি আপনার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় তবে সে কথা উঠাইবেন।"

আমি এই উত্তর দিলাম। জজ শান্ত হইয়া বলিলেন—"কথার মাঝখানে আপনাকে বাধা দেওয়ায় দুঃখবোধ করিতেছি, আপনার বক্তব্য বলিয়া যান।"

আমার কাছে পরিষ্কার করিয়া বলার মত যুক্তি অনেক ছিল। প্রথমেই ঐ সন্দেহ উঠায়, আমার যুক্তির উপর জজের মনোযোগ দৃঢ়বদ্ধ রাখিতে পারিব বলিয়া আমার সাহস আসিল এবং তাঁহাকে অবাধে বুঝাইতে পারিলাম। জজ ধৈর্য সহকারে শুনিলেন এবং তিনি বুঝিলেন যে, ঐ ভুল অনিচ্ছাকৃত ও অনেক পরিশ্রমে যে হিসাব তৈরি হইয়াছিল তাহা ইহার জন্য রদ করা যায় না।

বিরুদ্ধ-পক্ষের উকিলের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই ভুল স্বীকারের পর তাঁহার আর বেশি যুক্তি-তর্ক করিতে হইবে না। কিন্তু জজ এই স্পষ্ট অথচ যাহা সহজেই সংশোধন করা যায়, এমন ভুলের জন্য সালিসের রায় রদ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। প্রতিপক্ষের উকিল অনেক মাথা কুটিলেন, কিন্তু পূর্বে জজের যেখানে যেখানে সন্দেহ হইয়াছিল সেখানে এখন তিনি আমারই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

জজ বলিলেন—"যদি মিঃ গান্ধী ভুল স্বীকার না করিতেন, তবে আপনি কি করিতেন?"

তিনি বলিলেন—"যে হিসাব-পরীক্ষককে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা ভাল বিশেষজ্ঞ আর কোথায় পাইব ?"

"আপনি আপনার মক্কেলের দিকটা ভাল করিয়াই জানেন, ইহা ত আমাকে মানিয়া লইতে হইবে। ঐ ভুল ব্যতীত আর কোনও ভুল যদি না দেখাইতে পারেন, তবে একটা স্পষ্ট ভুলের জন্য উভয় পক্ষকে আবার প্রথম হইতে খরচার মধ্যে ফেলিতে পারি না। সুতরাং আপনি যে এই মোকদ্দমা আবার নতুন করিয়া আরম্ভ করিতে বলিতেছেন তাহা সম্ভবপর নয়।"

এই ধরনের অনেক কথায় প্রতিপক্ষের উকিলকে শান্ত করিয়া, ভুল সংশোধন করিয়া, অথবা ভুল সংশোধন করার হুকুম সালিসের উপর দিয়া ঐ রায়ই বহাল রাখিলেন।

আমার অপার আনন্দ হইল। মক্কেল ও সিনিয়র উকিল সন্তুষ্ট হইলেন। ওকালতিতে সত্য ত্যাগ না করিয়াও কাজ চলে এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় হইল।

ব্যবসার জন্য ওকালতি করার ভিতর মূলগত যে দোষ রহিয়াছে তাহা এই সত্যপালনের দ্বারাও যে দূর করা যায় না, একথাও পাঠকদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

৪৬

মক্কেল সঙ্গী হইলেন

নাতাল ও ট্রান্সভালে ওকালতিতে একটা পার্থক্য ছিল। নাতালে এটর্নী ও এডভোকেটে ভেদ ছিল। কিন্তু তাহা থাকিলেও উহারা উভয়েই সকল কোর্টেই ওকালতি করিতে পারিত। ট্রান্সভালে বোম্বাইয়ের মত প্রভেদ ছিল। সেখানে এডভোকেট এটর্নীর হাত দিয়াই মক্কেলের সঙ্গে কাজ করিতে পারে। কেউ ব্যারিস্টার হইয়া আসিলে, সে ইচ্ছামত এটর্নী হইতে পারে। নাতালে আমি এডভোকেট ছিলাম, ট্রান্সভালে এটর্নীর সার্টিফিকেট লইয়াছিলাম। এখানে এডভোকেট হইলে, আমি ভারতীয়দের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্কে আসিতে পারিতাম না; আর শ্বেতাঙ্গ এটর্নীরা আমাকে মোকদ্দমা দিবে, দক্ষিণ আফ্রিকা এমন স্থান নয়।

ট্রান্সভালে এটর্নীরা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মোকদ্দমা করিতে পারিত।

আমি অনেকবার ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে উপস্থিত হইয়াছি। এইরূপ একবার কোর্টে মোকদ্দমা চলিতেছে, তখন দেখি যে আমার মক্কেল আমাকে ঠকাইয়াছে। তাহার মোকদ্দমা মিথ্যা। কাঠগড়ায় উঠিয়া সে একেবারে দমিয়া গেল। তখন আমি উঠিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে রায় দিতে বলিয়া বসিয়া পড়িলাম। প্রতিপক্ষের উকিল আশ্চর্য হইল। ম্যাজিস্ট্রেট খুশি হইলেন। মক্কেল জানিতেন যে, আমি মিথ্যা মোকদ্দমা লই না। তিনি ইহা স্বীকার করিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে যে বিপক্ষে রায় দিতে বলিয়াছিলাম তাহাতে তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। যাহাই হোক আমার এই ব্যবহারের ফলে আমার ব্যবসায় কোনও ক্ষতি হয় নাই। কোর্টেও আমার কাজ সহজ হইয়াছিল। আমি ইহাও দেখিলাম যে, সত্যের প্রতি আমার এই নিষ্ঠা দেখিয়া, আইন-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে আমার প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াছিল এবং তাঁহাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিচিত্র রকমের হইলেও কাহারও কাহারও সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধেও আবদ্ধ হইতে পারিয়াছিলাম।

ওকালতি করার সময় আমার এই অভ্যাস হইয়াছিল যে, আমার অজ্ঞতার বিষয় আমি কি মক্কেলের কাছে কি উকিলের কাছে লুকাইতাম না। যাহা আমি বুঝিতাম না, সে সব স্থানে আমি মক্কেলকে অপর উকিলের কাছে যাইতে বলিতাম। আর যদি আমাকেই নিয়োগ করিতে চায়, তবে অভিজ্ঞ উকিলের সাহায্য লইয়া কাজ করিব বলিতাম। এই প্রকার খোলা ব্যবহারের জন্য আমি মক্কেলদের অফুরন্ত ভালবাসা ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলাম। সিনিয়র উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে যে খরচ হইত, তাহা মক্কেলরা সন্তুষ্টচিত্তেই দিত। তাহাদের ঐ ভালবাসা ও বিশ্বাস আমার জনসেবার ক্ষেত্রে খুব কাজে আসিয়াছিল।

পূর্বে আমি জানাইয়াছি যে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে কেবল লোকসেবার জন্যই আমি ওকালতি করিতাম। এই সেবা করিতে হইলে, আমার প্রতি লোকের বিশ্বাস থাকা আবশ্যক ছিল। আমি পয়সা লইয়া কাজ করিলেও, উদার-হৃদয় ভারতীয়েরা আমার সে কাজ সেবাই বলিয়া মনে করিত। যখন তাহাদিগকে তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য জেলের দুঃখ সহ্য করিতে বলিয়াছি, তখন তাহাদের মধ্যে অনেকে সচেতনভাবেই এই অনুসারে কাজ করা অপেক্ষা, আমার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসাবশতঃই সে দুঃখ বরণ করিয়াছে।

এই কথা লিখিতে লিখিতে আমার ওকালতির দিনের অনেক মধুর স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। শত শত মক্কেল বন্ধু ও সহযোগী জনসেবায় আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং আমার কঠোর জীবনকে তাঁহারা সরস করিয়া তুলিয়াছিলেন।

৪৭

মক্কেল জেলে গেল না

পারসী রুস্তমজীর নাম পাঠক ভালরকম জানেন। পারসী রুস্তমজী একই সঙ্গে আমার জনহিতকর কার্যের সঙ্গী ও মক্কেল হইয়াছিলেন। অথবা এমনও বলা যায় যে, তিনি প্রথমেই সঙ্গী হইয়াছিলেন, পরে মক্কেল হন। তিনি আমাকে এত বিশ্বাস করিতেন যে, নিজের গোপনীয় ঘরোয়া ব্যাপারেও আমার পরামর্শ লইতেন এবং তাহা অনুসরণ করিতেন। তাঁহার অসুখ হইলে আমার পরামর্শ লইতেন এবং জীবনযাত্রার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকিলেও নিজের চিকিৎসার বেলায় আমারই চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রয়োগ করিতেন।

আমার এই সঙ্গীর উপর একসময় বড় বিপদ আসিয়া পড়িল। যদিও তিনি নিজের ব্যবসার সকল কথাই বলিতেন, তথাপি একটা কথা তিনি আমার কাছে গোপন করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বোম্বাই ও কলিকাতা হইতে মাল আমদানি করিতেন। ইহাতে তিনি 'ঘাটচুরি' করিতেন, অর্থাৎ অবৈধভাবে বিনাশুল্কে মাল লইয়া আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে সকল কর্মচারীর ভাল পরিচয় থাকায় তাঁহার উপর কেউ সন্দেহ করিত না। তিনি যে চালান দিতেন তাহারই উপর শুল্ক ধার্য করা হইত। কর্মচারীদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ জানিয়া শুনিয়াও চোখ বুজিয়া এই কাজ চলিতে দিতেন।

'আখো' নামক এক গুজরাটী কবির উক্তি ফলিয়া গেল। তিনি বলিয়াছেন—পারা যেমন চাপিয়া রাখা যায় না, এদিকে সেদিকে ছুটিয়া পলায়, চুরিও তেমনি চিরকাল গোপন থাকে না। অবশেষে পারসী রুস্তমজীর চুরি ধরা পড়িল। আমার কাছে দৌড়াইয়া আসিলেন, চোখে তাঁহার জল ঝরিতেছে। রুস্তমজী বলিলেন—"ভাই, আমাদ্বারা আপনি প্রতারিত হইয়াছেন। আজ আমার পাপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমি গোপনে মাল আমদানি করিতাম; এখন আমার অদৃষ্টে জেল আছে। এইবার আমার সর্বনাশ হইবে। এই

বিপদে এক আপনিই আমাকে বাঁচাইতে পারেন। আমি আপনার কাছে কোনও কথাই গোপন করি না, কিন্তু ব্যবসার ভিতরকার চুরির কথা কেমন করিয়া বলা যায় এই মনে করিয়া এই চুরির কথা আপনাকে বলি নাই। এখন অনুতাপ হইতেছে।"

আমি ধৈর্য রাখিয়া বলিলাম—"আমার ধরন ত আপনি জানেন, খালাস হওয়া আর না হওয়া ঈশ্বরের হাত। দোষ স্বীকার করিলে যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলেই আমি খালাস করিতে পারি।"

তাঁহাকে বড়ই কাতর দেখাইতেছিল। তিনি বলিলেন—"আপনার কাছে দোষ স্বীকার করিলাম, ইহাই কি যথেষ্ট নহে?"

"আপনি দোষ করিয়াছেন সরকারের কাছে। আমার কাছে সেই দোষ স্বীকার করিলে কি লাভ?"—আমি মৃদুস্বরে এই কথা তাঁহাকে বলিলাম।

রুস্তমজী বলিলেন—"আপনি যাহা বলিতেছেন, অবশেষে তাহা ত করিতেই হইবে। কিন্তু আমার এক পুরানো উকিল আছেন, একবার তাঁহার পরামর্শ লইবেন ত? তিনি আমার বন্ধুও।"

অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, অনেক দিন হইল এই চুরি চলিতেছে। যে চুরিটা ধরা পড়িয়াছে উহা ত সামান্য। পুরানো উকিলের কাছে আমরা গেলাম। তিনি মোকদ্দমা বুঝিলেন। "এই মোকদ্দমা জুরির নিকট হইবে, আর জুরি কি ভারতীয় আসামীকে ছাড়িবে? তবে আমি আশা ছাড়িব না।" —উকিল এই কথা বলিলেন।

ইঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। তাঁহাকে পারসী রুস্তমজী বলিলেন—"আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি; এই মোকদ্দমা মিঃ গান্ধীর পরামর্শ অনুসারেই চালাইব। ইঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আপনার যাহা পরামর্শ দেওয়ার, ইঁহাকে দিবেন।"

উকিলের সঙ্গে কাজ এই প্রকারে শেষ করিয়া আমরা রুস্তমজী শেঠের দোকানে গেলাম।

আমি বুঝাইলাম—"এই মোকদ্দমা কোর্টে যাওয়ার মত মনে করি না। মোকদ্দমা করা না-করা প্রধান কর্মচারীর হাতে। তাঁহাকে গভর্নমেণ্টের প্রধান উকিলের পরামর্শ লইয়া চলিতে হইবে। আমি এই দুইজনের সঙ্গে দেখা করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা কি করিবেন জানি না, তবে এই চুরি স্বীকার করিতে হইবে; তাঁহারা যে অর্থ-দণ্ড করেন, তাহা দিতে প্রস্তুত হইতে

হইবে। সম্ভবতঃ তাঁহারা এইরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। কিন্তু যদি না মানেন, তবে জেলে যাইবার জন্য তৈরী হইতে হইবে। আমার মতে লজ্জা ত জেলে যাওয়ায় নাই, লজ্জা চুরি করায়। লজ্জার কাজ যাহা তাহা ত হইয়াই গিয়াছে। জেলে যাইতে হয় ত প্রায়শ্চিত্ত করা হইল মনে করিতে হইবে। সত্য সত্য প্রায়শ্চিত্ত ত ভবিষ্যতে আর 'ঘাট-চুরি' না করার প্রতিজ্ঞা লওয়া।"

এই সকল কথা রুস্তমজী যে ঠিকমত বুঝিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তিনি সাহসী পুরুষ, কিন্তু এই সময়টা দমিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠা নষ্ট হওয়ার সময় উপস্থিত। এত চেষ্টায় যাহা গড়িয়া তুলিয়াছেন, আজ তাহা বিসর্জন দিয়া কোথায় যাইবেন?

তিনি বলিলেন—"আপনার হাতে ত আমি নিজেকে সঁপিয়া দিয়াছি এখন আপনার যেমন করিতে হয় করিবেন।"

এই মোকদ্দমায় আমার বিনয় প্রকাশের শক্তি প্রাণ খুলিয়া ব্যবহার করিয়াছিলাম। আমদানির কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করিলাম। সমস্ত ফাঁকির কথা নির্ভয়ে তাঁহাকে বলিলাম। সমস্ত খাতাপত্র দেখিতে বলিলাম ও রুস্তমজীর অনুতাপের কথা বলিলাম।

তিনি বলিলেন—"বুড়া পারসীকে আমি জানি। কাজটা তিনি মূর্খের মত করিয়াছেন। কিন্তু আমার কর্তব্য কি তাহাও আপনি জানেন; সরকারী প্রধান উকিল যাহা বলেন, আমাকে তেমনি করিতে হইবে। তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া আপনাকে বুঝাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম—"পারসী রুস্তমজীকে আদালতে ঠেলিয়া দেওয়ার জন্য যদি আপনি জেদ না করেন, তাহা হইলেই আমি খুশি হইব।" ইঁহার নিকট হইতে এই বিষয়ে অভয়-বাক্য পাইয়া, আমি প্রধান সরকারী উকিলের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিতে লাগিলাম। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমার সত্যপ্রিয়তা বুঝিতে পারিলেন এবং আমি যে কিছুই লুকাই নাই তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন। ইহার পর অন্য কোনও এক মোকদ্দমায় তাঁহার কাছে উপস্থিতি হইলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আপনি 'না' জবাব ত লইবেনই না।

রুস্তমজীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো হইল না। তিনি যত টাকা এ পর্যন্ত ঠকাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাঁহার দুইগুণ টাকা লইয়া মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়ার হুকুম দেওয়া হইল।

রুস্তমজী শেঠের সম-ব্যবসায়ী বন্ধুরা আমাকে এই বলিয়া সাবধান করিলেন

যে, ইহা রুস্তমজীর সত্য বৈরাগ্য নয়, ইহা তাঁহার 'শ্মশান-বৈরাগ্য'। ইহা কতদূর সত্য, তাহা আমি জানি না। একথা কিন্তু আমি রুস্তমজীকে বলিলে তিনি উত্তর দিলেন—"আপনাকেও যদি ঠকাই তাহা হইলে আমার স্থান কোথায়?"

পঞ্চম ভাগ

১

প্রথম অভিজ্ঞতা

ফিনিক্স হইতে যে দলের আসার কথা ছিল, আমার দেশে পৌঁছার পূর্বেই সে দল পৌঁছিয়াছিল। আমরা ধরিয়া রাখিয়াছিলাম যে, আমি আগে দেশে পৌঁছিব। যুদ্ধের জন্য আমি লণ্ডনে আটকাইয়া পড়ায়, এই দলের লোকদের কোথায় রাখা যায় সে এক সমস্যা হইল। সকলে একসঙ্গে থাকিয়া যদি ফিনিক্সের ন্যায় জীবন-যাপন করিতে পারে, তাহা হইলে ভাল হয়। দেশের এমন কোনও আশ্রম-পরিচালকের সঙ্গে পরিচয় ছিল না যে, তাহাদের সেইখানে যাইতে বলিব। সেইজন্য, আমি তাহাদের মিঃ এণ্ড্রুজের সঙ্গে দেখা করিয়া, তাঁহার নির্দেশ অনুসারেই চলিতে বলিলাম।

তাহাদের প্রথমে কাঙ্গড়ী গুরুকুলে রাখা হয়। সেখানে স্বর্গীয় শ্রদ্ধানন্দজী ইহাদের নিজের সন্তানের মত রাখিয়াছিলেন। তারপর তাহাদের শান্তিনিকেতনে রাখা হয়। সেখানে কবিগুরু ও তাঁহার লোকজন ইহাদের অসামান্য ভালবাসায় আপ্লুত করিয়া রাখেন। এই দুই জায়গায় তাহারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিল, তাহা তাহাদের ও আমার বড়ই উপকারে আসে।

আমি বলিতাম, কবিগুরু, শ্রদ্ধানন্দজী ও শ্রীযুত সুশীল রুদ্র,—ইঁহারা ছিলেন মিঃ এণ্ড্রুজের ত্রিমূর্তি। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি এই তিনজনের প্রশংসা করিতে কখনও ক্লান্ত হইতেন না। এই তিন মহাপুরুষের নাম তাঁহার কাছে দিবারাত্র শুনিয়াছি; সেই সুখ-স্মৃতির দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক স্নেহময় স্মৃতি মধ্যে আমার চিত্ত-পটে অঙ্কিত হইয়া আছে। শ্রীসুশীল রুদ্রের সঙ্গেও মিঃ এণ্ড্রুজ ছেলে-পিলেদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রুদ্র মহাশয়ের আশ্রম ছিল না। কিন্তু নিজের বাড়ি ছিল। সেই বাড়িই তিনি আমার পরিবারের হাতে একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার ছেলেপিলেরা ইহাদের সঙ্গে একদিনেই এমন মিশিয়া গেল যে, তাহারা যেন ফিনিক্স ভুলিয়া গেল।

আমি যখন বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সংবাদ পাইলাম যে আমার ফিনিক্স পরিবারের লোকেরা শান্তিনিকেতনে আছে। আমি গোখলের সঙ্গে দেখা করিয়া সেখানে যাওয়ার জন্য অধীর হইলাম।

বোম্বাইয়ে অভ্যর্থনা পাওয়ার সময় আমায় এক ছোট রকম সত্যাগ্রহ করিতে হইয়াছিল। মিঃ পেটিট সেখানে আমার অভ্যর্থনার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাদের কাছে গুজরাটীতে জবাব দেওয়ার আমার সাহস হয় নাই। তাঁহার বাসভবনের ঐশ্বর্য ও চাকচিক্যের মধ্যে, 'গিরিমিটিয়া' মজুরের সঙ্গী গেঁয়ো চাষী বলিয়া আমি নিজেকে বোধ করিতে লাগিলাম। আমি আজ যাহা পরি, তাহার তুলনায় তখন যাহা পরিতাম—কাথিয়াওয়াড়ী জামা, পাগড়ি ও ধুতি, তাহা অনেক সভ্য চেহারার বলা যায়। কিন্তু সেই রাজপ্রাসাদে, সেই পারিপাট্যের মধ্যে, আমার নিজেকে খাপছাড়া বোধ হইতেছিল। সেখানে যেমন তেমন করিয়া আমার কর্তব্য সম্পাদন করিলাম। অবশ্য সেখানে মিঃ ফিরোজশা মেহতার আশ্রয়ের আড়াল পাইয়াছিলাম।

গুজরাটীদেরও ত একটা অভ্যর্থনা দেওয়া চাই। ৺উত্তমলাল ত্রিবেদী এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। এই সম্মেলনের কতকটা কার্যক্রম আমি পূর্বেই জানিয়াছিলাম। গুজরাটী বলিয়া মিঃ জিন্নাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই সভাপতি ছিলেন অথবা প্রধান বক্তা ছিলেন তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি সংক্ষেপে ও মধুর বাক্যে ইংরেজীতেই বক্তব্য বলিলেন। যতটা মনে আছে অন্য বক্তৃতাও ইংরেজীতেই হইয়াছিল। যখন আমার উত্তর দেওয়ার সময় আসিল, তখন আমি গুজরাটীতেই বলিলাম এবং হিন্দুস্থানী ও গুজরাটী ভাষার প্রতি আমার পক্ষপাত আমি অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়া, গুজরাটী সভায় যাঁহারা ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করেন তাঁহাদের কাছে সবিনয়ে আমার বিরুদ্ধ মত জানাইলাম। এই প্রকার বলিতে অবশ্যই আমার মনে সংকোচ হইয়াছিল। আমার মনে হইতেছিল, দীর্ঘ দিন প্রবাসের পর ফিরিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বলাকে অবিবেকীর কাজ বলিয়া ইঁহারা হয়ত বিবেচনা করিবেন। কিন্তু আমি যে সাহসের সঙ্গে গুজরাটীতেই উত্তর দিলাম, তাহাতে কেউ অসন্তুষ্ট হন নাই এবং আমার বিরুদ্ধ মতও সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এবং আমার অন্যান্য সিদ্ধান্তও জনসাধারণের কাছে যে ক্লেশকর হইবে না, তাহার আভাসও আমি এই সভাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

বোম্বাইয়ে দুই এক দিন থাকিয়া তখনকার মত কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া গোখলের আজ্ঞানুসারে পুণায় গেলাম।

২

গোখলের সঙ্গে পুণায়

আমি বোম্বাই পৌঁছামাত্রই গোখলে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, গভর্ণর আমার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা করেন। পুণায় রওনা হওয়ার পূর্বেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসা মন্দ নয়। আমি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করিলাম। কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর তিনি বলিলেন—

"একটা কথা আপনাকে বলিতেছি। সরকারের বিরুদ্ধে যদি আপনাকে কখনও যাইতে হয়, তাহা হইলে আমার সঙ্গে প্রথমে দেখা করিয়া, কথা বলিয়া, তারপর যাহা হয় করিবেন।"

আমি জবাব দিলাম—"এ কথা আমি সহজেই আপনাকে দিতে পারি। সত্যাগ্রহী হিসাবে আমার নিয়ম এই যে, কাহারো বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে, তাহার দৃষ্টিতে জিনিসটা জানা ও যতটা তাহার অনুকূল হওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই নিয়ম সব সময়েই পালন করিয়াছি ও এখানেও তাহাই করিব।"

লর্ড উইলিংডন ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—

"আপনার যখনই দেখা করিতে ইচ্ছা হয়, তখনই দেখা করিতে পারিবেন। আমার গভর্নমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া কোনও অনিষ্ট করিতে চায় না, ইহা আপনি দেখিতে পাইবেন।"

আমি বলিলাম—"এই বিশ্বাসের উপরই আমি নির্ভর করিয়া চলিতেছি।" পুণায় পৌঁছিলাম। সেখানকার সমস্ত কথা বলার সামর্থ্য আমার নাই। গোখলে ও সার্ভেণ্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্যরা আমাকে গভীর ভালবাসার ধারায় অভিষিক্ত করিলেন। আমার স্মরণ আছে যে, আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শনের জন্য অনেক সদস্যকে পুণায় ডাকিয়া আনা হইয়াছিল। সকলের সঙ্গেই নানা বিষয়ে হৃদয় খুলিয়া কথাবার্তা হইল। গোখলের খুব ইচ্ছা ছিল যে, আমি এই সোসাইটির সদস্য হই। আমার ইচ্ছা ত ছিলই। কিন্তু সদস্যদের কাছে মনে হইল যে, সোসাইটির আদর্শ ও কার্যপদ্ধতি আমার পদ্ধতি অপেক্ষা ভিন্ন। সেইজন্য আমার সদস্য হওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। গোখলে বলিলেন—"তোমার মধ্যে তোমার নিজের আদর্শ অনুযায়ী চলার যেমন ইচ্ছা আছে, অপরের আদর্শ মানিয়া তাহার সহিত মিশিয়া কাজ করাও

তেমনি তোমার স্বভাব। কিন্তু আমাদের সদস্যদের কাছে তোমার এই অপরের আদর্শ সম্মান করার স্বভাব পরিচিত নয়। তাঁহাদেরও নিজের আদর্শ ধরিয়া থাকারই স্বভাব এবং তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন মতাবলম্বী। আমি ত আশা করি যে, তাঁহারা তোমাকে সদস্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আর যদি স্বীকার না করেন, তবুও একথা মনে করিও না যে, তোমার প্রতি তাঁহাদের প্রেম বা প্রীতি কিছু কম। এই প্রেমধারা সমানভাবে যাহাতে বহিতে পারে সেইজন্যই তাঁহারা কোনও ঝক্কি লইতে ভয় পান। তবু তুমি সোসাইটির নিয়ম মত সদস্য হও আর নাই হও, আমি তোমাকে সদস্য বলিয়াই গণ্য করিব।"

আমার কথা আমি তাঁহাকে জানাইলাম। বলিলাম—"সোসাইটির সভ্য হই আর নাই হই, আমার এক আশ্রম স্থাপন করিয়া ফিনিক্সের সঙ্গীদলসহ সেখানে বসিয়া যাইতে হইবে। গুজরাটী বলিয়া গুজরাটের ভিতর দিয়াই সেবা করা উচিত মনে করি। এই জন্য গুজরাটেই কোথাও বসিবার ইচ্ছা হইতেছে। গোখলের এ প্রস্তাব ভাল লাগিল। তিনি বলিলেন—"তুমি অবশ্যই উহা করিবে। সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তার ফল যাহাই হোক, তোমার আশ্রমের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা আমার কাছ হইতে লইও। উহা আমারই আশ্রম বলিয়া আমি গণ্য করিব।"

আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। টাকা তোলার চেষ্টা হইতে আমার মুক্তি হইল মনে করিলাম। আমি খুব সন্তুষ্ট হইলাম। আমার আর একেলা দায়িত্ব লইতে হইবে না এবং প্রত্যেক অসুবিধাতেই একজন পথ-প্রদর্শক পাইব এই বিশ্বাসে আমার উপর হইতে গুরুভার নামিয়া গেল বলিয়া মনে হইল।

৺ডাক্তার দেবকে ডাকিয়া গোখলে বলিয়া দিলেন—"গান্ধীর হিসাব আমাদের খাতায় তুলিয়া নিন। তাঁহার আশ্রমের জন্য ও সাধারণের সেবার জন্য যে ব্যয় লাগে তাহা আপনি দিতে থাকিবেন।"

পুণা ত্যাগ করিয়া এখন শান্তিনিকেতনে যাইবার জন্য তৈরী হইতে লাগিলাম। গোখলে শেষের দিন রাত্রিতে তাঁহার নিজের যে সকল বন্ধুর আমাকে ভাল লাগে, তাঁহাদের লইয়া একটি পার্টি দিলেন। উহাতে আমার পছন্দমত মেওয়া ও টাটকা ফলই দেওয়া হইয়াছিল। এই পার্টি তাঁহার ঘরের কয়েক পা দূরেই হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার এতটুকু হাঁটিয়া আসার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু আমার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা রোগের নিষেধ মানিতে চাহে নাই। তিনি আসিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। তিনি আসিলেন।

কিন্তু আসিয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হইল। এই প্রকার মূর্ছা যাওয়া তাঁহার নতুন নয়, তাই জ্ঞান হইলে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, পার্টি যেন চলিতে থাকে। সোসাইটির আশ্রমের অতিথি-গৃহের প্রাঙ্গণে ফরাস বিছাইয়া মুগ-অঙ্কুর, খেজুর ইত্যাদি কিছু জলযোগ করা ও পরস্পর হৃদয় খুলিয়া কথাবার্তা বলাই ছিল এই পার্টির বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু গোখলের এই মূর্ছা আমার জীবনের অসাধারণ ঘটনা হইয়াছিল।

৩

ধমক নাকি ?

আমার দাদার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে ও অন্যান্য আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করিতে রাজকোটে ও পোরবন্দর যাইতে হয় বলিয়া বোম্বাই হইতে সেখানে গেলাম। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ যুদ্ধের সময়, আমার পোশাক-পরিচ্ছদ যতটা 'গিরমিটিয়া' মজুরের মত করা যায়, ততটা করিয়া ফেলিয়াছিলাম। বিলাতেও বাড়িতে ঐ পোশাক পরিতাম। দেশে আসিয়া আমার কাথিয়াওয়াড়ী বেশ পরিতে হইত। উহা দক্ষিণ আফ্রিকা হইতেই আমার সঙ্গে থাকিত। বোম্বাইতে সেইজন্য আমি কাথিয়াওয়াড়ী পোশাক লইলাম—শার্ট, বড় কোট, ধুতি ও সাদা পাগড়ি। এ সকলই দেশী মিলের কাপড়ের তৈরি ছিল।

বোম্বাই হইতে কাথিয়াওয়াড় তৃতীয় শ্রেণীতে যাইব বলিয়া পাগড়ি ও কোট আমার নিকট ভার বলিয়া বোধ হইল। সেই জন্য শার্ট, ধুতি ও আট-দশ আনার একটা কাশ্মীরী টুপি লইলাম। এইরকম পোশাক পরিলে গরিবদের মধ্যে চলা যায়। এই সময় বিরামগামে বা ওয়াঢ়াওয়াণে প্লেগের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে নামিতে হইত। আমার অল্প জ্বর ছিল। অনুসন্ধানকারী কর্মচারী হাত দেখিয়া জ্বর আছে অনুভব করিলেন। তিনি আমাকে রাজকোটে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার জন্য হুকুম দিলেন ও আমার নাম টুকিয়া লইলেন।

বোম্বাই হইতে কেউ টেলিগ্রাম করিয়া থাকিবে। সেই জন্য ওয়াঢ়াওয়াণ স্টেশনে স্থানীয় সুপরিচিত জনসেবক দর্জি মতিলাল আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বিরামগামে 'কাস্টমস'-এর তদন্তের সম্বন্ধে বলিলেন। কেউ কোন দ্রব্য শুল্ক না দিয়া লইয়া যায় কিনা, তাহাই এখানে

তদন্ত হইত। সেজন্য যাত্রীদের যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল। তখন আমি জ্বরে কাতর ছিলাম, বেশি কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না। তাহাকে আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম—

"তুমি জেলে যাইতে প্রস্তুত আছ কি?"

চিন্তা না করিয়া উৎসাহের বশে অনেক যুবকই জবাব দেয়। আমি মতিলালকে তাহাদেরই একজন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু বাস্তবিক তিনি স্পষ্ট ভাষায় আমাকে জবাব দিলেন—

"আমরা অবশ্যই জেলে যাইব, কিন্তু আমাদিগকে পরিচালনা করিতে হইবে। কাথিয়াওয়াড়ী বলিয়া আপনার উপর আমাদের প্রথম দাবি আছে। এখন ত আপনাকে আমি নামাইতে পারিব না। কিন্তু ফিরিবার বেলা আপনাকে ওয়াঢ়াওয়াণে অবশ্যই নামিতে হইবে। এখানকার যুবকদের কাজ ও তাহাদের উৎসাহ দেখিয়া আপনি খুশি হইবেন। আমাদিগকে আপনার সৈন্যদলে যখনই ইচ্ছা ভর্তি করিয়া লইতে পারিবেন।"

মতিলালের উপর আমার চোখ পড়িল। অন্য একজন সঙ্গী তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিল—

"এই ভাই দরজির কাজ করে। নিজের কাজে নিপুণ, সেইজন্য রোজ এক ঘণ্টা মাত্র কাজ করিয়া মাসে প্রায় ১৫ টাকা নিজের খরচার জন্য রোজগার করে, বাকি সমস্ত সময় জনসাধারণের সেবার কাজ দেয়। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতিলাল চালায় ও তাহার কর্মশক্তি দ্বারা আমাদের লজ্জা পাওয়ায়।"

পরে আমি ভাই মতিলালের সঙ্গে ভাল রকমে মিশিয়াছিলাম। আমি দেখিয়াছিলাম, তাঁহার সম্পর্কে যে প্রশংসা করা হইয়াছিল তাহা আদৌ অতিশয়োক্তি নহে। সত্যাগ্রহাশ্রম স্থাপিত হইলে, প্রতি মাসেই কিছুদিন করিয়া সেখানে তিনি কাটাইতেন। বালকদের সেলাই শিখাইতেন ও আশ্রমের সেলাইয়ের কাজ করিতেন। বিরামগামের কথাও আমাকে রোজ শুনাইতেন। যাত্রীদের উপর যে অত্যাচার হইত তাহা তাঁহার একেবারে অসহ্য ছিল। ভরা যৌবনেই মতিলাল রোগে দেহত্যাগ করিয়া ওয়াঢ়াওয়াণ শূন্য করিয়া চলিয়া যান।

রাজকোট পৌঁছানোর দ্বিতীয় দিনে, আমি পূর্বের হুকুম মত হাসপাতালে হাজির হইলাম। সেখানে আমি অপরিচিত ছিলাম না। ডাক্তার লজ্জিত হইলেন ও যে কর্মচারী ঐ হুকুম দিয়াছিল, তাঁহার উপর রাগ করিতে লাগিলেন।

আমি ক্রোধের কারণ দেখিলাম না। সেই কর্মচারী নিজের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। তিনি আমাকে চিনিতেন না, আর চিনিলেও ঐ হুকুম পালন করাই তাঁহার ধর্ম হইত।

ডাক্তার আমাকে সংবাদ দেওয়ার জন্য হাসপাতালে আসিতে না দিয়া, তাঁহার লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন।

সংক্রামক রোগ যাহাতে না ছড়ায় সেইজন্য এই রকম সময়ে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পরীক্ষা করা আবশ্যক। বড় মানুষেরা যদি তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন, তবে তাঁহাদেরও, গরিবদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করানো হয়, এ ব্যাপারে কর্মচারীদেরও পক্ষপাত করা উচিত হয় না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতেছি যে, কর্মচারীরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মানুষ মনে না করিয়া পশু বলিয়াই মনে করে। তুই-তোকারি না করিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা বলে না। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর কোনও কথা খাটে না, কোনও যুক্তি চলে না। কর্মচারীরা এরূপ ব্যবহার করে যেন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী তাহাদের চাকর। তাহাদের মারে, পয়সা লুট করে, ট্রেন ফেল করায়, টিকিট দিতে বেগ দেয়; আমি নিজের চোখে এই সকল দেখিয়াছি। এই অবস্থার সংস্কার করার পথ হইতেছে, যদি ধনবানদের ও শিক্ষিতদের কেউ কেউ গরিবের মতই তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া, গরিব যাহা পায় না এমন কোনও সুবিধা না লয় এবং অন্যায়, অবিচার, অসুবিধা ও বীভৎসতা নীরবে সহ্য না করিয়া, উহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ও প্রতিকার করে।

কাথিয়াওয়াড়ে যখনই গিয়াছি, তখনই বিরামগামের যাত্রীদের ঐ শুল্ক আদায়ের জন্য পরীক্ষার অভিযোগ শুনিয়াছি।

লর্ড উইলিংডনকে যে কথা দিয়াছিলাম আমি এবার শীঘ্রই তাহার সদ্ব্যবহার করিলাম। এই শুল্ক আদায় বিষয়ে যে সকল কাগজপত্র ছিল, তাহা পড়িলাম। অভিযোগের কারণ যে ঠিক, তাহা বুঝিয়া লইলাম। তারপর বোম্বাই সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে পত্রালাপ করিলাম। সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিলাম। লর্ড উইলিংডনের সহিতও দেখা করিলাম। তিনি তাঁহার দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন এবং দিল্লীর সরকারের দোষ দিলেন।

"যদি আমাদের হাতেই থাকিত, তবে এই শুল্কের গণ্ডি কবে আমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম। আপনি ইম্পিরিয়াল গভর্নমেণ্টের কাছে যান"—সেক্রেটারী এই কথা বলিলেন।

আমি ইম্পিরিয়াল গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পত্রালাপ করিতে লাগিলাম। কিন্তু পত্র-প্রাপ্তির স্বীকৃতি ভিন্ন আর কোনও জবাব পাইলাম না। যখন আমার লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাতের অবসর হইয়াছিল, তখন, অর্থাৎ প্রায় দুই বৎসর পত্রালাপের পর ইহার প্রতিকার হয়। ওখানকার কথা শুনিয়া লর্ড চেমসফোর্ড বিস্ময় বোধ করেন। তিনি বিরামগামের কোনও খবরই রাখিতেন না। আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিলেন এবং তখনি টেলিফোন করিয়া বিরামগামের কাগজপত্র আনাইলেন। যদি আমার বর্ণিত অবস্থার বিরুদ্ধে কর্মচারীদের কিছু বলার না থাকে, তবে শুল্কের গণ্ডি তুলিয়া দিবেন বলিয়া কথা দিলেন। দেখা হওয়ার অল্পদিন পরেই শুল্ক-গণ্ডি তুলিয়া দেওয়ার নোটিশ আমি সংবাদপত্রে পড়িলাম।

এই জয়কে আমি সত্যাগ্রহের ভিত্তি বলিয়া মনে করি। বিরামগামের বিষয়ে বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারী বলিলেন যে, ঐ বিষয়ে বাগসরাতে আমি যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম, তাহার নকল তাঁহার কাছে আছে। ঐ বক্তৃতায় সত্যাগ্রহের উল্লেখে তিনি অসন্তোষও জানাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি কি স্বীকার করেন না যে, ইহাতে ধমক দেখানো হইয়াছে? এই শক্তিশালী সরকার কি ধমকে ভয় খাইবে?"

আমি বলিলাম, "ইহা ধমক নয়, ইহা লোকশিক্ষা। লোকের নিজের দুঃখ দূর করার জন্য সকল প্রকার সম্ভবপর উপায় দেখানো আমার জীবনের ধর্ম। যে প্রজা স্বাধীনতা পাওয়ার ইচ্ছা করে, তাহার কাছে নিজের রক্ষার চরম উপায় থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ এই চরম উপায় হিংসায় দেখা দেয়। সত্যাগ্রহ শুদ্ধ অহিংস অস্ত্র। উহার ব্যবহার ও উহার সীমা বুঝাইয়া দেওয়া আমার ধর্ম। ইংরেজ সরকার শক্তিমান, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যাগ্রহ যে সর্বজয়ী অস্ত্র সে বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই।"

চতুর সেক্রেটারী মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"আমরা দেখিয়া লইব।"

৪

শান্তিনিকেতন

রাজকোট হইতে আমি শান্তিনিকেতনে গেলাম। সেখানকার অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা আমাকে ভালবাসায় অভিষিক্ত করিলেন। অভ্যর্থনার পদ্ধতিতে আড়ম্বর-শূন্যতা, কলা-কৌশল ও ভালবাসা মিশ্রিত ছিল। সেইখানে কাকা সাহেব কালেলকারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। কালেলকারকে কাকা সাহেব কেন বলা হইত, তাহা আমি তখন জানিতাম না। পরে জানিলাম যে, কেশবরাও দেশপাণ্ডে বরোদা রাজ্যে গঙ্গানাথ বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। কেশবরাও আমার সমকালীন ছিলেন এবং বিলাতে তাঁহার সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় ছিল। তাঁহার নানা কল্পনার মধ্যে, স্কুলকে পারিবারিক ভাবে গড়িয়া তোলারও একটা কল্পনা ছিল। সেইজন্য সকল অধ্যাপকেরই একটা করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছিল। কালেলকার এমনি করিয়া কাকা নাম পান। হরিহর শর্মা 'অন্ন' (ভাই) হইলেন। আর অপর সকলে অন্য উপযুক্ত নাম পাইলেন। কাকার সঙ্গী আনন্দানন্দ (স্বামী) ও মামার বন্ধু বলিয়া পটবর্ধন (আপ্পা) পরে এই পরিবারভুক্ত হন। এই পরিবারের উপরের পাঁচজন, একে একে আমার সঙ্গী হইয়া পড়েন। দেশপাণ্ডে 'সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। সাহেবের স্কুল ভাঙ্গিয়া যায় এবং এই পরিবারও ভাঙ্গিয়া যায়। তবু তাঁহারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক যোগ ছাড়েন নাই। কাকা সাহেব বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই সময়ে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। চিন্তামন শাস্ত্রী বলিয়া সেই পরিবারের আর একজন সেখানে থাকিতেন। তাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষকের কার্য করিতেন।

শান্তিনিকেতনে আমার পরিবারকে একটি পৃথক বাড়ি দেওয়া হইয়াছিল। এখানে মগনলাল গান্ধী এই পরিবারের প্রধান ছিল এবং সে ফিনিক্স আশ্রমের সমস্ত নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিত এবং করাইত। সে নিজের ভালবাসা, জ্ঞান ও উদ্যমের দ্বারা নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেও সক্ষম হইয়াছিল। এইখানে এণ্ড্রুজ ছিলেন, পিয়ার্সন ছিলেন। জগদানন্দবাবু, নেপালবাবু সন্তোষবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু, নগেনবাবু, শরৎবাবু ও কালীবাবুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল।

আমার স্বভাব অনুযায়ী আমি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে মিশিয়া

গিয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের সঙ্গে আত্মনির্ভরতা সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিলাম। বেতনভোগী পাচকের পরিবর্তে যদি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকেরা নিজেই রান্না করে তবে ভাল হয়। উহাতে পাকশালার স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষকদের হাতে আসে, বিদ্যার্থীরা স্বাবলম্বী হয় এবং নিজের হাতে রান্না করার ব্যবহারিক শিক্ষাও লাভ করে। এই সকল কথা আমি শিক্ষকদের জানাইলাম। দুই একজন শিক্ষক মাথা নাড়িলেন। কাহারও কাহারও এই পরীক্ষা ভাল মনে হইল। বালকদের কাছে ত নূতন জিনিস মাত্রই ভাল লাগে। সেই অনুসারে প্রস্তাবটা তাহাদেরও ভাল লাগিল। এমনি করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলিলেন, শিক্ষকেরা যদি রাজী হন তবে এ পরীক্ষা তাঁহার নিজের খুব ভাল লাগিবে। তিনি বিদ্যার্থীদিগকে বলিলেন—ইহার মধ্যেই স্বরাজের চাবিকাঠি রহিয়াছে।

পিয়ার্সন এই উদ্যম সফল করার জন্য ভীষণ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। প্রস্তাবটি তাঁহার কাছে বড় ভাল লাগিয়াছিল। একদল তরকারি কোটার আর একদল চাল-ডাল ধোয়া-বাছার ভার লইল। পাকশালার চতুষ্পার্শ্ব সাফ রাখার জন্য নগেনবাবুরা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের কোদাল লইয়া কাজ করিতে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম।

কিন্তু এই কাজে সওয়া-শত ছেলে ও শিক্ষক একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িবে এমন হইতে পারে না। এ বিষয় লইয়া প্রতিদিন আলোচনা হইত। পিয়ার্সনের কি শ্রান্তি আছে? তিনি হাসিমুখে রান্নাঘরে কোন না কোন কাজে লাগিয়া থাকিতেন। বড় বড় বাসন মাজার কাজ তাঁহারই ছিল। বাসন মাজার দলের ক্লান্তি দূর করার জন্য একদল সেখানে সেতার বাজাইত। প্রত্যেক কাজেই বিদ্যার্থীরা পুরা উৎসাহে লাগিয়া পড়িল এবং সমস্ত শান্তিনিকেতন ইহাদের কর্মচেষ্টার গুঞ্জনে মুখর হইয়া উঠিল।

এ ধরনের পরিবর্তন একবার আরম্ভ হইলে আর থামে না। ফিনিক্সের পাকশালা স্বাবলম্বী ছিল। কেবল তাহাই নহে, উহা খুব সাদাসিধাও ছিল। সেখানে মশলা ত্যাগ করা হইয়াছিল এবং ভাত, ডাল, তরকারি একই পাত্রে স্টীমে একসঙ্গে রান্না করা হইত। বাংলার রান্নার সংস্কার করার জন্যও এই ধরনের একটা ব্যবস্থা করা হইল। এজন্য দুই-একজন অধ্যাপক ও কয়েকজন ছাত্র জুটিলেন।

কিন্তু কতকগুলি কারণে এই পরীক্ষা বন্ধ হইয়াছিল। আমি মনে করি যে, এই জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের এই ছোটখাটো পরীক্ষার জন্য কোন অসুবিধা হয় নাই বরং উহা হইতে লব্ধ কতকগুলি অভিজ্ঞতা কিছু সহায়কই হইয়া থাকিবে।

আমি কিছুকাল শান্তিনিকেতনে থাকিব ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতা আমাকে বলপূর্বক টানিয়া লইয়া গেলেন। আমার সেখানে থাকার এক সপ্তাহ পরে পুণা হইতে গোখলের মৃত্যু-সংবাদ তারযোগে পাইলাম। শান্তিনিকেতন শোকে ডুবিয়া গেল। সকলে আমার কাছে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতে আসিলেন। মন্দিরের কাছে সভা হইল। সে দৃশ্য অপূর্ব গম্ভীর। আমি সেই দিনই পুণা যাওয়ার জন্য রওনা হইলাম। স্ত্রীকে ও মগনলালকে সঙ্গে লইয়া চলিলাম। বাকি সকলে শান্তিনিকেতনে রহিলেন।

মিঃ এণ্ড্রুজ বর্ধমান পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ করার অবসর আসিবে বলিয়া কি তোমার মনে হয়? যদি সেরূপ মনে কর, তবে সেদিন কখন আসিতে পারে?"

আমি বলিলাম—"এখন জবাব দেওয়া মুশকিল। আমি ত এক বৎসর কিছুই করিব না। গোখলে আমার কাছ হইতে কথা লইয়াছিলেন যে, এক বৎসর পর্যন্ত আমাকে ভ্রমণ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে সাধারণের স্বার্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনও মত গঠন করিব না বা যুক্তি দিব না। এই কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছি। তবে পাঁচ বৎসরের মধ্যে সত্যাগ্রহ করার অবকাশ আসিবে বলিয়া মনে হয় না।"

আমি এইখানে একটি কথা বলিব। "হিন্দ স্বরাজ্যে" আমি যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছি, তাহাতে গোখলে হাসিয়া বলিতেন—"এক বৎসর তুমি হিন্দুস্থানে থাকিয়া দেখ, তোমার যুক্তি তখন ঠিক রাস্তায় আসিবে।"

৫

তৃতীয় শ্রেণীর বিড়ম্বনা

বর্ধমান পৌঁছিয়া আমি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইতে যাই। উহাতেও বিড়ম্বনায় পড়ি। "তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট এত পূর্বে দেওয়া হয় না"—এই জবাব পাইলাম। আমি স্টেশন মাস্টারের নিকট গেলাম। কিন্তু আমাকে তাহার কাছে যাইতে দেয় কে? কে একজন দয়া করিয়া স্টেশন মাস্টারকে

দেখাইয়া দিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহার কাছেও সেই জবাব পাইলাম। "জানালা খুলিয়াছে" জানিয়া টিকিট কিনিতে গেলাম। কিন্তু সহজে কি টিকিট পাওয়ার যো আছে? বলবান যাত্রীরা একের পর একে ঠেলিয়া ঢুকিতে লাগিল; আমাকে ঠেলিয়া জোর করিয়াই যাইতে লাগিল। অবশেষে টিকিট মিলিল।

গাড়ি আসিল। এখানেও যাহারা বলবান তাহারা ঢুকিয়া পড়িল। যাহারা বসিয়া আছে ও যাহারা প্রবেশার্থী, তাহাদের মধ্যে গালিগালাজ ধাক্কাধাক্কি চলিতেছিল। ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়া ঢোকা আমার কর্ম নয়। আমরা তিনজন এদিক সেদিক যাইতে লাগিলাম। সব জায়গা হইতেই একই জবাব আসে—"এখানে জায়গা নাই।" আমি গার্ডের নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন—"জায়গা পাও ত বস, নয়ত পরের ট্রেনে যাইও।"

আমি নম্রভাবে বলিলাম—"কিন্তু আমার জরুরী কাজ আছে।" ইহা শুনিবার সময় গার্ডের হইল না। আমি হার মানিলাম। মগনলালকে যেখানে পারে বসিতে বলিলাম। স্ত্রীকে লইয়া আমি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট থাকা সত্ত্বেও ইণ্টারে গিয়া বসিলাম। গার্ড আমাকে উঠিতে দেখিল।

আসানসোল স্টেশনে গার্ড ভাড়া আদায় করিতে আসিল। আমি বলিলাম —"আমাকে বসিবার জায়গা দেওয়া আপনার কাজ। জায়গা পাই নাই বলিয়াই এখানে বসিয়াছি, আমাকে তৃতীয় শ্রেণীতে জায়গা দিলে আমি সেখানেই বসিতে প্রস্তুত আছি।"

গার্ড সাহেব বলিলেন—"আমার সঙ্গে তর্ক করা চলিবে না। জায়গা আমার কাছে নাই। পয়সা না দেও ত তোমাকে ট্রেন হইতে নামিতে হইবে।"

আমাকে ত যেমন করিয়াই হোক পুণা পঁহুছিতে হইবে। গার্ডের সঙ্গে ইহা লইয়া লড়িবার সাহস হইল না। আমি টাকা দিয়া দিলাম। সে পুণা পর্যন্ত সমস্ত ভাড়াই লইল। আমি ইহা অন্যায় বলিয়া প্রতিবাদ করিলাম।

সকালে মোগলসরাই আসিয়া পঁহুছিলাম। মগনলাল তৃতীয় শ্রেণীতে জায়গা করিয়া লইয়াছিল। মোগলসরাইতে আমি তৃতীয় শ্রেণীতে গেলাম। টিকিট কলেক্টরকে আমি অবস্থাটা বুঝাইলাম ও তাঁহার কাছ হইতে এখন তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়ার সার্টিফিকেট চাহিলাম। তিনি দিতে পারিলেন না। পরে আমি সমস্ত অতিরিক্ত ভাড়া ফেরত চাহিয়া রেল-কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র দিলাম।

"সার্টিফিকেট ছাড়া ভাড়ার টাকা ফেরত দেওয়ার রেওয়াজ নাই। কিন্তু

আপনার বেলায় আমরা দিতেছি। বর্ধমান হইতে মোগলসরাই পর্যন্ত ভাড়া ফেরত হইবে না," এই ধরনের জবাব পাইলাম।

ইহার পর তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণে আমার এমন সকল অভিজ্ঞতা হয় যে, তাহা লিখিতে গেলে একখানা পুঁথি হইয়া পড়ে। সুতরাং কিছু কিছু প্রসঙ্গ এই পুস্তকে উল্লেখ করা ছাড়া বেশি লেখার উপায় নাই। স্বাস্থ্যের জন্য আমার তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ বন্ধ হইয়াছে বলিয়া আমার দুঃখ হইয়াছে। এ দুঃখ থাকিয়াই যাইবে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর দুঃখ কর্মচারীদের জবরদস্তির জন্য ত আছেই কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর ভিতর অনেকের ঔদ্ধত্য, তাহাদের নোংরা অভ্যাস, তাহাদের স্বার্থ-বুদ্ধি ও তাহাদের অজ্ঞতাও কম নয়। দুঃখের বিষয় এই, তাহারা যে উদ্ধত ব্যবহার করিতেছে, অথবা চারধার ময়লা করিতেছে অথবা স্বার্থপরের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে এ কথা তাহারা জানেও না। যাহা করে তাহাই তাহাদের কাছে স্বাভাবিক বোধ হয়। আমাদের শিক্ষিতেরা তাহাদের খোঁজও করেন না।

কল্যাণ জংশনে যখন পৌছিলাম তখন একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। মগনলাল ও আমি স্টেশনের জলের কল হইতে জল লইয়া স্নান করিলাম। পত্নীর জন্য কিছু ব্যবস্থা করিতেছিলাম, সেই সময় "সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি"র শ্রীযুক্ত কোলে আমাকে চিনিতে পারিয়া আমার কাছে আসিলেন। তিনিও পুণা যাইতেছিলেন। স্নান করিবার জন্য তিনি আমার পত্নীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় লইয়া যাইতে বলিলেন। এই সবিনয় অনুরোধ পালন করিতে আমার সংকোচ হইল। আমার পত্নীর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আশ্রয় লওয়ার অধিকার নাই, আমার এই বোধ ছিল। কিন্তু ঐ কামরায় স্ত্রীকে স্নান করিতে দেওয়ার অন্যায়ের দিকে ইচ্ছা করিয়াই চোখ বুজিয়াছিলাম। সত্যের পূজারীর এরূপ করা শোভা পায় না। পত্নীরও কিছু সেখানে যাওয়ার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পতির মোহরূপ সুবর্ণ পর্দাদ্বারা সত্যের মুখ আবৃত করিলাম।

পুণায় পৌঁছিলাম। শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হওয়ার পর সার্ভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির ভবিষ্যৎ পরিচালনা ও আমাকে উহার সদস্য হইতে হইবে কিনা তাহা লইয়া ভাবনার ভিতর পড়িয়া গেলাম। ইহা আমার পক্ষে কঠিন ভার হইয়া পড়িল। গোখলে বাঁচিয়া থাকিতে আমার সোসাইটির সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হওয়ার আবশ্যকতা ছিল না। আমার কর্তব্য ছিল গোখলের আজ্ঞা ও ইচ্ছানুযায়ী চলা। এই অবস্থা আমার ভাল লাগিয়াছিল। ভারতবর্ষের রাজনীতি-সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য আমার পথ-প্রদর্শকের আবশ্যক ছিল। আর গোখলের ন্যায় পথ-প্রদর্শকের কাছে আমি সুরক্ষিত ছিলাম।

এখন আমার মনে হইল যে, আমাকে সোসাইটির সদস্যভুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। গোখলের আত্মাও ইহাই চায়—আমার এইরূপ মনে হইতে লাগিল। আমি নিঃশঙ্ক ভাবে ও দৃঢ়তার সহিত এই প্রযত্ন করিতে লাগিলাম। এই সময় সোসাইটির প্রায় সকল সদস্যই পুণায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইতে ও আমার সম্বন্ধে তাঁহাদিগের যে ভয় ছিল তাহা দূর করিতে সচেষ্ট হইলাম। আমি দেখিলাম যে, সদস্যদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ আমাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, অপর সকলে আমাকে গ্রহণ করার বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত বাধা দিতেছিলেন। উভয় পক্ষের ভিতরেই আমার প্রতি ভালবাসা আছে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু আমার প্রতি ভালবাসা অপেক্ষা সোসাইটির প্রতি দায়িত্ববোধ তাঁহাদের অধিক ছিল, সোসাইটির উপর ভালবাসাও কম ছিল না।

সেই জন্য আমার সম্বন্ধে আলোচনা তিক্ততাশূন্যভাবে ও কেবল মূলনীতি লইয়াই হইত। বিরুদ্ধপক্ষের এই প্রকার মনে হইত যে, অনেক বিষয়ে আমার মত ও তাঁহাদের মতের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। এই হেতু তাঁহাদের খুব বিশ্বাস ছিল যে, গোখলে যে আদর্শ লইয়া এই সোসাইটি রচনা করিয়াছিলেন, আমি সোসাইটির ভিতর প্রবেশ করিলে সে আদর্শের উপরই আঘাত পড়ার পুরাপুরি সম্ভাবনা আছে। ইহা তাঁহাদিগের নিকট অসহ্য হওয়াই স্বাভাবিক।

অনেক আলোচনার পর আমরা ফিরিলাম। সদস্যরা এই বিষয়ের শেষ

সিদ্ধান্ত অন্য সভায় নির্ধারণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তখনকার মত ইহা মুলতবী রাখিলেন।

বাড়ি ফিরিয়া আমি চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। অধিকাংশ লোকের মতের জোরে সভায় প্রবেশ করায় কি লাভ হইবে? ইহাতেই কি গোখলের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করা হইবে? যদি আমার সঙ্গে মতের অনৈক্য হয়, তখন আমিই সোসাইটিকে বিচ্ছিন্ন করার কারণ হইব না ত? আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে, সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে আমাকে লইয়া মতভেদ আছে। এ অবস্থায় আমার নিজেরই সোসাইটিতে প্রবেশ করার আগ্রহ ত্যাগ করা উচিত। তাহাতে বিরুদ্ধমতের সদস্যদের একটা মুশকিল হইতে ত বাঁচানো যাইবেই, সোসাইটির প্রতি ও গোখলের প্রতি আমার অনুরাগও প্রকাশ করা হইবে। মনে মনে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা মাত্রই শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীকে পত্র দিয়া জানাইলাম যে, আমাকে সদস্য-শ্রেণীভুক্ত করার ব্যাপারে সভা আহ্বান যেন আর করা না হয়। যাঁহারা আমাকে গ্রহণের বিরোধী ছিলেম তাঁহাদিগের কাছে এই সংকল্প খুব ভাল লাগিল। তাঁহারা ধর্ম-সংকট হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। আমার সঙ্গে তাঁহাদের স্নেহের বন্ধন আরও দৃঢ় হইল। এমনি করিয়া সোসাইটিতে প্রবেশ করার দরখাস্ত ফিরাইয়া লইয়া সোসাইটির সত্যকার সদস্য হইলাম।

এখন অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, সোসাইটির সদস্য না হইয়া ভালই করিয়াছিলাম। আর যাঁহারা আমার প্রবেশের বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও ঠিকই করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ও আমার সিদ্ধান্তের পার্থক্য পরবর্তী অভিজ্ঞতাই দেখাইয়া দিতেছে। কিন্তু এই পার্থক্য জানিলেও আমাদের আন্তরিক পার্থক্য কখনো হয় নাই। কখনো কটু ভাব দেখা দেয় নাই। মতভেদ সত্ত্বেও আমরা বন্ধু ও মিত্রই রহিয়া গিয়াছি। সোসাইটির গৃহ আমার কাছে তীর্থস্থান হইয়া রহিয়াছে। লৌকিক দৃষ্টিতে আমি সোসাইটির সদস্য না হইলেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমি উহার সদস্য। লৌকিক সম্পর্ক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক অধিক মূল্যবান। আধ্যাত্মিক সম্পর্ক-শূন্য লৌকিক সম্পর্ক প্রাণশূন্য দেহের মত।

৭

কুম্ভ

ডাক্তার প্রাণজীবনদাস মেহতার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে রেঙ্গুন যাইতে হইয়াছিল। রেঙ্গুনের পথে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নিমন্ত্রণে তাঁহার বাড়িতে উঠি। এইখানে বাঙ্গালী পরিবারের অতিথি-সৎকারের চূড়ান্ত পরিচয় পাই। এই সময়ে আমি কেবল ফল খাইয়া থাকিতাম। আমার সঙ্গে আমার ছেলে রামদাস ছিল। কলিকাতায় যত রকম মেওয়া ও ফল পাওয়া যায় সেই সমস্ত খুঁজিয়া আনা হইত। স্ত্রীলোকেরা রাত্রি জাগিয়া পেস্তা ইত্যাদির খোসা ছাড়াইতেন। ফলগুলি যত সুন্দর করিয়া ছাড়াইয়া সাজাইয়া দেওয়া যায় সেইরূপ করিয়া দেওয়া হইত। আমার সঙ্গীদের জন্য নানাপ্রকারে রান্না হইত। এই ভালবাসা ও আতিথেয়তা আমি অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু একজন লোকের জন্য বাড়ির সমস্ত লোক সারাদিন নিযুক্ত থাকিবে, ইহা আমার অসহ্য লাগিত। কিন্তু ইহা হইতে উদ্ধার পাওয়ারও কোন উপায় ছিল না।

রেঙ্গুন যাইতে আমি ডেকের যাত্রী ছিলাম। বসু মহাশয়ের গৃহে যেমন স্নেহের অত্যাচার ছিল, এখানে তেমনি অবহেলার বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয়। ডেকের যাত্রীদের কষ্টের সীমা থাকে না। স্নানের জায়গায় যাওয়া যায় না এমন ময়লা,—পায়খানা ত নরক। মলমূত্রের উপর দিয়া অথবা ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইত। আমার পক্ষে এই অসুবিধা বড় ক্লেশকর হইয়াছিল। স্টীমারের প্রধান কর্মকর্তার কাছে গেলাম, কিন্তু প্রতিকার কে করে? যাত্রীরা নিজেরাই ডেক নোংরা করিয়া রাখিত। যেখানে বসিয়া আছে সেইখানেই থুথু ফেলে, তামাক ও পানের পিক ছড়ায়, উচ্ছিষ্টও সেইখানেই ফেলে। গোলমালের ত সীমাই নাই। যে যতটা পারে জায়গা জুড়িয়া লয়, কেউ কারুর সুবিধার দিকে তাকায় না। নিজেরা যত জায়গা লয়, মাল রাখিয়া তাহার চাইতে বেশি জায়গা বন্ধ করিয়া রাখে। এই দুই দিনে আমার বিষম পরীক্ষা হইয়াছিল।

রেঙ্গুনে পৌছিয়া আমি স্টীমার কোম্পানীর এজেণ্টকে সকল অবস্থা জানাইলাম। ঐ চিঠির ফলে ও ডাক্তার মেহতার তদ্বিরের জোরে ফেরার সময় অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল।

আমার ফলাহারের হাঙ্গামা এখানেও বেশি রকমই হইতে লাগিল। ডাক্তার মেহতার বাড়ি নিজের মনে করিতে পারি, আমার সঙ্গে এমন সম্পর্ক।

খাদ্যোপচারের সম্বন্ধে আমি কথা বলিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু কত রকমের জিনিস খাইব তাহার কোনও একটা বাঁধাবাঁধি না থাকাতে নানা রকম ফল আসিতে লাগিল। রকমফের দেখিয়া চোখের ও জিহ্বার তৃপ্তি হয়। খাওয়ার সময়ও যখন তখন ছিল। আমার নিজের অভ্যাস মত সময় স্থির রাখা যাইত না। রাত্রির খাওয়া ত আটটা নয়টার পূর্বে হইতই না।

এই ১৯১৫ সালে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা ছিল। সেখানে যাওয়ার আমার বড় ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মহাত্মা মুন্শীরামকে দর্শন করিতে ত আমাকে যাইতেই হইবে। কুম্ভের সময় গোখলের সেবা-সমিতি একটা বড় দল পাঠাইতেন। উহার ব্যবস্থা শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর হাতে ছিল। স্বর্গীয় ডাক্তার দেবও সেখানে ছিলেন। এখানে সাহায্য করার জন্য আমার দলকেও লইয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। মগনলাল গান্ধী শান্তিনিকেতন হইতে আমাদের দল লইয়া আমার পূর্বেই গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমি রেঙ্গুন হইতে গিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইলাম।

কলিকাতা হইয়া হরিদ্বার যাইতে খুব অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। রেলের কামরায় কখন কখন রাত্রিতে আলো পর্যন্ত থাকিত না। সাহারাণপুর হইতে ত যাত্রীদের মালগাড়িতেই বোঝাই করিয়া দিল। গাড়ির উপর ছাদ ছিল না, খোলা গাড়িতে উপর হইতে দুপুরে সূর্যের তাপ, আর নিচে কেবল লোহার মেঝে—কষ্টের কথা আর কি বলিব? এরূপ অবস্থাতেও তৃষ্ণা পাইলে যদি মুসলমানী পানিপাঁড়ে আসে তবে হিন্দুরা তাহা পান করিবে না। হিন্দু-জল কখন আসিবে তাহার জন্য চীৎকার করিতে থাকিবে, আসিলে তখন জল-পান করিবে। এই নিষ্ঠাবান হিন্দুরাই ঔষধের ভিতর ডাক্তার মদ দিলে, মুসলমান বা খ্রীষ্টানের ছোঁয়া জল দিলে, মাংসের সুরুয়া দিলে তাহা খাইতে সংকোচ করে না, জিজ্ঞাসা করারও দরকার বোধ করে না।

আমি শান্তিনিকেতনে থাকার সময় অনুভব করিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে কাজ করাটাই আমাদের বিশেষ একটা কর্তব্য হইয়া পড়িবে। সেবকদের জন্য কোনও ধর্মশালায় তাঁবু খাটানো হইয়াছিল। পায়খানার জন্য ডাক্তার দেব গর্ত খনন করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা সাফ করার ব্যবস্থা ত, এই সময়ে যে অল্পবিস্তর বেতনভোগী মেথর মিলিবে তাহাদের দ্বারাই ডাক্তার দেবকে করিতে হইবে? এই গর্তে পতিত মল মাঝে মাঝে সরাইয়া ফেলা ও পায়খানার অন্য রকম সাফাই রাখার কাজ আমি 'ফিনিক্স' দলের জন্য চাহিয়া লইলাম। ডাক্তার

দেব খুশি হইয়াই সম্মত হইলেন। এই সেবাকার্য করার জন্ত অনুমতি চাওয়ার কাজ ছিল আমার, আর সাফ করার বেলায় ছিল মগনলাল গান্ধী।

আমার বেশির ভাগ কাজ ছিল তাঁবুতে বসিয়া 'দর্শন' দেওয়া, আর যে সমস্ত যাত্রী আসিত তাহাদের সহিত ধর্ম ও অন্যান্য বিষয় চর্চা করা। দর্শন দেওয়ার আমার আর শেষ ছিল না। উহা হইতে এক মিনিটও ফাঁক পাওয়া যাইত না। স্নান করিতে গেলেও দর্শনাভিলাষীরা আমাকে একা থাকিতে দিত না। ফলাহার করিতে হয়, তাহাই বা একান্তে করা যায় কিভাবে? তাঁবুতে আমি এক মিনিটও একলা বসিয়া থাকিতে পারি নাই। আমি হরিদ্বারে গিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার দ্বারা যা কিছু সেবা হইয়াছে, সারা ভারতবর্ষের উপর তাহার কি গভীর প্রভাব পড়িয়াছে।

আমি যেন জাঁতাকলে পড়িয়া পিষ্ট হইতে লাগিলাম। যদি পরিচয় কেউ না পায়, তবে তৃতীয়ে শ্রেণীর যাত্রীর যে অসুবিধা তাহাই ভোগ করিতে হয়, আর যদি লোকে পরিচয় পায় তবে দর্শনার্থীর ভালবাসার দ্বারা পীড়িত হই। এই দুই অবস্থার মধ্যে কোনটা বেশি কৃপার যোগ্য, তাহা অনেক সময় বলা শক্ত হইত। দর্শনার্থীর অন্ধ প্রেম আমাকে অনেকবার ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে এবং তার জন্য মনে দুঃখও পাইয়াছি। তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণে কষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু কখনও ক্রোধ হয় নাই এবং উহাতে আমার উন্নতিই হইয়াছে।

এই সময় আমার চলাফেরা করার শক্তি ভালই ছিল বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতাম। তখন এতটা প্রসিদ্ধ হই নাই বলিয়া রাস্তাতেও হাঁটিয়া চলিতে ফিরিতে পারিতাম। আমি ঘুরিয়া দেখিলাম যে, এখানকার যাত্রীদের মধ্যে ধর্মভাব অপেক্ষা অন্যমনস্কতা, চঞ্চলতা, ভণ্ডামি, অপরিচ্ছন্নতা খুবই বেশি। সাধুরা যেন মালপোয়া ও বীরখণ্ডী খাওয়ার জন্যই জন্ম লইয়া সেখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইখানে আমি পাঁচ-পা-পয়ালা একটা গাই দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। অভিজ্ঞেরা আমার অজ্ঞতা শীঘ্রই দূর করিলেন। পাঁচ-পা-ওয়ালা গাই দুষ্ট লোভী লোকের ব্যবসায়ের বলি। এই গাইয়ের কাঁধে জীবন্ত বাছুরের একটা পা কাটিয়া কাঁধের চামড়া তুলিয়া সেখানে উহা বসাইয়া সেলাই করিয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই জঘন্য পাপাচরণ করিয়া লোক ঠকাইয়া পয়সা উপার্জন করা হয়। পাঁচ-পা-ওয়ালা গাভী দেখিতে কোন্ হিন্দুর না ইচ্ছে হয়? উহা দর্শন করার জন্য যতই দান করুক না কেন তাহা হিন্দুর কাছে কখনো বেশি বলিয়া মনে হইবে না।

কুম্ভের দিন আসিল। ঐ দিন আমার কাছে ধন্য। আমি পুণ্যের উদ্দেশ্যে হরিদ্বারে যাই নাই। তীর্থক্ষেত্রে পবিত্রতার সন্ধানে যাওয়ার মোহ আমার কখনো ছিল না। মেলায় সতের লক্ষ লোক আসে বলিয়া শোনা যায়। এবং যে সতের লক্ষ লোক ওখানে গিয়াছিল তাহারা সকলেই কিছু ভণ্ড নয়। ইহার ভিতর অসংখ্য লোক যে পুণ্য অর্জনের জন্য, শুদ্ধি পাওয়ার জন্য আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রকারের শ্রদ্ধা আত্মাকে কতটা উন্নত করিতে পারে, সে কথা বলা অসম্ভব না হইলেও বলা কঠিন।

বিছানায় পড়িয়া আমি আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিলাম। চতুর্দিকের এই ভণ্ডামির ভিতর ঐ সকল পবিত্র আত্মাও তো রহিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরের কাছে নিষ্পাপ। যদি হরিদ্বারে আসাই পাপ হয় তবে কুম্ভের দিনে প্রকাশ্য ভাবেই আমার হরিদ্বার ত্যাগ করা উচিত। আর যদি কুম্ভে আসা ও দিনযাপন করা পাপজনক না হয়, তবে আমার কোনও না কোনও কঠিন ব্রত লইয়া প্রবহমাণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত—আত্মশুদ্ধি করা উচিত। আমার জীবন ব্রতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমি এখন কোনও কঠিন ব্রত লওয়া স্থির করিলাম। কলিকাতায় ও রেঙ্গুনে আমার জন্য অতিথি-সেবকদের অনাবশ্যক পরিশ্রমের কথা আমার স্মরণ আছে। সেইজন্য খাদ্যের একটা সীমা স্থির করার ও সূর্যাস্তের পূর্বে আহার করার একটা ব্রত লওয়া স্থির করিলাম। আমি দেখিলাম, যদি এইরূপ একটা সীমা না ঠিক করি, তবে অতিথি-সেবকদের অসুবিধা হইবে এবং সেবা করার পরিবর্তে প্রত্যেক জায়গাতেই আমিই লোককে সেবায় আটকাইয়া রাখিব। সেই জন্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচটার বেশি দ্রব্য না খাওয়ার এবং রাত্রে আহার বর্জন করার ব্রত লইলাম। উভয় বিষয়েরই কঠিনতা সম্যক বিচার করিয়াই এই ব্রত লইলাম। আমি কোনও ফাঁক রাখিতে প্রস্তুত ছিলাম না। অসুখের সময় ঔষধ বলিয়া যাহা দেওয়া হয় তাহা বস্তু বলিয়া গণ্য করিব কিনা এই সমস্ত বিচার করিয়া লইলাম এবং নিশ্চয় করিলাম যে, খাওয়ার কোনও পদার্থই পাঁচের বেশি না হয়। আজ তের বৎসর এই দুইটি ব্রত পালন করিতেছি। উহারা আমাকে ঠিক পরীক্ষা করিয়া লইয়াছে। যেমন পরীক্ষা করিয়াছে তেমনি আবার উহারা আমাকে বর্মের মত রক্ষাও করিয়াছে। এই ব্রত আমার জীবন দীর্ঘ করিয়াছে এইরূপ আমার বিশ্বাস। আর ঐ ব্রতের জন্য আমি অনেকবার ব্যাধি হইতেও মুক্তি পাইয়াছি বলিয়াও আমার মনে হয়।

৮

লছমন ঝোলা

পর্বতপ্রমাণ বিশাল-দেহী মহাত্মা মুন্সীরামজীকে ও তাঁহার গুরুকুল দর্শন করিয়া শান্তি পাইলাম। হরিদ্বারের কোলাহল ও গুরুকুলের শান্তির মধ্যে ভেদ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইল। মহাত্মা আমাকে অপার ভালবাসায় আবৃত করিলেন। ব্রহ্মচারীদের এমন হইল যে, তাঁহারা ভালবাসাবশতঃ আমার পাশ হইতে আর নড়িতে চাহেন না। রামদেবজীর সঙ্গে এই সময় আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি শীঘ্রই তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইলাম। আমাদের মধ্যে কতকগুলি মতের পার্থক্য আছে দেখিতে পাইলাম। তাহা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গাঢ় হইল। গুরুকুলে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে ও অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে অনেক আলোচনা হইল। গুরুকুল শীঘ্র ত্যাগ করিয়া আসিতে আমার দুঃখ হইল।

লছমন ঝোলার প্রশংসা আমি খুব শুনিয়াছিলাম। হৃষীকেশ না গিয়া হরিদ্বার ত্যাগ করিতে নাই বলিয়া অনেকে উপদেশ দিলেন। আমার সেখানে হাঁটিয়াই যাইতে ইচ্ছা, এইজন্য প্রথমে হৃষীকেশ ও পরে লছমন ঝোলা এইভাবে দুইবারে এই পথ আমি হাঁটার ব্যবস্থা করিলাম।

হৃষীকেশে অনেক সন্ন্যাসী দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 'ফিনিক্স'-মণ্ডল আমার সঙ্গে ছিল। তাহাদের সকলকে দেখিয়া তিনি অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমাদের মধ্যে ধর্ম-চর্চা হইল। ধর্মের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ রহিয়াছে ইহা তিনি দেখিতে পাইলেন। আমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছিলাম, শরীর অনাবৃত ছিল। আমার মাথায় শিখা ও স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত না দেখিয়া তাঁহার দুঃখ হইল। তিনি বলিলেন—"আপনি আস্তিক হইয়াও শিখা ও যজ্ঞোপবীত রাখেন না। এজন্য আমার দুঃখ হইতেছে। উহা হিন্দুধর্মের বাহ্য চিহ্ন এবং প্রত্যেক হিন্দুরই উহা ধারণ করা উচিত।"

দশ বৎসর বয়সের বালক যখন ছিলাম, তখন ব্রাহ্মণ বালকদের যজ্ঞোপবীতে বাঁধা চাবির শব্দে আমার মন চঞ্চল হইত। ভাবিতাম, যজ্ঞোপবীতে রুণঠুন শব্দকারী চাবির গোছা ঝুলাইতে পারিলে না জানি কেমন মজা হইত! কাথিয়া-ওয়াড়ের বৈশ্য পরিবারে উপবীত ধারণ করার প্রথা তখন ছিল না। কিন্তু প্রথম

তিন বর্ণের লোকের উপবীত ধারণ করা চাই—এইরূপ নতুন একটা মত প্রচার হইতেছিল। সেই মতে গান্ধী পরিবারের কয়েকজন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ আমার দুই-তিন বন্ধুকে রামরক্ষা পাঠ শিক্ষা দিতেন, তিনি আমাকে উপবীত দেওয়াইলেন। আমার চাবি রাখার কোনও আবশ্যক না থাকিলেও আমি দুই-তিনটা চাবি লটকাইলাম। উপবীত ছিঁড়িয়া যাইতেই তাহার মোহও ছিন্ন হইল কিনা মনে নাই, তবে নতুন উপবীত আর ধারণ করি নাই। বয়স বাড়িলে ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে অপরে আমাকে উপবীত ধারণ করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার উপর তাঁহাদের যুক্তির প্রভাব হয় নাই। শূদ্র যদি উপবীত ধারণ করিতে না পারে, তবে অপর তিন বর্ণ কেন ধারণ করিবে? যে বাহ্য বস্তু ধারণ করা আমার পরিবারের রীতি ছিল না, তাহা গ্রহণ করার উপযোগী কোনও সঙ্গত কারণ পাইলাম না। আমি উপবীতের অভাব বোধ করিতাম না, উহা ধারণ করার যুক্তির অভাব বোধ করিতাম। বৈষ্ণব বলিয়া আমি কণ্ঠি পরিতাম। শিখা বড় ভাইয়েরা রাখিতেন। বিলাত গিয়া খোলা মাথায় শিখা দেখিয়া যদি শ্বেতাঙ্গরা কখনো হাসে—এই লজ্জায় শিখা কাটিয়া ফেলিয়াছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ছগনলাল আমাদের সঙ্গে থাকিত। সে বড় শ্রদ্ধার সহিত শিখা রাখিত। শিখা থাকিলে তাহার সাধারণ সেবার কাজের অসুবিধা হইবে—এই ভাবিয়া তাহার মনে দুঃখ দিয়াও তাহার শিখা কাটাইয়া ফেলিয়াছি। শিখায় আমার এইরূপ লজ্জা ছিল।

স্বামীজীকে আমি উপরের অবস্থা শুনাইলাম এবং বলিলাম—উপবীত আমি ধারণ করিব না। অসংখ্য হিন্দু যে উপবীত না পরিলেও হিন্দু বলিয়া গণ্য হয়, তাহা পরার আবশ্যকতা আমি দেখি না। উপবীত ধারণ করা মানে দ্বিতীয় জন্ম লওয়া, নিজেকে ইচ্ছাপূর্বক শুদ্ধ রাখা, ঊর্ধ্বগামী হওয়া। এখন হিন্দুস্থানী ও হিন্দুস্থান উভয়েই পতিত, এমন অবস্থায় উপবীত গ্রহণের মত অধিকার আছে কি? ভারত যদি অস্পৃশ্যতার ময়লা ধুইয়া ফেলে, উচ্চনীচের কথা ভুলিয়া যায়, গৃহের অন্য দোষ দূর করে, চতুর্দিকে যে অধর্ম ও ভণ্ডামি বিস্তৃত রহিয়াছে তাহা দূর করে, তবেই তাহার উপবীতে অধিকার আসে। এই উপবীত গ্রহণের কথা আমি এখন মানিয়া লইতে পারি না। কিন্তু শিখা সম্বন্ধে আপনার কথা অবশ্য বিচার করিব। আমি ত শিখা রাখিতাম। আমি লজ্জা ও স্বার্থের ভয়ে উহা কাটিয়া ফেলিয়াছি। উহা ধারণ করা দরকার একথা এখন আমার মনে হয়। সুতরাং

আমার সাথীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিব।"

উপবীত সম্বন্ধে আমার যুক্তি স্বামীজীর পছন্দ হইল না। আমি যে সকল কারণে উহা না পরাই উচিত মনে করি, তিনি সেই সকল কারণেই উহা গ্রহণ করা উচিত মনে করেন। উপবীত সম্বন্ধে হৃষীকেশে যে ধারণা মনে আসিয়াছিল আজও তাহাই বজায় আছে। যতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্ম আছে, ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেক ধর্মেরই বাহ্যিক চিহ্নের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু যখন সেই চিহ্ন আড়ম্বরের হেতু হয় কিংবা নিজের ধর্ম অপরের ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করার হেতু হয়, তখন তাহা ত্যজ্য হইয়া পড়ে। এইজন্য উপবীত ধারণ হিন্দু ধর্মকে উন্নত করিবার কোনও সাধনা নহে। আর সেই জন্যই এ বিষয়ে আমি নির্বিকার আছি। আমি লজ্জা-বশে শিখা ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেইজন্য সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া শিখা রাখার সংকল্প করিলাম। এখন আমাদিগকে লছমন ঝোলা যাইতে হইবে।

হৃষীকেশ ও লছমন ঝোলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বড়ই মনোরম। এখানে আসিয়া আমাদের পূর্বপুরুষদের গভীর সৌন্দর্য বোধ সম্পর্কে, তাঁহাদের কলাশিল্প বিষয়ে, ধর্মীয় দৃষ্টি এবং তাঁহাদের দূরদর্শিতা সম্পর্কে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল।

মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া কোথাও চিত্তে শান্তি আসে না। যেমন হরিদ্বারে তেমনি হৃষীকেশে লোকে গঙ্গার সুন্দর তীর নোংরা করিয়া রাখে। গঙ্গার পবিত্র জল কলুষিত করিতে তাহাদের সংকোচ হয় না। পায়খানা যাওয়ার আবশ্যক হইলে দূরে না গিয়া, যেখানে মানুষের যাতায়াত সেইখানেই যায়। ইহা দেখিয়া হৃদয়ে বড় আঘাত লাগে।

লছমন ঝোলা যাওয়ার পথে লোহার পুল দেখিলাম। লোকের কাছে শুনিলাম যে, এই পুল পূর্বে খুব মজবুত দড়ির তৈরি ছিল। কোন উদারচিত্ত মারোয়াড়ী গৃহস্থ উহার পরিবর্তে বহু অর্থব্যয়ে লোহার পুল তৈরি করিয়া উহার চাবি সরকারের হাতে দিয়াছেন। দড়ির পুল কেমন ছিল, সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নাই। কিন্তু লোহার পুল স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কলুষিত করিয়াছে। ইহা অনেকের চোখেই লাগিত। যাত্রীদের এই রাস্তার চাবি সরকারের হাতে সমর্পণ করাটা আমার তখনকার দিনের রাজভক্তিতেও অসহ্য বোধ হইয়াছিল।

এখানে স্বর্গাশ্রমের দৃশ্য সর্বাপেক্ষা দুঃখদায়ক। করোগেট টিনের কতক-গুলি কদর্য কুটরির নাম স্বর্গাশ্রম দেওয়া হইয়াছে। সাধকদের জন্য উহা নির্মাণ

করা হইয়াছে বলিয়া শুনিলাম। সেখানে কদাচিৎ কোনও সাধক এ সময়ে থাকে। এখানকার প্রধান গৃহে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে আমার মনে ভাল ধারণা জন্মাইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, হরিদ্বারের অভিজ্ঞতা আমার নিকট অমূল্য। আমি কি করিব, কোথায় বসিব—এ বিষয়ে হরিদ্বারের অভিজ্ঞতা আমাকে খুব সাহায্য করিয়াছিল।

৯

আশ্রম-স্থাপনা

কুম্ভমেলায় যাওয়াতে আমার দ্বিতীয়বার হরিদ্বার দর্শন হইয়াছিল। সত্যাগ্রহাশ্রম ১৯১৫ সালের ২৫শে মে স্থাপিত হয়। শ্রদ্ধানন্দজীর অভিপ্রায় ছিল যে, আমি হরিদ্বারে বসি। কলিকাতার কয়েকজন বন্ধু আমাকে বৈদ্যনাথধামে বসিতে বলিয়াছিলেন। আবার কয়েকজন বন্ধুর আমাকে রাজকোটে বসাইবার খুব আগ্রহ ছিল।

যখন আমি আমেদাবাদের ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম, তখন অনেক বন্ধু আমেদাবাদকেই পছন্দ করিতে বলিলেন। আশ্রমের খরচ তাঁহারাই সংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিলেন। বাড়ি খোঁজ করিয়া দেওয়ার ভারও তাঁহারাই লইতে চাহিলেন। আমেদাবাদের জন্য আমার আকর্ষণ ছিল। গুজরাটী বলিয়া গুজরাটী ভাষার সাহায্যেই আমি সর্বাপেক্ষা বেশি সেবা দিতে পারিব—এইরূপ মনে করিতাম। আমেদাবাদ এককালে হাতের তাঁতে বোনা কাপড়ের কেন্দ্র ছিল। এখানেই হাতে সূতা কাটা—এই কুটিরশিল্প পুনরুদ্ধারের কাজ সবচাইতে ভাল চলিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয়। গুজরাটের প্রধান শহর বলিয়া এইখানেই ধনাঢ্য লোক অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পারিবেন—এ আশাও ছিল।

আমেদাবাদের বন্ধুদের সঙ্গে স্বভাবতঃই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্পর্কে আলোচন হইত। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলিতাম যে, কোনও অন্ত্যজ ভাই আশ্রমে প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহাকে অবশ্যই আশ্রমভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে।

"আপনার শর্ত পালন করিতে পারে এমন অন্ত্যজই বা কোথায় পড়িয়া আছে?"—এই বলিয়া এক বৈষ্ণব মিত্র নিজের মনের আনন্দ জানাইলেন। অবশেষে আমি আমেদাবাদে বসাই স্থির করিলাম।

বাড়ি খুঁজিতে আমাকে আমেদাবাদবাসীদের মধ্যে শ্রীজীবনলালজী ব্যারিস্টারই বেশি সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারই কোচরবের বাড়ি ভাড়া লওয়া স্থির করিলাম।

আশ্রমের কি নাম রাখা হইবে এ প্রশ্ন শীঘ্রই উঠিল। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করিলাম। কতকগুলি নাম পাওয়া গেল। সেবাশ্রম, তপোবন, ইত্যাদির প্রস্তাব আসিল। সেবাশ্রম নামটি ভাল ছিল। কিন্তু তাহাতে সেবার রীতির পরিচয় দেওয়া হয় না। তপোবন নাম পছন্দ হইল না। কেন না এই নাম প্রিয় হইলেও উহা আমাদের পক্ষে গুরুতর বলিয়া মনে হইল। আমাদের ত সত্যের পূজা, সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহারই আগ্রহ রাখিতে হইবে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি যে পদ্ধতির ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার পরিচয় ভারতবর্ষকে দিতে হইবে ও তাহার শক্তি যে কত ব্যাপক হইতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। সেইজন্য আমি ও সঙ্গীরা 'সত্যাগ্রহ' নামই পছন্দ করিলাম। উহাতে সেবার ভাব ও সেবার পদ্ধতির ভাব সহজেই ব্যক্ত হয়।

আশ্রম চালাইবার জন্য নিয়মাবলী আবশ্যক। সেই জন্য নিয়মাবলী তৈরি করিয়া সে সম্বন্ধে বন্ধুদের মতামত জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেক অভিমতের মধ্যে স্যার গুরুদাস ব্যানার্জীর প্রেরিত অভিমত আমার স্মরণ আছে। তাঁহার এই নিয়মাবলী পছন্দ হইয়াছিল। তিনি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে ব্রতের ভিতর 'নম্রতা' একটা ব্রত থাকা চাই। তাঁহার পত্রের ভিতর এই ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, আমাদের যুবকদের মধ্যে নম্রতার অভাব আছে। যদিও নম্রতার অভাব আমি ভালরকমই অনুভব করিতেছিলাম, তথাপি নম্রতাকে ব্রতের মধ্যে স্থান দিলে, নম্রতারই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নম্রতার সম্পূর্ণ অর্থ ত আত্মাভিমানশূন্যতা। এই অভিমান-শূন্যতায় পৌঁছানোর জন্যই অন্য সকল ব্রত। অভিমানশূন্যতা মোক্ষ প্রাপ্তিরই অবস্থা। মুমুক্ষুর বা সেবকের প্রত্যেক কার্যে যদি নম্রতা বা নিরভিমান না থাকে, তবে সে মুমুক্ষু নয়, সেবকও নয়—সে স্বার্থপর, সে অহঙ্কারী।

আশ্রমে এই সময় প্রায় ১৩ জন তামল ছিলেন। আমার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে পাঁচজন তামিল বালক আসিয়াছিল। আর বাকি কয়জন ছিলেন স্থানীয় লোক। ২৫ জন স্ত্রী-পুরুষ লইয়া আশ্রম আরম্ভ হইল। সকলে এক পাকশালায় খাইত এবং একই পরিবারের মত চলার চেষ্টা করিত।

১০

কষ্টিপাথরে পরীক্ষা

আশ্রম-স্থাপনার কয়েক মাস পরেই এমন এক পরীক্ষা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল যা কখনও আশা করি নাই। ভাই অমৃতলাল ঠক্কর চিঠি দিলেন—"এক গরীব অথচ সৎ অন্ত্যজ পরিবার আছে। আপনার আশ্রমে আসিয়া থাকার তাহাদের ইচ্ছা হইয়াছে। সেই পরিবারকে কি গ্রহণ করিবেন?"

আমি বিচলিত হইলাম। ঠক্কর বাপার মত লোকের কাছ হইতে পরিচয়-পত্র হইয়া অন্ত্যজ পরিবার এখানে থাকিতে আসিবে, তাহা আমি আশা করি নাই। সঙ্গীদের পত্র পড়িয়া শুনাইলাম। তাঁহারা খুশি হইয়া সম্মতি জানাইলেন। ভাই অমৃতলাল ঠক্করকে জানাইলাম যে, সে পরিবার যদি আশ্রমের নিয়ম মানিয়া চলিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাহাদিগকে লওয়া যাইতে পারে।

দুদাভাই, তাঁহার পত্নী দানীবহিন এবং একরত্তি মেয়ে লক্ষ্মী—এই পরিবারটি আশ্রমে আসিলেন। দুদাভাই বোম্বাইয়ে শিক্ষকের কাজ করিতেন। তাঁহারা নিয়ম পালন করিতে প্রস্তুত হওয়ায় আশ্রমে লওয়া গেল।

যেসব বন্ধু সাহায্য করিতেছিলেন, এবার তাঁহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। যে কূপ হইতে বাংলোর মালিক জল লইতেন সে কূপ হইতে জল লওয়ার অসুবিধা হইল। যে ব্যক্তি জল উঠানোর জন্য মালিকের তরফ হইতে নিযুক্ত ছিল, সে তাহার বৃহৎ জলপাত্রে (কোষে) আমাদের জলের ছিটা পড়িবে বলিয়া আপত্তি তুলিল। তারপর আমাদিগকে গালি দিতে আরম্ভ করিল, দুদাভাইকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। আমি সকলকে বলিয়া দিলাম যে, গালি সহ্য করিবে ও দৃঢ়তার সহিত জলও তুলিবে। আমরা গালি সহ্য করিতেছি দেখিয়া জলের কোষ-ওয়ালা লজ্জা পাইল এবং বিরক্ত করা বন্ধ করিল। টাকা-পয়সার সাহায্য আসাও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যে ভাই, অন্ত্যজেরা আশ্রমের নিয়ম পালন করিবে না বলিয়া প্রথমেই সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাঁহার আশা ছিল না যে, সত্যই আশ্রমে কোনও অন্ত্যজ প্রবেশ করিবে। টাকার সাহায্য বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে 'বয়কট' করার কথাও শোনা যাইতে লাগিল। আমি সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিলাম—"যদি আমাদের সমাজ হইতে বহিষ্কার করা হয়, আর আমাদের

কাছে কোনও সাহায্য না আসে তাহা হইলেও আমরা আমেদাবাদ ত্যাগ করিব না। অন্ত্যজদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের সঙ্গেই থাকিব। আর যা-কিছু পাওয়া যায় তাহার উপর নির্ভর করিব, অথবা মজুরি করিয়া দিন চালাইব।"

অবশেষে একদিন মগনলাল আমাকে নোটিস দিলেন—"আগামী মাসের আশ্রম চালাইবার খরচ আমাদের কাছে নাই।" আমি ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দিলাম—"তবে আমাদিগকে অন্ত্যজ পাড়ায় উঠিয়া যাইতে হইবে।" এইরূপ পরীক্ষা আমার এই প্রথম নয়। প্রত্যেকবারেই শেষ অবস্থায় ঈশ্বর সাহায্য পাঠাইয়াছেন।

মগনলালের নোটিস দেওয়ার দুই-একদিন পরেই এক সকালে একটি ছেলে সংবাদ দিল, "বাহিরে মোটর দাঁড়াইয়া আছে এবং এক শেঠ আপনাকে ডাকিতেছেন।" আমি মোটরের কাছে গেলাম। শেঠ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আশ্রমে কিছু সাহায্য করার ইচ্ছা করি, আপনি কি লইবেন?" আমি জবাব দিলাম—"যদি কিছু দেন, তবে আমি অবশ্যই লইব। আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এখন আমি কঠিন পরীক্ষায় পড়িয়াছি।"

"আমি কাল এই সময় আশ্রমে আসিব, আপনি কি তখন আশ্রমে থাকিবেন?" আমি 'হাঁ' বলিলে শেঠ চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিন নির্দিষ্ট সময় মোটরের আওয়াজ শোনা গেল। বালকেরা খবর দিল। শেঠ ভিতরে আসিলেন না; আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমার হাতে ১৩০০০৲ টাকার নোট দিয়া চলিয়া গেলেন।

এই সাহায্যের আশা আমি কখনো করি নাই। সাহায্য দেওয়ার এই রীতি নতুন লাগিল। তিনি আশ্রমে পূর্বে কখনো পা দেন নাই। আমি তাঁহার সঙ্গে একবার মাত্র মিশিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। আশ্রমে আসা নাই, জিজ্ঞাসা করা নাই, সোজা টাকা দিয়া চলিয়া গেলেন। এরকম অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। এই সাহায্য পাওয়ার ফলে আমাদের অন্ত্যজ পাড়ায় যাওয়া বন্ধ হইল। প্রায় এক বৎসরের খরচ পাওয়া গিয়াছিল।

বাহিরে যেমন গোলমাল হইয়াছিল, আশ্রমের ভিতরেও তেমনি চাঞ্চল্য ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমার কাছে অন্ত্যজ আসিত, থাকিত, খাইত। কিন্তু এখানে অন্ত্যজ যে একেবারে পরিবারের ভিতর প্রবেশ করিল। ব্যাপারটি আমার স্ত্রীর ও অপর স্ত্রীলোকদের যে ভাল লাগিয়াছিল, একথা বলা যায় না।

দানীবহিনের প্রতি অপ্রীতি না হোক উদাসীনতা আমি চোখে ও কানে দেখিতে ও শুনিতে লাগিলাম। আর্থিক সাহায্যের অভাবের জন্ত আমি মোটেই চিন্তায় পড়ি নাই, কিন্তু এই ভিতরের গোলমাল আমাকে বড়ই আঘাত করিল। দানীবহিন সাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন। দুদাভাই অল্প শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তাঁহার ধৈর্য আমার ভাল লাগিত। তাঁহার কখনও কখনও ক্রোধ হইত; তাহা হইলেও তাঁহার সহ্যশক্তি আমার মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। অল্পস্বল্প অপমান সহ্য করিয়া যাইতে আমি দুদাভাইকে মিনতি করিতাম। তাহা নিজে তিনি বুঝিতেন ও দানীবহিনকে দিয়া সহ্য করাইতেন।

এই পরিবারকে আশ্রয় দিয়া আশ্রমের বেশ শিক্ষা হইয়াছিল। আশ্রমে যে অস্পৃশ্যতার স্থান নাই তাহা আরম্ভকালেই স্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় আশ্রমের কর্মসীমা নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই দিক দিয়া আশ্রমের কাজও খুব সহজ হইয়া গিয়াছিল।

অস্পৃশ্য পরিবার লইলেও আশ্রমের দিন-দিন যে খরচ বৃদ্ধি পাইতেছিল, সে খরচার প্রধান অংশই নিষ্ঠাবান হিন্দুদের কাছ হইতে পাওয়ায় ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, অস্পৃশ্যতার মূল আলগা হইয়া গিয়াছে। উহার আরো অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু যেখানে অন্ত্যজের হাতে খাওয়া পর্যন্ত চলিতেছে, সেখানে যাঁহারা সনাতনী হিন্দু বলিয়া গণ্য তাঁহারাও সাহায্য করিতেছেন, ইহা তুচ্ছ প্রমাণ নয়!

এই প্রশ্নসংক্রান্ত অন্য অসুবিধা, এই প্রশ্ন হইতে উদ্ভূত অন্য সূক্ষ্ম প্রশ্ন ও নানা অপ্রত্যাশিত বাধাপ্রাপ্তি ইত্যাদি সত্যের অনুসন্ধানের ও প্রয়োগের ব্যাপার এখানে লেখার ইচ্ছা থাকিলেও দেওয়া যাইতেছে না বলিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। পরবর্তী অধ্যায় সম্পর্কেও এই অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে। আমাকে অগত্যা অনেক প্রয়োজনীয় ঘটনার বর্ণনা বাদ দিতে হইবে, কেন না তাহার সঙ্গে যাঁহারা জড়িত তাঁহারা জীবিত আছেন। তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত তাঁহাদের নামের সহিত যুক্ত প্রসঙ্গের উল্লেখ করা উচিত মনে হয় না। সেই সকল ব্যক্তির সম্মতি যখন তখন চাহিয়া লওয়া অথবা তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিবার পূর্বে তাঁহাদিগকে দেখাইয়া লওয়া সম্ভব নয় এবং ঐ প্রকার করাও এই আত্মকথার সীমার বহির্ভূত। সেইজন্য অতঃপর যে সকল সত্যের অনুসন্ধান এবং প্রয়োগ জানাইবার যোগ্য বলিয়া মনে হইবে তাহা অসম্পূর্ণ

হইলেও, এবং এই অসম্পূর্ণতা রাখিয়াই, উল্লেখ করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। তবুও যদি ঈশ্বর করেন, তবে অসহযোগের যুগ পর্যন্ত পৌঁছিব এই প্রকার আমার ইচ্ছা ও আশা আছে।

১১
এগ্রিমেণ্ট প্রথা

নতুন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ঝড়ের মধ্যে দিয়া যে আশ্রম উত্তীর্ণ হইতেছিল তাহার কথা এখন স্থগিত রাখিয়া, এগ্রিমেণ্ট প্রথার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। যে সকল ভারতীয় মজুর পাঁচ বৎসর, বা কখনও তাহার চাইতে কম সময়ের জন্য কাজ করিবার চুক্তিপত্রে (এগ্রিমেণ্ট) সহি করিয়া এ দেশ হইতে বিদেশে যায়, তাহাদিগকে 'এগ্রিমেণ্টী' বলা হয়।

১৯১৪ সালেই নাতালের এগ্রিমেণ্টীদের উপর হইতে বার্ষিক তিন পাউণ্ড কর রদ করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ এগ্রিমেণ্ট প্রথা তখন পর্যন্তও বন্ধ হয় নাই। ১৯১৬ সালে ভারতভূষণ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রশ্ন তোলেন। তদুত্তরে লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহার বক্তব্য স্বীকার করিয়া লইয়া বলেন যে, এই প্রথা "সময় হইলে" তুলিয়া দেওয়ার আশ্বাস তিনি মহামান্য সম্রাটের কাছ হইতে পাইয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হইল, এই প্রথা এখনই বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করা দরকার। বস্তুতঃ কেবল ভারতবর্ষের অসাবধানতা বশতঃই এই প্রথা এতদিন চলিয়া আসিতেছে। এখন এই প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়ার মত জাগরণ ভারতবাসীর মধ্যে আসিয়াছে। ইহাই আমার ধারণা ছিল। কয়েকজন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। সংবাদপত্রেও এ বিষয় লিখিলাম এবং আমি দেখিলাম যে, এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার পক্ষে জনমত রহিয়াছে। ইহাতে কি সত্যাগ্রহের প্রয়োগ হইতে পারে? এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না যে, সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু কেমন করিয়া উহা প্রয়োগ করা যায় তাহা আমি জানিতাম না।

ইতোমধ্যে ভাইসরয় (বড়লাট) "সময় হইলে" শব্দের অর্থটি পরিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহার এই অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, "অন্য ব্যবস্থা করিতে যত সময় লাগে তত সময়ের পর" এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

অতঃপর ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, এগ্রিমেণ্ট প্রথা এখনই উঠাইয়া দেওয়ার জন্য এক আইন করার প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করার জন্য ভাইসরয়ের অনুমতি চাহেন। তিনি উহা নামঞ্জুর করিলেন। ইহার পরই এই প্রশ্নটি লইয়া আমি ভারতবর্ষে সফর আরম্ভ করিলাম।

আন্দোলন আরম্ভ করার পূর্বে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া লওয়া উচিত মনে করিলাম। জিজ্ঞাসা মাত্রই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করার তারিখ জানাইয়া দিলেন। সেই সময় মিঃ মফী, এখন স্যার জন মফী, তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন। মিঃ মফীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে আমার সন্তোষজনক কথাবার্তা হয়। তিনি নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। কিন্তু চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমাকে আশা দিলেন।

বোম্বাই হইতেই সফর শুরু করিলাম। বোম্বাইয়ে সভা করার ভার মিঃ জাহাঙ্গীর পেটিট লইলেন। 'ইম্পিরিয়াল সিটিজেনসিপ এসোসিয়েসন'-এর নামে সভা হইল। ঐ এসোসিয়েসনের কমিটি সভার খসড়া প্রস্তাব রচনা করিলেন। ঐ কমিটির সভায় ডাক্তার রীড স্যার লালুভাই সমলদাস, মিঃ নটরাজন ইত্যাদি ছিলেন। মিঃ পেটিট ত ছিলেনই। প্রস্তাবে 'এগ্রিমেণ্ট' রদ করার জন্য আবেদন ছিল। কেন বন্ধ করা দরকার তাহাও বলা হইয়াছিল। কমিটির সম্মুখে ঐ প্রথা রদ করার সময় সম্বন্ধে তিনটি প্রস্তাব ছিল;— (১) 'যত শীঘ্র হয় তত শীঘ্র' (২) '৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে', (৩) 'শীঘ্র'। আমার প্রস্তাব ছিল "৩১শে জুলাই।" আমার নিশ্চিত একটা তারিখেরই দরকার ছিল। কেন না সেই সময়ের মধ্যে যদি কিছু না হয়, তবে কি করিব অথবা কি করিতে পারি, তাহা তখন বিচার করা যাইবে। স্যার লালুভাইয়ের প্রস্তাব ছিল 'শীঘ্র' ব্যবহার করা। তিনি বলিলেন যে, ৩১শে জুলাই অপেক্ষা 'শীঘ্র' ত অনেক পূর্বেই বুঝায়। আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, জনসাধারণ শীঘ্র' শব্দ বুঝিতে পারিবে না। জনসাধারণের কাছ হইতে যদি কোনও কাজ আদায় করিতে হয়, তবে তাহাদের সম্মুখে নিশ্চয়াত্মক শব্দ থাকা চাই। 'শীঘ্র' শব্দের অর্থ ত প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছানুরূপ করিয়া লইবে। সরকার এক রকম অর্থ করিবেন, জনসাধারণ আর এক প্রকার করিবে। "৩১শে জুলাইয়ের" অর্থ সকলেই একই প্রকার বুঝিবে

ও সেই তারিখে যদি 'এগ্রিমেণ্ট' না উঠিয়া যায়, তবে নিজেরা কি উপায় গ্রহণ করিবে তাহা বুঝিতে পারিবে। ডাঃ রীড এই যুক্তি তখনই বুঝিলেন। অবশেষে স্যার লালুভাইও '৩১শে জুলাই' তারিখ স্বীকার করায়, সেই তারিখই স্থির রহিল। সাধারণ সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইল ও পরে অন্য সকল সভাতেও তাহাই গৃহীত হইল।

শ্রীমতী জায়জী পেটিটের বিপুল অধ্যবসায়ের ফলে ভাইসরয়ের কাছে এক 'প্রতিনিধিদল' গেল। তাহাতে লেডী তাতা, ৺দিলশাদ বেগম ইত্যাদি ছিলেন। ভগ্নীদের সকলের নাম মনে নাই। এই প্রতিনিধিদল যাওয়ার প্রভাব খুব ভাল হইয়াছিল। কেন না 'ভাইসরয়' খুব আশাপ্রদ উত্তর দিয়াছিলেন।

কলিকাতা, করাচী প্রভৃতি স্থানে আমি গিয়াছিলাম। সকল স্থানেই ভাল সভা হইয়াছিল। সকল স্থানের লোকই খুব উৎসাহ দেখাইতেছিল। যখন আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন এত সভা হইবে এবং এত সংখ্যক লোক তাহাতে যোগ দিবে, সে আশা করি নাই।

এই সময় আমি একাই ভ্রমণ করিতাম ও তাহাতে আশ্চর্য অভিজ্ঞতাও হইত। ডিটেকটিভ ত পিছনে লাগিয়াই ছিল। ইহাদের সঙ্গে আমার বিরোধ করার কারণ ছিল না। আমার কিছু লুকাইবার নাই, এইজন্য তাহারা আমাকে অসুবিধায় ফেলে নাই। আমিও তাহাদিগকে কষ্ট দিই নাই। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে আমার 'মহাত্মা' উপাধি প্রাপ্তি ঘটে নাই, যদিও যেখানেই লোকে আমাকে চিনিত সেইখানেই ঐ নামে চীৎকার করিয়া ধ্বনি দিত। এবার রেলে যাইতে কয়েকটি স্টেশনে ডিটেকটিভ আমার টিকিট দেখিতে আসে ও নম্বর টুকিয়া লয়। তাহারা অনেক প্রশ্নও করিতেছিল এবং আমি তৎক্ষণাৎ তাহার জবাবও দিতেছিলাম। আশেপাশের যাত্রীরা ভাবিল, আমি কোনও সাধু অথবা ফকির। দুই-চার স্টেশনে ডিটেকটিভ আসিতেই যাত্রীরা তাহার উপর রাগিয়া উঠিল এবং গালি ও ধমক দিতে লাগিল।

"এই বেচারা সাধুকে মিছামিছি কেন কষ্ট দিতেছ?" আমার দিকে তাকাইয়া বলিল—"এই বদমাশকে টিকিট দেখাইও না।"

আমি বিনয় করিয়া যাত্রীদিগকে বলিলাম—"টিকিট দেখিতেছে তাহাতে আমার কোনও লোকসান নাই; তাহার প্রতি যাহা আদেশ আছে সে তাহাই পালন করিতেছে, তাহাতে আমার কোনও দুঃখ নাই।" যাত্রীদের একথা পছন্দ হইল না। তাহারা আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে লাগিল এবং

পরস্পর বলিতে লাগিল যে, নির্দোষ মানুষকে কেন এমন করিয়া হয়রাণ করা হয়।

বলিতে গেলে, ডিটেকটিভেরা ত আমাকে কিছুই কষ্ট দেয় নাই। রেলে ভিড়ের জন্যই লাহোর হইতে দিল্লীর মধ্যে খুব ক্লেশ হইয়াছিল। করাচী হইতে কলিকাতা লাহোর হইয়া যাইতে হয়। লাহোরে ট্রেন বদলাইতে হয়। এই ট্রেনে কোথাও উঠিবার জায়গা ছিল না। যাত্রীরা জোর করিয়া উঠিতেছিল। দরজা বন্ধ থাকে ত জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। আমার কলিকাতায় নির্দিষ্ট তারিখে পৌঁছিবার কথা। এই ট্রেন ফেল করিলে সময়মত কলিকাতা পৌঁছানো হয় না। আমি জায়গা পাওয়ার আশা ছাড়িয়া দিলাম। কেউই আমাকে নিজেদের গাড়িতে লয় না। একজন মুটিয়া আমাকে জায়গা খুঁজিতে দেখিয়া বলিল—"আমাকে বারো আনা দাও ত জায়গা করিয়া দিব।" বলিলাম—"জায়গা যদি করিয়া দিতে পার তবে অবশ্য বারো আনা দিব।" বেচারা মুটিয়া যাত্রীদিগকে হাতজোড় করিয়া মিনতি করিতে লাগিল, কিন্তু কেউই আমাকে প্রবেশ করিতে দিতে প্রস্তুত নয়। ট্রেন তখন প্রায় ছাড়ে। এক কামরা হইতে কয়েকজন যাত্রী বলিল—"ইহার ভিতর জায়গা নাই, তবে ইহার ভিতর ঢুকাইয়া দিতে পার ত দাও, দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।" মুটিয়া বলিল—"কি বলেন?" আমি "হাঁ" বলাতে আমাকে তুলিয়া সে জানালা দিয়া গলাইয়া দিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলাম, সে মুটিয়াও বারো আনা রোজগার করিল।

সে রাত আমার বড়ই কষ্টে কাটিয়াছিল। অন্য যাত্রীরা যেমন তেমন করিয়া বসিয়া গেল। আমি উপরের বাঙ্কের শিকল ধরিয়া দুই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে কয়েকজন যাত্রী ধমকাইতে লাগিল—"আরে, এখনো বসিতেছ না কেন?" আমি তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, বসিবার স্থান নাই। কিন্তু আমার দাঁড়াইয়া থাকা তাহারা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। যদিও তাহারা উপরের বাঙ্কে আরাম করিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, তবু বার বার আমাকে বিরক্ত করিতেছিল। কিন্তু যখনই বিরক্ত করে তখনই আমি ধীরভাবে উত্তর দিই। ইহাতেই অবশেষে তাহারা নরম হইল। এইবার আমার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিবার পালা। যখন আমার নাম জানিল, তখন লজ্জিত হইয়া মাফ চাহিল এবং নিজেদের কাছে জায়গা করিয়া দিল। "সবুরে মেওয়া ফলে" এই প্রবাদবাক্য স্মরণ হইল। আমি বড়ই শ্রান্ত হইয়াছিলাম,

মাথা ঘুরিতেছিল। বসার জায়গা যখন বড়ই আবশ্যক হইয়াছিল তখনই ঈশ্বর তাহা মিলাইয়া দিলেন।

এমনি করিয়া কোনও রকমে সময়মত কলিকাতায় পৌঁছিলাম। কাসিমবাজারের মহারাজা তাঁহার বাড়িতে উঠিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। করাচীতে যেমন, তেমনি কলিকাতাতেও লোকের উৎসাহ উথলিয়া উঠিয়াছিল। সভায় কয়েকজন ইংরেজও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৩১শে জুলাইয়ের পূর্বেই গভর্নমেণ্ট জানাইয়া দিলেন যে, এগ্রিমেণ্ট প্রথা বন্ধ করা হইল। ১৮৯৪ সালে এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার দরখাস্তের খসড়া আমি করিয়াছিলাম। কিছুদিনের মধ্যে এই 'অর্ধ ক্রীতদাসত্ব' প্রথা রদ হইবে এই প্রকার আশা করিয়াছিলাম। ১৮৯৪ সাল হইতে এই চেষ্টায় অনেকে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ সত্যাগ্রহ ব্যবহৃত হওয়াতেই যে তাড়াতাড়ি এই প্রথার বিলোপ ঘটিল—একথা না বলিলে চলে না। এই কাহিনীর সমস্ত ঘটনা ও তাহাতে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিষয় দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাসে পাঠকেরা পুরাপুরি পাইবেন।

১২

নীলের দাগ

চম্পারণ স্থানটি পুরাকালে জনক রাজার অধীন ছিল। চম্পারণে আজ যেমন আমের বাগান আছে, ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তেমনি ওখানে নীলের ক্ষেতও ছিল। নিজের জমির প্রতি বিঘায় তিন কাঠা করিয়া জমিতে চাষীরা মূল মালিকের জন্য নীল চাষ করিবে—এই ছিল সেখানকার নিয়ম। ইহাকে 'তিন কাঠিয়া' বলা হইত। বিশ কাঠায় সেখানে এক একর হয়। বিশ কাঠার মধ্যে তিন কাঠা নীলের চাষের জন্য আলাদা করিয়া রাখার নাম 'তিন কাঠিয়া' প্রথা।

আমাকে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তখন আমি চম্পারণের নাম-ঠিকানাও জানিতাম না। নীলের যে চাষ হয় তাহাও জানিতাম না। নীলের প্যাকেট দেখিয়াছি, কিন্তু উহা যে চম্পারণে তৈরি হয়, তাহা জানিতাম না এবং উহার পশ্চাতে যে হাজার হাজার কৃষকের দুঃখ রহিয়াছে তাহার খবরও জানা ছিল না।

চম্পারণের রাজকুমার শুক্ল নামে একজন চাষী ছিল। তাহার মাথায় দুঃখের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই দুঃখ তাহাকেও বিঁধিলেও, এই নীলের দাগ সকলের উপর হইতে ধুইয়া ফেলার ঐকান্তিক ইচ্ছা তাহার জন্মে।

আমি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গিয়াছিলাম সেইখানেই এই কৃষকটি আমাকে পাইয়া বসিল। "উকিলবাবু আপনাকে সব অবস্থা বলিবেন"—এই কথা বলিয়া আমাকে সে চম্পারণ যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানায়। এই উকিলবাবু আমার চম্পারণের প্রিয় সঙ্গী ও বিহারের সেবা-জীবনের প্রাণস্বরূপ ব্রজকিশোরবাবু। তাঁহাকে রাজকুমার শুক্ল আমার তাঁবুতে লইয়া আসিল। তাঁহার কালো আলপাকার আচকান, পাতলুন ইত্যাদি পরা ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বিশেষ কিছু ভাল ধারণা হইল না। আমি ধরিয়াই লইলাম যে, অবোধ চাষাকে যে সব উকিল লুট করিয়া থাকেন, ইনি তাঁহাদেরই একজন উকিল সাহেব।

আমি চম্পারণের কাহিনী তাঁহার নিকট হইতে কিছু কিছু শুনিলাম। আমার রীতি অনুসারে আমি জবাব দিলাম—"না দেখিয়া-শুনিয়া এ বিষয়ে আমি কিছু বলিতে পারি না। আপনি মহাসভায় এই বিষয় উত্থাপন করিবেন, এখন আমাকে রেহাই দিন।" রাজকুমার শুক্লকে ত কংগ্রেসের সাহায্য লইতেই হইবে। ব্রজকিশোরবাবু চম্পারণের দুঃখের কথা কংগ্রেসে বলিলেন এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইল।

রাজকুমার শুক্ল খুশি হইল, কিন্তু উহাতে তাহার মন উঠিল না। সে আমাকে বলিতেছিল যে, আমি যাইয়া যেন চম্পারণের কৃষকের দুঃখ দেখি। আমি বলিলাম—"আমার ভ্রমণের স্থানগুলির ভিতর চম্পারণ থাকিবে এবং সেখানে এক দিন থাকিব।" সে বলিল—"এক দিনই যথেষ্ট। চোখে দেখিলেই হইল।"

লক্ষ্ণৌ হইতে আমি কানপুর গেলাম। সেখানেও রাজকুমার শুক্ল হাজির। "এখান হইতে চম্পারণ খুব কাছে—একটা দিন চম্পারণের জন্য দিন।" "এখন আমাকে মাফ কর, তবে আমি যাইব এই কথা দিতেছি"— এই বলিয়া নিজেকে আরো বাঁধিয়া ফেলিলাম।

আমি আশ্রমে ফিরিলাম। রাজকুমার শুক্ল এখানেও আমার পিছনে আসিয়াছে। সে বলিল—"এইবার দিন স্থির করুন।"

আমি বলিলাম—"এখন যাও—অমুক তারিখ আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। সেই সময় আমাকে কলিকাতা হইতে লইয়া যাইও।" কোথায় যাইব, কি করিব, কি দেখিব—এসব বিষয়ে আমার কোনও ধারণা ছিল না।

কলিকাতায় আমি ভূপেনবাবুর নিকট পৌঁছিলাম। তাহার পূর্বেই সে সেই বাড়িতে গিয়া হাজির ছিল। এই নিরক্ষর সরল, কিন্তু দৃঢ়সংকল্প চাষী এমনি করিয়া আমাকে জয় করিল।

১৯১৭ সালের প্রথমে কলিকাতা হইতে আমরা দুইজন রওনা হইলাম। দুইজনকেই চাষীর মত দেখাইতেছিল। রাজকুমার শুক্ল যে গাড়িতে লইয়া গেল সেইখানেই দুইজনে বসিলাম। প্রাতঃকালে পাটনা পৌঁছিলাম।

পাটনায় আসা এই আমার প্রথম। পাটনায় কাহারও বাড়িতে উঠিতে পারি, এমন পরিচয় আমার কাহারও সঙ্গে ছিল না। আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল যে, রাজকুমার শুক্ল সাধারণ কৃষক মাত্র হইলেও পাটনায় উহার কোনও অবলম্বন থাকিবেই। ট্রেনে রাজকুমারের সব খবর জানিতে পারিলাম। পাটনায় উহার মূল্য কি তাহা ভাল করিয়াই বুঝিলাম। রাজকুমার শুক্লের বুদ্ধি নির্দোষ ছিল। সে যাহাদিগকে বন্ধু মনে করিত সেই উকিলেরা তাহার বন্ধু ছিল না, পরন্তু রাজকুমার ছিল তাঁহাদের ভৃত্যেরই মত এক চাষী মক্কেল। তাহার এবং উকিলের মধ্যে যে ব্যবধান তা গঙ্গার প্রবল বন্যার মত বিস্তৃত।

আমাকে সে রাজেন্দ্রবাবুর বাড়িতে লইয়া গেল। রাজেন্দ্রবাবু পুরী না কোথায় গিয়াছিলেন। বাংলোয় দুই-একজন মাত্র চাকর ছিল। খাওয়ার জিনিস আমার সঙ্গে কিছু ছিল। তবে আমার কিছু খেজুর দরকার থাকায় বেচারা রাজকুমার শুক্ল তাহা বাজার হইতে আনিয়া দিল।

এদিকে বিহারে ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার বড় শক্ত রকমের। আমার বালতির জলের ছিটা যদি চাকরদের বালতিতে লাগে, তবে তাহাতে তাহাদের জল অপবিত্র হইয়া যাইবে। চাকর আমার জাতের খবর ত জানে না। রাজকুমার দেখাইয়া দিল ভিতরের পায়খানা ব্যবহার করিতে। চাকর বাহিরের পায়খানার দিকে তৎক্ষণাৎ আঙ্গুল নির্দেশ করিল। এই সকল আমার নিকট আশ্চর্য ও বিরক্তির কারণ হয় নাই। এই প্রকার অভিজ্ঞতায় আমি অভ্যস্ত ছিলাম। চাকর তাহার নিজের ধর্মই পালন করিতেছিল—রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাবুর আদেশ পালন করিতেছে বলিয়া বুঝিতেছিল। এই উপভোগ্য অভিজ্ঞতা হইতে রাজকুমার শুক্লের সম্বন্ধে যেমন আমার শ্রদ্ধা বাড়িল, তেমনি তাহার সম্বন্ধে আমার জ্ঞানও বাড়িল। পাটনাতেই আমি বুঝিতে পারিলাম, রাজকুমার আমাকে পরিচালিত করিতে পারিবে না। 'রাশ' আমাকে নিজের হাতে গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩

বিহারী সরলতা

মৌলানা মজহরুল হক ও আমি একসময়ে লণ্ডনে একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম। তারপর ১৯১৫ সালে বোম্বাইয়ের কংগ্রেসে আমাদের দেখা হয়। সেই বৎসর তিনি মুস্লিম লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি পুরানো পরিচয় বশতঃ পাটনা গেলে আমাকে তাঁহার বাড়িতেই উঠার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে চিঠি দিলাম ও আমার কাজের বিষয় জানাইলাম। তিনি তখনই নিজের মোটর লইয়া আসিলেন এবং আমাকে তাঁহার সহিত লইয়া যাওয়ার জন্য আগ্রহ করিলেন। আমি তাঁহার উপকার স্বীকার করিয়া, আমার যেখানে যাওয়ার কথা, সেইস্থানে প্রথম ট্রেনেই পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। রেলওয়ে গাইড হইতে গন্তব্য স্থান খুঁজিয়া বাহির করা আমার সাধ্য ছিল না। তিনি রাজকুমার শুক্লের সহিত কথা বলিলেন এবং আমাকে প্রথমতঃ মজঃফরপুর যাইতে হইবে বলিলেন। সেই সন্ধ্যাতেই মজঃফরপুরের ট্রেনে তিনি আমাকে রওনা করিয়া দিলেন। মজঃফর-পুরে সেই সময় আচার্য কৃপলানী থাকিতেন। তাঁহাকে আমি জানিতাম। যখন হায়দ্রাবাদ গিয়াছিলাম, তখন তাঁহার মহান ত্যাগের বিষয়, তাঁহার সরল জীবন-যাত্রার বিষয় ও তাঁহার অর্থে পরিচালিত আশ্রমের বিষয় ডাঃ চৌথরামের কাছে শুনিয়াছিলাম। তিনি মজঃফরপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সেই সবে মাত্র তিনি সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়াছেন। আমি তাঁহাকে তার করিয়াছিলাম। মধ্যরাত্রে মজঃফরপুরে ট্রেন যায়। তিনি সেই সময় একদল ছাত্র লইয়া স্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি অধ্যাপক মালকানীর নিকট থাকিতেন। আমাকে তিনি সেইখানে লইয়া গেলেন। মালকানী সেখানকার কলেজের প্রফেসর। তখনকার দিনে সরকারী কলেজের প্রফেসরের পক্ষে আমাকে স্থান দেওয়া অসাধারণ কার্য বলিয়া মনে হয়।

কৃপলানীজী বিহারের এবং তাহার মধ্যে আবার ত্রিহুতের দুঃখ-দুর্দশার কথা আমাকে বলিয়া, আমার কার্যের দুরূহতার বিষয় জানাইয়া দিলেন। কৃপলানীজী বিহারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে আমার কাজের কথা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছিলেন। সকালে উকিলদের ছোট একটি দল আমার কাছে আসিয়া হাজির হইল। তাঁহাদের মধ্যে রামনবমী

প্রসাদের কথা আমার স্মরণ আছে। তিনি নিজের আগ্রহের আতিশয্যের দ্বারা আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

"আপনি যে কাজে আসিয়াছেন তাহা এখান হইতে হইবে না। আপনাকে আমাদের ওখানে গিয়া থাকিতে হইবে। গয়াবাবু এখানকার নামজাদা উকিল। তাঁহার অনুরোধেই আপনাকে তাঁহার বাড়িতে উঠিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতেছি। আমরা সকলেই সরকারকে ভয় করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের দ্বারা যতটা সম্ভব, সে সাহায্য আমরা অবশ্যই আপনাকে করিব। রাজকুমার শুক্লের অনেক কথাই সত্য। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের নেতা আজ এখানে নাই। বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ ও রাজেন্দ্র প্রসাদকে আমি তার করিয়াছি। উভয়েই শীঘ্রই আসিয়া পড়িবেন এবং তাঁহারা পুরাপুরি সাহায্য করিবেন। আপনি দয়া করিয়া গয়াবাবুর ওখানে চলুন।"

এ কথায় আমার লোভ হইল। আমাকে লইয়া পাছে গয়াবাবুর অসুবিধা হয়, তাই সংকোচ হইতেছিল। কিন্তু রামনবমীবাবু এ বিষয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

আমি গয়াবাবুর ওখানে গেলাম। তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ আমাকে ভালবাসায় মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন।

ব্রজকিশোরবাবু দ্বারভাঙ্গা হইতে আসিলেন। রাজেন্দ্রবাবু পুরী হইতে আসিলেন। এখন যাঁহাকে দেখিলাম ইনি লক্ষ্ণৌয়ের সে বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ নহেন। ইঁহার মধ্যে বিহারীদের নম্রতা, সরলতা, ভালমানুষি ও অসাধারণ শ্রদ্ধা দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। বিহারী উকিলদের মধ্যে ব্রজকিশোরবাবুর প্রতি সম্মানের ভাব দেখিয়া আনন্দিত ও আশ্চর্য হইলাম। এই দলের সহিতও আমার জন্মের মত গাঢ় বন্ধন স্থাপিত হইয়া গেল।

ব্রজকিশোরবাবু আমাকে সকল অবস্থার সহিত পরিচিত করাইলেন। তিনি গরীব কৃষকদের ঐসকল মোকদ্দমা লইয়া লড়িতেন। ঐরূপ দুইটি মোকদ্দমা তাঁহার হাতে ছিল। এই প্রকার মোকদ্দমা করিয়া গরীবদের জন্য কিছু করিতেছেন বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেন। কখন কখন মোকদ্দমা নিষ্ফল হইত। এই সকল সাধারণ কৃষকের কাছ হইতে তিনি 'ফী' লইতেন। ত্যাগী হইলেও ব্রজকিশোরবাবু অথবা রাজেন্দ্রপ্রসাদবাবু 'ফী' লইতে সংকোচ বোধ করিতেন না। ব্যবসায়ে ফী যদি না লওয়া যায়, তবে সংসার খরচ চলিবে না এবং লোককে সাহায্যও করিতে পারিবেন না—এই তাঁহাদের যুক্তি ছিল।

তাঁহারা যে 'ফী' লইতেন এবং বাংলা দেশে ও বিহারে ব্যারিস্টারেরা যে ফী লইয়া থাকেন তাহার অঙ্ক শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল।

—"সাহেবকে আমরা ওপিনিয়নের (পরামর্শের) জন্য ১০,০০০ টাকা দিয়াছি।" হাজার ছাড়া ত আমি কথাই শুনিলাম না।

এই বিষয়ে এই বন্ধুমণ্ডল আমার কাছ হইতে মিষ্ট ভাষায় কিছু শক্ত কথা শুনিলেন। কিন্তু তাঁহারা উহাতে কিছু মনে করিলেন না।

"এই সকল মোকদ্দমার বিবরণ পড়িয়া আমার মত এই যে, আপনারা এই ধরনের মোকদ্দমা করা ছাড়িয়া দিন। এই সকল মোকদ্দমা হইতে লাভ খুব কমই হয়। যেখানকার রায়তেরা এত ভীরু, যেখানে সকলেই এত ভয়-ভীত, সেখানে আদালতের দ্বারা কমই সাহায্য হইতে পারে। লোকের ভয় দূর করাই এখানে সর্বাগ্রে দরকার। যে পর্যন্ত এই 'তিন কাঠিয়া' প্রথা না যায়, সে পর্যন্ত আপনারা সুখে বসিয়া থাকিতে পারিবেন না। আমি ত দুই দিনে যাহা দেখা যায় তাহাই দেখিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এই কাজ দুই বৎসরও লইতে পারে। যতটা সময় লাগে তাহা আমি দিতে প্রস্তুত আছি। এই কাজের জন্য কি করা আবশ্যক তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আপনাদের সাহায্য চাই।"

ব্রজকিশোরবাবুকে আমি খুব স্থিরবুদ্ধি দেখিলাম। তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন—"আমাদের দ্বারা যতটা সাহায্য হইতে পারে ততটা সাহায্য আপনাকে করিব। কিন্তু আপনি কি প্রকারের সাহায্য চাহেন তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন।" এই কথা লইয়াই আমাদের রাত কাটিল। আমি ব্রজকিশোরবাবুকে বলিলাম—"আপনাদের ওকালতি বুদ্ধি আমার খুব কম কাজে লাগিবে। আপনাদের নিকট হইতে আমি কেরানীর ও দোভাষীর কাজ চাই। ইহাতে জেলে যাইতেও হইবে দেখিতেছি। আপনারা সে বিপদ বরণ করেন ত আমার ভাল লাগিবে। তবে যদি ঐ বিপদ ঘাড়ে লইতে ইচ্ছা না হয় তবে লইবেন না। উকিল হইতে কেরানী হওয়া ও অনিশ্চিত কালের জন্য নিজেদের ব্যবসা বন্ধ রাখাও আমি কিছু কম কাজ মনে করি না। এখানকার হিন্দী কথা বুঝিতে আমার কষ্ট হয়। কাগজপত্র সব কায়েথী বা উর্দুতে লেখা, উহা আমি পড়িতে পারিব না। ঐ সকলের তর্জমা আপনারা করিয়া দিবেন সে আশা রাখি। এই কাজ পয়সা দিয়া করা চলিবে না। ইহা কেবল সেবা-ভাব হইতে ও বিনা পয়সায় হওয়া চাই।"

ব্রজকিশোরবাবু বুঝিলেন এবং তিনি আমাকে ও নিজের সঙ্গীদের জেরা করিতে লাগিলেন। আমার কথার অর্থের প্রসারতা কতদূর তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমার আন্দাজে কতদিন উকিলদের সময় দিতে হইবে, কয়জন চাই, কেহ যদি অল্পস্বল্প সময়ের জন্যে আসে ত চলে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উকিলদের মধ্যে আবার কে কি পরিমাণ ত্যাগ করিতে পারেন তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন।

অতঃপর তিনি সব স্থির করিয়া আমাকে জানাইলেন যে,—"আমাদের মধ্যে এই কয়জন, আপনি যে যে কাজ করিতে বলেন তাহাই করিতে প্রস্তুত আছেন। ইঁহাদের মধ্যে যতজনকে যতদিনের জন্য আপনাদের নিকট থাকিতে বলিবেন ততদিন থাকিবেন। জেলে যাওয়ার কথা আমাদের কাছে নতুন। সেজন্য আমরা শক্তি অর্জন করার চেষ্টা করিব।"

১৪
অহিংস সংগ্রামের মুখোমুখি

আমাকে কৃষকদের অবস্থার অনুসন্ধান করিতে হইত এবং নীলকর মালিকের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ছিল, তাহার কতটা সত্য তাহা দেখিতে হইত। এই কাজের জন্য হাজার হাজার কৃষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক হইত। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া বসিবার পূর্বে, নীলের মালিকদের সঙ্গে ও কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমি আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। উভয়কেই পত্র দিলাম।

নীল-মালিকদের সেক্রেটারী দেখা করার সম্বন্ধে সাফ লিখিয়া দিলেন যে, আপনাকে বিদেশী মনে করি। আমাদের ও কৃষকের মধ্যে আপনার আসা উচিত নহে। তাহা হইলেও যদি আপনার কিছু বলার থাকে তবে তাহা লিখিয়া জানাইবেন।

আমি সেক্রেটারীকে সবিনয়ে জানাইলাম যে, আমি নিজেকে বিদেশী বলিয়া মনে করি না। আর যদি কৃষকেরা ইচ্ছা করে, তবে তাহাদের অবস্থার পুরাপুরি অনুসন্ধান করার অধিকার আমার আছে। কমিশনার সাহেব দেখা করিলেন। তিনি ত ধমকাইতে আরম্ভ করিলেন এবং আমাকে অতঃপর আর অগ্রসর না হইয়া ত্রিহুত ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। আমি সঙ্গীদের সঙ্গে সকল কথা

আলোচনা করিয়া বলিলাম যে, অনুসন্ধান করাও সরকার বন্ধ করিয়া দিবে এমনটা হইতে পারে। জেলে যাওয়ার যখন সময় আসিবে বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম তাহার পূর্বেই হয়ত সে সময় আসিবে। যদি গ্রেপ্তার হইতে হয় তবে আমার মতিহারীতে, অথবা যদি সম্ভব হয় তবে বেতিয়াতেই গ্রেপ্তার হওয়া চাই।

চম্পারণ ত্রিহুত বিভাগের জেলা এবং মতিহারী তাহার প্রধান শহর। বেতিয়ার কাছাকাছি রাজকুমার শুক্লের বাড়ি, আর তাহার আশেপাশের কৃষক অধিকাংশই হতদরিদ্র। তাহাদের অবস্থা দেখাইতে রাজকুমার শুক্লের লোভ হইত। এখন আমার সেইখানে যাওয়ার ইচ্ছা হইল।

সেই হেতু সঙ্গীদের লইয়া আমি সেই দিনই মতিহারী যাওয়ার জন্য রওনা হইলাম। মতিহারীতে গোরক্ষবাবু আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহার বাড়ি ধর্মশালায় পরিণত হইল। আমাদের সকলের ঠেসাঠেসি করিয়া সেখানে কুলাইত। যে দিন মতিহারী পৌঁছিলাম সেই দিনই শুনিলাম যে, মতিহারী হইতে মাইল পাঁচেক দূরে এক কৃষকের উপর অত্যাচার হইয়াছে। তাহাকে দেখিতে ধরণীধর প্রসাদ উকিলকে লইয়া সকালে যাইতে হইবে, এই প্রকার স্থির করিলাম। আমরা সকালে হাতিতে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। চম্পারণে হাতির ব্যবহার অনেকটা গুজরাটের গরুর-গাড়ি ব্যবহারের মত। অর্ধেক পথ গিয়াছি এমন সময় পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টে লোক আসিয়া পৌঁছিল এবং আমাকে বলিল—"আপনাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেলাম দিয়াছেন।" আমি বুঝিতে পারিলাম। ধরণীধরবাবুকে আমি অগ্রসর হইয়া যাইতে বলিলাম। তারপর সেই লোক যে ভাড়ার গাড়ি আনিয়াছিল, তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। সে আমাকে চম্পারণ পরিত্যাগ করিবার নোটিস দিল। আমাকে বাড়িতে ফিরাইয়া লইয়া গেল এবং আমার স্বাক্ষর চাহিল। আমি জবাবে লিখিয়া দিলাম যে, আমার চম্পারণ ছাড়িয়া যাওয়ার ইচ্ছা নাই। আমাকে আরো অগ্রসর হইতে হইবে এবং অনুসন্ধান করিতে হইবে। চম্পারণ ত্যাগের আদেশ অমান্য করার জন্য পরের দিন কোর্টে হাজির হওয়ার সমন আসিল।

সারারাত ধরিয়া আমার যত চিঠি লেখার ছিল লিখিলাম ও যে যে নির্দেশ দেওয়ার ছিল তাহা ব্রজকিশোরবাবুকে দিলাম।

সমনের কথা ক্ষণকালমধ্যেই প্রচার হইয়া গেল। লোকে বলে যে, মতিহারী সেদিন যে দৃশ্য দেখিয়াছিল পূর্বে এমন কখনো দেখে নাই। গোরক্ষবাবুর বাড়ি

ও কোর্ট লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে আমার সমস্ত কাজই আমি রাত্রিতে শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেইজন্য সেই ভিড়ের দিকে আমি মন দিতে পারিলাম। সঙ্গীদের যে মূল্য কি, তাঁহাদের তখন তাহার পুরাপুরি পরিচয় দিতে হইল। তাঁহারা লোকদের নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিয়া গেলেন। কাছারিতে যেখানে যাই লোক দলে দলে আমার পিছনে চলে।

কলেক্টার, ম্যাজিস্ট্রেট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং আমার মধ্যে এক রকমের একটা প্রীতির বন্ধন উৎপন্ন হইল। সরকারী নোটিস ইত্যাদি যদি আইনমত অগ্রাহ্যই করিতে হইত, তবে আমি তাহা করিতে পারিতাম। তাহার পরিবর্তে তাঁহাদের সমস্ত নোটিস আমি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম; এবং কর্মচারীদিগের সহিত ব্যক্তিগত ভদ্র ব্যবহার করাতে তাঁহারা বুঝিয়া গেলেন যে, তাঁহাদের সহিত আমার বিরোধ নাই—আমি সবিনয়ে তাঁহাদের হুকুমেরই বিরোধিতা করিব। ইহাতে তাঁহারা এক প্রকার অভয় পাইলেন। আমাকে বিরক্ত করার পরিবর্তে তাঁহারা খুশি হইয়া লোকদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আমার ও আমার সঙ্গীদের সাহায্য লইলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ক্ষমতা আজ হইতে লোপ পাইল—লোকে মুহূর্তের জন্য দণ্ডের ভয় ত্যাগ করিল এবং তাহাদের নূতন বন্ধুর ভালবাসার বশীভূত হইল।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চম্পারণে কেউ আমাকে চিনিত না। কৃষকেরা সকলেই অজ্ঞ লোক ছিল। চম্পারণ গঙ্গার অপর পারে, অনেক উত্তরে, হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের নিকটস্থ প্রদেশ। সেখানে অনেকে কংগ্রেসের নামও শোনে নাই—কংগ্রেসের সভ্য কাহাকেও পাওয়া যায় না। যাহারা কংগ্রেসের নাম জানে তাহারা উহার সভ্য হওয়া দূরে থাকুক, নাম লইতেই ভয় পায়। আজ কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সেবক এই প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে—কংগ্রেসের নামে নয়, উহার সত্য স্বরূপে।

সঙ্গীদের সহিত কথা বলিয়া আমি স্থির করিলাম যে, এখানে কংগ্রেসের নামে কোনও কাজ করিব না। নামের দরকার নাই, কাজের দরকার—ছায়া নয়, কায়া চাই। কংগ্রেসের নাম ইহাদের কাছে অপ্রীতিকর, কেন না এ প্রদেশ কংগ্রেস মানে উকিলের মারামারি ও আইনের ফাঁকি দিয়া পলানোর প্রযত্ন; কংগ্রেস মানে বোমা ও গুলি, কংগ্রেস মানে বলা এক, করা আর। এখন বোঝাপাড়া হইতেছে সরকারের সঙ্গে এবং সরকারেরও যেসরকার সেই নীলকুঠির মালিকের সঙ্গে। তাহারা কংগ্রেস বলিয়া যাহা জানিত, কংগ্রেস তাহা নয়,

কংগ্রেস কি তাহাই আমাকে এখানে বুঝাইতে হইবে। সেইজন্য আমি কোথাও কংগ্রেসের নাম না লইতে এবং লোককে কংগ্রেসের ভৌতিক দেহের সহিত পরিচয় না করাইতেই কৃতনিশ্চয় হইলাম। কংগ্রেসের দেহকে না জানিয়া যদি লোকে তাহার আত্মাকে জানে ও অনুসরণ করে, তাহা হইলেই যথেষ্ট। তাহাই কংগ্রেসের সত্য পরিচয়—ইহাই আমরা বিচার করিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

সেইজন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোনও গোপন বা প্রকাশ্য দূত প্রেরণ করিয়া সেখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত করার আবশ্যক হয় নাই। রাজকুমার শুক্লের পক্ষে হাজার হাজার লোকের ভিতর প্রবেশ করার শক্তি ছিল না। তাহাদের মধ্যে কেউ এ পর্যন্ত রাজনৈতিক কোন কাজ করে নাই। চম্পারণের বাহিরের জগৎটা কি তাহারা জানিত না। তাহা হইলেও এই লোকগুলির সঙ্গে আমার মিলন যেন পুরানো বন্ধুর সঙ্গে মিলনের মত হইয়াছিল। ঈশ্বর, অহিংসা ও সত্যের সাক্ষাৎ এই জনতার ভিতর পাইয়াছিলাম, একথা বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না, বরং উহাই আক্ষরিকভাবে সত্য। এই সাক্ষাৎকারে আমার অধিকার অনুসন্ধান করিলে লোকের প্রতি প্রেম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। অহিংসার উপর আমার সহজ শ্রদ্ধাই এই প্রেমের অন্য নাম।

চম্পারণের এই দিন জীবনে কখনো ভুলিবার নয়। এই দিন আমার ও কৃষকদের পক্ষে এক উৎসবের দিন। সরকারী নিয়ম অনুসারে আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার কথা। কিন্তু সত্য সত্য দেখিতে গেলে, এই মোকদ্দমা সরকারের বিরুদ্ধেই হইতেছিল। আমাকে আটকাইবার জন্য কমিশনার যে জাল রচনা করিয়াছেন, সেই জালে তিনি সরকারকেই ফেলিলেন।

১৫

মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া

মোকদ্দমা চলিল। সরকারী উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা কি করিবেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সরকারী উকিল মোকদ্দমার শুনানি মুলতুবী রাখার দরখাস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি মধ্যে পড়িয়া মিনতি জানাইলাম যে, মুলতুবী রাখার কোন আবশ্যকতা নাই। কেন না চম্পারণ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার নোটিস অমান্য করার দোষ আমি স্বীকার

করিব। এই বলিয়া আমি খুব সংক্ষেপে যে বিবৃতি লিখিয়াছিলাম তাহা পড়িলাম। বিবৃতিটি এই রকম ছিল :—

"দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে প্রদত্ত হুকুম অমান্য করার মত গুরুতর কাজ আমি কেন করিলাম, সে বিষয়ে আদালতকে সংক্ষেপে কিছু জানাইতে ইচ্ছা করি। আমার মতে বস্তুতঃ ইহা আইন অমান্যের প্রশ্ন নয়, ইহা স্থানীয় সরকারের সঙ্গে আমার মতভেদের প্রশ্ন। এই প্রদেশে জনসেবা ও দেশসেবা করার জন্য প্রবেশ করিয়াছি। রায়তের সঙ্গে নীলকরের ন্যায়ানুমোদিত ব্যবহার নাই। এই জন্য রায়তদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমাকে খুব আগ্রহ সহকারে কেউ কেউ ডাকিয়াছে বলিয়া আমাকে আসিতে হইয়াছে। সমস্ত বিষয়টা ভাল করিয়া না জানিয়া আমি তাহাদের কেমন করিয়া সাহায্য করিব? সেই জন্য আমি এই বিষয়টি বুঝিতে—সম্ভব হইলে সরকার ও নীলকরের সাহায্যেই বুঝিতে আসিয়াছি। আমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। আমার আসার জন্য লোকের মধ্যে শান্তিভঙ্গ হইবে, খুনাখুনি হইবে একথা আমি স্বীকার করি না। এই বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব খাঁটি—আমি এই দাবি করিতেছি। কিন্তু সরকারের বিচার এই বিষয়ে আমার বিপরীত। তাঁহাদের অসুবিধা আমি বুঝিতেছি। আমি ইহাও স্বীকার করি—তাঁহারা যে প্রকার অবস্থার সংবাদ পান তাহারই উপর তাঁহাদের বিশ্বাস রাখিতে হয়। আইন-মান্যকারী প্রজা হিসাবে আমার উপর যে হুকুম হইয়াছে, উহা মান্য করাই স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তাহা করিলে আমি যাহাদের জন্য এখানে আসিয়াছি তাহাদিগকে আঘাত করা হয় বলিয়া আমার ধারণা। আমার মনে হয় যে, তাহাদের সেবা আমি আজ তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই করিতে পারি। সেই জন্য স্বেচ্ছায় চম্পারণ ছাড়িতে পারি না। এই ধর্ম-সংকটে আমাকে চম্পারণ হইতে সরাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের উপর না ফেলিয়া পারি না। আমার মত ব্যক্তির পক্ষে এই পথ গ্রহণ করায় যে দৃষ্টান্ত লোককে দেখানো হয়, তাহার দায়িত্ব আমি খুব বুঝিতেছি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার মত অবস্থায় পতিত আত্মসম্মানশীল মানুষের পক্ষে এই হুকুম অমান্য করা এবং এজন্য যাহা সাজা হয় তাহা গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোনও সম্মানজনক পথ নাই। আমাকে কম করিয়া সাজা দেওয়া হোক, এই জন্য এই উক্তি আমি করিতেছি না। আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের অস্বীকার করাই আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আমার অন্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ন্তার

যে নিয়ম আমি স্বীকার করি, তাঁহার প্রতি আমার অন্তরাত্মার আহ্বান স্বীকার করাই আমার এই আদেশ অমান্যের উদ্দেশ্য বলিয়া আমি জানাইতেছি।"

এক্ষণে মোকদ্দমা মুলতুবী রাখার হেতু আর রহিল না। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ও উকিল এই রকম হইবে বলিয়া আশা করেন নাই। সেই জন্য কি সাজা দেওয়া হইবে তাহা পরে জানাইবার অছিলায় মোকদ্দমা মুলতবী রাখা হইল। আমি ভাইসরয়কে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া তার করিলাম। ভারতভূষণ পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য প্রভৃতিকেও অবস্থা জানাইয়া তার পাঠাইয়াছিলাম। সাজা লওয়ার জন্য কোর্টে যাওয়ার পূর্বেই আমার উপর ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম আসিল যে, গভর্নর সাহেবের হুকুম অনুসারে এই মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হইতেছে। কলেক্টারের পত্রও পাইলাম যে, আমার যাহা অনুসন্ধান করিতে হয় তাহা করিতে পারিব ও তাহার জন্য সরকারী কর্মচারীদের কাছ হইতে যে সাহায্য প্রয়োজন তাহা যেন চাহিয়া লই। এই রকম শীঘ্র এবং এই প্রকার শুভ পরিণামের আশা আমরা কেহ করি নাই।

আমি কলেক্টার মিঃ হেককের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহাকে ভাল মানুষ ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়া মনে হইল। কোনও কাগজপত্র দরকার হইলে আমি পাইব এবং যখন ইচ্ছা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি, তিনি এই কথা বলিয়া দিলেন।

অন্য দিক দিয়া, দেশ সত্যাগ্রহ অথবা আইন অমান্যের একটা স্থানীয় দৃষ্টান্ত পাইল। খবরের কাগজে খুব আলোচনা হইল। চম্পারণ ও আমার অনুসন্ধান সম্বন্ধে খুব রটনা হইল।

আমার অনুসন্ধানের জন্য সরকারের দিক হইতে পক্ষপাতশূন্যতা আবশ্যক হইলেও সংবাদপত্রে আলোচনা ও সমর্থনের আবশ্যক ছিল না। কেবল তাহাই নহে, কাগজে লম্বা মন্তব্য ও অনুন্ধানের বড় বড় রিপোর্ট দ্বারা ক্ষতি হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য আমি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা যেন রিপোর্টার পাঠাইবার হাঙ্গামা না করেন। যতটুকু ছাপানো আবশ্যক ততটুকু আমিই পাঠাইয়া দিব এবং তাঁহাদিগকে সংবাদ দিতে থাকিব।

চম্পারণের নীলকরেরা চটিয়া গিয়াছিল তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। সরকারী কর্মচারীরাও যে মনে মনে খুশি ছিল না তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

সংবাদপত্রে সত্য-মিথ্যা খবর উঠিলে তাহাতে তাহারা খুবই অসন্তুষ্ট হইবে

এবং তাহাদের এই ক্রোধ আমার উপর না পড়িয়া গরিব ভীত রায়তের উপরেই পড়িবে। আর তাহা হইলে যে সত্য অবস্থার অনুসন্ধান আমি করিতে চাহি তাহাতেও বিঘ্ন আসিবে। নীলকরের দিক হইতে বিষময় আন্দোলন আরম্ভ হইল। তাহাদের পক্ষ হইতে আমার ও আমার সঙ্গীদের নামে সংবাদপত্রে নানা মিথ্যা প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু আমার অত্যন্ত সাবধানতার জন্য, এবং অতি সামান্য বিষয়েও সত্য অবলম্বন করিয়া থাকার জন্য, তাহাদের বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল।

ব্রজকিশোরবাবুর নানাপ্রকার নিন্দা করিতে নীলকরেরা একটুও ত্রুটি করিল না। কিন্তু তাহারা যতই নিন্দা করিতে লাগিল ততই ব্রজকিশোরবাবুর প্রতিষ্ঠা বাড়িতে লাগিল।

এই সংকটের সময় আমি রিপোর্টারদের আসিতে আদৌ উৎসাহিত করি নাই। নেতৃবর্গকে ডাকি নাই। মালব্যজী আমাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে আবশ্যক হইলে যেন সংবাদ দিয়া তাঁহাকে লইয়া আসি। তাঁহাকেও কষ্ট দিই নাই। এবং এই লড়াইকে রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করিতে দিই নাই। যাহা ঘটিতেছিল সে বিষয়ে মাঝে মাঝে আমি প্রধান সংবাদপত্রগুলিকে সংবাদ পাঠাইয়া দিতাম। তাহাও তাঁহাদের নিজেদের অবগতির জন্য মাত্র। রাজনৈতিক কাজ করিতেও যেখানে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার আবশ্যক নাই সেখানে ঐ প্রকার রূপ দিলে, রাজনীতির ও কাজের উভয়েরই ক্ষতি হয়—এই অভিজ্ঞতা আমি ভাল রকম পাইয়াছিলাম। শুদ্ধ লোকসেবাতে, প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষ রাজনীতি যে রহিয়াছেই তাহা চম্পারণের যুদ্ধে প্রমাণ হইয়া গিয়াছিল।

১৬
কার্যপদ্ধতি

চম্পারণের অনুসন্ধানের বিবরণ দেওয়া, আর চম্পারণের কৃষকদের ইতিহাস লেখা একই কথা। সে সমস্ত কথা এই অধ্যায়ে দেওয়া যায় না। ইহাই বলা যায় যে, চম্পারণের অনুসন্ধান-কার্য অহিংসা এবং সত্যের বড় রকমের এক প্রয়োগ। এই জন্য ঐ দৃষ্টি হইতে যতটা পারি সপ্তাহে সপ্তাহে লিখিব। এই যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখিত হিন্দী পুস্তক * হইতে পাঠক পাইবেন।

* ইহার ইংরেজী সংস্করণ মাদ্রাজের শ্রীগণেশমের নিকট পাওয়া যায়।

এখন এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়ের কথা লিখিতেছি। গোরক্ষবাবুর ওখানে বসিয়া যদি এই অনুসন্ধান করিতে হয়, তবে গোরক্ষবাবুকে তাঁহার বাড়ি খালি করিয়া দিতে হয়। মতিহারীতে ভাড়া চাহিলেই কেউ এজন্য বাড়ি ভাড়া দিবে, এমন নির্ভীকতা লোকের ভিতর এখনও আসে নাই। কিন্তু চতুর ব্রজকিশোর বাবু এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণযুক্ত বাড়ি ভাড়া করিয়া ফেলিলেন; আমরা সেখানে গেলাম।

টাকা ছাড়া শেষ পর্যন্ত কাজ চালানো যাইতে পারে না। তখন পর্যন্তও সাধারণের কাজের জন্য জনসাধারণের কাছ হইতে টাকা লওয়ার প্রথা হয় নাই। ব্রজকিশোরবাবুর দল প্রধানতঃই উকিল ছিলেন। প্রয়োজন মত তাঁহারা নিজেদের টাকাতেই ব্যয় সরবরাহ করিতেন, অথবা নিজেদের বন্ধুদের কাছ হইতে টাকা লইতেন। যাঁহাদের নিজেদের টাকাপয়সা আছে তাঁহারা অপরের কাছে কেমন করিয়া ভিক্ষা চাহিবেন, ইহাও ছিল তাঁহাদের যুক্তি। চম্পারণের রায়তদের কাছ হইতে এক পয়সাও লওয়া হইবে না—ইহা আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল। নইলে লোকে এজন্য খারাপ অভিপ্রায় আরোপ করিতে পারিত। এই অনুসন্ধানের জন্য ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছ হইতে চাঁদা লইব না ইহাও স্থির করিয়াছিলাম। ঐ প্রকার করিলে এই অনুসন্ধান রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করিত। বোম্বাইয়ের বন্ধুরা আমাকে ১৫,০০০ টাকা পাঠাইবেন বলিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐ সাহায্যও ধন্যবাদ সহকারে প্রত্যাখ্যান করিলাম। আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, যে সকল অবস্থাপন্ন বিহারী বাহিরে থাকেন, তাঁহাদের কাছ হইতে ব্রজকিশোরবাবু ও তাঁহার বন্ধুদের সাহায্যে টাকা সংগ্রহ করা হইবে। যা কম পড়ে তা ডাক্তার প্রাণজীবনদাস মেহতার কাছ হইতে লওয়া স্থির করিলাম। ডাক্তার মেহতা, যা দরকার হয় তা চাহিয়া পাঠাইতে লিখিলেন। এমনি করিয়া টাকার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। দরিদ্রের মত খুবই কম ব্যয় করিয়া এই যুদ্ধ চালাইতে হইবে বলিয়া অনেক টাকার আবশ্যক হওয়ার কথা নয়। কার্যতঃ টাকা বেশি আবশ্যকও হয় নাই। আমার ধারণা যে, সমস্ত লইয়া দুই-তিন হাজার টাকার বেশি খরচ হয় নাই। ঐরূপ খরচ করিয়া ৫০০৲ কি ১০০০৲ টাকা বাঁচিয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয়।

প্রথম প্রথম আমাদের থাকার ধরন বিচিত্র ছিল। আর উহা লইয়া রোজই আমাকে তামাশা উপভোগ করিতে হইত। উকিলদের প্রত্যেকের জন্য একজন

করিয়া বামুন ও চাকর ছিল। প্রত্যেকের জন্য আলাদা করিয়া রান্না হইত, আর সকলে রাত্রি বারোটায় আহার করিতেন। এই ভদ্রলোকেরা নিজের নিজের খরচাতেই থাকিতেন। তবুও আমার কাছে তাঁহাদের এই প্রকার থাকা বিশ্রী লাগিত। আমার ও আমার বন্ধুদের মধ্যে এখন প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইয়াছিল বলিয়া, আমাদের মধ্যে বোঝাবুঝির ভুল হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। তাঁহারা আমার তিরস্কার প্রেমের সঙ্গেই গ্রহণ করিতেন। অবশেষে এই প্রকার হইল যে, চাকরদের বিদায় দিয়া সকলের একত্র খাওয়া হইত—খাওয়ার সময়ও নির্দিষ্ট হইল। সকলেই নিরামিষাহারী ছিলেন। কিন্তু দুইটা রান্নার ব্যবস্থা করিলে খরচ বেশি হয় বলিয়া একটা পাকশালায় একত্র নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা হইল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সাদাসিধে। এজন্য ব্যয় কমিল, কাজ করিবার শক্তি বাড়িল ও সময়ও বাঁচিল।

সময় ও শক্তি এই দুটি জিনিস খুব আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। নিজেদের দুঃখের কথা লিখাইবার জন্য কৃষকেরা দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যাহারা লিখাইতে আসিত তাহাদের সঙ্গে দলে দলে লোকও আসিত। ইহাতে বাড়ি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। আমাকে দর্শন-অভিলাষীদের কাছ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সঙ্গীরা নিষ্ফল চেষ্টা করিতেন। নির্দিষ্ট সময়ে এক-একবার করিয়া আমাকে বাহিরে আসিয়া দর্শন দিতে হইত। লোকের জবানবন্দী লিখিবার জন্য পাঁচ-সাতজন সব সময় থাকিতেন। কিন্তু তবুও দিনের শেষে সকলকার জবানি লেখা হইয়া উঠিত না। এত বেশি জবানবন্দি লওয়ার আবশ্যক ছিল না, কিন্তু উহা লইলে লোকের মনে সন্তোষ হইত এবং আমিও তাহাদের অবস্থার খবর পাইতাম।

জবানবন্দি-লেখকদের কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইত। প্রত্যেক কৃষককেই জেরা করা হইবে। জেরায় যাহার কথা না টিকে তাহার কথা লেখা হইবে না। যাহার কথা গোড়াতেই ভিত্তিহীন দেখা যায়, তাহার জবানি লেখা হইবে না। এই নিয়ম পালন করার জন্য সময় কিছু বেশি লাগিত। কিন্তু জবানবন্দিগুলি অনেকটা সত্য ও প্রমাণ-যোগ্য হইত।

এই জবানবন্দি লওয়ার সময় ডিটেকটিভ পুলিসের দুই-একজন কর্মচারী উপস্থিত থাকিত। এই কর্মচারীদের আসা বন্ধ করা যাইত। কিন্তু আমরা গোড়াতেই স্থির করিয়া লইয়াছিলাম যে, ইহাদিগকে আসিতে দেওয়া বন্ধ করিব না। কেবল ইহাই নহে, উহাদের সঙ্গে বিনীতভাবে ব্যবহার করিব এবং

যে খবর দেওয়া যায় সে খবরও দিব। উহাদের চোখের সামনে সমস্ত জবানবন্দি লওয়া হইত। তাহাতে লাভ এই হইল যে, লোকের মধ্যে খুব নির্ভীকতা দেখা দিল। এক দিক দিয়া পুলিসের ভয় যেমন গেল, তেমনি অপর দিকে পুলিসের উপস্থিতির জন্য অতিশয়োক্তির ভয়ও কমই রহিল। মিথ্যা বলিলে কর্মচারী মুশকিলে ফেলিবে এই ভয়ে তাহাদিগকে সাবধানতার সঙ্গে জবানবন্দি দিতে হইত।

আমার কাজ ছিল নীলকরদের উত্ত্যক্ত না করিয়া বিনয়ের দ্বারা তাঁহাদের জয় করা। সেইজন্য যাঁহার নামে বিশেষ অভিযোগ আসিত, তাঁহাকে পত্র দিতাম এবং তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চেষ্টা করিতাম। আমি নীলকর মণ্ডলের সঙ্গেও দেখা করিতাম এবং রায়তদের অভিযোগ তাঁহাদিগকে জানাইয়া তাঁহাদের বক্তব্য শুনিয়া লইতাম। তাঁহাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে তিরস্কার করিতেন, কেউ উদাসীন থাকিতেন, আবার কেউ বা বিনয় প্রকাশ করিতেন।

১৭

সঙ্গীগণ

ব্রজকিশোরবাবু ও রাজেন্দ্রবাবু মিলিয়া এক অদ্বিতীয় জুড়ি হইয়াছিলেন। তাঁদের তুলনা হয় না। তাঁহারা না হইলে আমার এক পা চলারও শক্তি ছিল না। তাঁহাদের ভালবাসা আমাকে এমনি অশক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহাদের শিষ্যই বলুন, আর সঙ্গীই বলুন—শম্ভুবাবু, অনুগ্রহবাবু, ধরণীবাবু, রামনবমীবাবু ইত্যাতি উকিলেরা প্রায় সকল সময়ে আমার সঙ্গেই থাকিতেন। বিন্ধ্যবাবু ও জনকধারীবাবু মধ্যে মধ্যে আসিতেন। বিহারী সঙ্ঘ ইঁহারাই ছিলেন। ইঁহাদের প্রধান কাজ ছিল জবানবন্দি লওয়া।

অধ্যাপক কৃপলানী আমাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার লোক নন। তিনি সিন্ধী হইলেও বিহারীদের চেয়েও বেশি বিহারী ছিলেন। আমি এরূপ সেবক খুব কমই দেখিয়াছি। এমন কিছু কিছু লোক থাকেন, যাঁহারা যখন যে প্রদেশে যান সেই প্রদেশের সঙ্গে এমন ভাবেই মিশিয়া যান যে, মূলতঃ তাঁহারা যে অন্য প্রদেশের লোক, তা কাহাকেও জানিতে দেন না; কৃপলানী এইরূপ অল্পসংখ্যকদের মধ্যে একজন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল দারোয়ানী করা। দর্শনার্থীদের কাছ হইতে আমাকে বাঁচানোও এই সময় তাঁর জীবনের এক

সার্থকতা বলিয়া তিনি গণ্য করিয়াছিলেন। কাহাকেও মিষ্ট কথায় আমার কাছে আসা আটকাইতেন, আবার কাহাকেও বা অহিংসভাবে ধমকাইয়া ঠেকাইতেন। রাত হইলে তিনি অধ্যাপকের ব্যবসা আরম্ভ করিতেন ও তাঁহার ইতিহাসের জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার সঙ্গীদের পরিতৃপ্ত করিতেন। আর কোনও ভীরু স্বভাবের লোক আসিয়া পড়িলে তাহার ভয় ভাঙ্গাইয়া দিতেন।

মৌলানা মজহরুল হক আমার সাহায্যকারী হিসাবে নাম লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন ও মাসের মধ্যে দুই-একবার করিয়া আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। তাঁহার তখনকার দিনের ঠাট ও জাঁকজমক এবং আজকার দিনের সাদাসিধা চাল-চলনের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। আমাদের কাছে আসিয়া তিনি নিজের হৃদয় খুলিয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার সাহেবীয়ানার জন্য বাইরের লোকের মনে হইত যে, তিনি আমাদের মত নন।

যেমন আমার অভিজ্ঞতা বাড়িতেছিল তেমনি আমার মনে হইতেছিল যে, চম্পারণে বরাবর কাজ করিতে হইলে গ্রামের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আবশ্যক। লোকের অজ্ঞতা দেখিয়া দয়া হইত। গ্রামের ছেলেরা ঘুরিয়া বেড়াইত, অথবা মাত্র দুই-তিনটা পয়সার জন্য নীল-ক্ষেতে সারাদিন মজুরি করিত। এই সময় পুরুষদের মজুরি দশ পয়সার বেশি ছিল না। স্ত্রীলোকদের মজুরি ছিল ছয় পয়সা ও বালকদের তিন পয়সা। যে চার আনা মজুরি পায় সে কৃষক ত ভাগ্যবান।

সঙ্গীদের সঙ্গে যুক্তি করিয়া গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় খোলা স্থির করিলাম। শর্ত এই যে, সেই সেই গ্রামের প্রধানেরা মিলিয়া স্কুল-গৃহ নির্মাণ ও শিক্ষকের খোরাকি দিবেন। আর তাহার অন্য বেতনাদি খরচা আমাদের দিতে হইবে। এখানে গ্রামের লোকদের হাতে পয়সা না থাকিলেও, লোকের শস্যাদি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। সেই জন্য লোকে ধান গম প্রভৃতি দিতে প্রস্তুত হইল।

শিক্ষক কোথা হইতে পাওয়া যাইবে—এ এক কঠিন প্রশ্ন। বিহারের শিক্ষকদের মধ্যে কেহ কম বেতন লইবে অথবা বিনা বেতনে কাজ করিবে, এমন কাহাকে পাওয়া অসম্ভব ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল যে, সাধারণ শিক্ষকের হাতে ছেলেদের ফেলিয়া দেওয়া হইবে না। শিক্ষকের লেখাপড়ার বিদ্যা কম থাকে ত থাকুক, কিন্তু চরিত্রবান হওয়া চাই।

এই কাজে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকদের জন্য আমি প্রকাশ্যভাবে আবেদন করিলাম। তাহার উত্তরে গঙ্গাধররাও দেশপাণ্ডে, বাবাসাহেব সোমন ও পুণ্ডরীককে পাঠাইলেন। বোম্বাই হইতে অবন্তিকাবাঈ গোখলে আসিলেন।

আমি ছোটেলাল, সুরেন্দ্রনাথ ও আমার ছেলে দেবদাসকে আনাইলাম। এই সময় আমি মহাদেব দেশাই ও নরহরি পরীখকেও পাই। মহাদেব দেশাইএর পত্নী দুর্গা বেন ও নরহরি পরীখের পত্নী মণি বেনও আসিলেন। কস্তুরবাকেও আমি সংবাদ দিয়া আনিলাম। ইঁহাদের দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী সঙ্ঘ পূর্ণ হইল। শ্রীমতী অবন্তিকা বাঈ ও শ্রীমতী আনন্দী বাঈ শিক্ষিত। কিন্তু দুর্গা বেন ও মণি বেন পরীখের ত সামান্য গুজরাটী জ্ঞান ছিল, আর কস্তুরবার তাহাও ছিল না। এই মহিলারা হিন্দি ভাষা বালকদের কেমন করিয়া শিখাইবেন?

যুক্তি পরামর্শ করিয়া আমি তাঁহাদের বুঝাইলাম যে, বালকদের ব্যাকরণ অথবা লিপিতে পড়িতে শিখাইতে হইবে না। তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৎ আচার ব্যবহার শেখানোই তাঁহাদের কাজ হইবে। হিন্দী, মারাঠী ও গুজরাটী লিপির মধ্যে খুব বড় প্রভেদ নাই, ইহাও তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম এবং প্রথম শিক্ষার্থীদের অক্ষরের আঁচড় কাটিতে ও এক দুই লিখিতে শিখানো বড় বিশেষ কঠিন কাজ নয় বলিলাম। ফলে দেখা গেল এই শিক্ষিকারা খুব সুন্দরভাবে কাজ চালাইতে লাগিলেন। তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আসিল ও তাঁহারা নিজেরা এই কাজে আনন্দ পাইতে লাগিলেন। অবন্তি বেনের পাঠশালা ত আদর্শ ছেলের স্থান লইয়াছিল। তিনি তাঁহার শিক্ষাশালার প্রাণস্বরূপ ছিলেন, যদিও তাঁহার অসুবিধা অনেক ছিল। এই স্ত্রীলোকদের সাহায্যে গ্রামের স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

কিন্তু কেবল শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টাতেই আমার কাজ শেষ হওয়ার নয়। গ্রামের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার শেষ ছিল না। গলিগুলিতে ময়লা, কূপের পাশে কাদা ও দুর্গন্ধ, আঙ্গিনার দিকে তাকানো যায় না। বয়স্ক লোকদেরও পরিচ্ছন্নতা শিখানো দরকার ছিল। চম্পারণের লোকদের প্রায়ই পীড়াগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। যতটা সংস্কার করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করা হইবে ও এইভাবে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রবেশ করা হইবে, আমার এই সংকল্প ছিল। এই কাজে ডাক্তারের সাহায্যের দরকারও ছিল। সেইজন্য আমি গোখলের সোসাইটির কাছ হইতে ডাক্তার দেবকে চাহিলাম। তাঁহার সঙ্গে আমার প্রীতির বন্ধন পূর্ব হইতেই ছিল। ছয় মাসের জন্য তাঁহার সেবা পাওয়ার সুবিধা আমাদের হইল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাজ করিতে হইবে।

সকলের সঙ্গে এই বোঝাপড়া হইয়াছিল যে, কেউ নীলকরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আলোচনা করিবেন না, রাজনীতির আলোচনা করিবেন না।

যাহারা অভিযোগ জানাইতে চায় তাহাদের আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। কেউ নিজের নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে এক পাও যাইবেন না। চম্পারণে এই সঙ্গীরা এই সকল নিয়ম আশ্চর্যরূপে পালন করিয়াছিলেন। কেউ নির্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া একবারও শুনিয়াছি—একথা মনে পড়ে না।

১৮

গ্রামে প্রবেশ

সাধারণতঃ প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ভার একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের উপর থাকিত। তাঁহাদের হাত দিয়াই ঔষধ দেওয়া ও সংস্কারের কাজ করা হইত। স্ত্রীলোকদের সাহায্যেই গ্রামের স্ত্রীলোকের ভিতর কাজ করানো হইত। ঔষধ দেওয়ার কাজ খুব সহজ করিয়া ফেলা হইয়াছিল। রেড়ির তেল কুইনাইন ও একপ্রকার মলম প্রত্যেক স্কুলে রাখা হইত। জিভে যদি ময়লা দেখা যায় বা কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তবে রেড়ির তেল দিতে হইবে। জ্বর হইলে প্রথম রেড়ির তেল দিয়া পরে কুইনাইন দেওয়া হইত। ফোঁড়া পাঁচড়া হইলে উহা ধুইয়া উপরে মলম লাগানো হইত। খাওয়ার ঔষধ বা মলম সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে দেওয়া হইত না। কোনও গুরুতর পীড়া হইলে অথবা রোগ বুঝা যাইতেছে না এমন হইলে, ডাক্তার দেবের জন্য অপেক্ষা করা হইত। ডাক্তার নির্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন স্থানে গিয়া দেখিয়া আসিতেন। এইরূপ সহজ ব্যবস্থার সুবিধা লোকে বুঝিতে পারিতেছিল। কঠিন রোগ অল্পই ছিল। সেজন্য বড় বিশেষজ্ঞের কিছু আবশ্যকতা ছিল না—একথা মনে রাখিলে উপরের ব্যবস্থা কাহারও হাস্যজনক মনে হইবে না। লোকের কাছে ইহা মোটেই হাসিয়া উড়াইবার মত জিনিস ছিল না।

স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ কঠিন। লোকে বদ অভ্যাস ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। যে রোজ নিজের হাতে ক্ষেতের কাজ করে, সেও নিজের হাতে নিজেদের আবর্জনা সাফ করিতে প্রস্তুত নয়। ডাক্তার দেব পরাজয় স্বীকার করার পাত্র নহেন। তিনি নিজের হাতে ও স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা একটি গ্রাম সাফ করিতে মন দিলেন। লোকের উঠান হইতে আবর্জনা দূর করিলেন, গ্রামের রাস্তা সাফ করিলেন, কূপের আশপাশের গর্ত বুজাইলেন, কাদা সাফ করিলেন ও গ্রামের লোককে ভালবাসার সুরে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

কোনও কোনও স্থানে লোকেরা লজ্জা পাইয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। কয়েকটি স্থানে লোকেরা এত উৎসাহিত হইয়াছিল যে, আমার যাওয়ার জন্য মোটরের রাস্তা পর্যন্ত নিজেদের হাতে তৈরি করিয়া দিয়াছিল। এই সকল মধুর অভিজ্ঞতার সঙ্গে লোকের অমনোযোগিতার তিক্ত অভিজ্ঞতাও জড়িত ছিল। আমার মনে আছে, একটি গ্রামের লোকদের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য সংস্কারের কথা শুনিয়া অসন্তোষ উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে আর একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না এবং একথা আমি অনেক মহিলা সভায় বলিয়া আসিয়াছি। ভীতিহারোয়া একটি ছোট গ্রাম। তার কাছেই আবার তার চেয়েও ছোট গ্রাম আছে। সেই স্থানের কতকগুলি স্ত্রীলোকের কাপড় বড়ই ময়লা দেখা গেল। আমি কস্তুরবাকে বলিলাম যে, এই ভগ্নীদের কাপড় সাফ করার কথা যেন বলিয়া দেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে কথা বলিলেন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন তাঁহাকে নিজের কুটীরে লইয়া গেল ও বলিল—"তুমি দেখ, এখানে কোনও বাক্স প্যাঁটরা নাই যাতে কাপড় থাকিতে পারে। যে শাড়ীখানা পরিয়া আছি, আমার কেবলমাত্র সেইখানাই আছে। আমি কেমন করিয়া কাপড় ধুইব? মহাত্মাজীকে বলিও যে, যদি কাপড় পাঠান তবে রোজ স্নান করিতে ও কাপড় বদলাইতে প্রস্তুত আছি।" ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে এই রকম দরিদ্র কুটীর কিছু আশ্চর্য নয়! অসংখ্য কুটীরে আসবাবপত্র, বাক্স-প্যাঁটরা, কাপড়-চোপড় নাই। অসংখ্য লোক কেবল এক বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিয়া দিন যাপন করিতেছে।

আর একটা অভিজ্ঞতাও উল্লেখযোগ্য। চম্পারণে বাঁশের ও ঘাসের অভাব নাই। ভীতিহারোয়ার লোকেরা যে স্কুলের ঘর তৈরি করিয়া দিয়াছিল তাহাও বাঁশ ও ঘাসের। কোনও লোক রাত্রে তাহা পোড়াইয়া দেয়। আশেপাশের নীলকরের লোকের উপরই সন্দেহ হয়। ইহার পর আবার ঐ বাঁশ ও ঘাসের ঘর তৈরি করা উচিত বোধ হইল না। এই স্কুল শ্রীসোমন ও কস্তুরবার হাতে ছিল। শ্রীসোমন ইট পোড়াইয়া ঘর তৈরি করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তাঁহার হাতে কাজ করার দৃষ্টান্ত অপর লোকেরাও অনুকরণ করিল। তাহাতে শীঘ্রই পাকা ঘর তৈরি হইল, আর আগুনে পোড়ার ভয় রহিল না।

এই প্রকারে পাঠশালা, সংস্কার ও ঔষধ দেওয়ার দ্বারা লোকের স্বেচ্ছাসেবার বিষয়ে মর্যাদা বাড়িল ও লোকের উপর ইহার প্রভাব ভাল হইল।

দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার এই কাজ স্থায়ী করার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। যে কজন স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গিয়াছিল তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্ম। অপর নূতন স্বেচ্ছাসেবক পাওয়ার অসুবিধা হইল এবং বিহার হইতে এই কাজের যোগ্য স্থায়ী সেবক পাওয়া গেল না। আমার চম্পারণের কাজ শেষ হইতেই, অন্যত্র যে কাজ অপেক্ষা করিতেছিল তাহা আমাকে টানিয়া লইয়া গেল। তাহা হইলেও এই ছয় মাসের কাজ এতদূর পর্যন্ত শিকড় বিস্তার করিয়াছিল যে, আজ পর্যন্তও তাহার প্রভাব কোনও না কোনও রূপে সক্রিয় রহিয়াছে।

১৯
উজ্জ্বল দিক

পূর্বের অধ্যায়ে লিখিত সমাজ সেবার কাজ যখন একরকম চলিতেছিল, অন্যদিকে তখনই আবার লোকের দুঃখের কথা লেখার কাজ বাড়িতেছিল। হাজার হাজার লোকের দুঃখের কাহিনী লেখা হইতেছে, ইহার ফল না হইয়া যায় কোথায়? আমার কাছে আসার লোকের সংখ্যা যেমন বাড়িতে লাগিল, নীলকরের ক্রোধও তেমনি বাড়িতে লাগিল। আমার এই অনুসন্ধান যাতে বন্ধ করা যায়, সেজন্য তাহারা ক্রমশঃ আরো সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

একদিন আমি বিহার গভর্নমেণ্টের পত্র পাইলাম। তাহার ভাবার্থ এই প্রকার—"আপনার অনুসন্ধান কার্য বড় দীর্ঘস্থায়ী হইতেছে। এখন আপনার উহা বন্ধ রাখিয়া বিহার ত্যাগ করা উচিত।" চিঠিটি নম্র হইলেও উহার অর্থ সুস্পষ্ট।

আমি লিখিলাম যে, "অনুসন্ধান দীর্ঘস্থায়ী হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও লোকের দুঃখ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমার বিহার ত্যাগ করার সম্ভাবনা নাই।"

আমার অনুসন্ধান বন্ধ করার জন্য গভর্নমেণ্টের কেবলমাত্র একটি পথই ছিল। তাহা হইতেছে এই সব লোকের অভিযোগ সত্য মানিয়া তাহার প্রতিকার করা, অথবা অভিযোগ স্বীকার করিয়া গভর্নমেণ্টের নিজ পক্ষ হইতে অনুসন্ধান কার্য চালানো। গভর্নর স্যার এডোয়ার্ড গেইট আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং নিজে অনুসন্ধান কার্য চালাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই অনুসন্ধান

সভার সভ্য হওয়ার জন্যও তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ জানান। এই সভার অন্য সদস্যদের নাম জানিয়া এবং আমি আমার সঙ্গীদের সঙ্গে যুক্তি করিয়া এই শর্তে সদস্য হইতে স্বীকার করিলাম যে, সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করিবার অধিকার আমার থাকিবে এবং সদস্য হইলেও আমি যে কৃষকদের পৃষ্ঠপোষক সে সম্পর্ক বহাল থাকিবে ও অনুসন্ধানের পর আমি যদি সঙ্গত মনে করি তবে তখন রায়তদিগকে ইচ্ছামত চালাইবার স্বাধীনতা আমার থাকিবে।

স্যার এডোয়ার্ড গেইট এই শর্ত ন্যায্য গণ্য করিয়া ইহাতে সম্মত হইলেন। স্বর্গগত স্যার ফ্রাঙ্কস্লাই এই সভার সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। অনুসন্ধান সমিতি কৃষকদের সমস্ত অভিযোগ সত্য বলিয়া নির্ধারণ করিলেন। তাঁহারা নীলকরের অবৈধভাবে গৃহীত টাকার নির্দিষ্ট ভাগ ফেরত দেওয়ার ও "তিন কাঠিয়া" প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার পরামর্শ দিলেন।

স্যার এডোয়ার্ড গেইট এই রিপোর্ট সর্বসম্মত করিতে ও পরে এই অনুযায়ী আইন প্রস্তুত করিতে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি দৃঢ় না থাকিতেন, অথবা তাঁহার কার্যকুশলতার যদি পুরা ব্যবহার না করিতেন, তবে এই রিপোর্টে সকলে একমত হইতেন না এবং অবশেষে যে আইন পাস হইয়াছিল তাহাও হইতে পারিত না। নীলকরদের ক্ষমতা প্রভূত ছিল। রিপোর্ট সত্ত্বেও নীলকরদের কেউ কেউ এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্যার এডোয়ার্ড গেইট শেষ পর্যন্ত দৃঢ় ছিলেন এবং অনুসন্ধান সভার সমস্ত মন্তব্য কাজে পরিণত করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে এক শত বৎসর ধরিয়া প্রচলিত "তিন কাঠিয়া" প্রথা উঠিয়া গেল, এবং তাহার সঙ্গে নীলকর-রাজ্যও অস্তমিত হইল। যে রায়তেরা কেবল পিষ্ট হইত, তাহারা নিজেদের শক্তি সম্পর্কে কিছু সচেতন হইল এবং নীলের দাগ যে ধোয়া যাইবে না—এ ভুল দূর হইল।

চম্পারণে আরব্ধ সংগঠন-কার্য সমান ভাবে চালাইয়া আরো কয়েক বৎসর কাজ করিতে, অনেকগুলি পাঠশালা খুলিতে এবং আরো অনেক গ্রামে প্রবেশ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমার মনের ইচ্ছা ঈশ্বর অনেকবার পূর্ণ হইতে দেন নাই। আমি স্থির করিলেও আমাকে দৈব অন্য কাজে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

২০

শ্রমিকদের সংস্পর্শে

যখন চম্পারণে আমি কমিটির কাজ শেষ করিতেছিলাম, তখন খেড়া হইতে মোহনলাল পাণ্ডা ও শঙ্করলাল পারীখের পত্রে খেড়া জেলায় ফসল না হওয়ার সংবাদ পাইলাম। সেখানকার যে সব লোক খাজনা দিতে অক্ষম, তাহাদের আন্দোলন পরিচালনা করিতে তাঁহারা আমাকে অনুরোধ জানাইলেন। স্থানীয় অবস্থা অনুসন্ধান না করিয়া আমার পরামর্শ দেওয়ার ইচ্ছাও ছিল না, শক্তি ও সাহস ছিল না।

অন্য দিক হইতে শ্রীমতী অনসূয়া বাঈয়ের পত্রে আমেদাবাদে তাঁহার শ্রমিক সঙ্ঘের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। শ্রমিকদের বেতন কম। তাহাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘদিন হইতে আন্দোলন চলিতেছিল। এই আন্দোলন পরিচালনার ইচ্ছা আমার ছিল। এত দূর হইতে এই সামান্য কাজ পরিচালনা করিতে পারিব—এ বিশ্বাস আমার ছিল না। সেইজন্য সুবিধা হওয়া মাত্রই আমি আমেদাবাদ পৌঁছিলাম। আমার মনে ইচ্ছা ছিল, এই দুইটি বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই চম্পারণে আবার ফিরিয়া আসিব এবং সেখানকার গঠনমূলক কার্যের তত্ত্বাবধান করিব।

কিন্তু আমেদাবাদে পৌঁছিলে এমন কাজ আসিয়া পড়িল যে, আমি কিছুদিন পর্যন্ত চম্পারণে যাইতে পারিলাম না এবং যেসব স্কুল চলিতেছিল একটার পর একটা তাহা বন্ধ হইতে লাগিল। সঙ্গীরা ও আমি কত আকাশকুসুম রচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে সেই আকশকুসুম ধূলিসাৎ হইল।

চম্পারণে গ্রাম্য পাঠশালা ও গ্রাম্য সংস্কার ভিন্ন আমি গো-রক্ষার কাজ হাতে লইয়াছিলাম। গোশালা ও হিন্দী প্রচারের ভার মারোয়াড়ী ভাইয়েরাই লইয়াছেন—ইহা আমি সফরকালে দেখিয়াছিলাম। বেতিয়াতে এক মারোয়াড়ী ভাই নিজের ধর্মশালায় আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বেতিয়ার মারোয়াড়ী গৃহস্থেরা তাঁহাদের গোশালার কাজে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আজ গো-রক্ষা সম্বন্ধে আমার যে কল্পনা আছে তখনই তাহা গঠিত হইয়াছিল। গো-রক্ষা মানে গোবংশ বৃদ্ধি, গোজাতির সংস্কার, বলদ খাটাইয়া পরিমাণ মত কাজ লওয়া, আদর্শ দুগ্ধালয় স্থাপন ইত্যাদি। এই কাজে মারোয়াড়ী ভাইয়েরা পুরা সাহায্য করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি চম্পারণে স্থির

হইয়া বসিতে পারিলাম না বলিয়া সেই কাজ সম্পন্ন হয় নাই। বেতিয়ার গোশালা আজও চলিতেছে, কিন্তু তাহা আদর্শ দুগ্ধালয় হয় নাই। চম্পারণে বলদ খাটাইয়া আজও অতিরিক্ত কাজ লওয়া হয়। নামে হিন্দু হইয়াও লোকে বলদের উপর অতিরিক্ত অত্যাচার করে ও ধর্ম খোয়ায়—এই ক্ষোভ ও দুঃখ আমার বরাবর রহিয়া গিয়াছে। আজ যখনই চম্পারণে যাই, তখনই এই অসম্পূর্ণ কাজের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলি এবং এজন্য মারোয়াড়ী ও বিহারীদের মৃদু তিরস্কারও করি।

বিদ্যালয়গুলির কাজ কোন ও না কোনও রকমে নানাস্থানেই চলিতেছে। কিন্তু গো-সেবার কাজ তেমন করিয়া কোথাও শিকড় গাড়ে নাই। সেইজন্য ইহা ঠিকপথে চলিতে পারিতেছে না।

আমেদাবাদে খেড়ার কাজ সম্পর্কে আলোচনা যখন চলিতেছিল, তখনই শ্রমিকদের কাজ আমি হাতে লইলাম।

আমার অবস্থা বড় কঠিন ছিল। আমি জানিলাম যে, শ্রমিকদের দাবি ন্যায়সঙ্গত। শ্রীমতী অনসুয়া বেনকে তাঁহার নিজের ভাইয়ের সঙ্গে লড়িতে হইয়াছিল। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে এই দারুণ সংগ্রামে শ্রীমতী অনসূয়া বেনের ভাই শ্রীঅম্বালাল সারাভাই মালিকদের পক্ষে মুখ্যস্থান লইয়াছিলেন। মিল-মালিকদের সঙ্গে আমার একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আমার পক্ষে বিষম কাজ। তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে একটা সালিসী বসাইতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু মালিকেরা তাঁহাদের ও তাঁহাদের শ্রমিকদের মধ্যে একটা সালিসীর স্থান দেওয়ার যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেন না।

আমি শ্রমিকদের হরতাল (ধর্মঘট) করিবার পরামর্শ দিলাম। এই পরামর্শ দেওয়ার পূর্বে তাহাদের ও নেতাদের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলিয়া লইলাম। হরতাল করার এই শর্ত তাহাদের বুঝাইলাম—

১। শান্তি ভঙ্গ করিবে না।

২। যে ব্যক্তি কাজে যাইতে চায় তাহার উপর জোর করিবে না।

৩। শ্রমিকেরা ভিক্ষান্ন খাইবে না।

৪। হরতাল যত দীর্ঘই হোক্ না কেন তবু দৃঢ় থাকিবে এবং যদি পয়সা ফুরাইয়া যায় তবে, খাওয়া মাত্র যাহাতে চলে, এমন মজুরি করিবে।

এই শর্ত উহাদের প্রধানেরা বুঝিয়াছিল ও স্বীকার করিয়াছিল। শ্রমিকেরা

প্রকাশ্য সভা করিয়া স্থির করিল যে, তাহাদের দাবি যতদিন স্বীকৃত না হয় অথবা তাহাদের দাবির ন্যায়-অন্যায় স্থির করার জন্য যতদিন সালিসী না বসে, ততদিন তাহারা কাজে যোগ দিবে না।

এই হরতালের মধ্যে শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেল ও শ্রীযুত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করিলাম। শ্রীমতী অনসূয়া বেনের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমি ভালরকম পরিচয় করিয়াই লইয়াছিলাম।

হরতালকারীদের সভা প্রত্যহই নদীতীরে এক ঝাউগাছের নীচে হইতে লাগিল। সেখানে তাহারা প্রত্যেকেই প্রতিদিন হাজির হয়। আমি তাহাদের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইতাম, শান্তি রাখিতে ও আত্মসম্মান রাখিতে প্রতিদিনই পরামর্শ দিতাম। তাহারাও নিজেরা "একটেক" (প্রতিজ্ঞা-অটল) লেখা পতাকা লইয়া শহরে শোভাযাত্রা করিয়া বেড়াইত ও সভায় হাজির হইত।

এই হরতাল ২১ দিন চলিয়াছিল। তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে আমি মালিকদের সঙ্গে পরামর্শ করিতাম এবং তাঁহাদের ন্যায় আচরণ করিতে অনুনয় করিতাম।

"আমাদের প্রতিজ্ঞা কি স্থির থাকিবে না? আমাদের ও আমাদের শ্রমিকদের মধ্যে বাপ-বেটা সম্বন্ধ···তাহার মধ্যে অন্য কেউ আসিয়া পড়িলে আমরা কেমন করিয়া সহ্য করিব? ইহার মধ্যে আবার সালিসী কি?"— এইরূপ উত্তর আমি পাইতাম।

২১

আশ্রমে ক্ষণিক দর্শন

শ্রমিকদের ধর্মঘট সম্পর্কে আরো কিছু বলিবার পূর্বে একবার আশ্রমের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার আছে। চম্পারণে থাকা কালেও আমি আশ্রমকে বিস্মৃত হইতে পারি নাই। কখন কখন আসা-যাওয়া করিতাম।

কোচরব আমেদাবাদের পার্শ্বেই ছোট গ্রাম। কোচরবে মড়ক দেখা দিল। ছেলেপিলেদের সেই বস্তিতে নিরাপদে রাখা সম্ভবপর ছিল না। আশ্রমে পরিচ্ছন্নতার নিয়ম খুব পালিত হইলেও আশপাশের অপরিচ্ছন্নতা হইতে আশ্রমকে মুক্ত রাখা অসম্ভব ছিল। কোচরবের লোকদের দিয়া স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার নিয়ম পালন করানো অথবা কোচরবের লোকদের সেবা করার মত

শক্তি এসময় আমাদের ছিল না। আমাদের আদর্শ ছিল—আশ্রমকে শহর বা গ্রাম হইতে দূরে স্থাপিত করা, তবে এত দূরে নয় যে সেখানে পৌঁছিতে কষ্ট হয়। কোনও দিন আশ্রমকে আশ্রম-রূপে নিজস্ব খোলা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প ছিল।

মড়ককেই কোচরব ছাড়ার নোটিস বলিয়া গণ্য করিলাম। শ্রীযুত পুঞ্জাভাই হীরাচন্দ আশ্রমের সঙ্গে খুব নিকট সম্পর্ক রাখিতেন ও আশ্রমের ছোটবড় সেবা নিরভিমানে ও শুদ্ধভাবে করিতেন। তিনি আমেদাবাদের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি আশ্রমের জন্য উপযুক্ত জমি খুঁজিয়া দেওয়ার ভার লইলেন। কোচরবের উত্তর-দক্ষিণ ভাগ আমি তাঁহার সঙ্গে ঘুরিলাম। তারপর উত্তর দিকে ৩।৪ মাইল দূরে যদি জমি পাওয়া যায় তবে তাহার খবর লইতে বলিলাম। এখন যেখানে আশ্রম আছে সেই জমি তিনি খোঁজ করিয়া আসিলেন। উহা জেলের কাছে ছিল বলিয়া আমার পক্ষে খুব প্রলোভনের বিষয় ছিল। কারণ সত্যাগ্রহ-আশ্রমবাসীদের কপালে জেল ত লেখা আছেই। এইরূপ বিশ্বাস ছিল বলিয়া জেলের প্রতিবেশী হইতে আমার ভাল লাগিল। আমি জানিতাম, চারিদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আছে এমন স্থান দেখিয়াই জেল বসানো হয়।

দিন আটের মধ্যেই জমি কেন হইয়া গেল। জমির উপর একটা ঘর কি একটা গাছও ছিল না। নদীর তীর এবং নির্জন বলিয়া ইহা পছন্দসই ছিল। আমরা তাঁবুতে থাকা স্থির করিলাম। রান্নার জন্য একটা করোগেটের কাজ চালানো মত ছাপ্পর বাঁধিয়া লইয়া ধীরে ধীরে ঘর তৈরি করা স্থির করিলাম।

এই সময় আশ্রমের বাসিন্দার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ছোট-বড় ও স্ত্রী-পুরুষ লইয়া ৪০ জন ছিলেন। সকলেই এক পাকশালায় খাইতেন বলিয়া সুবিধা ছিল। আশ্রম সরাইয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল আমার, আর সেই সিদ্ধান্তকে রূপায়িত করার কাজ ছিল মগনলালের।

স্থায়ী গৃহাদি নির্মাণের পূর্বে অসুবিধার শেষ ছিল না। সম্মুখে বর্ষাকাল। জিনিসপত্র সমস্তই ৪ মাইল দূরবর্তী শহর হইতে আনিতে হইত। এই পতিত জমিতে সাপ ত ছিলই। এমন জায়গায় ছেলেপিলে লইয়া বাস করার বিপদ কম ছিল না। সাপ না মারার প্রথা ছিল। কিন্তু সাপের ভয় হইতে মুক্ত তখন কেউ আমাদের মধ্যে ছিল না, আজও নাই।

হিংস্র জীবদের হত্যা না করার নিয়ম 'ফিনিক্স', 'টলস্টয়' ও 'সবরমতী'—এই তিন আশ্রমেই যথাসাধ্য পালন করা হইতেছে। এই তিন স্থানেই পতিত জমিতে বসবাস করিতে হইতেছে, তিন জায়গাতেই সর্পাদির উপদ্রব খুব বেশি ছিল। তাহা হইলেও আজ পর্যন্ত একজনও মারা যায় নাই। আমার মত বিশ্বাসী মানুষ ইহার মধ্যে ঈশ্বরের হাত ও তাঁহার দয়া দেখিতে পায়। ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করেন না, মানুষের প্রতিদিনের কাজে তাঁহার হাত দেওয়ার আবশ্যকতা নাই, এই প্রকার নিরর্থক শঙ্কা যেন কেউ না করে। এই বস্তু অনুভবের বিষয়। এ ছাড়া অন্য ভাষায় ব্যক্ত করার মত জ্ঞান আমার নাই। লৌকিক ভাষায় ঈশ্বরের বিভূতি ব্যক্ত হইলেও, আমি জানি যে, তাঁহার কাজ বর্ণনাতীত। কিন্তু মরণশীল মানুষ যদি তাঁহার কাজের বর্ণনা করিতে চায়, তবে নিজের অসম্পূর্ণ বাক্‌শক্তি মাত্রই তাহার সম্বল। সাধারণতঃ সাপ না মারিলেও, এতগুলি লোকের পঁচিশ বৎসর সর্পাঘাতাদি হইতে বাঁচিয়া যাওয়া, আকস্মিক ঘটনা বলিয়া না মানিয়া ঈশ্বর-কৃপা মানা যদি ভুল হয়, তবে সে ভুল পোষণ করার যোগ্য।

যখন শ্রমিকদের হরতাল হয় তখন আশ্রমের গৃহাদির ভিত্তি গাঁথা হইতেছিল। তখন আশ্রমের প্রধান কাজ ছিল কাপড় বোনা। সুতাকাটা তখন পর্যন্তও ঠিক করিয়াই উঠিতে পারি নাই। বয়নশালা প্রথমে নির্মাণ করা স্থির হইয়াছিল। সেই জন্য তাহার ভিত্তি নির্মিত হইতেছিল।

২২

অনশন

শ্রমিকেরা প্রথম দুই সপ্তাহ যথেষ্ট সাহস দেখাইল। শান্তিও খুব বজায় রাখিয়াছিল। প্রতিদিনের সভায় বহু শ্রমিক উপস্থিত হইত। আমি প্রতিদিন তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিতাম। "আমরা মরিব তবু আমাদের 'একটেক' (প্রতিজ্ঞা) কখনো ছাড়িব না"—এই কথা প্রতিদিনই তাহারা চিৎকার করিয়া বলিত।

অবশেষে তাহারা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। যেমন দুর্বল লোক হিংস্র হয়, তেমনি দুর্বল হওয়ার পর, যাহারা মিলে কাজে যাইত তাহাদের প্রতি তাহারা দ্বেষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল—

কে কখন জবরদস্তি আরম্ভ করে। দিনের পর দিন সভায় হাজিরা কমিতে লাগিল। তাহাদের মুখে-চোখে উদাসীনতা ফুটিয়া উঠিল। শেষে আমার কাছে খবর আসিল যে, তাহারা সংকল্প ত্যাগ করার উপক্রম করিয়াছে। আমি ব্যথিত হইলাম এবং এই সময় আমার ধর্ম কি তাহা ভাবিতে লাগিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্রমিকদের হরতালের অভিজ্ঞতা আমার ছিল। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা নূতন। যে প্রতিজ্ঞার প্রেরণা আমার দ্বারাই দেওয়া হইয়াছে, যে প্রতিজ্ঞায় আমি প্রতিদিন সাক্ষী হইয়াছি, সে প্রতিজ্ঞা কেমন করিয়া ভাঙ্গিতে দেওয়া যায়? এই প্রকার বিচারকে অভিমানও বলা যায়, অথবা শ্রমিকদের প্রতি ও সত্যের প্রতি প্রেম বলিয়াও গণ্য করা যায়। সেদিন সকালে আমি শ্রমিকদের সভায় আসিয়াছি। আমার মনে কিছুই স্থির ছিল না যে, কি করিব। কিন্তু সভায় আমার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইয়া গেল—"যতদিন শ্রমিকেরা ফিরিয়া না দাঁড়ায়, যতদিন মিটমাট না হয়, ততদিন হরতাল চলিবে ও ততদিন আমাকে উপবাস করিতে হইবে।"

উপস্থিত শ্রমিকেরা স্তম্ভিত হইল। অনসূয়া বেনের চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। শ্রমিকেরা বলিয়া উঠিল—"তোমার নয়, আমাদেরই উপবাস করা উচিত, তোমাকে উপবাস করিতে দেওয়া হইবে না। আমাদিগকে মাফ কর, আমরা প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"

আমি বলিলাম—"তোমাদের উপবাস করার আবশ্যকতা নাই। তোমরা যদি তোমাদের প্রতিজ্ঞা পালন কর তাহা হইলেই যথেষ্ট। আমাদের কাছে পয়সা নাই, আমরা শ্রমিকদের ভিক্ষান্ন খাওয়াইয়া হরতাল চালাইব না। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মজুরি আরম্ভ কর, যাহাতে কোনও রকমে তোমাদের খাওয়া জোটে। তাহা হইলে আমরা যতদিন খুশি হরতাল চালাইতে পারিব। তোমরাও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে। আর আমার উপবাসও মিটমাট হইলেই ভাঙ্গিবে।" বল্লভভাই শ্রমিকদের জন্য মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু সেখানে কিছু কাজের আশা পাওয়া গেল না। মগনলাল বলিলেন—"আশ্রমের বয়নশালার মেঝে বালি ভরাট করিতে হইবে। তাহাতে অনেক মজুরকে কাজ দেওয়া যাইবে।" শ্রমিকেরা সেই কাজ করিতে প্রস্তুত হইল। অনসূয়া বেন প্রথমে ঝুড়ি ধরিলেন এবং তিনি নদী হইতে বালি মাথায় করিয়া আনিতেই শ্রমিকদল ঐ কাজে লাগিয়া গেল। এই দৃশ্য দেখার মত। শ্রমিকদের মধ্যে নতুন শক্তি আসিল, যাহারা তাহাদিগকে হিসাব

করিয়া পয়সা বিলি করিতেছিল, তাহাদের কাজ শেষ করা কঠিন হইয়া উঠিল।

এই উপবাসে এক ক্রটি ছিল। মালিকদের সঙ্গে আমার যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল তাহা আমি পূর্বেই লিখিয়াছি। সেই জন্য এই উপবাস তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবেই। সত্যাগ্রহী হিসাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমার উপবাস করা চলে না, একথা আমি জানিতাম। তাঁহাদের উপর উপবাসের যে প্রভাব পড়িবে তাহা সেখানে না পড়িয়া শ্রমিকদের উপরেই পড়া উচিত। প্রায়শ্চিত্ত মালিকদের দোষের জন্য নয়, শ্রমিকদের দোষের জন্যই আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি শ্রমিকদের প্রতিনিধি ছিলাম, সেই জন্য তাহাদের দোষে আমিও দোষী হই। মালিকদের কাছে আমার অনুনয় করার কথা, তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপবাস করা ত জোর করার সামিল। কিন্তু তাহা হইলেও আমার উপবাসের প্রভাব তাঁহাদের উপর পড়িবেই ইহাও আমি জানিতাম। কিন্তু উপায় ছিল না। আমার উপবাস না করিয়া থাকার শক্তিই ছিল না। এই প্রকার ক্রটিপূর্ণ উপবাস করা আমার ধর্ম বলিয়া আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

মালিকদের আমি বুঝাইলাম—"আমার উপবাস বশতঃ আপনাদের পথ এতটুকুও ছাড়িতে হইবে না।" তাঁহারা আমাকে মিঠা-কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন। তাঁহাদের শুনাইবার অধিকারও ছিল।

শেঠ অম্বালাল এই হরতালের বিপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ়তা আশ্চর্য ধরনের ছিল। মিটমাটের বিরুদ্ধে তাঁহার এই দৃঢ়তা আমার ভাল লাগিয়াছিল। তাঁর বিরুদ্ধে লড়া আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় ছিল। তাঁহার সঙ্গে বিরোধ করিতে যাহারা সহসা অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদেরই পক্ষ হইয়া তাঁহার উপর উপবাসের প্রভাব ফেলায় আমার পীড়া বোধ হইল। তাঁহার পত্নী সরলা দেবী আমাকে ভাইয়ের মত ভালবাসিতেন। আমার উপবাসের জন্য তিনি যে দুঃখ পাইতেছিলেন তাহা দেখা আমার পক্ষে অসহনীয় ছিল।

আমার উপবাসের প্রথম দিন অনসূয়া বেন, অন্যান্য অনেক বন্ধু ও শ্রমিক সঙ্গে সঙ্গে উপবাস করিয়াছিলেন। পরের দিন আমার সঙ্গে উপবাস করা হইতে তাঁহাদের নিবৃত্ত করিয়াছিলাম। তাঁহাদিগকে বুঝানো শক্ত হইয়াছিল। তবু এই প্রকারে চারিদিকের পরিবেশ প্রেমময় হইয়াছিল। মিলের মালিকেরা কেবল আমার প্রতি দয়ার বশবর্তী হইয়া মিটমাটের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। অনসূয়া বেন তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে লাগিলেন। শ্রীযুত আনন্দ

শঙ্কর ধ্রুব মাঝখানে আসিয়া পড়িলেন। তাহার পর তাঁহারা সালিসী বসাইলেন। হরতালের অবসান হইল। আমাকে তিন দিন উপবাস করিতে হইয়াছিল। মালিকেরা শ্রমিকদের মধ্যে মিঠাই বিতরণ করিয়াছিলেন। ২১ দিনে এই হরতাল শেষ হয়। মিটমাট সূচক এক সভা হয়। তাহাতে মিলের মালিকগণ ও বিভাগীয় কমিশনার হাজির ছিলেন। কমিশনার শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেন—"গান্ধী যাহা বলেন, তোমাদের সব সময় তাহাই করা উচিত।" এই মিটমাটের অল্পদিন পরেই আমাকে তাঁহার বিরুদ্ধেই দাঁড়াইতে হয়। সময় বদলাইল বলিয়া তিনিও বদলাইয়া গেলেন। তিনি খেড়ার পাটীদারদের বলিতে লাগিলেন—আমার পরামর্শ তাহারা যেন না শোনে।

এই মিটমাট সম্পর্কে একটি সরস অথচ করুণা-উদ্দীপক বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। মালিকেরা প্রচুর মিঠাই তৈরি করাইয়াছিলেন। কি করিয়া উহা পরিবেশন করা যায়, সে সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উঠিল। যে ঝাউগাছের তলায় মজুরেরা প্রতিজ্ঞা লইয়াছিল, সেখানেই মিঠাই বিতরণ করা ভাল। এত লোকের উপযুক্ত অন্য সুবিধাজনক স্থান পাওয়া যাইবে না বলিয়া সেই খোলা মাঠেই মিঠাই বিতরণ করা স্থির হয়। আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, ২১ দিন পর্যন্ত যাহারা নিয়ম পালন করিয়া আছে, তাহারা এ সময়ে অবশ্যই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মিঠাই লইবে, অধীর হইয়া মিঠাইয়ের উপর আসিয়া পড়িবে না। দুই-তিনবার মিঠাই বিতরণ করার চেষ্টা নিষ্ফল হইল। লাইন করিয়া দাঁড় করাইয়া দুই তিন মিনিট স্থির রাখা হয়, তারপরই লাইন ভাঙ্গিয়া ভিড় হইয়া যায়। মজুরদের প্রধানেরা খুব চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মজুরেরা তারপর ভিড় করিয়া মিঠাইয়ের উপর গিয়া পড়ে ও কতক মিঠাই মাটিতে পড়িয়া নষ্ট হয়। ফলে ময়দানে বিতরণ বন্ধ করিতে হয় ও অতি কষ্টে যতটা মিঠাই বাঁচানো গিয়াছিল তাহা শ্রীযুত অম্বালালের মির্জাপুরের বাংলোয় লইয়া যাওয়া হয়। তাহার পরের দিন এই মিঠাই বাংলোর মাঠে বিতরণ হয়।

এই ব্যাপার স্পষ্টতঃই হাস্যকর। 'একটেকে'র ঝাউগাছের তলায় মিঠাই বিতরণ করা হইবে—ইহা শুনিয়া আমেদাবাদের ভিখারীরা সব সেখানে জড় হইয়াছিল ও তাহারাই লাইন ভাঙ্গিয়া মিঠাইয়ের উপর হুড়মুড় করিয়া পড়িতে চেষ্টা করিতেছিল—ইহাই ইহার করুণ দিক।

এই দেশ ক্ষুধায় এত পীড়িত যে, ভিখারীর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে ও

তাহাদের আহার পাওয়ার জন্য ব্যগ্রতা সাধারণ মর্যাদাবোধ লোপ করিয়া দিয়াছে। ধনীরা এই ভিখারীদের জন্য কাজের ব্যবস্থা না করিয়া বিনাবিচারে তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া পুষিতেছেন।

২৩

খেড়ায় সত্যাগ্রহ

শ্রমিকদের হরতাল শেষ হওয়ার পর আমি নিঃশ্বাস লওয়ারও অবকাশ পাই নাই, অমনি খেড়া জেলার সত্যাগ্রহের কাজ হাতে লইতে হয়। খেড়া জেলায় দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় খাজনা আদায় মাফ করার জন্য খেড়ার পাটীদারেরা (জোতদাররা) আন্দোলন করিতেছিল। এই বিষয়ে শ্রীযুত অমৃতলাল ঠক্কর অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিয়াছিলেন। আমি কোনও নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে কমিশনারের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। শ্রীযুত মোহনলাল পাণ্ডা ও শ্রীযুত শঙ্করলাল পরীখ এজন্য খুব পরিশ্রম করিতেছিলেন। ৺গোকুলদাস কহান দাস পারেখ ও শ্রীযুত বিঠলভাই প্যাটেলের সাহায্যে তাঁহারা কাউন্সিলে খাজনা মাফ করার জন্য খুব আন্দোলন করিতেছিলেন। সরকারের কাছে একাধিক প্রতিনিধিদলের ডেপুটেশন গিয়াছিল।

এই সময় আমি গুজরাট সভার সভাপতি ছিলাম। সভার পক্ষ হইতে কমিশনার ও গভর্নরের কাছে দরখাস্ত পাঠাই, টেলিগ্রাম করি এবং তাঁহাদের কাছ হইতে অপমান সহ্য করি। তাঁহারা সভার উপর যে ধমক চালান তাহা চুপ করিয়া হজম করি। সেই সময়কার সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহার এখন হাস্যজনক মনে হয়। তাঁহাদের সে সময়কার তাচ্ছিল্যযুক্ত ব্যবহার এখনকার দিনে অসম্ভব লাগে

স্থানীয় লোকের আবেদন এত যুক্তিসঙ্গত ছিল, এত সামান্য ছিল যে, উহা বিরোধিতা করার যোগ্যই ছিল না। যে বৎসর চার আনা বা চার আনার কম ফসল হয়, সে বৎসর খাজনা মাফ হওয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু এখানে সরকারের কর্মচারীদের আন্দাজে ফসল চার আনার বেশি হইয়াছিল। স্থানীয় লোকের দিক হইতে যে প্রমাণ ছিল তাহাতে ফসল চার আমার কম ধরাই উচিত। কিন্তু সরকার তাহা মানিবেন কেন? স্থানীয় লোকের পক্ষ হইতে সালিস নিযুক্ত করার জন্য অনুরোধ গেল। সরকারের কাছে তাহা অসহ্য বোধ

হইল। যতটা অনুনয় করা যায় তাহা করার পর, সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া আমি সত্যাগ্রহ করার পরামর্শ দেই।

আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে খেড়া জেলার সেবক ব্যতীত শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীযুত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, শ্রীমতী অনসূয়া বেন, শ্রীযুত ইন্দুলাল কানাইয়ালাল যাজ্ঞিক ও শ্রীমহাদেব দেশাই প্রভৃতি ছিলেন। বল্লভভাইয়ের ওকালতির উপার্জন খুব বেশি ছিল ও ব্যবসা বাড়িয়া চলিতেছিল; তিনি তাহা ছাড়িয়া আসিলেন। তাহার পর তাঁহার আর স্থির হইয়া বসিয়া ওকালতি করাই হয় নাই—একথা বলা চলে।

আমরা নড়িয়াদ অনাথ আশ্রমে বাস করিতাম। অনাথ আশ্রমে বাস করার বৈশিষ্ট্য কিছু নাই। নড়িয়াদে এতগুলি লোক বাস করিতে পারে এমন খালি বাড়ি ছিল না।

নীচের লিখিত মত প্রতিজ্ঞা পত্রে শেষকালে আমরা খেড়ার লোকদের স্বাক্ষর গ্রহণ করি।

"আমাদের গ্রামের ফসল চার আনার বেশি হয় নাই, ইহা আমরা জানি। এই কারণে খাজনা আদায় আগামী বৎসর পর্যন্ত মুলতবী রাখার জন্য আমরা সরকারের কাছে দরখাস্ত করিয়াও আদায় বন্ধ করাইতে পারি নাই। সেইজন্য আমরা নিম্ন-স্বাক্ষরকারীরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই বৎসরের পুরা বাকি খাজনা, অথবা আমাদের মধ্যে যাহার আংশিক বাকি আছে সেই আংশিক খাজনা আমরা দিব না। এই খাজনা আদায় করার জন্য সরকার আইন অনুসারে যাহা করিতে চাহেন করিতে দিব এবং তাহার জন্য দুঃখ সহ্য করিব। আমাদের জমি যদি বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবে তাহা করিতে দিব। তবুও আমরা হাতে তুলিয়া সরকারকে খাজনা দিয়া আমাদের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিয়া আত্মসম্মান খোয়াইব না। যদি সরকার আগামী কিস্তি আদায় সমস্ত জেলায় মুলতবী রাখেন, তবে আমাদের মধ্যে যাহাদের শক্তি আছে তাহারা পুরা বা আংশিক বাকি খাজনা জমা দিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের মধ্যে যাহাদের খাজনা দিতে পারে এমন শক্তি আছে, তাহাদেরও খাজনা না দেওয়ার কারণ এই যে, যাহাদের শক্তি আছে তাহারা খাজনা দিলে, যাহাদের শক্তি নাই তাহারা ভয়ে যাহা পাইবে তাহাই বেচিয়া বা কর্জ করিয়া খাজনা দিবে ও দুঃখ পাইবে। এই অবস্থায় গরিবদের বাঁচানো শক্তিমানের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।"

এই লড়াইয়ের বর্ণনায় আমি আর বেশি অধ্যায় নিয়োগ করিতে পারিব না। তাহার জন্য অনেক আনন্দদায়ক স্মৃতি বাদ দিয়া যাইতে হইবে। যাঁহারা এই লড়াইয়ের সমস্ত ঘটনায় ভাল ভাবে ও গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহারা শ্রীযুত শঙ্করলাল পরীখ লিখিত ও প্রামণিক বলিয়া গণ্য খেড়া সত্যাগ্রহের ইতিহাস পড়িতে পারেন।

২৪
পেঁয়াজ চোর

চম্পারণ ভারতবর্ষের এক কোণায় অবস্থিত। সেজন্য সেখানকার সত্যাগ্রহের কথা সংবাদপত্রে স্থান পায় নাই। বাহিরের লোক উহাতে আকৃষ্ট হইয়াও সেখানে আসেন নাই। কিন্তু খেড়ার সত্যাগ্রহের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গুজরাটীরা এই নতুন রকম যুদ্ধের আস্বাদ ভাল করিয়াই পাইয়াছিলেন। তাঁহারা এই সত্যাগ্রহের সাফল্যের জন্য অর্থ ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সত্যাগ্রহ-যুদ্ধ টাকা দিয়া চালানো যায় না এবং ইহাতে অর্থের আবশ্যকতা কমই আছে—একথা তাঁহাদিগকে সহজে বুঝানো যায় নাই। আমি নিষেধ করিলেও বোম্বাইয়ের শেঠেরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দিয়াছিলেন। সত্যাগ্রহের পরও কিছু টাকা উদ্বৃত্ত ছিল।

অন্য দিক হইতে সত্যাগ্রহীদের সাদাসিধা চালচলনের নতুন পাঠ দিতে হইতেছিল। ঐ শিক্ষা তাহারা পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছিল একথা বলিতে পারি না। তবে তাহারা সাধ্যমত ঐ সংস্কার অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিল।

পাটীদারদের পক্ষে এই ধরনের লড়াই নূতন। আমাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সত্যাগ্রহের অর্থ বুঝাইতে হইত। সরকারী কর্মচারীরা প্রজার মনিব নহে—সেবক। প্রজার পয়সাতেই তাহারা বেতন পায়, ইহা বুঝাইয়া তাহাদের ভয় দূর করার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু নির্ভয় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে যে বিনয়ী হইতে হয়—একথা বুঝাইয়া উঠা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। একবার সরকারী কর্মচারীর ভয় ত্যাগ করিলে, উহাদের দেওয়া অপমানের প্রতিশোধ না নিয়া কে থাকিতে পারে? আর যদিই সত্যাগ্রহী ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করে, তাহা হইলে সেটা দুধের সঙ্গে বিষ মিশানোর মতই হয়। বিনয়ের শিক্ষা যে

পাটীদারেরা ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহা আমি পরে বেশ বুঝিয়াছিলাম। অভিজ্ঞতার ফলে আমি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, বিনয় সত্যাগ্রহের সর্বাপেক্ষা কঠিন অংশ। বিনয় মানে কেবল এইটুকুই নহে যে, সম্মানের সহিত কথা বলিতে হইবে। বিনয় মানে বিরোধীর প্রতি একটা সহজাত ভদ্রতার ভাব পোষণ করা, তাহাদের কল্যাণ কামনা করা। সত্যাগ্রহীর প্রতিটি কার্যে ইহা প্রতিফলিত হওয়া চাই।

প্রথম দিকটায় লোকের খুব সাহস দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, আর সরকারও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু যেমন লোকের দৃঢ়তা বাড়িতে লাগিল, তেমনি সরকার উগ্রমূর্তি ধারণ করিতে লাগিলেন। সরকারী মাল ক্রোককারীরা লোকের গরু-বাছুর ধরিয়া বেচিতে লাগিল ও ঘর হইতে যাহা পায় তাহাই টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। খাজানা না দিলে সাজা দেওয়ার নোটিস বাহির করা হইল। কোনও কোনও গ্রামে ক্ষেতের উপরকার সমস্ত শস্য ক্রোক করিল। লোকের মধ্যে একটা ত্রাসের ভাব দৃষ্ট হইল। এই অবস্থায় কেউ কেউ খাজানা দিয়া ফেলিল। কেউ কেউ নিজের মাল ক্রোক হওয়ার জন্য, সেগুলি এমন ভাবে রাখিয়া দিল, যেন উহা দিয়াই খাজানা দেওয়া হইয়া যায়। আবার এজন্য মরিতেও প্রস্তুত, এমন কোন কোন লোকও ইহার মধ্য হইতে বাহির হইল।

ইতিমধ্যে শ্রীযুত শঙ্করলাল পরীখের খাজানা তাঁহার প্রজারা দিয়া দেয়। ইহাতে হাহাকার পড়িয়া গেল। ঐ জমি সাধারণের হিতার্থে দান করিয়া ফেলিয়া শ্রীযুত পরীখ নিজের প্রজার দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠা উজ্জ্বলতর ও অপরের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইল।

যাহারা ভয় পাইয়া গিয়াছিল তাহাদের উৎসাহিত করার জন্য আমি এক পথ গ্রহণ করিলাম। একটা তৈরি পেঁয়াজের ক্ষেত সরকার অন্যায় করিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। শ্রীযুত মোহনলাল পাণ্ডার নেতৃত্বে ঐ পেঁয়াজের ফসল তুলিয়া লইয়া আসিতে আমি পরামর্শ দিলাম। আমার দৃষ্টিতে ইহা আইন ভঙ্গ করা বলিয়া গণ্য হয় নাই। আর যদি তাহাই হয়, তবুও আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, ক্ষেতের উপরিস্থ শস্য ক্রোক করা আইন অনুযায়ী কার্য হইলেও উহা নীতিবিরুদ্ধ। ইহা লুঠ করা ছাড়া আর কিছু নয় এবং ঐ রকম ক্রোক অমান্য করাই ধর্ম। ঐ কাজ করিলে জেলে যাওয়ার বা অন্য দণ্ড পাওয়ার ভয় আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলাম। শ্রীযুত মোহনলাল পাণ্ডা ত তাহাই

চাহেন। সত্যাগ্রহ-সম্মত রীতিতে কেউ জেলে না যাইতেই সত্যাগ্রহ যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়, ইহা তাঁহার পছন্দ হইতেছিল না। তিনি ঐ ক্ষেত হইতে পেঁয়াজ উঠাইয়া আনার ভার লইলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও ৭।৮ জন গেলেন।

সরকারের পক্ষে তাঁহাকে গ্রেপ্তার না করিয়া আর উপায় কি? শ্রীযুক্ত মোহনলাল পাণ্ডা ও তাঁহার সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করা হইল এবং ইহাতে সত্যাগ্রহীদের উৎসাহ বাড়িল। যেখানে জেল ইত্যাদি দণ্ডের সম্বন্ধে লোক নির্ভয় হয়, সেখানে তখন রাজদণ্ড তাহাদের না দমাইয়া আরও বীরত্ব দেয়। এই মোকদ্দমার দিন আদালত লোকে ভরিয়া গেল। শ্রীপাণ্ডার ও তাঁহার সঙ্গীদের অল্পদিনের জন্য জেল হইল। আমি মনে করি আদালতের সিদ্ধান্ত ভুল। পেঁয়াজ তুলিয়া লওয়া চুরির সামিল হয় না। কিন্তু ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার ইচ্ছা কাহারও ছিল না।

লোকে শোভাযাত্রা করিয়া জেল পর্যন্ত গেল এবং সেই দিন হইতে শ্রীমোহনলাল পাণ্ডা লোকের কাছ হইতে "ডুংলী (পেঁয়াজ) চোর" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। আজ পর্যন্তও তাঁহার সেই "ডুংলী-চোর" নামই বহাল আছে।

এই যুদ্ধ কখন ও কেমন করিয়া শেষ হইল, তাহার বর্ণনা করিয়া খেড়ার কথা শেষ করিব।

২৫

খেড়াসত্যাগ্রহ শেষ

অপ্রত্যাশিত ভাবে এই যুদ্ধের শেষ হইল। লোকে যে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। যাহারা দৃঢ় ছিল, তাহাদিগকে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকিয়া একেবারে নষ্ট হইতে দিতে আমার সংকোচ বোধ হইতেছিল। সত্যাগ্রহীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য এমন কোনও উপায়ে যাহাতে এই যুদ্ধ শেষ করা যায়, সেই দিকেই আমার দৃষ্টি ছিল। এই রকম উপায়ও অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া পড়িল। নড়িয়াদ তালুকার মামলতদার বলিয়া পাঠাইলেন যে, অবস্থাপন্ন পাটীদারেরা যদি খাজানা দেয়, তবে গরীবদের খাজানা মুলতবী রাখা হইবে। এই মর্মে আমি লিখিত স্বীকৃতি চাহিয়া পাঠাইলে তাহাও পাওয়া গেল। কিন্তু মামলতদার নিজের তালুকার জন্যই বলিতে পারে। সমস্ত জেলার সম্বন্ধে দায়িত্ব এক কলেক্টারই লইতে পারেন। সেইজন্য আমি কলেক্টারকে জিজ্ঞাসা

করিলাম। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, মামলতদার যাহা বলিয়াছে সেই মর্মে সরকারী আদেশ পূর্বেই জারি করা হইয়াছে। আমি সে সংবাদ তখনো পাই নাই। তবে হুকুম বাহির হইয়া থাকিলে লোকের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে বলা যায়। প্রতিজ্ঞাও এই জন্যই লওয়া হইয়াছিল। সেই হেতু এই সরকারী আদেশে সন্তুষ্ট হইলাম।

তাহা হইলেও সত্যাগ্রহের এই প্রকার অবসান হওয়াতে আমি সুখী হইতে পারি নাই। সত্যাগ্রহ-যুদ্ধের পর যে আনন্দ হয়, এক্ষেত্রে তাহার অভাব ছিল। কলেক্টারের ভাব এই যে, তিনি কোনও মিটমাট করেন নাই। গরীব লোকদের খাজানা আদায় ছাড়ার কথা হইয়াছিল। কিন্তু বড় কেউ এই সুবিধা পায় নাই। গরীব যে কে একথা স্থির করার প্রজার অধিকার থাকিলেও, তাহা প্রয়োগ করা যায় নাই। প্রজার ভিতর এই শক্তি নাই বলিয়া মনে দুঃখ হইত। সেইজন্য যদিও সত্যাগ্রহের অবসানে বিজয় উৎসব হইয়াছিল, তথাপি ঐ দৃষ্টিতে এই উৎসবে আমার ভিতর হইতে প্রেরণা পাই নাই।

সত্যাগ্রহ আরম্ভের সময়ে প্রজার মধ্যে যে তেজ থাকে, সত্যাগ্রহ অবসান কালে যদি সেই তেজ বাড়ে, তবেই সত্যাগ্রহের ঠিক মত অবসান হইয়াছে—একথা মনে করা যায়। এখানে তাহা দেখা যায় নাই।

তাহা হইলেও এই যুদ্ধ হইতে অপ্রত্যক্ষ ফল যাহা হইয়াছে, আজও তাহার ফল প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যাইতেছে। খেড়ার কৃষক-যুদ্ধ হইতে গুজরাটের কৃষকবর্গের জাগরণ ও তাহাদের রাজনৈতিক শিক্ষা আরম্ভ হয়।

বিদুষী ডঃ বেসান্টের গৌরবময় 'হোমরুল' আন্দোলন চাষীদিগকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু কৃষকদের জীবনের মধ্যে শিক্ষিত মানুষদের ও স্বেচ্ছাসেবকদের ঐকান্তিক প্রবেশ এই সত্যাগ্রহ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। স্বেচ্ছাসেবকগণ পাটীদারের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণও নিজেদের কর্মক্ষেত্রের মর্যাদা এই যুদ্ধ হইতে বুঝিতে পারিয়া তাহা যথাশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বল্লভভাইও নিজেকে এই যুদ্ধে চিনিতে পারিয়াছিলেন। এবং সে যে একটা কম লাভ নয়, তাহা গত বৎসর বন্যাত্রাণের সময় ও এই বৎসর বারদোলীতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। গুজরাটের প্রজাদের জীবনে নূতন শক্তি ও সাহসিকতা আসিয়াছে—নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে। পাটীদারেরা নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে তাহা কখনও ভুলিবার নয়। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রজার মুক্তি

প্রজার নিজের উপরেই—নিজের ত্যাগ-শক্তির উপরেই নির্ভর করে। খেড়ার ভিতর দিয়াই সত্যাগ্রহ গুজরাটে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। যদিও যেভাবে লড়াইয়ের অবসান হইয়াছে তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই, তবু খেড়ার প্রজাদের উৎসাহ ছিল; কেননা তাহারা দেখিয়া লইয়াছিল যে, এজন্য যতটা করিয়াছে তাহার ফল পাইয়াছে এবং ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দুঃখ হইতে মুক্তির পথ কি তাহা জানিয়াছে। এই জ্ঞান তাহাদের উৎসবের পক্ষে যথেষ্ট।

তবুও খেড়ার কৃষকেরা সত্যাগ্রহের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারে নাই এবং সেজন্য আমাকে যে দুঃখ অনুভব করিতে হইয়াছে তাহা পরে লিখিতেছি।

২৬

ঐক্য

যখন খেড়াসত্যাগ্রহ চলিতেছিল, তখনও ইউরোপে মহাযুদ্ধ বন্ধ হয় নাই। সেই উপলক্ষে ভাইসরয় নেতৃবর্গকে নিমন্ত্রণ করেন এবং আমাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে আমার যে মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

আমি এই নিমন্ত্রণে দিল্লী যাই। কিন্তু এই সভায় যোগ দিতে আমার একটা সংকোচ ছিল। প্রধান কারণ এই যে, উহাতে আলী ভাইয়েরা, লোকমান্য ও অন্য নেতারা নিমন্ত্রিত হন নাই। সে সময় আলী ভাইয়েরা জেলে ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমি দুই একবার দেখা করিয়াছিলাম। তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। তাঁহাদের সেবাবৃত্তি ও সাহসিকতার প্রশংসা সকলেই করিতেন। হাকিম সাহেবের সঙ্গে তখন আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে নাই। স্বর্গীয় আচার্য রুদ্র ও দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছি। কলিকাতায় মুস্লীম লীগের অধিবেশনে আমি শোয়ব কুরেশী ও ব্যারিস্টার খাজার সাক্ষাৎলাভ করি। ডাক্তার আনসারী ও ডাঃ আবদুর রহমানের সঙ্গেও আমার পরিচয় হইয়াছিল। ভাল মুসলমানদের সঙ্গে আমি বন্ধুত্বের প্রয়াসী ছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পবিত্র ও দেশভক্ত বলিয়া গণ্য, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের মন জানিতে গভীর ইচ্ছা হইত। সেইজন্য তাঁহাদের সমাজে আমাকে তাঁহারা যখনই লইয়া যাইতেন, তখনই বিনা আপত্তিতে আমি যাইতাম।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক মৈত্রী সম্পর্ক নাই, ইহা আমি দক্ষিণ

আফ্রিকাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের বাধা দূর করিতে কোনও সুযোগই আমি ত্যাগ করিতাম না। খোশামোদ করিয়া বা নিজের আত্মসম্মান ত্যাগ করিয়া কাহাকেও খুশি করা আমার স্বভাব নয়। সেই জন্যই আমার মনে হইত যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ক্ষেত্রে আমার অহিংসার পরীক্ষা ও তাহার বিশাল প্রয়োগ হইতে পারে। এই বিশ্বাস আজও আমার অবিচল রহিয়াছে। প্রতি মুহূর্তেই ঈশ্বর আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন দেখিতেছি। আমার চেষ্টাও চলিতেছে।

আমার এই মনোভাব বশতঃ বোম্বাই বন্দরে নামার পর হইতেই আলী ভাইদের সঙ্গে মিশিতে ভাল লাগিত। আমাদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরমুহূর্তেই সরকার তাঁহাদের জীবন্ত কবর দেন। যখনি জেলারের অনুমতি পাইতেন, তখনই মৌলানা মহম্মদ আলী বেতুল জেল বা ছিন্দওয়াড়া জেল হইতে আমাকে দীর্ঘ পত্র লিখিতেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আমি সরকারের অনুমতি চাহিয়া পাই নাই।

আলী ভাইদের জেল হওয়ার পর, কলিকাতা মুস্লিম লীগে আমাকে মুসলমান ভাইয়েরা লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে সভায় বক্তৃতা দিতে বলেন। আমি বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, আলী ভাইদের জেল হইতে মুক্ত করা মুসলমানদের ধর্ম।

অতঃপর তাঁহারা আমাকে আলীগড় কলেজে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে আমি দেশের জন্য ফকিরি লইতে মুসলমানদের আমন্ত্রণ করিলাম।

আলী ভাইদের মুক্তি দেওয়ার জন্য আমি সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ চালাইয়াছিলাম। এই সময় আমি আলী ভাইদের খিলাফত আন্দোলনের লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হই। মুসলমানদের সঙ্গে আলোচনা করিলাম। আমার এই মনে হইল যে, যদি সত্যই আমি মুসলমানদের বন্ধু হইতে চাই, তবে যাহাতে আলী ভাইদের জেল হইতে খালাস করিতে পারা যায় ও খিলাফত প্রশ্নের ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তি হয়, সে বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সাহায্য করাই সঙ্গত। খিলাফতের প্রশ্ন আমার কাছে সহজ বোধ হইতেছিল। আমার কাছে উহার ভালমন্দ বিচার করার আবশ্যকতা ছিল না। কেবল ঐ বিষয়ে মুসলমানদের দাবি নীতিবিরুদ্ধ না হইলেই আমার সাহায্য করা উচিত বলিয়া বুঝিলাম। ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নে শ্রদ্ধার স্থান সর্বোপরি। সকলের শ্রদ্ধাই যদি একই বস্তুর উপর একই রকম হইত, তাহা হইলে জগতে একই ধর্ম হইত। খিলাফত আন্দোলনের

দাবি আমার কাছে নীতিবিরুদ্ধ মনে হয় নাই। কেবল তাহাই নহে, এই দাবি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁর সেই কথা কাজে রূপায়িত করিতে আমার চেষ্টা করা একান্ত উচিত বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। লয়েড জর্জের প্রতিশ্রুতি এত স্পষ্ট ভাষায় ছিল যে, ঐ বিষয়ের দোষ-গুণ অনুসন্ধান করা কেবল আমার বিবেকের তুষ্টির জন্যই আবশ্যক ছিল।

খিলাফত সম্পর্কে আমি মুসলমানদের পক্ষ লইয়াছি বলিয়া মিত্রেরা ও সমালোচকেরা আমার খুব সমালোচনা করিয়াছেন। ঐ সকল সমালোচনা বিচার করিয়াও, আমি তখন যে সংকল্প করিয়াছিলাম এবং যে সাহায্য করিয়াছিলাম, তাহার জন্য আমার অনুতাপ হইতেছে না। ঐ সকল সমালোচনায় আমার নিজেকে সংশোধন করিবার কিছুই নাই। আজও যদি ঐ প্রকার প্রশ্ন উঠে, তবে আমার আচরণ যে ঠিক ঐরূপই হইবে, ইহা আমার কাছে সুস্পষ্ট।

মনে মনে এই ধরনের চিন্তা লইয়া আমি দিল্লী গেলাম। মুসলমানদের দুঃখের কথা লইয়া বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা করিব মনে করিয়াছিলাম। খিলাফত প্রশ্ন তখনও পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করে নাই।

দিল্লী পৌঁছিলে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এক নৈতিক প্রশ্ন তুলিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ড ও ইটালীর মধ্যে একটা গোপন সন্ধির বিষয় সংবাদপত্রে আলোচিত হইতেছিল। সেই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু আমাকে বলিলেন—"যদি এই প্রকার গুপ্ত সন্ধি ইংলণ্ড কাহারও সঙ্গে করিয়া থাকে, তবে আপনার এই সভায় যোগ দেওয়ার কি দরকার?" আমি এই সন্ধি সম্বন্ধে কিছু জানিতাম না। দীনবন্ধুর কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই কারণে সভায় যোগ দেওয়া সম্পর্কে দ্বিধার কথা জানাইয়া আমি লর্ড চেমসফোর্ডকে পত্র দিলাম। তিনি ঐ বিষয় আলোচনা করার জন্য আমাকে ডাকিলেন। তাঁহার সঙ্গে ও পরে তাঁহার একান্ত সচিব মিঃ মফীর সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হইল। তাহার ফলে সভায় যোগ দিতে আমি স্বীকার করিলাম। বড়লাটের যুক্তি সংক্ষেপে এই ছিল :—"আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না যে, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা যাহা কিছু করে, তাহাই বড়লাট জানে। ব্রিটিশ সরকার যে ভুল করে না একথা আমি বলি না, কেউই বলিবে না। কিন্তু যদি উহার অস্তিত্ব জগতের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া স্বীকার করেন এবং উহার চেষ্টায় এই দেশের মোটের উপর কল্যাণ হইতেছে—ইহা যদি মানেন, তবে উহার বিপদের সময় যে সাহায্য করাও আপনার ধর্ম তাহা কি আপনি স্বীকার করিবেন না? গোপন সন্ধি সম্বন্ধে আপনিও যাহা কাগজে দেখিয়াছেন,

আমিও তাহাই দেখিয়াছি। উহার বেশি ঐ বিষয়ে আমি কিছু জানি না, একথা আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি। সংবাদপত্রে কত আজগুবী কথা উঠে, তাহা ত আপনি জানেন। সংবাদপত্রে কি একটা নিন্দার কথা উঠিয়াছে, সেইজন্য কি আপনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে এমন সময় ত্যাগ করিতে পারেন? যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, তখন আপনার নীতি সম্পর্কিত যত প্রশ্ন থাকে তাহা উঠাইতে পারেন এবং আক্রমণ করিতে হইলেও করিতে পারেন।"

এই যুক্তি নূতন নয়। কিন্তু যে সময়ে যে ভাবে ইহা বলা হইয়াছিল তাহা আমার কাছে নূতনের মত লাগিয়াছিল। আমি সভায় যোগ দিতে স্বীকার করিলাম। খিলাফত সম্বন্ধে আমাকে বড়লাটের কাছে পত্র দিতে হইবে—এই রকম স্থির হইল।

২৭
রংরুট ভর্তি

সভায় আমি উপস্থিত হইলাম। বড়লাটের খুব ইচ্ছা যে, আমি সিপাহী সংগ্রহের প্রস্তাবের পক্ষে বলি। আমি হিন্দী-হিন্দুস্থানীতে বলার অনুমতি চাহিলাম। ভাইসরয় অনুমতি দিলেন। কিন্তু উহার সহিত ইংরেজীতেও বলার প্রস্তাব করিলেন। আমার বক্তৃতা করার বিশেষ দরকার ছিল না। আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা মাত্র এই—"আমার দায়িত্বের কথা সম্পূর্ণ স্মরণ করিয়া এবং সেই দায়িত্ব বুঝিয়া এই প্রস্তাব করিতেছি।"

আমি হিন্দুস্থানীতে বলিয়াছি বলিয়া অনেকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, বড়লাটের সভায় এতকালের মধ্যে এই প্রথম হিন্দুস্থানী ভাষায় বলা হইল। এই ধন্যবাদ ও এই প্রথম হিন্দী ভাষা প্রবেশ করার সংবাদ আমাকে বিঁধিল। আমি লজ্জিত হইলাম। আমার নিজের দেশে, আমার দেশের কাজের আলোচনা সভায়, আমার নিজের দেশের ভাষার অব্যবহার অথবা তাহার অপমান কী দুঃখের বিষয়! এই ঘটনা আমাদের অধঃপতনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সভায় যে কথা আমি বলিয়াছিলাম তাহার মূল্য আমার কাছে খুবই বেশি ছিল। এই সভা এবং আমার এই প্রস্তাব সমর্থন, আমার পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল। আমার একটি দায়িত্ব ছিল—যে দায়িত্ব দিল্লীতেই পূরণ করা দরকার। সে কাজ বড়লাটকে পত্র লেখা। আমার

কাছে এই কাজ তত সহজ ছিল না। ঐ সভায় যাওয়ায় আমার দ্বিধা ও তাহার কারণ এবং ভবিষ্যতের আশা ইত্যাদির কথা—আমার জন্য, সরকারের জন্য ও জনসাধারণের জন্য—স্পষ্ট করিয়া লওয়ার দরকার ছিল।

আমি বড়লাটকে যে পত্র দিলাম তাহাতে লোকমান্য তিলক, আলীভাই ইত্যাদি নেতাদের অনুপস্থিতির জন্য দুঃখপ্রকাশ করিলাম। জনসাধারণের সর্বনিম্ন রাজনৈতিক অধিকার লাভের বিষয় ও যুদ্ধ হইতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের দাবীর বিষয় উল্লেখ করিলাম। এই পত্র প্রকাশের জন্য আমি অনুমতি চাই ও ভাইসরয় সন্তুষ্টচিত্তে তাহা দেন।

এই পত্র সিমলায় পৌঁছাইয়া দেওয়ার দরকার ছিল। কেননা সভা শেষ হওয়ার পর ভাইসরয় সিমলায় গিয়াছিলেন। ডাকযোগে পত্র দিলে বিলম্ব হইবে। আমার কাছে ঐ পত্রের বিশেষ মূল্য ছিল এবং অবিলম্বে উহা পৌঁছাইয়া দেওয়ার দরকার ছিল। কোনও শুদ্ধ চরিত্রের লোকের হাত দিয়া পত্রখানা পাঠাইলে ভাল হয়, এই রকম আমার মনে হইতেছিল। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্র, রেভারেণ্ড আয়ারল্যাণ্ডের নাম প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, পত্রটি পড়িয়া যদি শুদ্ধ মনে হয়, তবে তিনি তাহা লইয়া যাইতে পারেন। পত্রখানা গোপনীয় ছিল না। তিনি পড়িয়া দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও লইয়া যাইতে রাজী হইলেন। আমি তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া দিতে চাওয়ায়, তিনি উহা লইতে অস্বীকার করিলেন এবং যাইবার সময় ইণ্টার ক্লাসেই গেলেন। তাঁহার সাদাসিধা ভাবে, সরলতায় ও স্পষ্ট ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলাম। এই পবিত্র ব্যক্তির হাতে প্রেরিত পত্রের ফল আমার বিশ্বাস মত ভালই হইয়াছিল। আমার পথ ইহা দ্বারা পরিষ্কার হইয়া গেল।

আমার দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল যুদ্ধের জন্য সিপাহী সংগ্রহ করা (রংরুট বা recruit ভর্তি করা)। সিপাহী যদি চাই, তাহার জন্য খেড়াতে না যাইয়া আর আমি কোথায় যাইব ? আমার নিজের সঙ্গীদেরই যদি প্রথম সিপাহী হইতে নিমন্ত্রণ না করি, তবে কাহাকে করিব ? খেড়া পৌঁছিয়াই বল্লভভাই প্রভৃতির সঙ্গে কথাবার্তা বলিলাম। তাঁহাদের কাহারও কাহারও এই কাজ পছন্দ হইল না। আবার যাঁহাদের ভাল লাগিল, তাঁহারা সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। যে শ্রেণীর লোকের কাছে সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার অনুরোধ করিব, সরকারের সঙ্গে তাহাদের মোটেই সদ্ভাব ছিল না। সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচারের স্মৃতি তাহারা তখনও ভুলে নাই।

তবুও তাহারা কাজ আরম্ভ করিতে সম্মত ছিল। কিন্তু কাজ আরম্ভ করিতেই আমার চোখ খুলিয়া গেল। আমার আশাও কতকটা নিস্তেজ হইল। সত্যাগ্রহ-লড়াইয়ের সময় আমরা বিনাভাড়ায় গাড়ি পাইতাম, একজন স্বেচ্ছাসেবক চাহিলে তুইজন পাইতাম। এখন পয়সা দিয়াও গাড়ি পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাতেও আমরা নিরাশ হইলাম না। গাড়ি না লইয়া হাঁটিয়াই ভ্রমণ করা স্থির করিলাম। প্রত্যহ ২০ মাইল করিয়া আমাদের চলিতে হইত। আর গাড়িই যদি না পাওয়া যায়, তবে খাদ্যই বা কেন পাওয়া যাইবে? খাদ্য চাওয়াও ঠিক হয় না। সেইজন্য প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক নিজের খাদ্য নিজের ঝুলিতেই লইয়া বাহির হইবে স্থির করিলাম। গরমের দিন বলিয়া বিছানা কিংবা গায়ে দেওয়ার চাদরের আবশ্যকতা ছিল না।

যে সব গ্রামে যাইতাম সেইস্থানেই সভা করিতাম। লোকে সভায় আসিত, কিন্তু নাম পাওয়া যাইত মাত্র তুই একজনের। "আপনি অহিংসাবাদী হইয়া অস্ত্র লওয়ার কথা কেন বলিতেছেন? সরকার কি হিন্দুস্থানী, সরকার কি আমাদের ভাল করিতেছেন যে সাহায্য করিতে বলিতেছেন?"—এই ধরনের আরও অনেক প্রশ্ন আমি শুনিতে পাইতাম।

এই প্রকার হইলেও ধীরে ধীরে আমাদের কাযের প্রভাব লোকের উপর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নামও বেশ আসিতে লাগিল। প্রথম দল বাহির হইয়া গেলে, দ্বিতীয় দলে লোক-প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হইবে বলিয়া মনে হইল। সংগৃহীত লোকদের কোথায় রাখা হইবে, এই সব সম্পর্কে কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করিতে যাইতে হইত। দিল্লীতে যেমন সভা হইয়াছিল, কমিশনারেরা সেই পদ্ধতিতে সভা করিতে লাগিলেন। গুজরাটেও সভা হইতেছিল। সেই সকল সভায় আমার ও আমার সহকর্মীদের যাওয়ার নিমন্ত্রণ হইত এবং আমিও উপস্থিত হইতাম। দিল্লীতে আমার যে স্থান ছিল এখানে তাহাও ছিল না। সেই সকল সভার দাস-মনোভাবের পরিবেশ আমাকে স্বস্তি দিত না। দিল্লীতে যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়াছিলাম এখানে তার চেয়ে আমি কিছু বেশি বলিতাম। আমার বক্তব্যের মধ্যে খোশামোদ থাকিত না, বরঞ্চ তুই-চারটা কড়া কথাই থাকিত।

'রংরুট'-এ ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন ছাপাইয়া বিতরণ করিতাম। সিপাহী দলে ভর্তি হওয়ার ঐ আবেদনপত্রে একটি এরূপ যুক্তি ছিল যাহাতে কমিশনার-দের পীড়া বোধ হইত। তাহার সারমর্ম এইপ্রকার ছিল—ব্রিটিশ রাজ্যের

অনেক অপকীর্তির মধ্যে সমস্ত প্রজাকে নিরস্ত্র করিয়া রাখার আইনকে ভবিষ্যৎ ইতিহাস সর্বাপেক্ষা গর্হিত কাজ বলিবে। এই আইন যদি তুলিয়া দিতে হয়, যদি অস্ত্রচালনার শিক্ষা লইতে হয়, তবে এই সুবর্ণ সুযোগ। রাষ্ট্রের বিপদের সময় যদি মধ্যবিত্ত লোকেরা সাহায্য করে, তবে অবিশ্বাস দূর হইয়া যাইবে। আর যাহার অস্ত্রধারণ করার ইচ্ছা, সে অক্লেশে অস্ত্রধারণ করিতে পারিবে। আমার এই বক্তব্য সম্পর্কে কমিশনারকে বলিতে হইত যে, তাঁহার ও আমার মধ্যে মতভেদ থাকিলেও তিনি আমার সভায় যোগদান করা পছন্দ করেন। আমার মত আমি যতটা পারি মিষ্ট কথায় সমর্থন করিতাম।

উপরে বড়লাটের কাছে প্রেরিত যে পত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সারমর্ম নীচে দেওয়া হইল :—

"যুদ্ধ সম্পর্কিত সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া সম্পর্কে আমার মনে সংশয় ছিল। কিন্তু আপনার সহিত দেখা করার পর তাহা দূর হয়। আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার ভাবই উহার একমাত্র কারণ। সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার প্রধান কারণ এই ছিল যে, উহাতে লোকমান্য তিলক, শ্রীমতী বেসাণ্ট ও আলী ভাইদের নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। ইঁহাদের আমি খুব প্রভাবশালী জননায়ক বলিয়া গণ্য করি। আমার বিশ্বাস যে, তাঁহাদের নিমন্ত্রণ না করিয়া সরকার অত্যন্ত ভুল করিয়াছেন। এবং আমি এখনো বলি যে, তাঁহাদের প্রাদেশিক সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই ভুল সংশোধন করা যায়। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, মতের যতই মৌলিক অমিল হোক না কেন, এইরূপ বিশিষ্ট জননায়কদের কোনও সরকার অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। এই অবস্থায় আমি সম্মেলনে আমার মতামত উপস্থাপিত করি নাই এবং শুধু সভার প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলাম। সরকার যদি আমার সাহায্যদানের পদ্ধতি স্বীকার করেন, তবে শীঘ্রই আমার সমর্থিত বিষয় কার্যে পরিণত করিব—এই প্রকার আশা রাখি।

"আমরা ভবিষ্যতে যে সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণরূপে অংশীদার হইবার আশা রাখি, তাহাকে বিপদের সময় সাহায্য করা আমার ধর্ম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একথাও আমাকে বলিতে হয়, ইহার সহিত আমাদের এ আশাও রহিয়া গিয়াছে যে, এই সাহায্য করার জন্য আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থানে অধিকতর শীঘ্র পৌঁছিব। সেই জন্য জনসাধারণের ইহাও মনে করার অধিকার আছে যে, আপনার বক্তৃতায় যে শাসন-সংস্কার শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলিয়াছেন, তাহাতে

কংগ্রেস ও মুস্লীম লীগের প্রধান দাবির সমাবেশ থাকিবে। যদি আমার দ্বারা সম্ভব হইত, তবে আমি সাম্রাজ্যের এই বিপদের দিনে 'হোমরুল' ইত্যাদি দাবির কথা উচ্চারণ না করিয়া সকল শক্তিমান ভারতবাসীকে সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে প্রেরণা দিতাম। ইহার দ্বারাই আমরা সাম্রাজ্যের প্রধান ও যোগ্য অংশীদার বলিয়া গণ্য হইতে এবং বর্ণ-ভেদ তুলিয়া দিতে পারিতাম।

"কিন্তু দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এ বিষয়ে সাহায্য করার বিশেষ প্রয়াস করেন নাই। জনসাধারণের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। আমি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইয়াছি। আমি আপনাকে জানাইতে চাই যে, স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার ইচ্ছা সাধারণ প্রজার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ ছাড়া লোকে কখনও সন্তুষ্ট হইবে না। তাহারা বুঝিয়াছে যে, স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার জন্য যতই দুঃখভোগ করা যাক না কেন, তাহাই যথেষ্ট নয়। সেই জন্য সাম্রাজ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে যত স্বেচ্ছাসেবক আবশ্যক হয় তাহা দেওয়া গেলেও আর্থিক সাহায্য সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। লোকের আর্থিক অবস্থা দেখিয়া আমি বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষ এতাবৎ যে আর্থিক সাহায্য দিয়াছে তাহা তাহার শক্তির অতীত।

"কিন্তু আমি ইহা জানি যে, এই সম্মেলনে আমাদের উপস্থিতির চরিত্র কিছুটা বিচিত্র ধরনের। আমরা এই সাম্রাজ্যের সমশ্রেণীর অংশীদার নই। ভবিষ্যতের আশার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই সাহায্য করিতেছি। সেই আশা কি, তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আবশ্যক। অবশ্য এই আশা পূরণের শর্ত হিসেবে আমরা এই সাহায্য করিতে চাই না। কিন্তু যদি আমাদের আশা পূর্ণ না হয়, তবে সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যে ধারণা আমরা করিয়াছি, তাহা ভুল বলিয়া গণ্য হইবে। আপনি ঘরোয়া ঝগড়া ভুলিয়া যাইতে বলিয়াছেন। তাহার মানে যদি এই হয় যে, সরকারী কর্মচারীর জুলুম সহ্য করিতে হইবে, তাহাদের দুষ্কার্য সহ্য করিতে হইবে, তবে তাহা করা অসম্ভব জানিবেন। সংগঠিত জুলুমের বিরুদ্ধে সমস্ত বল প্রয়োগ করা আমি আমার ধর্ম বলিয়া মানি। সেইজন্য আমি বলি, কর্মচারীদের এই নির্দেশ দেওয়া দরকার যে, একজনের জীবনকেও তাঁহারা যেন অগ্রাহ্য না করেন এবং এ পর্যন্ত যে লোক-মতকে তাঁহারা সম্মান দেন নাই তাহাকেও যেন অতঃপর সম্মান দেন। চম্পারণে

শতবর্ষব্যাপী অনুষ্ঠিত জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ব্রিটিশের ন্যায়বিচারের শ্রেষ্ঠত্বই আমি প্রমাণ করিয়াছি। খেড়ার রায়তেরা দেখিয়া লইয়াছে যে, যখন তাহাদের সত্যের জন্য দুঃখ বরণ করার প্রয়োজন হয়, তখন তাহাদের সত্যকার শক্তি—রাজশক্তি নয় লোকশক্তিই। সেইজন্য যে রাজত্বকে প্রজারা অভিশাপ দিত, আজ সেখানে বিরক্তির ভাব কমিয়া আসিয়াছে। যে রাজশক্তি প্রজার আইন-অমান্য আন্দোলন সহ্য করিয়া লয়, সে শক্তি শেষ পর্যন্ত লোকমতকে উপেক্ষা করিতে পারে না—এই বিশ্বাস তাহাদের হইতেছে। সেইজন্য আমি মনে করি যে, চম্পারণ ও খেড়ায় আমি যে কাজ করিয়াছি তাহা সাম্রাজ্যের এই যুদ্ধের সাহায্যে আমার সেবা। এই ধরনের কাজ যদি আমাকে বন্ধ করিতে বলেন, তবে আমার শ্বাস বন্ধ করিতে বলিতেছেন জানিব। আমি যদি ভারতবর্ষে এই আত্মশক্তি—যার অন্য নাম প্রেমশক্তি—তাকে বর্বরশক্তির বিরুদ্ধে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিতে সকল হই, তবে আমি জানি, ভারতবর্ষ সারা জগতের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও যুঝিতে পারিবে। সেইজন্য সব সময় এই দুঃখ বহন করার সনাতন নীতি আমার জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে আমার আত্মার সাধনা থাকিবে। এই নীতি স্বীকার করার জন্য অপরকেও সর্বদা আহ্বান করিব এবং যদি আমি অন্য ধরনের কাজ হাতে লই, তবে তাহারও উদ্দেশ্য হইবে—এই নীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা।

"পরিশেষে, মুসলমান দেশসমূহ সম্পর্কে একটা সুনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রী-মণ্ডলের কাছে প্রস্তাব করিতে আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি। আপনি জানেন, এ সম্পর্কে সকল মুসলমানেরই দুশ্চিন্তা আছে। নিজে হিন্দু হইয়া মুসলমানের প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারি না। তাহাদের দুঃখও আমাদের দুঃখ। মুসলমান-দেশের দাবি স্বীকার করা, তাঁহাদেরও ধর্মস্থান সম্বন্ধে তাহাদের প্রয়োজনকে মান্য করা এবং ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন বিষয়ের দাবি স্বীকার করা—এই সমস্তের উপরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণ নির্ভর করে। আমার এই পত্র লেখার কারণ এই যে, আমি ইংরেজদের ভালবাসি এবং যে রাজভক্তি ইংরেজদের আছে সেই রাজভক্তি আমি প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করি।"

মৃত্যুশয্যায়

'রংরুট' সংগ্রহ করিতে (যুদ্ধের জন্য সিপাহী ভর্তি) আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গেল। এই সময় আমার খাদ্য ছিল প্রধানতঃ পেষাই করা চীনাবাদাম ভাজা, কলা ইত্যাদি ফল ও ২।৩ টা লেবুর জল। চীনাবাদাম বেশি খাইলে অসুখ করিত, তাহা জানিয়াও উহাই যথেষ্ট খাইতাম। ইহাতে একটু আমাশয় হইল। আমাকে মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিতে হইত। এই আমাশয় আমি গ্রাহ্য করিতাম না। ঔষধ এই সময় বড় খাইতাম না। একবেলা খাওয়া ছাড়িয়া দিলেই ভাল হইয়া যাইব মনে হইত। পরদিন সকালবেলা যদি কিছু না খাইতাম, তবে ব্যথা প্রায় সারিয়া যাইত। আমি জানিতাম, আমার উপবাস বেশি দিন দেওয়া দরকার। আর যদি খাইতেই হয়, তবে ফলের রস ইত্যাদি খাওয়া উচিত।

সেদিন কোনও একটা পর্ব ছিল। দুপুরে আমি খাইব না একথা কস্তুরবাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে লোভে ফেলিলেন এবং আমিও লোভে পড়িয়া গেলাম। এই সময় আমি কোনও পশুরই দুধ খাইতাম না। সেইজন্য ঘি অথবা ঘোল ইত্যাদিও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সুতরাং ঘি-এর পরিবর্তে তেল দিয়া আমার জন্য তিনি যবের একপ্রকার 'লপসি' করিতেন। ঐ খাবার ও এক বাটি মুগ আমার জন্য রহিল—বলিয়া গেলেন। আমি স্বাদের বশীভূত হইয়া খাইলাম। খাওয়ার সময় ভাবিলাম যে, কস্তুরবাকে খুশি করার জন্য অল্প একটু খাইব। তাহাতে স্বাদ লওয়াও হইবে, শরীর রক্ষাও হইবে। শয়তান সুবিধা দেখিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। খাইতে বসিয়া একটুমাত্র খাওয়ার বদলে পেট ভরিয়া খাইলাম। স্বাদ পুরাপুরি লওয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে যমরাজকে নিমন্ত্রণ পত্রও পাঠানো হইল। খাওয়ার পর একঘণ্টা না যাইতেই ভীষণ আমাশয় দেখা দিল।

সেই রাত্রে নড়িয়াদ ফিরিয়া যাইতেই হইবে। সবরমতী স্টেশন পর্যন্ত হাঁটিয়া গেলাম। কিন্তু সওয়া মাইল রাস্তা চলিতেই বড় কষ্ট হইল। আমেদাবাদ স্টেশনে বল্লভভাই আসিয়া যোগ দিলেন। তিনি আমার যন্ত্রণা হইতেছে দেখিলেন। কিন্তু যন্ত্রণা যে কত অসহ্য তাহা তাঁহাকে কি অন্য সাথীকে জানিতে দিলাম না।

নড়িয়াদ পৌঁছিলাম। এখান হইতে অনাথ আশ্রম আধ মাইলের ভিতর হইলেও মনে হইল যেন দশ মাইল। খুব কষ্টে ঘরে উঠিলাম। যন্ত্রণা বাড়িতেই ছিল ও ১৫ মিনিট পর পর পায়খানার বেগ হইতেছিল। অবশেষে হার মানিলাম, এবং অসহ্য যাতনার কথা জানাইয়া শয্যা লইলাম। আশ্রমে সাধারণ পায়খানা ছিল। তাহার পরিবর্তে কমোড চাহিলাম। কমোড চাহিতে খুব লজ্জা হইল, কিন্তু আমি তখন নিরুপায়। ফুলচন্দ বাপুজী বিদ্যুৎবেগে গিয়া কোথা হইতে কমোড লইয়া আসিলেন। চিন্তাক্লিষ্ট সাথীরা আশপাশ হইতে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। আমার প্রতি তাঁহাদের ভালবাসার সীমা ছিল না। কিন্তু তাঁহারা আমার ব্যথা ভাল করিতে পারিলেন না। আমার জেদেরও অন্ত ছিল না। আমি ডাক্তার ডাকিতে দিব না, ঔষধ খাইব না। ইচ্ছা করিয়া যে ভুল করিয়াছি তাহার ফল ভুগিব। সাথীরা নিরুপায় হইয়া শুষ্কমুখে সহ্য করিতে লাগিলেন। খাওয়া ত বন্ধই করিয়াছিলাম। প্রথম দিন ফলের রসও খাই নাই, খাওয়ার রুচিও আদৌ ছিল না। যে শরীর পাথরের মত আজ পর্যন্ত মনে করিতাম, তাহা কাদার মত হইয়া গেল। শক্তি লোপ পাইল। ডাক্তার কানুগা আসিলেন। তিনি ঔষধ খাইতে মিনতি করিলেন। আমি অস্বীকার করিলাম। ইনজেকশন দিতে চাহিলেন, আমি অস্বীকার করিলাম। এই সময় ইনজেকশন সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা উপহাসযোগ্য ছিল। আমি মনে করিতাম যে, ইনজেকশন মাত্রই কোন জান্তব রস (serum)। পরে বুঝিয়াছিলাম, উহা নির্দোষ গাছ-গাছড়ায় তৈরি ঔষধ। কিন্তু সময় চলিয়া গেলে এই জ্ঞান হইয়াছিল। পায়খানার বেগ হইতেছিল। অত্যন্ত অবসাদের জন্য প্রলাপের সঙ্গে জ্বর আসিল। বন্ধুরা আরও ভীত হইয়া পড়িলেন। আরো ডাক্তার আনিলেন। কিন্তু যে রোগী ডাক্তারের কথা শুনিবে না, ডাক্তার তাহার কি করিবে?

শেঠ অম্বালাল ও তাঁহার ধর্মপত্নী নড়িয়াদে আসিলেন। সঙ্গীদের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি আমাকে অত্যন্ত যত্নের সহিত তাঁহার মির্জাপুর বাংলোয় লইয়া গেলেন। এই পীড়িতাবস্থায় আমি যে নির্মল নিষ্কাম সেবা পাইয়াছিলাম, তাহার অধিক সেবা কেউই পাইতে পারে না—একথা অবশ্যই বলিতে পারি। অল্প জ্বর রহিয়া গেল। শরীর ক্ষীণ হইতে চলিল। এই পীড়া দীর্ঘদিন ভোগ করিতে হইবে। হয়ত বা আর শয্যাত্যাগ করা হইবে না—এইপ্রকার মনে হইতে লাগিল। শেঠ অম্বালালের বাংলোয় প্রেমে পরিবৃত হইয়াও আমার মন

অশান্ত হইয়া উঠিল। আমাকে আশ্রমে লইয়া যাওয়ার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম। আমার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া তিনি আশ্রমে লইয়া গেলেন।

আশ্রমে যখন পীড়িত আছি, তখন বল্লভভাই সংবাদ আনিলেন যে, জার্মানীর সম্পূর্ণ হার হইয়াছে এবং আর রংরুট ভর্তি করার কোনও আবশ্যক নাই—এই কথা কমিশনার বলিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহাতে লোক ভর্তি করার চিন্তা হইতে মুক্তি পাইলাম ও তাহাতে শান্তি আসিল।

এখন জল-চিকিৎসা করিতেছিলাম। তাহাতে যন্ত্রণার কিছু লাঘব হইতেছিল, কিন্তু শরীর গঠন করা শক্ত ছিল। বৈদ্য ও ডাক্তার-বন্ধুরা অনেক প্রকার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আমি কোনও ঔষধ খাইতে প্রস্তুত ছিলাম না। দুই তিনজন বন্ধু, দুধে বাধা থাকিলে মাংসের সুরুয়া খাইতে বলিলেন ও ঔষধরূপে মাংসাদি বস্তু যাহা ইচ্ছা খাওয়া যায়—আয়ুর্বেদ হইতে তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন। কেউ ডিম খাওয়ার উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও যুক্তি আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না। আমার একই মাত্র জবাব ছিল—না।

খাদ্যাখাদ্যের নির্ণয় আমি কেবল শাস্ত্রের শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া করিতাম না। শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হইয়া খাদ্যাখাদ্য-বিচার আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল। যাই হোক না কেন খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া খাওয়া এবং এইভাবে আমার বাঁচিয়া থাকার এতটুকুও লোভ ছিল না। যে ধর্মের প্রয়োগ আমি আমার স্ত্রীর, পুত্রের ও স্নেহাশ্রিতদের সম্বন্ধে করিয়াছি, নিজের বেলায় সে ধর্ম কেমন করিয়া ত্যাগ করিব?

এই দীর্ঘ দিন স্থায়ী এবং জীবনের এই প্রথম গুরুতর রোগে, আমি আমার ধর্মমত নিরীক্ষণ করিতে ও উহার পরীক্ষা করিতে এক অভূতপূর্ব সুযোগ পাইয়াছিলাম। এক রাত্রে আমি জীবন সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইয়াছিলাম। আমার মনে হইল, মৃত্যু নিকটে আসিয়াছে। শ্রীমতী অনুসূয়া বেনকে সংবাদ পাঠাইলাম। তিনি আসিলেন, বল্লভভাই আসিলেন, ডাক্তার কানুগা আসিলেন। ডাক্তার কানুগা নাড়ী দেখিয়া বলিলেন—"মৃত্যুর ত কোনও চিহ্ন আমি দেখিতেছি না। নাড়ী ভালই আছে, আপনার কেবল দুর্বলতার জন্য মানসিক আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।" কিন্তু আমার মন মানিল না। রাত্রি কাটিয়া গেল। সে রাত্রিতে আমি ঘুমাইতে পারি নাই।

সকাল হইল, কিন্তু মৃত্যু হইল না। তবুও আমি জীবনের কোনও আশা

করিতে পারিলাম না। মৃত্যু নিকটে। তাই সঙ্গীদের মুখে গীতাপাঠ শুনিয়া যতটুকু সময় আছি তাহা কাটাইতে লাগিলাম। কোন কাজ-কর্ম করার শক্তি ছিল না, এমন কি পড়ার শক্তিও ছিল না। কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেও ইচ্ছা হইত না। অল্প কথাতেই মাথার যন্ত্রণা হয়। এজন্য জীবনে কোনও আগ্রহ ছিল না। শুধু বাঁচিবার জন্যই বাঁচিতে আমার কখনও ভাল লাগিত না। কোনও কাজ না করিয়া এবং সঙ্গীদের সেবা লইয়া, যে দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, তাহাকে দীর্ঘকাল স্থায়ী রাখা, বড়ই মর্মন্তুদ বোধ হইত।

এইভাবে যখন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তখন ডাক্তার তলোয়ালকর এক অদ্ভুত মানুষ সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তিনি ছিলেন মারাঠী। তাঁহার খ্যাতি কিছু ছিল না। তবে তাঁহার মাথায় আমারই মত গোলমাল আছে, ইহা আমি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার চিকিৎসা-বিদ্যা আমার উপর প্রয়োগ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি গ্রাণ্ট মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়িতেন। কিন্তু ডিগ্রি লওয়ার পূর্বেই কলেজ ছাড়েন। পরে জানিয়াছিলাম যে, তিনি ব্রাহ্ম সমাজের লোক, তাঁহার নাম কেলকর এবং তাঁহার স্বভাব ছিল স্বাধীন। তিনি বরফের চিকিৎসার ভারি প্রশংসা করিতেন। আমার পীড়ার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার বরফ চিকিৎসা আমার উপর প্রয়োগ করিতে আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে "বরফ ডাক্তার" নাম দিয়াছিলাম। নিজের চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস ছিল অগাধ। তাঁহার বিশ্বাস যে, খ্যাতনামা ডাক্তার অপেক্ষাও তিনি কতকগুলি বিষয় বিশেষ ভাবে জানিতেন। তাঁহার চিকিৎসার উপর তাঁহার নিজের যে বিশ্বাস তাহা আমার মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার ও আমার উভয়েরই দুঃখের বিষয়। কতকটা দূর পর্যন্ত তাঁহার চিকিৎসা-পদ্ধতির উপকারিতা আমি মানিতাম এবং আমার বিশ্বাস যে, তিনি কতকগুলি সিদ্ধান্ত যথেষ্ট বিচার না করিয়াই পোষণ করিতেছেন। তাঁহার আবিষ্কারের মূল্য যাহাই হোক, আমি তাঁহাকে আমার শরীরের উপর পরীক্ষা করিতে সম্মতি দিয়াছিলাম। বাহ্য-প্রয়োগই তাঁহার করণীয় ছিল বলিয়া আমার আপত্তি ছিল না। তাঁহার ব্যবস্থাও ছিল বরফ ও জলের ব্যবহার করা। তিনি আমার সমস্ত শরীরে বরফ ঘষিতে লাগিলেন। তিনি যেমন মনে করেন ততটা ফল তাঁহার চিকিৎসায় আমার না হইলেও, আমি প্রতিদিন যে মৃত্যুর পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতে থাকিতাম, তাহার পরিবর্তে এখন জীবনের একটা আশা জাগিতে লাগিল। কতকটা উৎসাহ আসিল এবং মনের উৎসাহের ফলে শরীরেও উৎসাহ

সঞ্চারিত হইল। কিছু বেশি করিয়া খাইতে পারিতাম। ৫।১০ মিনিট করিয়া রোজ বেড়াইতে পারিতাম। তিনি বলিলেন—"যদি আপনি কাঁচা ডিম খান, তবে আপনার এখন যে সুস্থতা দেখা দিয়াছে তাহা অনেক বাড়িবে। ডিম দুধের মত নির্দোষ পদার্থ, উহা মাংসের মত নয়। প্রত্যেক ডিমেই মুরগি হয় এমন নহে। যে সকল ডিম হইতে মুরগি হইতে পারে না, সেই সকল নির্বীজ ডিম ব্যবহার করা যায়।" আমি নির্বীজ ডিম খাইতে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। যাহা হউক, আমার শরীরের কিছু উন্নতি হইল। আশেপাশের কাজে কিছু কিছু করিয়া আমার মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

২৯

রাউলাট অ্যাক্ট ও আমার ধর্মসংকট

বন্ধুরা বলিলেন মাথেরান * গেলে শরীর শীঘ্র সারিয়া উঠিবে। তাঁহাদের কথায় মাথেরান গেলাম। কিন্তু সেখানকার জলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয় বলিয়া আমার মত রোগীর অসুবিধা হইল। আমাশয় হওয়ায় মলদ্বার নরম হইয়া গিয়াছিল এবং উহা (fissures) স্থানে স্থানে কাটিয়া যাওয়ায় মলত্যাগকালে খুব যন্ত্রণা হইত। এইজন্য কিছু খাইতেই ভয় হইত। এক সপ্তাহের মধ্যেই মাথেরান হইতে ফিরিতে হইল। শঙ্করলাল এই সময় আমার স্বাস্থ্যরক্ষার ভার নিজের উপর লইয়াছিল। সে ডাক্তার দালালের পরামর্শ লওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ডাক্তার দালাল আসিলেন। তাঁহার দ্রুত রোগ-নির্ণয় শক্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। তিনি বলিলেন—

"আপনি দুধ না খাইলে আপনার শরীর ভাল করিতে পারিব না। শরীর ভাল করার জন্য আপনার দুধ খাওয়া দরকার এবং লৌহ ও সেঁকো (iron and arsenic) দ্বারা প্রস্তুত ঔষধের ইনজেকশন করা দরকার। যদি এইরূপ করেন, তবে আপনার শরীর সারাইয়া দেওয়ার গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।"

আমি বলিলাম—"ইনজেকশন দিন। কিন্তু দুধ ত খাইতে পারিব না।"

"দুধ না খাওয়া সম্পর্কে আপনি কি ধরনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন?"

"গরু-মহিষের উপর 'ফুকা' করা হয় জানিয়া, দুধ খাওয়ার প্রতি আমার মনে ধিক্কার আসিয়াছিল। আর দুধ যে মানুষের খাওয়ার জিনিস নয় ইহা আমি

---

* বোম্বাইয়ের নিকটে এক স্বাস্থ্যকর স্থান

বরাবরই মনে করিতাম। সেই জন্যই দুধ ত্যাগ করিয়াছি।”

কস্তুরবা খাটিয়ার পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—“ছাগলের দুধ খাওয়া যায়।”

ডাক্তার বলিলেন—“ছাগলের দুধ খাইলেও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।”

আমি সত্যভ্রষ্ট হইলাম। সত্যাগ্রহের প্রতি মোহবশে আমার বাঁচিয়া থাকার জন্য লোভ হইয়াছিল। আমি প্রতিজ্ঞার শব্দার্থ পালন করিয়া ইহার নিহিতার্থ জলাঞ্জলি দিলাম। দুধ সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করার সময় যদিও আমার মনে গরু-মহিষের দুধের কথাই আসিয়াছিল, তবুও আমার প্রতিজ্ঞা দুধ মাত্রই না খাওয়ার বিষয়েই ছিল। সেইজন্য যে পর্যন্ত আমি পশুর দুধ মানুষের অখাদ্য বলিয়া মনে করিব, সে পর্যন্ত আমার দুধ খাওয়ার অধিকার নাই—একথা জানিয়াও আমি ছাগলের দুধ খাইতে স্বীকার করিলাম। সত্যাগ্রহ-যুদ্ধ করার জন্য বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছায়, সত্যের পূজারী সত্যকেই ম্লান করিয়া ফেলিল!

এই কাজের জন্য আমার অন্তর্দাহ এখনো রহিয়া গিয়াছে। ছাগলের দুধ ত্যাগ করার কথা আমি সর্বদাই চিন্তা করিয়া থাকি। ছাগলের দুধ খাইতে প্রতিদিনই দুঃখ হয়, কিন্তু সেবা করার একটা সূক্ষ্ম মোহ আমাকে পাইয়া বসিয়াছে।

আহার সম্বন্ধে পরীক্ষা করা, অহিংসা-পালনের দিক দিয়াই আমি কর্তব্য বলিয়া জানিয়াছি। উহাতেই আমার আনন্দ হয়, উহাই আমার মনের ক্লান্তি দূর করে, মন সতেজ করে। কিন্তু ছাগলের দুধ খাওয়া, আহার্য পরিবর্তন পরীক্ষা বা অহিংসার দৃষ্টিতে আমাকে পীড়া দেয় না। সত্য পালনের দিক হইতে এই অপরাধ আমাকে শূলের ন্যায় বিদ্ধ করে। আমার মধ্যে অহিংসার পরিচয় আমি পাইয়াছি। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও সত্যের পরিচয় অধিকতর পাইয়াছি বলিয়া মনে করি। যদি আমি সত্য ত্যাগ করি, তবে অহিংসার প্রহেলিকার আবরণ আমি কখনও মুক্ত করিয়া দেখিতে পারিব না। সত্যের পালন মানে, যে ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছে সে ব্রতের দেহ ও আত্মা, উভয়েরই পালন, ব্রতের শব্দার্থ ও ভাবার্থ পালন। আমি ঐ বিষয়ে ব্রতের আত্মাকে, ব্রতের ভাবার্থকে হত্যা করিয়াছি এবং সেইজন্য প্রতিদিন উহা আমাকে বিঁধিতেছে। একথা পরিষ্কার জানিলেও এই ব্রত সম্বন্ধে আমার কর্তব্য কি তাহা আমি পরিষ্কার বুঝিতেছি না, অথবা অন্য কথায় বলিতে গেলে ব্রতপালন করার সাহস আমার নাই। এই ব্রতপালন বিষয়ে সংশয়ও যাহা, সাহসের অভাবও

তাঁহাই—উভয়েই একই বস্তু। কেননা সংশয়ের মূলে শ্রদ্ধার অভাব রহিয়াছে। হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে শ্রদ্ধা দাও।

ছাগলের দুধ খাওয়ার কিছুদিন পরে, আমার মলদ্বারে যেখানে ফাটিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর অস্ত্রোপচার করাতে ভাল হই।

তখনও রোগশয্যা ত্যাগ করি নাই। শুইয়া শুইয়াই সংবাদপত্রাদি পড়িতাম। এমন সময় রাউলাট কমিটির রিপোর্ট আমার হাতে আসিল। উহাতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। ভাই উমর ও শঙ্করলাল আসিয়া তৎক্ষণাৎ উহার বিরুদ্ধে কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়ার অনুমতি চাহিলেন। মাসখানেকের মধ্যেই আমি আমেদাবাদে গেলাম। সেখানে বল্লভভাই প্রায় প্রতিদিনই আমাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার কাছে এই কথা তুলিলাম এবং এ সম্বন্ধে কিছু করা চাই বলিলাম। "কি করা যায়?" এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলিলাম যে—"অল্প লোকও যদি এই সময় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসে, আর এদিকে যদি কমিটির মন্তব্য অনুযায়ী আইন পাস হয়, তবে আমরা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিতে পারি। যদি আমি রোগে শয্যাশায়ী না থাকিতাম তবে আমি একাই ঝাঁপাইয়া পড়িতাম এবং আমার পিছনে অপরে আসিবে এই আশা রাখিতাম। কিন্তু শরীরের এই অবস্থায় আমার কাজে নামার শক্তি আদৌ নাই।"

এই প্রকার কথাবার্তার ফলে আমার সংস্পর্শে আছে এমনি কর্মীদের কয়েকজনকে লইয়া ছোট একটি সভা আহ্বান করা স্থির করা হয়। রাউলাটের নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে যে কমিটির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না ইহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। ইহাও আমার পরিষ্কার বোধ হইল যে, কোনও আত্মসম্মান-সম্পন্ন প্রজা এই আইন মানিয়া লইতে পারে না।

তারপর সভা হইল। উহাতে জনকুড়ি লোকও নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। আমার স্মরণ আছে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বল্লভভাইকে বাদ দিলে, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মিঃ হর্ণিম্যান, উমর সোবানী, শ্রীশঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, শ্রীমতী অনুসূয়া বেন প্রভৃতি ছিলেন।

প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করা হইল এবং যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই স্বাক্ষর করিলেন। এই সময় আমার নিজের কাগজ ছিল না। যেমন মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে লিখিতাম এখনো তাহাই করিতে লাগিলাম। শঙ্করলাল

ব্যাঙ্কার খুব আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই কাজ করিতে গিয়া শঙ্করলালের সংগঠন শক্তির পরিচয় পাইলাম।

প্রচলিত কোনও সংস্থা, সত্যাগ্রহের ন্যায় নতুন অস্ত্র গ্রহণ করিবে এ সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্য সত্যাগ্রহ-সভার স্থাপনা হইল। তাহার সভ্য প্রধানতঃ বোম্বাই হইতে সংগৃহীত হয় এবং উহার প্রধান কার্যালয় বোম্বাইতেই করা হয়। প্রতিজ্ঞাপত্রে খুব স্বাক্ষর সংগৃহীত হইতে লাগিল। খেড়া-সত্যাগ্রহে যেমন বুলেটিন বাহির করা হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে সভা করা হইয়াছিল, এখনও তেমনি আরম্ভ হইয়া গেল।

এই সভার আমি সভাপতি ছিলাম। আমি দেখিলাম যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং আমার মধ্যে বেশি মিল হইতে পারে না। সভায় গুজরাটী ব্যবহারে আমার আগ্রহ ও আমার অন্য কতকগুলি ব্যাপারে তাঁহাদের অসুবিধা হইত। কিন্তু আমাকে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা উদারতার সঙ্গে আমাকে সহ্য করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু আমি আরম্ভেই দেখিলাম যে, এই সভা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। ইতিমধ্যেই সত্য ও অহিংসার উপর আমি যে জোর দিতেছিলাম, তাহা কতক লোকের ভাল লাগিতেছিল না। তাহা হইলেও প্রথম দিকটায় এই নতুন কাজ খুব জোর চলিতে লাগিল।

৩০

অদ্ভুত দৃশ্য

রাউলাট কমিটির বিরুদ্ধে যেমন এক দিক দিয়া আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল, অপর দিকে সরকারেরও ঐ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইন পাস করার জেদ বাড়িতে লাগিল। রাউলাট বিল প্রচারিত হইল। আমি একবার মাত্র কাউন্সিল-সভায় গিয়াছিলাম এবং তা রাউলাট বিলের আলোচনা শোনার জন্য। শ্রীশ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাঁহার আবেগময়ী বক্তৃতায় সরকারকে সাবধান করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের আবেগপূর্ণ বক্তৃতা যখন চলিতেছিল, তখন ভাইসরয় একাগ্র চিত্তে তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আমার মনে হইল, এই বক্তৃতা তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। শাস্ত্রীজীর বক্তৃতা বড়ই প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল।

ঘুমন্ত লোককেই জাগানো যায়। কিন্তু যে জাগিয়া আছে তাহার কানের কাছে ঢোল পিটাইলেও সে শুনিতে পায় না। কাউন্সিল সভায় বিল আলোচনার

একটা প্রহসন করা মাত্র আবশ্যক ছিল। সরকার তাহাই করিলেন। সরকারের যাহা করণীয় তাহা পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইজন্য শাস্ত্রীর সাবধান বাণী নিরর্থক ছিল।

এই অবস্থায় আমার ক্ষীণ স্বর সরকার কি করিয়া শুনিবেন? আমি বড়লাটের সঙ্গে দেখা করিয়া খুব অনুনয় করিলাম, ব্যক্তিগত পত্র লিখিলাম এবং সংবাদপত্রে প্রকাশ্যভাবে পত্র দিলাম। সত্যাগ্রহ ব্যতীত আমার কাছে দ্বিতীয় অস্ত্র নাই, একথা তাঁহাকে জানাইলাম। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল।

তখনও বিল গেজেট করিয়া আইন করা হয় নাই। আমার শরীর দুর্বল থাকিলেও আমি দীর্ঘপথ ভ্রমণ করার ঝুঁকি লইলাম। আমার জোরে কথা বলার শক্তি ছিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে পারিতাম না—আজও সে শক্তি নাই। দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ বলিলেই শরীর কাঁপিতে আরম্ভ হয় ও বুকে পিঠে খিল ধরিয়া আসে। কিন্তু মাদ্রাজ হইতে যখন নিমন্ত্রণ আসিল তখন যাওয়াই চাই বলিয়া মনে হইল। দক্ষিণ প্রদেশকে তখন আমার বাড়ি বলিয়া মনে হইত। দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পর্ক বশতঃ, তামিল ও তেলেগুদের উপর আমার একটা দাবি আছে বলিয়া আমার মনে হইত। আর সেরূপ মনে করিয়া যে ভুল করিয়াছি একথা আজও বুঝিতে পারি নাই। নিমন্ত্রণ পত্র কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গারের স্বাক্ষরে আসিয়াছিল। মাদ্রাজ গিয়া জানিলাম যে এই নিমন্ত্রণের মূলে আছেন রাজাগোপালাচারী। ইহাই আমার রাজা-গোপালাচারীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় বলা যায়। এই সময়েই আমি তাঁহার পরিচয় পাইলাম।

জনসেবার কাজে আরও বেশি সময় দিবার জন্য শ্রীকস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার প্রভৃতির আমন্ত্রণে তিনি সালেম ছাড়িয়া মাদ্রাজে ওকালতি করিতে আসিয়াছিলেন। আমি দুদিন পরে টের পাইলাম যে, তাঁহারই বাড়িতে অতিথি হইয়াছি। বাংলোটি শ্রীকস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গারের ছিল বলিয়া আমি জানিতাম—আমি তাঁহারই অতিথি। শ্রীমহাদেব দেশাই আমার ভুল ধরিয়া দিলেন। শ্রীরাজাগোপালাচারী দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু মহাদেব তাঁহাকে ভাল রকম চিনিয়াছিলেন। মহাদেব আমাকে একদিন তাঁহার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিলেন। বলিলেন—আপনার রাজাগোপালাচারীকে ভাল করিয়া চিনিয়া লওয়া দরকার।

আমি পরিচয় করিলাম। তাঁহার সঙ্গে প্রতিদিন ভবিষ্যৎ সংগ্রাম সম্পর্কে

আলোচনা হইত। সভাসমিতি করা ছাড়া আর কি করা যায়, তাহা আমি বুঝিতাম না। রাউলাট বিল যদি আইন করা হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে আইন অমান্য কিভাবে করা যায়? সরকার সুযোগ দিলে তবেই কেউ আইন অমান্য করিতে পারিবে। অন্য কোনও আইন অমান্য করা যায় কিনা—কতদূর পর্যন্ত তাহার সীমারেখা টানা যায়—এই ধরনের আলোচনা হইত।

শ্রীকস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার নেতাদের একটি ছোট সভা ডাকিলেন। সে সভায় খুব আলোচনা হইল। তাহাতে শ্রীবিজয়রাঘবাচারী খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি আমার কাছে প্রস্তাব করিলেন, খুঁটিনাটিসহ সত্যাগ্রহের নিয়মকানুন, পদ্ধতি লিখিয়া ফেলা হউক। এ কাজ আমার সাধ্যাতীত—একথা আমি বলিলাম।

যখন এই রকম আলাপ আলোচনা চলিতেছিল, তখন সংবাদ আসিল যে ঐ বিলটি আইন বলিয়া গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে। এই সংবাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রে আমি ঘুমাইলাম। প্রাতঃকালের পূর্বেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অর্ধেক ঘুমের ঘোরে, যেন স্বপ্নের বশে, এই সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি তাহা আমার চিন্তার মধ্যে উদয় হইল। আমি শ্রীরাজাগোপালাচারীকে ডাকিয়া বলিলাম—

"আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটা ধারণা গতরাত্রে স্বপ্নাবস্থায় আমি পাইয়াছি। এই আইনের প্রত্যুত্তর স্বরূপ, আমরা সারা দেশে হরতালের ডাক দিব। সত্যাগ্রহ আত্মশুদ্ধির যুদ্ধ, ইহা ধর্ম-যুদ্ধ। ধর্ম-কার্য শুদ্ধি দ্বারাই শুরু করা উচিত বোধ হয়। ঐ দিন সকলে উপবাস করিবে ও নিজেদের কাজ-কর্ম বন্ধ রাখিবে। মুসলমানদের রোজার উপর উপবাস দরকার নাই। এই উপবাস ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত পালন করার অনুরোধ জানানো হইবে। এই কাজে সকল প্রদেশ যোগ দিবে কিনা তাহা বলিতে পারি না। আমার আশা হয় বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার ও সিন্ধুপ্রদেশ যোগ দিবে। এই কয়টি জায়গাতেও যদি ঠিক মত হরতাল হয়, তাহা হইলেও সন্তোষজনক মনে করা যাইবে।

এই প্রস্তাব শ্রীরাজাগোপালাচারীর খুব ভাল লাগিল। অন্যান্য বন্ধুদের জানানো হইল এবং তাহাদের সকলেরই ভাল লাগিল। হরতাল পালন সম্পর্কে একটি আবেদনের খসড়া আমি রচনা করিলাম। প্রথমে ১৯১৯ সালের ৩০শে মার্চ দিন স্থির করা হইয়াছিল। পরে ৬ই এপ্রিল স্থির হয়। এই হরতালের সংবাদ খুব অল্পদিন পূর্বে লোকে পাইল। কাজ শীঘ্র আরম্ভ করার আবশ্যকতা

ছিল বলিয়া, তৈরি হওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় দেওয়া যায় নাই।

কে জানে কেমন করিয়া সব ঘটিয়া গেল। সারা ভারতবর্ষে শহরে, গ্রামে হরতাল হইল। ইহা এক অপূর্ব দৃশ্য!

৩১

স্মরণীয় সপ্তাহ—১

মনে পড়ে দক্ষিণ ভারতে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া, ৪ঠা এপ্রিল বোম্বাই পৌঁছিলাম। ৬ই তারিখ হরতাল পালনের দিন বোম্বাইতে থাকার জন্য আমাকে শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার তার করিয়াছিলেন।

ইহার পূর্বেই দিল্লীতে ৩০শে মার্চ হরতাল হইয়া গিয়াছে। ৺শ্রদ্ধানন্দ স্বামী ও স্বর্গগত হাকিম আজমল খাঁর আদেশই দিল্লীতে শেষ কথা ছিল। ৬ই এপ্রিল যে হরতালের তারিখ বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে সংবাদ দিল্লীতে বিলম্বে পৌঁছে। দিল্লীতে সেদিন যেমন হরতাল হয়, পূর্বে আর কখনো তেমন হয় নাই। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই মিলিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছিল। শ্রদ্ধানন্দজী নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া জুম্মা মসজিদে বক্তৃতা দেন। এসব সরকারের সহ্য করার শক্তি ছিল না। শোভাযাত্রা রেল স্টেশনে যাওয়ার পথে পুলিস আটকাইয়া দিল। পুলিস গুলি চালাইল, অনেকে আহত হইল। কয়েকজন মারাও গেল। দিল্লীতে দমননীতি আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধানন্দজী আমাকে দিল্লী আসিতে লিখিলেন। ৬ই তারিখ পার হইলেই আমি দিল্লী যাইব বলিয়া উত্তর দিলাম।

যেমন দিল্লীতে, তেমনি লাহোরে এবং অমৃতসরে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। অমৃতসর হইতে ডাক্তার সত্যপাল ও কীচলু আমাকে টেলিগ্রাম করিয়া সেখানে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। এই দুই ভাইকে আমি তখন পর্যন্ত মোটেই জানিতাম না। দিল্লী হইতে তাঁহাদের ওখানে নিশ্চয় যাইব বলিয়া জানাইলাম।

৬ই তারিখ প্রাতঃকালে বোম্বাইএ হাজার হাজার লোক চৌপাটিতে সমুদ্র স্নানে গিয়াছিল। সেখান হইতে ঠাকুর-দ্বারে যাওয়ার জন্য শোভাযাত্রা হয়। ইহাতে স্ত্রীলোক এবং বালকেরাও যোগ দিয়াছিল। শোভাযাত্রায় অনেক মুসলমানও যোগ দেন। কয়েকজন মুসলমান ভাই আমাদের এই শোভাযাত্রা

হইতে এক মসজিদে লইয়া গেলেন। সেখানে শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ও আমাকে বক্তৃতা করিতে হইল। এইস্থানে শ্রীবিঠ্ঠলদাস জেরাজানী, স্বদেশী ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতিজ্ঞা লওয়ার প্রস্তাব করিলেন। তাড়াতাড়ি করিয়া এই ধরনের প্রস্তাব লইতে আমি নিষেধ করি। যতটা লোকে করিয়াছে আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পরামর্শ দেই। প্রতিজ্ঞা যদি লওয়া হয়, তবে তাহা আর ভঙ্গ করিতে নাই। স্বদেশীর অর্থ বুঝিতে পারা চাই। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দায়িত্ব কতদূর—সে বিষয়েও খেয়াল করা দরকার ইত্যাদি তাঁদের বলি। পরে প্রস্তাব দিই যে, যদি প্রতিজ্ঞা লওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে সকলে যেন পরদিন সকালে চৌপাটির ময়দানে উপস্থিত হন।

বোম্বাইএ পূর্ণ হরতাল হয়। আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা এখানে হইয়াছিল। যাহা লইয়া আইন অমান্য করা যায়, এমন দুই তিনটা বিষয় ছিল। যে আইন তুলিয়া দেওয়ার যোগ্য এবং যাহা সহজেই অমান্য করা যাইতে পারে, এমন আইনগুলি বাছিয়া লওয়া স্থির হয়। লবণের উপর যে শুল্ক ছিল সে সম্পর্কে জনসাধারণের মনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এই লবণ শুল্ক উঠাইয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। সকলেই বিনা লাইসেন্সে নিজের নিজের বাড়ীতে লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন অমান্য করিবে, এই প্রকার একটি প্রস্তাব আমি উপস্থিত করিলাম। আর একটা প্রস্তাব ছিল—সরকার যে সকল বিখ্যাত বই নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন সেগুলি ছাপানো ও বিক্রয় করার। আমারই এই ধরনের দুখানা বই ছিল—"হিন্দ স্বরাজ্য" ও "সর্বোদয়"। এই বই ছাপাইয়া বিক্রয় করিলে সকলে সহজেই আইন অমান্য করিতে পারে। উপবাস অন্তে যে বৃহৎ সভা হইল তাহাতে এই বই ছাপাইয়া বিক্রয় করার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সন্ধ্যাবেলায় অনেক স্বেচ্ছাসেবক এই বই বিক্রয় করিতে বাহির হইলেন। একই মোটরে আমি বাহির হইলাম, আর এক মোটরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বাহির হইলেন। যতগুলি ছাপা হইয়াছিল তাহা সব বিক্রয় হইয়া গেল। বিক্রয়লব্ধ অর্থ আইন অমান্যের কাজে ব্যয় হইবে স্থির ছিল। একখানা বইর দাম চারি আনা। কিন্তু আমার হাতে কি সরোজিনী নাইডুর হাতে কদাচিৎ কেহ চার আনা দিতেছিল। অনেকে পকেট উল্টাইয়া যাহা ছিল তাহাই বইর দাম বলিয়া দিতেছিল। কতকগুলি দশ টাকার ও পাঁচ টাকার নোটও আসিতে লাগিল। পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়াও একখানা বই কেনা

হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ আছে। যে কিনিতেছে তাহাকে জেলে যাইতে হইতে পারে, একথা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছিল, কিন্তু সে সময়ের জন্য লোকে জেলের ভয় ভুলিয়া গিয়াছিল।

৭ই তারিখে জানা গেল যে, যে সব বই বিক্রয় করা হইয়াছে, সে বইগুলি সরকারের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ বইএর মধ্যে পড়ে না। যাহা বিক্রয় হইতেছিল তাহা পুনর্মুদ্রণ ছিল, আর সেই জন্যই নাকি উহা নিষিদ্ধ পুস্তক বলিয়া গণ্য নহে। সরকারের তরফ হইতে বলা হইল যে, ঐ বই ছাপাইয়া, বিক্রয় করিয়া ও কিনিয়া আইন অমান্য করা হয় নাই। এই সংবাদে লোকে নিরাশ হইল।

ঐ দিন সকালে চৌপাটিতে স্বদেশী ব্রত ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ব্রত লওয়ার জন্য লোক জমায়েত হইয়াছিল। বিঠ্ঠলদাস জেরাজানীর এই প্রথম অনুভব হইল যে, যাহা সাদা দেখায় তাহাই দুধ নহে। লোক অল্পই আসিয়াছিল। আমার মনে আছে কয়েকজন ভগ্নী আসিয়াছিলেন। পুরুষের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আমি প্রতিজ্ঞার খসড়া আনিয়াছিলাম। উহার অর্থ খুব ভাল করিয়া বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে ব্রত গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলাম। অল্প লোক আসিয়াছিল দেখিয়া আশ্চর্য হই নাই এবং আমার দুঃখও হয় নাই। উত্তেজনার কাজে ও ধীরেসুস্থে গঠনাত্মক কাজের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং লোকের উত্তেজনার জন্য আগ্রহ এবং গঠনাত্মক কাজের প্রতি বিরাগ, আমি সেই হইতে দেখিয়া আসিতেছি। এই বিষয়ে ভিন্ন এক অধ্যায়ই লিখিতে হইবে।

৭ই রাত্রে দিল্লী ও অমৃতসর যাওয়ার জন্য রওনা হইলাম। ৮ই তারিখ মথুরা পৌঁছিতে কে একজন এই সংবাদ দিয়া গেল আমাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। মথুরার পরের স্টেশনে গাড়ি থামিতেই প্রফেসর গিদোয়ানীর সঙ্গে দেখা হইল। আমাকে গ্রেপ্তার করা হইবে সে সংবাদ তিনি বিশ্বস্তসূত্রে পাইয়াছেন বলিলেন। তিনি আবশ্যক হইলে আমাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি উপকৃত হইলাম এবং আবশ্যক হইলে সাহায্য লইতে ভুলিব না জানাইলাম।

পলওয়াল স্টেশনে পৌঁছিবার পূর্বেই পুলিস আমার হাতে লিখিত হুকুমনামা দিল। "আপনি পাঞ্জাবে প্রবেশ করিলে শান্তিভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে। সেই জন্য পাঞ্জাবের সীমানায় আপনি প্রবেশ করিতে পারিবেন না"—হুকুম এই ধরনের ছিল। হুকুমনামা দিয়া পুলিস আমাকে গাড়ি হইতে নামিয়া যাইতে বলিল। আমি নামিতে অস্বীকার করিয়া বলিলাম—"আমি অশান্তি বাড়াইতে যাইতেছি না, নিমন্ত্রিত হইয়া অশান্তি কমাইতে যাইতেছি। এই

হুকুম মানিতে পারিতেছি না বলিয়া আমি দুঃখিত।”

পলওয়াল আসিলাম। মহাদেব আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাকে দিল্লী গিয়া শ্রদ্ধানন্দজীকে সংবাদ দিতে ও লোক শান্ত রাখিতে বলিয়া দিলাম—বলিয়া দিলাম আমি কেন হুকুম অমান্য করিয়া যে শাস্তি হয় তাহা লওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। শাস্তি পাওয়া সত্ত্বেও লোকে যদি শান্ত থাকে, তাহা হইলেই আমাদের জয় হইবে—একথাও বুঝাইতে মহাদেবকে বলিয়া দিলাম।

পলওয়াল স্টেশনে আমাকে নামাইয়া লইয়া পুলিসের হেপাজতে রাখিল। দিল্লী হইতে একখানা ট্রেন আসিতেছিল। উহার এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আমাকে বসাইল, সঙ্গেই পুলিসের দলও বসিল। মথুরা পৌছিতে আমাকে পুলিস ব্যারাকে লইয়া গেল। আমাকে কি করিবে, কোথায় লইয়া যাইবে, সে কথা কোনও কর্মচারী বলিতে পারিল না। সকাল ৪টায় আমাকে ঘুম হইতে তুলিয়া বোম্বাই-গামী এক মালগাড়িতে লইয়া বসাইল। দুপুরবেলায় মধুপুরে নামাইল। সেইখানে বোম্বাইয়ের মেল-ট্রেনে লাহোর হইতে ইনস্পেক্টার মিঃ বোরিং আসিলেন। তিনি আসিয়া আমার ভার লইলেন। এইবার আমাকে প্রথম শ্রেণীতে চড়ানো হইল। সাহেব সঙ্গে বসিলেন। এ পর্যন্ত আমি সাধারণ কয়েদী ছিলাম। এখন “ভদ্রলোক কয়েদী” হইলাম। সাহেব স্যার মাইকেল ও-ডায়ারের প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমার বিরুদ্ধে তাঁহার কোনও অভিযোগ ছিল না। কিন্তু আমার পাঞ্জাবে যাওয়াতে অশান্তির খুব আশঙ্কা আছে ইত্যাদি বলিয়া আমাকে ফিরিয়া যাইতে ও পাঞ্জাবে প্রবেশ না করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি হুকুম মানিতে পারিব না এবং আমি স্বেচ্ছায় ফিরিয়া যাইব না। তখন নিরুপায় হইয়া তিনি আইন অনুযায়ী কাজ করিবেন বলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“কিন্তু আমাকে লইয়া কি করিতে চান, বলিতে পারেন?” তিনি বলিলেন—“সে আমি জানি না, আমার অন্য আদেশ পাওয়া চাই। এখন ত আপনাকে বোম্বাই লইয়া যাইতেছি।”

সুরাটে আসিলে অন্য এক পুলিস অফিসার আমার ভার লইলেন। রাস্তায় আমাকে বলিলেন—“আপনি খালাস পাইয়াছেন। আপনার জন্য ‘মেরিন লাইন্সে’ ট্রেন থামাইব। সেখানে নামিলে ভাল হয়, কোলাবা স্টেশনে খুব ভিড় হওয়ার আশঙ্কা আছে।” আমি সম্মত আছি বলিলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইলেন ও আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। আমি মেরিন লাইন্সে নামিলাম। একজন বন্ধুর

গাড়ি সেই সময় সেখান দিয়া যাইতেছিল। তিনি সেই গাড়িতে আমাকে তুলিয়া লইয়া শ্রী রেবাশঙ্কর ঝাভেরীর বাড়িতে রাখিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন যে, আপনার গ্রেপ্তারের সংবাদে লোকে ক্রুদ্ধ এবং পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে। পায়ধুনীর কাছে গোলমাল হওয়ার ভয় আছে। সেই জন্য সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস গিয়া পৌঁছিয়াছে।

আমি ঘরে ঢুকিতেই উমর সোবানী ও অনসূয়া বেন মোটরে আসিলেন। তাঁহারা আমাকে পায়ধুনী যাইতে অনুরোধ করিলেন ও বলিলেন—"লোক সব অধীর ও উত্তেজিত হইয়াছে, আমাদের কেউ তাহাদের শান্ত করিতে পারিবে না। আপনাকে দেখিলে তবে শান্ত হইবে।"

আমি মোটরে উঠিলাম। রাস্তায় যাইতে খুব ভিড় দেখিলাম। লোকে আমাকে দেখিয়া আনন্দে পাগল হইয়া গেল। তখনি এক শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। "বন্দেমাতরম্" "আল্লা-হো-আকবর" ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে থাকে। পায়ধুনীতে অশ্বারোহী পুলিস দেখিলাম। উপর হইতে ইষ্টক-বৃষ্টি হইতেছিল। আমি হাতজোড় করিয়া লোকদিগকে শান্ত হইতে বলিতেছিলাম। কিন্তু এই ইষ্টক-বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব মনে হইল না। 'আব্দুর রহমান' গলি হইতে 'ক্রফোর্ড মারকেটে' যাইবার পথে শোভাযাত্রা আটকাইবার জন্য অশ্বারোহী পুলিস দল সামনে দাঁড়াইয়া গেল। শোভাযাত্রা ফোর্টের দিকে যাইতে তাহারা বাধা দিতেছিল। কিন্তু কেউ বাধা মানিতেছিল না। লোক পুলিস-লাইন ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। এই ভিড়ে আমার আওয়াজ কাহারও শোনা সম্ভবপর ছিল না। এই অবস্থায় অশ্বারোহী পুলিস দলের অধিনায়ক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার হুকুম দিলেন। তখন অশ্বারোহী পুলিস বর্শা উঁচাইয়া একদম ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। উহাদের বর্শা আমাদের গায়ে লাগিয়া যাওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু বর্শা গায়ে লাগিল না, গা ছুঁইয়া বর্শা লইয়া অশ্বারোহীরা তীরবেগে ছুটিয়া গেল। তখন লোকের ভিড় ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল—দৌড়া-দৌড়ি আরম্ভ হইল। কেউ পদদলিত হইল, কেহ পলাইল। অশ্বারোহীদের যাওয়ার কোনও স্থান ছিল না। লোকের আশেপাশে ছড়াইয়া পড়ারও কোন পথ ছিল না। তাহারা পিছনে ফিরিবে কি, সেখানেও হাজারো লোক ঠাসাঠাসি ভর্তি। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! অশ্বারোহী পুলিস ও জনতা উন্মত্তের মত একত্র মিশিয়া গিয়াছিল। অশ্বারোহীরা কিছু দেখিতে বা কোথাও যাইতে পারিতেছিল না। তাহারা অন্ধের ন্যায় মানুষের ভিতর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া রাস্তা কাটিতেছিল।

এই হাজার হাজার লোকের ভিড় কাটিয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাহারা কিছুই যে দেখিতে পাইতেছে না, তাহা আমি দেখিলাম।

এই রকম করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করা হইয়াছিল, এমনি করিয়া তাহাদের পথ আটকানো হইয়াছিল। আমার মোটর আগে যাইতে দিয়াছিল। আমি কমিশনারের আপিসের সামনে মোটর রাখিলাম এবং তাঁহার কাছে পুলিসের আচরণের বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্য নামিলাম।

৩২

স্মরণীয় সপ্তাহ—২

কমিশনার গ্রিফিথ সাহেবের আপিসে গেলাম। সিঁড়ির আশেপাশে যেখানে দেখা যায়, সেইখানেই হাতিয়ারধারী সৈন্য খাড়া রহিয়াছে। যেন যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া আছে। বারান্দাতে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছিল। আমি সংবাদ দিয়া আপিসের ভিতরে গিয়া দেখিলাম, সেখানে কমিশনারের কাছে মিঃ বোরিং বসিয়া আছেন।

আমি যে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি কমিশনারের কাছে তাহা বর্ণনা করিলাম। তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন—"আমি শোভাযাত্রা ফোর্টের দিকে যাইতে দিতে চাই নাই। সেখানে গেলে হাঙ্গামা না হইয়া যাইত না। আমি দেখিলাম লোকে অনুরোধ মানিতেছে না, তখন অশ্বারোহী পুলিস না পাঠাইয়া উপায় ছিল না।"

আমি বলিলাম—"কিন্তু তাহার ফল কি হইবে তাহা ত আপনি জানিতেন। লোকের ঘোড়ার পায়ের নীচে নিষ্পেষিত হওয়া ছাড়া অন্য পথ ছিল না। এই পুলিস দল পাঠানোর দরকারই ছিল না, আমি ত এইরূপ মনে করি।"

"আপনি সে খবর রাখেন না। আপনার শিক্ষার ফল লোকের উপর কি হয়, তাহা আপনার চেয়ে আমরা অনেক বেশি জানি। আমি প্রথম হইতে কঠিন উপায় না লইলে পরে অনেক বেশি লোকসান হইত। আমি আপনাকে বলিয়া দিতেছি, লোকে আপনার কথা মানিবে না। আইন অমান্য করার কথা তাহারা চট্ করিয়া বুঝে। শান্ত থাকার কথা উপলব্ধি করা তাহাদের শক্তির বাহিরে। আপনার মনোভাব ভাল। কিন্তু লোকে আপনার ভাব বুঝিবে না। তাহারা নিজের স্বভাবেরই অনুসরণ করিবে।"

আমি উত্তর দিলাম—"আপনার ও আমার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এইখানেই

পার্থক্য। লোকের স্বভাব লড়াই করার দিকে নয় বরং তারা শান্তিপ্রিয়।" তখন যুক্তি-তর্ক আরম্ভ হইল।

অবশেষে সাহেব বলিলেন—"ধরুন আপনি বুঝিলেন যে আপনার শিক্ষা লোকে বুঝে নাই। তখন আপনি কি করিবেন?"

আমি জবাব দিলাম—"যদি আমি তাহাই বুঝি, তবে এই সত্যাগ্রহ সাময়িক ভাবে বন্ধ করিয়া দিব।"

"বলেন কি? আপনি ত মিঃ বোরিংএর কাছে বলিয়াছেন যে মুক্তি পাওয়া মাত্রই আপনি পাঞ্জাবে ফিরিয়া যাইতে চান।"

"আমার ত ইচ্ছা ছিল যে পরের ট্রেনেই পাঞ্জাবে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু এখন ত আর যাওয়ার কথা বলা চলে না।"

"আপনি ধৈর্য ধরিয়া যদি থাকেন তবে অনেক খবর পাইবেন। আমেদাবাদে কি চলিতেছে তাহা জানেন কি? অমৃতসরে কি হইয়াছে? লোকে একেবারে পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে। আমি বিস্তৃত খবর পাই নাই। কতক জায়গায় লোকে টেলিগ্রাফের তারও কাটিয়া দিয়াছে। আমি আপনাকে বলিতেছি, এই সমস্ত হাঙ্গামারই দায়িত্ব আপনার।"

"আমার দায়িত্ব যেখানে আছে, সেখানে আমি তাহা অবশ্যই লইব। আমেদাবাদে লোকে যদি কিছু গোলমাল করিয়া থাকে, তবে আমি আশ্চর্যান্বিত ও দুঃখিত হইব। অমৃতসরের কথা কিছু জানি না। সেখানে আমাকে কেউ জানেও না। তবে আমি এটুকু জানি যে, পাঞ্জাবের সরকার যদি আমাকে সেখানে প্রবেশ করিতে বাধা না দিতেন, তবে আমি জনতাকে শান্ত রাখার কাজে যথেষ্ট অংশগ্রহণ করিতে পারিতাম। আমাকে যাইতে না দিয়াই ত সরকার লোককে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছেন।"

এইভাবে আমাদের কথা হইতে লাগিল। আমাদের মত মিলিবে এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। চৌপাটিতে সভা করিব ও লোককে শান্তি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিব, এই কথা বলিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।

চৌপাটিতে সভা করা হইল। আমি জনতাকে শান্তি ও সত্যাগ্রহের মর্যাদা সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিলাম—"সত্যাগ্রহ নিঃসন্দেহে সত্যনিষ্ঠের অস্ত্র। সত্যাগ্রহী অহিংসানিষ্ঠ থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং কায়মনোবাক্যে জনসাধারণ ইহা পালন না করিলে আমার দ্বারা গণসত্যাগ্রহ চালানো কখনও সম্ভব হইবে না।"

আমেদাবাদ হইতে শ্রীমতী অনসূয়া বেন সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, সেখানে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। কেউ গুজব তুলিয়াছিল যে, তাঁহাকে (শ্রীমতী বেনকে) গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাতে কারখানার শ্রমিকেরা পাগল হইয়া উঠে, কাজ বন্ধ করে ও হাঙ্গামা করে। একজন সার্জেণ্ট পর্যন্ত খুন হইয়া গিয়াছে।

আমি আমেদাবাদে গেলাম। সেখানে খবর পাইলাম যে, নড়িয়াদের কাছে রেলের লাইন তুলিয়া ফেলার চেষ্টা হইয়াছিল। বিরামগামে একজন সরকারী কর্মচারী খুন হইয়াছে এবং আমেদাবাদে 'সামরিক আইন' জারি হইয়াছে। সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। লোকে যেমন হিংসাত্মক কাজ করিয়াছিল তাহার ফলও তেমনি সুদ সমেত পাইতেছিল।

কমিশনার মিঃ প্র্যাটের কাছে আমাকে লইয়া যাওয়ার জন্য স্টেশনে লোক উপস্থিত ছিল। আমি তাঁহার কাছে গেলাম। তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন। আমি শান্ত হইয়া তাঁহার কথার জবাব দিলাম। যে খুন হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করিলাম। সামরিক আইনের অনাবশ্যকতার কথা বলিলাম এবং শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য যে উপায় গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহাই করিতে আমি প্রস্তুত আছি—একথা জানাইলাম। আমি সাধারণ সভা আহ্বানের অনুমতি চাই। সেই সভা আশ্রমের মাঠে করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করি। ইহা তাঁহার মনঃপূত হইল। আমার স্মরণ আছে যে, এই সভা ১৩ই তারিখ রবিবার দিন করা হইয়াছিল। 'সামরিক আইন' সেইদিন কি তার পরদিন প্রত্যাহৃত হয়। সেই সভায় আমি জনতার দোষ দেখাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনদিন উপবাসের সিদ্ধান্ত লই এবং সকলকে একদিন উপবাস করার জন্য পরামর্শ দিই। যাহারা খুন ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত আছে, তাহাদের অপরাধ স্বীকার করিতে বলি।

আমার ধর্ম আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। যে সকল শ্রমিকের সঙ্গে আমি এতদিন কাটাইয়াছি যাহাদের আমি সেবা করিয়াছি এবং যাহাদের কাছে আমি ভাল ব্যবহার আশা করিতাম, তাহারা এই হাঙ্গামায় অংশ লইয়াছে বলিয়া আমার গভীর দুঃখ হইল। আমি নিজেকেই ইহাদের অপরাধের অংশীদার বলিয়া মনে করি।

একদিকে যেমন অপরাধীদের নিজের অপরাধ স্বীকার করিতে বলিয়াছিলাম, অপরদিকে তেমনি সরকারকেও এইসব অপরাধ ক্ষমা করিবার পরামর্শ দিয়া-

ছিলাম। কিন্তু আমার কথা দুই পক্ষের কেউই শোনে নাই। না লোকে দোষ স্বীকার করিল, না সরকার মাফ করিলেন।

রমন ভাই ও আমেদাবাদের অনেকে আমার কাছে আসিলেন ও সত্যাগ্রহ মুলতুবী রাখার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি অনুরোধের অপেক্ষা রাখি নাই। যে পর্যন্ত শান্তিরক্ষা করিতে লোকে না শিখিতেছে, সে পর্যন্ত সত্যাগ্রহ মুলতুবী রাখার সংকল্প আমি পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহাতে তাঁহারা খুশি হইলেন।

কোনও কোনও বন্ধু অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, সকলে শান্ত থাকিবে এ প্রকার আশা যদি আমি রাখি ও তাহাই যদি সত্যাগ্রহের শর্ত হয়, তবে ব্যাপকভাবে সত্যাগ্রহ কখনো চালানো যাইবে না। আমি আমার মতপার্থক্যের কথা জানাইলাম। যেসব লোকের মধ্যে কাজ করিতে হইবে, যাহাদের দ্বারা সত্যাগ্রহ করার আশা করা হয়, তাহারা যদি শান্তি না রাখে, তবে অবশ্যই সত্যাগ্রহ চালানো যাইবে না। সত্যাগ্রহের নেতাদের মধ্যে নির্দিষ্ট ও পরিমিত শান্তি রাখিবার ক্ষমতা থাকা চাই, ইহাও আমার অন্যতম যুক্তি। এই অভিমত আজও আমার অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

৩৩

পর্বতপ্রমাণ ভুল

আমেদাবাদের সভার পরই আমি নড়িয়াদ যাই। "পর্বতপ্রমাণ ভুল" কথাটি (Himalayan miscalculation) যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহা আমি প্রথমে নড়িয়াদেই ব্যবহার করি। আমেদাবাদেই আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু এখানকার অবস্থা দেখিয়া এবং এই খেড়া জেলায় অনেক লোক গ্রেপ্তার হইতেছে শুনিয়া আমার হঠাৎ মনে হইল যে, খেড়া জেলায় এবং এই প্রকার অন্যান্য স্থানে ক্ষেত্র প্রস্তুতের পূর্বেই লোককে আইন অমান্য করিতে আহ্বান জানাইয়া আমি ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। এই ভুল আমার কাছে পর্বতপ্রমাণ মনে হয়। আমি একটি সভায় বক্তৃতা দিতেছিলাম। সেইখানেই আমি স্বীকারোক্তি করি।

এই কথা স্বীকার করাতে অনেকে আমাকে পরিহাস করেন। তাহা হইলেও, ভুল স্বীকার করার জন্য আমার কখনো অনুতাপ হয় নাই। আমার সর্বদাই মনে হয় যে, যদি অপরের চালুনীর মত ছিদ্রকে ছুঁচের ছিদ্রের মত মনে

করি, আর নিজের সরিষাপ্রমাণ দোষকে পর্বতপ্রমাণ মনে করিতে শিক্ষা করি, তাহা হইলেই পরের দোষ ও নিজের দোষের ঠিক পরিমাণ জানিতে পারিব। আমি ইহাও বলি যে, যে ব্যক্তি সত্যাগ্রহী হইতে ইচ্ছা করে এই সাধারণ নিয়ম তাহার খুব সূক্ষ্মভাবে পালন করা সঙ্গত।

এইবার এই পর্বতপ্রমাণ ভুলটা কি তাহা দেখা যাক। অহিংসভাবে আইন অমান্য তাহার দ্বারাই হইতে পারে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও শ্রদ্ধায় আইনকে মান্য করিয়া থাকে। অনেক সময়েই আমরা নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও, সাজা পাওয়ার ভয়েই আইন পালন করিয়া থাকি। যে সকল আইনে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নাই, সে সকল আইন সম্পর্কেই আইনের ভয়ে আইন মানার কথা বিশেষ ভাবে খাটে। চুরি করার বিরুদ্ধে আইন থাকুক আর নাই থাকুক, কোনও ভাল লোক হঠাৎ চুরি করিতে পারে না। কিন্তু সেই ব্যক্তিই রাত্রিকালে বাই-সাইকেলে আলো লইয়া চলার নিয়মভঙ্গ করিয়া কোনও ক্ষোভ অনুভব করিবে না। আর এই ধরনের নিয়ম পালন করার জন্য যদি কেউ বলে, তাহা হইলেও তাহা পালন করিতে ভাল মানুষেরাও তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয় না। কিন্তু যখন এই নিয়ম আইন বলিয়া পাস হইয়া যায় এবং উহা পালন না করিলে দণ্ড পাওয়ার ভয় থাকে, তখন দণ্ড পাওয়ার অসুবিধা হইতে বাঁচার জন্য রাত্রে বাইসাইকেলের বাতি জ্বালাইয়াই সকলে চলে। এই শেষোক্ত প্রকারের নিয়ম পালন করাকে স্বেচ্ছায় নিয়ম পালন করা বলে না।

সত্যাগ্রহী যখন সমাজের নিয়ম মান্য করে তখন সে জানিয়া, বুঝিয়া, স্বেচ্ছাক্রমে এবং এই নিয়ম মান্য করাকে ধর্মজ্ঞান করিয়াই উহা মান্য করিয়া থাকে। এইভাবে যে ব্যক্তি সমাজের নিয়ম জ্ঞানপূর্বক পালন করে, তাহারই সামাজিক নিয়মের নীতি-অনীতির পার্থক্য বুঝিবার শক্তি আসে এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কোনও বিশেষ নিয়ম ভঙ্গ করার অধিকার জন্মে। এই প্রকার নিয়ম ভঙ্গ করার অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই লোককে আইন ভঙ্গ করার জন্য আহ্বান করিয়া পর্বতপ্রমাণ ভুল করিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইয়াছিল। খেড়া জেলাতে প্রবেশ করিতেই, খেড়ার সত্যাগ্রহ যুদ্ধের স্মৃতিসমূহ হইতে আমার মনে আসিল যে, আমি কেমন করিয়া এই স্পষ্ট জিনিসটাও দেখিতে ভুল করিলাম। আমার এই বোধ হইল যে, আইন অমান্য করার পূর্বে উহার গভীর রহস্য সম্পর্কে লোকের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। যাহারা প্রত্যহ আইনকে মনে মনে ভঙ্গ করে, যাহারা লুকাইয়া অনেক সময়েই আইন অমান্য করে, তাহারা হঠাৎ আইন-

ভঙ্গের মর্ম কি বুঝিবে? কেমন করিয়া তাহার মর্যাদা রক্ষা করিবে?

কিন্তু এই আদর্শ অবস্থায় হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ লোক যে পৌঁছিতে পারিবে না, তাহা ত সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু যদি এই অবস্থাই হয়, তাহা হইলে আইন ভঙ্গ করিতে বলার পূর্বে, জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে পারে ও তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারে—এমন শুদ্ধ চরিত্র স্বেচ্ছাসেবকের দল গঠন করা প্রয়োজন এবং এই দলের আইন অমান্য ও তাহার মর্যাদা সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বোম্বাই পৌঁছিলাম এবং সত্যাগ্রহ সভার ভিতর দিয়া সত্যাগ্রহী-স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিলাম। তাহাদের সাহায্যে আইন অমান্য কি, সত্যাগ্রহের তাৎপর্য কি ইত্যাদি জনসাধারণকে বুঝাইতে লাগিলাম। এই সকল কথা বুঝাইয়া বলার জন্য বুলেটিন প্রচারও শুরু হইল।

এই কাজ ভালভাবে চলিলেও আমি দেখিলাম যে, উহাতে লোককে আকৃষ্ট করা যাইতেছে না। সত্যাগ্রহের মধ্যে যে অহিংসার দিক আছে, সেদিকে জনগণকে আকর্ষণ করা কঠিন। স্বেচ্ছাসেবকও যথেষ্ট পরিমাণে জুটিতেছিল না। যাহারা এই দলে ভর্তি হইতেছিল, তাহারাও সকলে নিয়মিতভাবে শিক্ষা লইতেছিল, ইহাও বলা যায় না। তাহাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্তে হ্রাস পাইতে লাগিল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আইন অমান্যের শিক্ষণকার্যের অগ্রগতি যত দ্রুত হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা ধীরে ধীরেই হইবে।

৩৪

'নবজীবন' ও 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'

যত ধীরেই হোক, শান্তিরক্ষা ও শান্তিস্থাপনার কাজ যেমন একদিক হইতে হইতেছিল, অপর দিক হইতে সরকার তেমনি পুরাদস্তুর দমননীতি চালাইতে-ছিলেন। পাঞ্জাবে এই দমননীতি পূর্ণ মূর্তিতে দেখা দিল। সেখানে সামরিক আইন জারি করিয়া সরকার যথেচ্ছাচার শুরু করিলেন। নেতাদের গ্রেপ্তার করা হইল। বিশেষ আদালত বসানো হইল এবং সেগুলিকে আদালত বলা যায় না। উহা কোনও একজন কর্তার হুকুম চালাইবার যন্ত্র মাত্র। সাক্ষী ও প্রমাণ ব্যতীতই ঐ আদালত হইতে দণ্ডবিধান হইতে লাগিল। মিলিটারী

সৈন্তেরা নির্দোষ লোকদের কেঁচোর মত পেটের উপর ভর দিয়া শুইয়া চলিতে বাধ্য করিল। তখন জালিয়ানওয়ালাবাগের ভীষণ হত্যাকাণ্ড এদেশের ও বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু এই পরবর্তী অত্যাচারের বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতার তুলনায় আমার কাছে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডও তুচ্ছ বোধ হইল।

যেমন করিয়াই হোক, পাঞ্জাব যাওয়ার জন্ত আমার উপর চাপ পড়িল। আমি ভাইসরয়কে পত্র দিলাম, তার করিলাম। কিন্তু প্রবেশের অনুমতি পাওয়া গেল না। অনুমতি না লইয়া যদি যাই, তবে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে পারিব না। আইন অমান্ত করার আত্মতুষ্টি লাভ করা হইবে মাত্র। এই ধর্মসংকটে আমার কি করা উচিত? আমি যদি হুকুম অমান্ত করিয়া পাঞ্জাবে প্রবেশ করি, তাহা হইলেও সেই আচরণ আইন অমান্ত পর্যায়ভুক্ত হয় না বলিয়া বোধ হইল। যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা আইন অমান্তের জন্ত প্রয়োজন তাহা তখন সেখানে ছিল না। পাঞ্জাবের নাদিরশাহী কাণ্ড লোকের মনে অশান্ত হওয়ার প্রবৃত্তি বাড়াইয়াছিল। এই সময় আমার আইন অমান্ত করা, আগুনে ঘি ঢালা হইবে বলিয়া আমার বোধ হইল এবং আমি পাঞ্জাবে প্রবেশ করার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিলাম না। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমার কাছে তিক্ত ঔষধ পান করার মত হইয়াছিল। প্রতিদিন আমার কাছে অত্যাচারের সংবাদ আসে, আর প্রতিদিনই আমাকে অবরুদ্ধ ক্ষোভের সঙ্গে উহা বসিয়া বসিয়া শুনিতে হয়!

মিঃ হর্ণিম্যান 'দি বোম্বে ক্রনিকল' পত্রিকাকে এক প্রচণ্ড শক্তির উৎসে পরিণত করিয়াছিলেন। গভর্নমেণ্ট নিদ্রিত প্রজার ঘর হইতে চোরের মত এই মিঃ হর্ণিম্যান সাহেবকে কোথায় উঠাইয়া লইয়া গেলেন। এই চুরির ভিতর যে বীভৎসতা ছিল তাহার দুর্গন্ধ এখনো আমার নাকে লাগিয়া রহিয়াছে। আমি জানি যে, মিঃ হর্ণিম্যান মার-কাট করা কখনো পছন্দ করিতেন না। আমি সত্যাগ্রহ সমিতির অনুমতি না লইয়াই সেবার পাঞ্জাবে আইন অমান্ত করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। আইন অমান্ত মুলতবী রাখাতে তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। মুলতবী রাখার সংকল্প আমি প্রকাশ করার পূর্বেই মুলতবী রাখার পরামর্শ দিয়া তিনি আমাকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। বোম্বাই ও আমেদাবাদের মধ্যে পথের দূরত্বের জন্তই তাঁহার পরামর্শ সংকল্প প্রকাশের পরে আমার হস্তগত হয়। তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কার

করিয়া দেওয়াতে আমার যেমন আশ্চর্য বোধ হইল, তেমনি দুঃখ বোধ হইল।

ওই অবস্থায় 'ক্রনিকল'-এর ব্যবস্থাপকেরা উহা চালাইবার ভার আমার উপর দিলেন। মিঃ ব্রেলভী ত ছিলেনই। সেইজন্য আমার বিশেষ কিছু করার আবশ্যক ছিল না। তাহা হইলেও আমার স্বভাব-বশতঃ এই দায়িত্ব আমার নিকট অতিরিক্ত হইয়া পড়িত। কিন্তু বেশিদিন আমাকে এই দায়িত্ব বহন করিতে হয় নাই। সরকারের কৃপায় 'ক্রনিকল' কাগজ বন্ধ হইয়া গেল।

শ্রীউমর সোবানী ও শ্রীশঙ্করলাল ব্যাঙ্কার 'ক্রনিকল'-এর ব্যবস্থাপক ছিলেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজ তাঁহাদেরই হাতে ছিল। ইঁহারা দুইজনেই আমাকে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'খানা দেখিতে বলিলেন। 'ক্রনিকল'-এর কাজ 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'-র দ্বারা করাইবার জন্য, উহা সপ্তাহে পূর্বের মত একবার বাহির না করিয়া দুইবার বাহির করার প্রস্তাব করিলেন। আমার তাহা পছন্দ হইল। সত্যাগ্রহের তাৎপর্য ও রহস্য বুঝাইতে আমার ইচ্ছা হইত। পাঞ্জাব সম্বন্ধে আর কিছু না হোক, আমি উপযুক্ত সমালোচনা ত করিতে পারিব! আমি যাহা লিখি তাহার পশ্চাতে যে সত্যাগ্রহের শক্তি রহিয়াছে ইহাও গভর্নমেণ্টের জানা ছিল। এই জন্য আমি এই বন্ধুদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

কিন্তু ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে কেমন করিয়া সত্যাগ্রহের শিক্ষা দেওয়া যায়! গুজরাটই আমার কাজের মুখ্য ক্ষেত্র; এই সময় ভাই ইন্দুলাল যাজ্ঞিক ঐ দলে ছিলেন। তাঁহার হাতে 'নবজীবন' মাসিক পত্রখানা ছিল। তাহার খরচও উক্ত বন্ধুরা যোগাইতেন। এই পত্রখানা ভাই ইন্দুলাল ও তাঁর বন্ধুগণ আমাকে দিলেন। ভাই ইন্দুলাল উহাতে কাজ করিতেও স্বীকার করিলেন। এই মাসিক পত্রিকাকে সাপ্তাহিক করা হইল।

ইতিমধ্যে 'দি বোম্বে ক্রনিকল' পুনরুজ্জীবিত হয়। সেইজন্য 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'কে আবার সাপ্তাহিক করা হইল এবং আমার প্রস্তাব অনুযায়ী উহা আমেদাবাদে আনা হইল। দুইখানা কাগজ দুই জায়গা হইতে পরিচালনা করার খরচও বেশি হয়। আমার অসুবিধাও বেশি হয়। 'নবজীবন' আমেদাবাদ হইতে বাহির হইত। আমি "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' হইতেই এই অভিজ্ঞতা পাইয়াছি যে, এই রকম সংবাদপত্রের জন্য নিজস্ব ছাপাখানা চাই। ইহা ছাড়া তখন ছাপাখানা সম্পর্কিত আইন এমন ছিল যে, আমার লেখা ব্যবসাদার ছাপাখানাওয়ালাদের ছাপিতে সংকোচ হওয়ার কথা। ইহাই নিজেদের ছাপাখানা বসাইবার প্রধান কারণ। ইহা আমেদাবাদেই সহজে

হইতে পারিত। এইজন্য 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' আমেদাবাদে আনা হইল।

এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমি, যথাশক্তি সত্যাগ্রহের শিক্ষা দিতে লাগিলাম। উভয় কাগজ সংখ্যায় অনেক ছাপা হইত এবং প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একসময় ৪০ হাজারের কাছাকাছি পৌছিয়াছিল। 'নবজীবন'এর গ্রাহক সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পায় আর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র গ্রাহক ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমার জেলে যাওয়ার পর গ্রাহক সংখ্যা হ্রাস পায়। এখন আট হাজারের নীচে নামিয়া গিয়াছে।

এই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন না লওয়ার ইচ্ছা আমার প্রথম হইতেই ছিল। আমার বিশ্বাস, ইহাতেও কোন ক্ষতি হয় নাই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে এই নীতি খুব সাহায্য করিয়াছে।

এখানে বলা যাইতে পারে আমি এই সংবাদপত্র দুইটি হইতে আমার শান্তি লাভ করিয়াছিলাম। যদিও আমি তখনই আইন অমান্য আরম্ভ করিতে পারি নাই, তথাপি ইচ্ছামত আমার মতবাদ প্রচার করিতে পারিতাম—যাহারা সাহায্যের জন্য আমার দিকে তাকাইত, তাহাদিগকেও আশ্বাস দিতে পারিতাম। আমার মনে হয়, জনসাধারণের সেই পরীক্ষার দিনে, এই দুইখানা পত্রিকা উপযুক্ত সেবা দিতে পারিয়াছে এবং সামরিক আইনের অত্যাচারকে কিছুটা খর্ব করিতে সাহায্য করিয়াছে।

৩৫

পাঞ্জাবে

পাঞ্জাবে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য স্যার মাইকেল ও-ডায়ার আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। কোনও কোনও যুবকও, সামরিক আইনের জন্য আমাকে দায়ী করিতে দ্বিধা করে নাই। কেউ বা ক্রুদ্ধ হইয়া একথাও বলিয়াছেন যে, যদি আমি আইন অমান্য বন্ধ না করিতাম, তাহা হইলে কখনো জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইত না। সামরিক আইনও জারি হইত না। দুই একজন এমন ভয়ও দেখাইয়াছেন যে, পাঞ্জাবে গেলে কেউ কেউ আমাকে হত্যা করিতেও দ্বিধা করিবে না।

কিন্তু আমার কাছে আমার কাজ এতই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছিল যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির উহা ভুল বুঝার সম্ভাবনা নাই। পাঞ্জাব যাওয়ার জন্য আমি

অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। পাঞ্জাবে আমি ইতঃপূর্বে কখনো যাই নাই। আমাকে যাঁহারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—ডাঃ সত্যপাল, ডাঃ কীচলু, পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরী—ইঁহাদের দেখিতে ইচ্ছা হইত। তাঁহারা জেলে ছিলেন। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, সরকার তাঁহাদের দীর্ঘ দিন কারাগারে রাখিতে পারিবেন না। বোম্বাইএ যখনই যাইতাম, তখন অনেক পাঞ্জাবী আমার সঙ্গে দেখা করিতেন। আমি তাঁহাদের উৎসাহিত করিতাম, তাঁহারাও আমার উৎসাহ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিতেন। এই সময় আমার আত্মবিশ্বাস গভীর ছিল। কিন্তু আমার যাওয়ার বিলম্ব হইতেছিল। ভাইসরয় প্রতিবারই আমার অনুরোধের উত্তরে জবাব দিতেন—'এখনো নয়'।

ইতিমধ্যে হাণ্টার কমিটি আসিল। তাঁহারা সামরিক আইনের আমলে সরকারী কর্মচারীদের কতকগুলি ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ তখন সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চিঠিতে হৃদয়-বিদারক বর্ণনা থাকিত। সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সামরিক আইনের জুলুম তার চেয়ে বেশি হইয়াছিল—ইহাই তাঁহার পত্রের সুর। অন্য দিক হইতে মালবাজীর তার আসিয়াছিল যে, আমার পাঞ্জাব যাওয়া চাই। এই অবস্থায় আমি পুনরায় ভাইসরয়কে তার করিলাম। জবাব আসিল অমুক তারিখে আপনি যাইতে পারিবেন। সে তারিখের কথা আজ স্মরণ নাই, তবে উহা ১৭ই অক্টোবর হওয়া সম্ভব।

আমি লাহোর পৌছিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা কখনো ভুলিবার নয়। অনেক দিন পরে যদি প্রিয়জন ঘরে ফিরে, তাঁহাকে দেখার জন্য যেমন বন্ধুরা আসে, তেমনি করিয়া আমাকে দেখিতে লোক শহর ছাড়িয়া আসিয়া স্টেশন ভরিয়া ফেলিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া তাহারা আনন্দে পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল।

পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীর বাংলোতে আমাকে লইয়া যাওয়া হইল। শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণীকে আমি পূর্বেই জানিতাম। তাঁহার উপর আমার দেখাশুনার ভার পড়িল। 'ভার' কথাটা আমি ইচ্ছাপূর্বকই ব্যবহার করিতেছি। কেন না যে মুহূর্তে আমি গেলাম, সেই মুহূর্তেই গৃহস্বামীর গৃহ ধর্মশালায় পরিণত হইল।

পাঞ্জাবে গিয়া আমি দেখিলাম যে, সেখানকার অনেক নেতা জেলে যাওয়াতে প্রধান নেতাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য,

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী। মালব্যজী ও শ্রদ্ধানন্দজীর সঙ্গে আমার পূর্বেই ভালরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়া গিয়াছিল। পণ্ডিত মতিলালজীর সঙ্গে লাহোরেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিলাম। এই সমস্ত নেতা এবং অন্য নেতা, যাঁহারা জেলে যাওয়ার সম্মান পান নাই, আমাকে শীঘ্রই আপনার জন করিয়া লইলেন। আমারও কাহাকেও অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না।

হাণ্টার কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্ত, আমরা সকলে একমত হইয়া স্থির করিলাম। ইহার কারণ তখন ভালরকমেই আলোচিত হইয়াছিল, সেইজন্য সে বিষয়ে এখন আর আলোচনা করিব না। সেই সকল কারণ যুক্তিযুক্ত ছিল এবং কমিটিকে বয়কট করা ঠিকই হইয়াছিল, একথা আজও আমি বলি।

হাণ্টার-কমিটিকে যদি বয়কট করা হইল, তবে আমাদের দিক হইতে এবং কংগ্রেসের দিক হইতে একটা অনুসন্ধান কমিটি হওয়া দরকার বলিয়া স্থির করা হইল। পণ্ডিত মালব্যজী এই কমিটিতে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীযুত আব্বাস তৈয়বজী, শ্রীযুত জয়াকর ও আমাকে লইলেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করার জন্য ছড়াইয়া পড়িলাম। এই কমিটির ব্যবস্থার ভার স্বাভাবিক ভাবে আমারই উপর পড়িল এবং বেশির ভাগ গ্রামের মধ্যে অনুসন্ধান আমাকেই করিতে হইয়াছিল বলিয়া, আমি পাঞ্জাবের গ্রাম দেখিবার অমূল্য সুযোগ পাইলাম।

এই অনুসন্ধানের সময় পাঞ্জাবের মহিলাদের সঙ্গে আমার এমন সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল, যেন আমরা কত যুগের পরিচিত। যেখানে যাই সেখানেই তাঁহারা দলে দলে আমার সঙ্গে দেখা করেন ও নিজের হাতে কাটা সূতার স্তূপ উপহার দেন। আমি এই অনুসন্ধানকালে স্বভাবতই দেখিলাম যে, পাঞ্জাব খাদির এক বিরাট ক্ষেত্র হইতে পারে।

লোকের উপর অত্যাচার সম্পর্কে অনুসন্ধান-কার্যে যতই আমরা গভীরভাবে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, ততই সরকারী অরাজকতা, কর্মচারীদের নৃশংসতা ও অভাবনীয় স্বৈরাচারের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। যেখানে সরকারের সব চেয়ে বেশি সিপাহী সংগ্রহ হয় সেই পাঞ্জাবের লোক কেমন করিয়া এমন নৃশংস অত্যাচার সহ্য করিল ইহা তখনও আমার কাছে আশ্চর্য মনে হইত, আজও আশ্চর্য মনে হয়।

এই কমিটির রিপোর্টের খসড়া তৈরি করার কাজ আমার উপর পড়িয়াছিল।

পাঞ্জাবে কী নির্যাতন হইয়াছিল তাহা যাঁহাদের জানার ইচ্ছা, তাঁহারা এই রিপোর্ট পড়িবেন ? এই রিপোর্ট সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি যে, ইহাতে ইচ্ছাকৃত অতিশয়োক্তি একটিও নাই। যে সকল অবস্থা দেখানো হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য আছে। এই রিপোর্টে যত সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি সাক্ষ্য কমিটির কাছে ছিল। যে সম্পর্কে সামান্ত মাত্র সন্দেহ হইতে পারে, তেমন একটি বিষয়ও এই রিপোর্টে দেওয়া হয় নাই। কেবল সত্য সম্মুখে রাখিয়া, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া লিখিত এই রিপোর্ট হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, ব্রিটিশ শাসন নিজের সত্তাকে বজায় রাখার জন্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, কি অমানুষিক কার্য করিতে পারে! আমি যতদূর জানি, এই রিপোর্টের একটা কথাও আজ পর্যন্ত কেউ মিথ্যা বলিতে পারেন নাই।

৩৬

খিলাফতের বদলে গো-রক্ষা

এখন কিছু সময়ের জন্য পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের কথা বন্ধ রাখিয়া অন্য কথা বলিব।

কংগ্রেসের দিক হইতে যখন পাঞ্জাবের ডায়ারী অত্যাচারের তদন্ত হইতেছিল, সেই সময় আমার কাছে এক সভায় যোগ দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ আসে। ঐ নিমন্ত্রণ-পত্রে স্বর্গীয় হাকিম সাহেব ও ভাই আসফ আলীর নাম ছিল। শ্রদ্ধানন্দজী উপস্থিত থাকিবেন, ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল। আমার মনে হয় তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। এই নিমন্ত্রণের বিষয় ছিল, দিল্লীতে খিলাফত সম্বন্ধে সেই সময়কার অবস্থার আলোচনা করা এবং হিন্দু ও মুসলমানেরা আগামী শান্তি উৎসবে (peace celebration) যোগ দিবে কিনা, তাহা নির্ধারণ করা। আমার মনে হয়, এই সভা নভেম্বর মাসে হইয়াছিল।

এই নিমন্ত্রণ-পত্রে উল্লেখ ছিল যে, ইহাতে খিলাফত বিষয়ে আলোচনা হইবে এবং কেবল তাহাই নহে, গো-রক্ষার বিষয়েও আলোচনা হইবে। কেন না গো-রক্ষার ব্যবস্থা করার ইহাই উপযুক্ত অবসর।

এই নিমন্ত্রণ-পত্রের উত্তরে আমি উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিব জানাইলাম। ইহাও জানাইলাম যে, খিলাফত ও গো-রক্ষা একত্র উল্লেখ করিয়া এবং একটার

বদলে আর একটা দেনা পাওনার যুক্তি না করিয়া, ঐ ঐ বিষয়ে তাহাদের নিজ নিজ দোষগুণের উপর বিচার করা উচিত।

সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং এই সভায় উপযুক্ত সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিল, যদিও পরবর্তীকালে হাজার হাজার লোক মিলিয়া যে সব সভা করিয়াছে ইহা তত বড় ছিল না। এই সভায় শ্রদ্ধানন্দজী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে উল্লিখিত বিষয়ে আমি আলোচনা করিয়া লইয়াছিলাম; তাঁহার কাছে আমার যুক্তি মনঃপূত হইল এবং তাহা সভায় উপস্থাপিত করিতে আমার উপরই ভার দিলেন। হাকিম সাহেবের সঙ্গে কথা বলিয়া লইয়াছিলাম। আমার যুক্তি এই ছিল যে, উভয় প্রশ্নই নিজ নিজ দোষগুণের উপর বিচার করা দরকার। যদি খিলাফত প্রশ্নে প্রমাণ হয় যে, সরকারের দিক হইতে অন্যায় হইয়াছে, তাহা হইলে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর যোগ দেওয়া দরকার। তাহার সহিত গো-রক্ষা জড়ানো উচিত নয়। হিন্দুরা যদি ইহার উপর কোনও শর্ত আরোপ করে, তবে তাহা শোভা পায় না। মুসলমানেরা খিলাফতে সাহায্য পাইয়াছে বলিয়া গো-হত্যা বন্ধ করিলে তাহাও শোভা পাইবে না। প্রতিবেশী এবং একই দেশবাসী বলিয়া এবং হিন্দুর মনোভাবকে মর্যাদা দেবার জন্য মুসলমানেরা স্বাধীনভাবে যদি গো-হত্যা বন্ধ করে, তবে তাহাই শোভা পায়। ইহা তাহাদের অবশ্য-কর্তব্য এবং ইহা ভিন্ন প্রশ্ন। যদি ইহা অবশ্য-করণীয় হয় এবং যদি তাহারা ইহাকে অবশ্য-করণীয় বলিয়া বুঝে, তবে হিন্দুরা খিলাফতের সাহায্য করুক বা না-ই করুক, তবু গো-হত্যা বন্ধ করিতে হয়। কাজেই এই উভয় প্রশ্নকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা সঙ্গত। সেইজন্য যদি সভাতে কেবল খিলাফতের প্রশ্নই আলোচিত হয় তাহাই ভাল—এই প্রকার আমি আমার যুক্তি জানাইলাম। সভায় ইহা পছন্দ হইল। গো-রক্ষার প্রশ্ন সভায় আলোচনা হইল না। তবে মৌলানা আবদুল বারি সাহেব বলিলেন যে, খিলাফতে হিন্দুদের সাহায্য পাওয়া যাক আর না যাক, এক দেশের লোক বলিয়া হিন্দুদের মনের দিকে চাহিয়া মুসলমানদের গো-হত্যা বন্ধ করা উচিত। একসময় এমনও মনে হইয়াছিল যে, মুসলমানেরা সত্যই গো-হত্যা বন্ধ করিবে।

কাহারও কাহারও মতে পাঞ্জাবের ঘটনাও খিলাফতের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। এই বিষয়ে আমি বিরোধিতা করিলাম। পাঞ্জাবের বিষয় স্থানীয়। পাঞ্জাবের দুঃখের কারণও আমাদের "শান্তি উৎসবের" ব্যাপারে ("Peace celebrations") যোগ দেওয়া না দেওয়ার সহিত যুক্ত না করিয়া থাকা যায়

না,—এই প্রকার যুক্তি অবিবেচনার কাজ। ইহা সকলেই অনুমোদন করিয়াছিলেন।

এই সভায় মৌলানা হজরৎ মোহানী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে পরিচয় আমার পূর্বেই হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে কি রকম সংগ্রামী তাহা এইস্থানেই দেখিলাম। এইখানে আমাদের মধ্যে যে মতভেদ হইল, তাহা অনেক বিষয়ে শেষ পর্যন্ত রহিয়াছে।

অনেক সিদ্ধান্তের মধ্যে এই সিদ্ধান্তও ছিল যে, হিন্দু মুসলমান সকলেই স্বদেশী ব্রত পালন করিবেন। এই সিদ্ধান্তের অর্থ বিদেশী বস্ত্র বর্জন করা। খাদি তখনো তাহার যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করে নাই। হজরৎ মোহানী এই সিদ্ধান্ত সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার বক্তব্য ছিল যে, যদি ইংরেজ সরকার খিলাফত সম্বন্ধে ন্যায় আচরণ না করেন, তবে সরকারকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিয়া ব্রিটিশ পণ্য মাত্রই বয়কট করা দরকার। তিনি এই প্রকার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

ব্রিটিশ পণ্য মাত্রই বয়কট করার অক্ষমতা ও অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমার যে সকল যুক্তি আজ সকলের কাছে পরিচিত, আমি সভায় সেই সকল যুক্তিই প্রয়োগ করিলাম। আমার অহিংসা-বৃত্তির যুক্তিও আমি পেশ করিলাম। আমি দেখিতে পাইলাম যে, সভার উপর আমার যুক্তির গভীর প্রভাব হইয়াছে। হজরৎ মোহানীর যুক্তি শুনিয়া লোকে এত উল্লাস জ্ঞাপন করিয়াছিল যে, আমার মনে হইয়াছিল আমার এই ক্ষীণ স্বর কেউ শুনিবে না। তাহা হইলেও আমার কর্তব্য হইতে বিচ্যুত বা বিচলিত হইব না স্থির করিয়া উত্তর দিতে উঠিলাম। লোকে আমার কথা খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনিল। মঞ্চের উপরের লোকের কাছ হইতে আমি পুরা সমর্থন পাইলাম। আমাকে সমর্থন করিয়া একজনের পর একজন বলিতে লাগিলেন। নেতারা দেখিতে পাইলেন যে, ব্রিটিশ মাল মাত্রই বয়কট করার সিদ্ধান্তের দ্বারা কোনও কাজ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে প্রচুর উপহাসের পাত্র হইতে হইবে। সারা সভায় এমন একজনও ছিলেন না, যাঁহার সঙ্গে কোনও না কোনও ব্রিটিশ দ্রব্য ছিল না। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরাই যাহা করিতে অসমর্থ, সেই কাজের জন্য সভায় প্রস্তাব পাস করায় লাভ অপেক্ষা ক্ষতি বেশি—একথা অনেকে বুঝিলেন।

"আপনাদের কেবলমাত্র এই ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কটের প্রস্তাবে আমি সন্তুষ্ট নই। কতদিনে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র দেশেই উৎপন্ন করিতে পারিব, কবে

তারপর বিদেশী বস্ত্রের বহিষ্কার সম্পূর্ণ হইবে? এখনি ব্রিটিশ জাতির উপরে আঘাত হানা যায় এমন একটা কিছু করা আমাদের দরকার। আপনার বস্ত্র বয়কট থাকে থাকুক, কিন্তু উহা অপেক্ষা শীঘ্র ফলপ্রসূ কিছু আপনাকে দেখাইয়া দিতে হইবে।"—এই ধরনের কথা মৌলানা তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা আমি যখন শুনিতেছিলাম, তখন বিদেশী বস্ত্র বয়কট ছাড়াও নূতন একটা কিছু দেখাইয়া দেওয়ার আবশ্যকতা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। বিদেশী বস্ত্রের বয়কট শীঘ্র হইতে পারে না, ইহা সেই সময়ই আমার কাছে স্পষ্ট হইল। যদি খাদি দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট করার ইচ্ছা করা যায়, তবে সে শক্তি আমাদের মধ্যে আছে, ইহা আমি পাঞ্জাবে দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু এখন পর্যন্তও তাহা জানিতাম না। কেবল মিল যে বস্ত্র সরবরাহ করিতে পারিবে না তাহা আমার জানা ছিল। মৌলানা সাহেব যখন বক্তৃতা শেষ করিলেন তখন আমি জবাব দিতে প্রস্তুত হইতেছিলাম।

উর্দু ও হিন্দী শব্দের সম্পদ আমার যথেষ্ট ছিল না। খাস মুসলমানদের মজলিসে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করার এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। কলিকাতার মুস্লীম লীগে আমি বলিয়াছিলাম, কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্য এবং তাহাও আবার ভাবপ্রবণ বাক্যে হৃদয় স্পর্শ করার জন্য। এখানে আমার বিরুদ্ধ মত-পোষণকারীদিগকেই বুঝাইতে হইবে। আমি ভাষার অজ্ঞতাজনিত লজ্জা ত্যাগ করিলাম। এই হিন্দুস্থানী মুসলমানদের সভায় মার্জিত উর্দু ভাষায় বক্তৃতা করার আমার সামর্থ্য নাই। আমার যাহা বক্তব্য তাহা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতেই আমাকে বুঝাইতে হইবে। এই কাজ আমি করিতে পারিয়াছিলাম। 'হিন্দী-উর্দু' যে রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্য এই সভাই তাহার সাক্ষী ছিল। যদি আমি ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিতাম, তবে আমার কাজ চলিত না। মৌলানা সাহেব আমার কথার প্রতিবাদ করার আবশ্যকতা বোধ করিতেন না। এবং যদিও প্রতিবাদ করিতেন, তবে ইংরেজী ভাষায় আমি উহার উত্তর দিয়া প্রত্যাশিত ফল পাইতে পারিতাম না।

আমার ভাব প্রকাশের উপযুক্ত উর্দু কি গুজরাটী একটি শব্দ হাতের কাছে না পাইয়া আমি লজ্জা বোধ করিলাম। আমার "নন-কো-অপারেশন" এই ইংরেজী শব্দ মনে আসিল। মৌলানা যখন বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখনই আমার মনে হইল যে, যে-ব্যক্তি সকল বিষয়ে সরকারের সাহায্য করিতেছে, তাহার পক্ষে বিরোধিতা করার কথা অন্তঃসারশূন্য। যেখানে তলোয়ার লইয়া

প্রতিরোধ করা যায় না, সেখানে বিপক্ষের সঙ্গে কাজে সহযোগিতা না করাতে যে প্রতিরোধ হয় তাহাই প্রকৃত প্রতিরোধ বলিয়া আমার মনে হইল। আমি 'নন-কো-অপারেশন' শব্দের প্রথম প্রয়োগ এই সভায় করিলাম। আমার বক্তৃতায় এই 'নন-কো-অপারেশন'এর সমর্থনের জন্য যুক্তি দিই। এই সময় 'নন-কো-অপারেশন' শব্দের বিস্তার কতদূর তাহা আমি জানিতাম না। সেইজন্য ইহার ভিতর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রবেশ করিলাম না। আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই ধরনের বলিয়া স্মরণ আছে :—

"মুসলমান ভাইয়েরা এক মহৎ সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বর না করুন, যদি সরকার শান্তির শর্তের বিরুদ্ধতা করেন, তবে মুসলমানেরা সরকারকে সকল সহায়তা হইতে বঞ্চিত করিবেন। আমার বিশ্বাস প্রজার এই কাজ করার অধিকার আছে। সরকারের দেওয়া খেতাব রাখিতে বা সরকারী চাকরি করিতে আমরা বাধ্য নই। যেখানে সরকারের দ্বারা খিলাফতের ন্যায় মহান ব্যাপারের ধর্মসঙ্গত পরিণতির ক্ষতি হয়, সেখানে আমরাই বা সরকারকে কেন সাহায্য করিব? সেই হেতু খিলাফতের বিষয়ে যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয়, তবে সরকারের সাহায্য না করাই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করাই আমাদের কর্তব্য।"

ইহার পরেও কয়েক মাস পর্যন্ত এই non-co-operation বা অসহযোগ শব্দটি প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। কারণ উহা কয়েক মাসের জন্য এই সভার কার্য-বিবরণীর অন্তরালেই চাপা পড়িয়াছিল। এক মাস পর অমৃতসরে কংগ্রেস বসে। সেখানে আমি সহযোগিতার সমর্থন করি। কারণ এখনও আমার আশা ছিল যে, সরকারের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের অসহযোগ করা আবশ্যক হইবে না।

৩৭

অমৃতসর কংগ্রেস

সামরিক আইন যখন জারি ছিল তখন শত শত নির্দোষ লোককে তথাকথিত আদালতে নামমাত্র সাক্ষী লইয়া, অল্প বা অধিক দিনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল; কিন্তু সরকার তাহাদিগকে আটক রাখিতে পারিতেছিলেন না। এই সুস্পষ্ট অন্যায়ের বিরুদ্ধে চারিদিকে এত চীৎকার ও বিক্ষোভ হইতেছিল যে, সরকারের পক্ষে এই সব দণ্ডিত ব্যক্তিকে আর বেশিদিন জেলে রাখা সম্ভব ছিল

না। এইজন্য কংগ্রেস বসার পূর্বেই অনেকে মুক্তি পাইয়াছিলেন। লালা হরকিষণলাল প্রভৃতি সকল নেতা মুক্ত হইয়াছিলেন। কংগ্রেস যখন চলিতেছিল তখন আলী ভাইয়েরা খালাস হইয়া আসিলেন। ইহাতে লোকের আনন্দের সীমা রহিল না। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু নিজের বিরাট ওকালতি ফেলিয়া আসিয়া পাঞ্জাবেই তাঁহার কর্মক্ষেত্র করিয়াছিলেন। তিনিই অমৃতসর কংগ্রেসের সভাপতি। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

আজ পর্যন্ত আমি কংগ্রেসে হিন্দী ভাষায় ছোটখাটো বক্তৃতা করিতাম। এর দ্বারা হিন্দী ভাষা ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হইত। আর ঐ সব বক্তৃতায় প্রবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে কি করণীয় তাহাও জানাইতাম। অমৃতসরেও এবার আমাকে ইহা অপেক্ষা বেশি কিছু করিতে হইবে, তাহা আমি ভাবি নাই। কিন্তু যেমন পূর্বেও হইয়াছে, তেমনি এবারেও অপ্রত্যাশিতভাবে আমার উপর দায়িত্ব আসিয়া পড়িল।

নূতন শাসন সংস্কার সম্পর্কে সম্রাটের ঘোষণা তখন সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘোষণা আমার কাছে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ছিল না। অন্য সকলের নিকট ত আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। তবে সম্রাটের ঘোষিত শাসন-সংস্কার, (রিফর্ম) উহার দোষ সত্ত্বেও স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে, আমি তখন এইরূপ মনে করিতাম। সম্রাটের ঘোষণায় ও উহার ভাষায় আমি লর্ড সিংহের হাত আছে দেখিতে পাইলাম। ইহাতে আমার চোখে আশার আলো দেখা দিতেছিল। কিন্তু অভিজ্ঞ লোকমান্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি যোদ্ধাগণ মাথা নাড়িলেন। ভারতভূষণ মালব্যজী নিরপেক্ষ ছিলেন।

আমাকে মালব্যজী তাঁহার ঘরে রাখিয়াছিলেন। কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় আমি তাঁহার সাদাসিধা চালচলনের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এবার ত এক ঘরে ছিলাম এবং তাঁহার দিনচর্যা দেখিয়া আমি আনন্দিত ও আশ্চর্য হইলাম। তাঁহার ঘর গরিবের ধর্মশালা ছিল। এত লোকের ভিড় থাকিত যে, চলাফেরার পথ পর্যন্ত থাকিত না। সেখানে না ছিল কোন নিজস্ব সময়, না ছিল একটু সময়ের জন্য নিরিবিলি। যে কেহ হোক, যে কোনও সময় আসিবে ও যত ইচ্ছা তাঁহার সময় লইবে। এই ঘরের এক কোণে ছিল আমার দরবার অর্থাৎ আমার খাটিয়া। যাহা হউক আমি মালব্যজীর থাকার ধরন বর্ণনা করিতে চাই না। এখন বক্তব্য-বিষয়ে আসিতেছি।

এই অবস্থায় মালব্যজীর সঙ্গে প্রতিদিন আলাপ আলোচনা চলিত। তিনি আমাকে সমস্ত রাজনৈতিক পার্টির কথা বড় ভাইয়ের মত বুঝাইয়া দিতেন। আমি ঐ শাসন-সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের আলোচনায় যোগ দেওয়া ধর্ম মনে করিলাম। পাঞ্জাবের ঘটনা সম্পর্কিত কংগ্রেস-রিপোর্টে আমার হাত ছিল। পাঞ্জাব সম্বন্ধে সরকারের কাছ হইতে কাজ আদায় করিতে হইবে, খিলাফত সম্বন্ধে ত হইবেই। আমি মনে করিতাম মিঃ মণ্টেগু ভারতবর্ষের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবেন না। কয়েদীদের যে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, আলী ভাইদের যে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, উহাকে আমি শুভচিহ্ন মনে করিতাম। আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, নির্ধারিত শাসন-সংস্কার গ্রহণ করাই উচিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কারকে অসন্তোষজনক ও অসম্পূর্ণ গণ্য করিয়া উহা অগ্রাহ্য করা উচিত। লোকমান্য কতকটা নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধু যদি কোনও প্রস্তাব আনেন, তবে সেইদিকেই নিজের সমর্থন জানাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

এই প্রকার অভিজ্ঞ, পরীক্ষিত এবং সর্বমান্য জননায়কদের সঙ্গে মতভেদ হওয়া আমার পক্ষে অসহনীয় হইতেছিল। কিন্তু অন্য দিক হইতেও বিবেকের বাণী আমার কাছে স্পষ্ট ছিল। আমি কংগ্রেসের বৈঠক হইতে পলাইবার চেষ্টা করিলাম। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও মালব্যজীর কাছে প্রস্তাব করিলাম যে, আমাকে অধিবেশনে অনুপস্থিত হইতে দিলে ভাল ফল হইবে। আমিও বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় নেতাদের সঙ্গে আমার মতভেদ ব্যক্ত করিবার হাত হইতে বাঁচিয়া যাইব।

আমার এই প্রস্তাব, এই দুই প্রবীণ নেতার পছন্দ হইল না। লালা হরকিষণলালের কানে এই কথা গেলে তিনি বলিলেন—"ইহা কখনও হইতে পারে না। ইহাতে পাঞ্জাবীদের কঠিন আঘাত করা হইবে।" লোকমান্যের সঙ্গে এবং দেশবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করিলাম। মিঃ জিন্নার সঙ্গেও দেখা করিলাম; কোনও রাস্তা বাহির হইল না। আমার মনোবেদনা আমি মালব্যজীর কাছে প্রকাশ করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম—"মীমাংসা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। যদি আমাকে আমার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হয় তবে পরিণামে ভোট লইতেই হইবে। কিন্তু এখানে ভোট লওয়ার কোনও ব্যবস্থাই দেখিতেছি না। এখন পর্যন্ত যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে সভার মধ্যে হাত উঠাইয়াই ভোট লওয়া হয়। দর্শক ও সদস্যদের মধ্যে হাত তোলার

বেলায় কোন পার্থক্যই করা হয় না। এই বিশাল সভার মধ্যে পৃথক ভাবে ভোটগণনা করার কোন উপায়ও নাই। সুতরাং আমার প্রস্তাবের উপর যদি ভোট লইতে হয় তবে তাহারও ব্যবস্থা নাই।"

লালা হরকিষণলাল এই ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার ভার লইলেন। তিনি বলিলেন—"ভোট লওয়ার দিন দর্শকদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। কেবল সদস্যরাই আসিবেন। তাঁহাদের ভোট গণনা করিয়া দেওয়া, সে আমার কাজ। কিন্তু আপনার কংগ্রেস হইতে অনুপস্থিত হওয়া চলিবে না।"

অবশেষে আমি হার মানিলাম। স্থির হইল আমার প্রস্তাব উত্থাপন করিতেই হইবে। বস্তুতঃ অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে আমার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে আমি স্বীকার করিলাম। মিঃ জিন্না ও মালব্যজী উহার সমর্থন করিলেন। প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা হইল। আমি দেখিতে পাইতেছিলাম যে, আমাদের মতভেদে যদিও কিছুই কটুতা ছিল না, বক্তৃতার ভিতর যুক্তি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তবু সভা মতভেদ মাত্রও সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। নেতাদের মধ্যে মতভেদে তাঁহাদের দুঃখ হইতেছিল। তাঁহারা সভায় ঐক্যমত চাহিতেছিলেন।

যখন এদিকে বক্তৃতা চলিতেছিল তখন অপরদিকে মঞ্চের উপর মতভেদ মিটাইবার চেষ্টা হইতেছিল। একে অন্যকে চিঠি দিতেছিল। মালব্যজী ত যেমন করিয়াই হোক মিটাইবার জন্য পরিশ্রম করিতেছিলেন। এই সময় জয়রামদাস আমার হাতে তাঁহার প্রস্তাব দিলেন এবং অতি মধুর বাক্যে ভোট দেওয়ার সংকট হইতে সদস্যদের বাঁচাইবার জন্য আমাকে মিনতি করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব আমার পছন্দ হইল। মালব্যজীর দৃষ্টি চতুর্দিকে একটু আশার আলোকই খুঁজিতেছিল। আমি বলিলাম—"এই প্রস্তাব উভয়েরই পছন্দ হইবে মনে হয়।" লোকমান্যকে আমি উহা দেখাইলাম। তিনি বলিলেন—"দাসের পছন্দ হয় ত আমার আপত্তি নাই।" দেশবন্ধু দেখিলেন, তিনি বিপিনচন্দ্র পালের দিকে তাকাইলেন। মালব্যজীর আশা হইল। তিনি কাগজখানা টানিয়া লইলেন এবং দেশবন্ধুর মুখ হইতে 'হ্যাঁ' শব্দ পুরাপুরি বাহির না হইতেই বলিয়া উঠিলেন—"প্রতিনিধিগণ, আপনারা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, মিটমাট হইয়া গিয়াছে।" আর দেখিবেন কি? হাততালির শব্দে মণ্ডপ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। লোকের মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল। এখন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কি সে প্রস্তাব ছিল তাহা উল্লেখেরও এখানে প্রয়োজন নাই। আমার সত্যের পরীক্ষা কি প্রকার হইয়াছিল, তাহার পরিচয় দিবার জন্যই এখানে উহার উল্লেখ। এই মিটমাট দ্বারা আমার দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইল।

৩৮

কংগ্রেসে প্রবেশ

অমৃতসর কংগ্রেসে আমাকে যোগ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাকেই আমি কংগ্রেসে প্রবেশ করা বলি না। ইহার পূর্বেও আমি কংগ্রেসে গিয়াছি, সে কেবল আমার আনুগত্যের চিহ্ন স্বরূপ। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সিপাহীর কাজ ব্যতীত আমার সেখানে আর কোনও কাজের কথা মনে আসিত না, করিতে ইচ্ছাও হইত না।

কিন্তু আমার অমৃতসরের অভিজ্ঞতা আমাকে দেখাইয়াছে যে, কংগ্রেসে আমার একটি শক্তির ব্যবহার কাজে লাগিতে পারে। পাঞ্জাব সমিতির কাজে লোকমান্য, মালব্যজী, মতিলালজী, দেশবন্ধু প্রভৃতি নেতারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—ইহা আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেইজন্য তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের বৈঠকের আলোচনায় ডাকিলেন। ইহাতে আমি দেখিয়াছিলাম যে, বিষয় নির্বাচনী সভার অনেক কাজ এই বৈঠকেই হইয়া যায়। এই আলোচনা সভায়, নেতারা যাঁহাদের উপর বিশেষ বিশ্বাস রাখেন, তাঁহাদিগকেই ডাকা হইত। আর সেইজন্যই আবার অনাবশ্যক লোকও মাঝে মাঝে ঢুকিয়া পড়িত।

আগামী বছরের জন্য যাহা করার ছিল তাহার মধ্যে আমার কাজ সম্পর্কে দুইটি বিষয়ে আমি আগ্রহ অনুভব করিতেছিলাম, ঐ কাজে আমার কুশলতাও ছিল। এই দুটির মধ্যে একটি হইতেছে—জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিরক্ষা। খুব উৎসাহের মধ্যে কংগ্রেসে প্রস্তাব পাস হয়। এইজন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা তুলিতে হইবে। উহার ট্রাস্টির মধ্যে আমার নামও ছিল। দেশে জনসাধারণের কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের শক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহাদের মধ্যে মালব্যজীর প্রথম স্থান ছিল—এখনো আছে। আমি জানিতাম ঐ কাজে আমিও তাঁর খুব পিছনে পড়িব না। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার এই শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। রাজা-মহারাজার কাছ হইতে যাদুবিদ্যার দ্বারা লাখ লাখ টাকা আনার শক্তি আমার ছিল না এবং আজও

নাই। এ বিষয়ে মালব্যজীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার আমার কোন সম্ভাবনা নাই। জালিয়ানওয়ালাবাগের জন্য টাকা রাজা-মহারাজার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না—ইহা আমি জানিতাম। সেইজন্য স্মৃতিরক্ষার উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমার নাম দেওয়াতেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ঐ টাকা তোলার প্রধান ভার আমার উপরে পড়িবে। কাজেও তাহাই হয়। বোম্বাইয়ের শহরবাসিগণ এজন্য প্রাণ খুলিয়া টাকা দিয়াছেন। আজ ঐ জন্য সাধারণের হাতে যত টাকা থাকা দরকার তাহা আছে। কিন্তু এই হিন্দু, মুসলমান ও শিখের রক্ত যেখানে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, সেখানকার জমির উপর কি রকমের স্মৃতিস্তম্ভ হইবে, অর্থাৎ টাকার কি রকম ব্যবহার হইবে—ইহা এক বিষম প্রশ্ন হইয়া পড়িয়াছে। কেন না এই তিন সম্প্রদায়, অথবা প্রকৃতপক্ষে তুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন বন্ধুত্বের পরিবর্তে শত্রুতা দেখা দিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

আমার আর এক শক্তি ছিল খসড়া প্রস্তুত করা, যাহা কংগ্রেসের ব্যবহারে লাগিতে পারে। লম্বা ধরনের কথা কেমন করিয়া মার্জিত ভাষায়, কম শব্দ প্রয়োগের দ্বারা রচনা করা যাইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম এবং নেতারাও তাহা বুঝিয়াছিলেন। কংগ্রেসের যে নিয়মাবলী তখন ছিল তাহা গোখলে রচিত। তিনি কতকগুলি নিয়মের খসড়া করিয়াছিলেন, তাহারই উপর কংগ্রেসের কাজ চলিত। এই নিয়ম তিনি কেমন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সে মধুর ইতিহাস আমি তাঁহার নিজের মুখ হইতেই শুনিয়াছি। কিন্তু এখনকার কাজ আর ঐ কয়টা নিয়মে চলে না, ইহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য নিয়মাবলী গঠনের আলোচনাও কয়েক বৎসর হইতে চলিতেছিল। এমন ব্যবস্থা ছিল না যে, সারা বৎসর ধরিয়া কেউ কাজ চালায়, অথবা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কেউ বিচার করে। কংগ্রেসের তিনজন সেক্রেটারী ছিলেন। কিন্তু সত্যকার কার্যনির্বাহকারী সেক্রেটারী একজনই হইতেন। একজন সেক্রেটারী আপিস চালাইবেন, না ভবিষ্যতের কার্যপদ্ধতি স্থির করিবেন, না পূর্বের কংগ্রেস যে সকল দায়িত্ব লইয়াছে, চলতি বৎসরে তাহা পূরণ করিবেন? এই প্রশ্ন এইবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কংগ্রেসের সময় ত হাজার হাজার লোকের ভিড় হয়। তখন জনসাধারণের জন্য যাহা করণীয় সে সকল কাজ করায় সুবিধা হয় না। প্রতিনিধির সংখ্যার শেষ নাই। যে কোনও প্রদেশ হইতে যত ইচ্ছা আসিতে পারেন। সেইজন্য কোনও নূতন একটা ব্যবস্থা হওয়ার আবশ্যকতা

সকলে জানাইলেন। নিয়মাবলীর খসড়া তৈরি করার দায়িত্ব আমি লইলাম, কিন্তু এক শর্ত ছিল। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম জনসাধারণের উপর দুইজন নেতার প্রভাব আছে। আমি চাহিয়াছিলাম আমাকে সাহায্য করার জন্য তাঁহাদের দুইজন ইহার সহিত যুক্ত থাকুন। তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নিজেরা এই খসড়া রচনা করার কাজ করিতে পারিবেন না, তাহা আমি জানিতাম। সেইজন্য লোকমান্যের কাছে ও দেশবন্ধুর কাছে তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন দুইজনের নাম চাহিলাম; ইহা ব্যতীত নিয়ম-গঠনকারী সমিতিতে আর কাহারও থাকার আবশ্যক নাই—এই প্রস্তাব করিলাম। এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। লোকমান্য শ্রীযুক্ত কেলকারের ও দেশবন্ধু শ্রীযুত আই. বি. সেনের নাম দিলেন। এই নিয়ম-রচনা সমিতি একবারও সাক্ষাৎভাবে মিলিত হয় নাই, তবু আমাদের কাজ একরূপ হইয়াছিল। পত্র-ব্যবহার দ্বারা আমাদের কাজ চালাইতাম এবং শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিযুক্ত রিপোর্ট দিতে পারিয়াছিলাম। এই গঠনতন্ত্র রচনা বিষয়ে আমার মনে অভিমান আছে। আমি মনে করি যে, এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া কাজ আদায় করা যায়, এবং উহা দ্বারাই আমাদের স্বরাজ-লাভের সংগ্রাম সিদ্ধ হয়। এই দায়িত্ব লওয়ার দ্বারাই আমি কংগ্রেসে সত্য সত্য প্রবেশলাভ করিলাম বলিয়া মনে করি।

৩৯

খাদির জন্ম

১৯০৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত আমি চরখা কি তাঁত দেখিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। তাহা হইলেও আমার "হিন্দ স্বরাজ" বইতে ভারতবর্ষে চরখার সাহায্যেই দারিদ্র্য দূর করা যায়, ইহা আমি বলিয়াছি। আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে পথে দেশের ক্ষুধা মিটিবে সেই পথেই স্বরাজ আসিবে। এমন কি ১৯১৫ সালে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিলাম তখনও আমি চরখা দেখি নাই। সবরমতীতে সত্যাগ্রহ আশ্রম খোলা হইলে তাঁত বসাইলাম। তাঁত বসাইতে আমার খুব মুশকিল হইয়াছিল। আমরা সকলেই অনভিজ্ঞ ছিলাম। সেইজন্য তাঁত বসাইয়াও তাঁত চালানো গেল না। আমরা সকলেই কলম চালাইতে বা ব্যবসা চালাইতে জানিতাম, কেহই কারিগর ছিলাম না। সেইজন্য তাঁত বসাইলেও কাপড় বোনার কাজ শিক্ষা করা আবশ্যক ছিল। শেষ পর্যন্ত পলানপুর

হইতে তাঁতের এক মাস্টার আসিল। সে নিজের সমস্ত কারিগরী শিখাইত না। কিন্তু মগনলাল গান্ধী যে কাজ হাতে লইয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দেওয়ার পাত্র নহেন। তাঁহার কারিগরের হাতই ছিল। তিনি বয়ন-কৌশল পুরা শিখিয়া লইলেন। একে একে আশ্রমে নূতন তাঁতি তৈরি হইতে লাগিল।

আমাদের নিজেদের কাপড় তৈরি করিয়াই পরা দরকার। সেইজন্য মিলের কাপড় পরা এখন বন্ধ করিলাম। আশ্রমবাসীরা হস্তচালিত তাঁতে দেশী কলে তৈরী সূতার কাপড় পরিবে—স্থির হইল। ইহা করিতে গিয়া আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা হইল। ভারতবর্ষের তাঁতিদের জীবনযাত্রা, তাহাদের উপার্জন, তাহাদের সূতা পাইতে যে সব অসুবিধা হয়, কেমন করিয়া তাহারা প্রতারিত হয় এবং দিনে দিনে তাহারা কেমন করিয়া দারিদ্র্যের অন্ধকারে ডুবিতেছে—সে-সব জানিতে পারা গেল। আমরা শীঘ্র যে নিজেদের সমস্ত কাপড় নিজেরা বুনাইয়া লইতে পারিব, এমন সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্য বাহিরের তাঁতিদের কাছ হইতে আমাদের আবশ্যকমত কাপড় বুনাইয়া লওয়া হইত। দেশী মিলের সূতার কাপড় তাঁতির নিকট পাওয়া যাইত না। তাঁতিরা সমস্ত কাপড়ই বিলাতী সূতায় প্রস্তুত করিত। আমাদের মিলে সূক্ষ্ম সূতা হয় না। আজও সূক্ষ্ম সূতা দেশী মিলে খুব কমই হয়—খুব সূক্ষ্ম সূতা ত আদৌ হয় না। যাহারা দেশী সূতার কাপড় বুনাইয়া দিতে সম্মত, এমন তাঁতি বহু কষ্টে মিলিল। এই সব তাঁতি যত দেশী সূতার কাপড় তৈরি করিবে, সে সমস্তই আশ্রমকে লইতে হইবে এই শর্তে তাহারা রাজী হইল। এই প্রকারে আমাদের জন্য তৈরি কাপড় আমরা পরিতাম ও বন্ধুদের মধ্যে তাহার প্রচার করিতাম। এমনি করিয়া বলিতে গেলে, আমরা সূতাকাটা মিলের বয়ন-এজেণ্ট হইয়া পড়িলাম। মিলের পরিচয়ে আসিয়া তাহাদের কার্য-ব্যবস্থা ও তাহাদের অসুবিধার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হইতে লাগিল। মিলের কর্তারা, হাত-তাঁতের ইচ্ছা করিয়া সাহায্য করিতেন না, অনিচ্ছাসত্ত্বেই করিতেন। এই সব দেখিয়া আমরা হাতে সূতা কাটার জন্য বিশেষ আগ্রহী হইলাম। যতদিত হাতে সূতা না কাটিতেছি, ততদিন আমাদের পরাধীনতা যাইবে না—আমরা ইহা দেখিলাম। মিলের এজেণ্টগিরি করিয়া আমরা দেশসেবা করিতেছি—বলা যায় না।

কিন্তু এদিকেও অসুবিধার শেষ রহিল না। না মিলে চরখা, না মিলে চরখা শিখানোর কোনও লোক! তাঁতের নলী ভরার চরখা আমাদের কাছে ছিল। কিন্তু তাহাতেই যে সূতা কাটা যায় এ জ্ঞানও ছিল না। একদিন কালিদাস

খাভেরী একজন স্ত্রীলোকের সন্ধান পাইলেন, যে সূতা কাটিতে জানে। নূতন কাজ শিখিতে ওস্তাদ একজন আশ্রমবাসীকে তাহার কাছে পাঠানো হইল। কিন্তু সেও কৌশলটা পুরা শিখিয়া আসিতে পারিল না।

সময় চলিয়া যাইতে লাগিল। আমি অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলাম। খবর পাওয়া যাইতে পারে, এমন কোনও লোকের সঙ্গে আশ্রমে দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু সূতা কাটার কাজ স্ত্রীলোকেরাই করিত। সেইজন্য কেহ যদি কোথাও সূতা কাটিতে জানে, সে খবর স্ত্রীলোকদের কাছ হইতেই পাওয়ার কথা।

১৯১৭ সালে গুজরাটী ভাইয়েরা আমাকে Broach Educational Conference-এ সভাপতিত্ব করিতে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে অসামান্যা মহিলা গঙ্গা বেনের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন না; কিন্তু শিক্ষিতা মহিলাদের ভিতর যে সাহস বা বোধশক্তি সাধারণতঃ দেখা যায়, তাঁহার মধ্যে তদপেক্ষা অধিক ছিল। তাঁহার জীবনযাত্রায় অস্পৃশ্যতার স্পর্শমাত্র ছিল না। তিনি বেপরোয়াভাবে অন্ত্যজদের সঙ্গে মিশিতেন ও তাহাদের সেবা করিতেন। তাঁহার অর্থ ছিল, কিন্তু প্রয়োজন সামান্যই ছিল। শরীর ছিল সুদৃঢ়, তিনি সর্বত্র একাই যাওয়া-আসা করিতেন, কোন সংকোচ করিতেন না। তিনি ঘোড়ায় চড়িতেও পটু ছিলেন। এই মহিলার সঙ্গে গোধরার আলোচনা সভায় আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হইল ও আমার চরখা ও সূতা কাটার লোক খোঁজার কথা তাঁহার কাছে বলিলাম। দময়ন্তী যেমন নলের জন্য খোঁজ করিয়াছিলেন, ইনি চরখা তেমনি ভাবে খুঁজিয়া বেড়াইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার ভার-লাঘব করিলেন।

পাইলাম

অবশেষে গুজরাটে ভাল রকম ঘোরার পর, বরোদারাজ্যের বিজাপুরে চরখা পাওয়া গেল। অনেকগুলি পরিবারে চরখা ছিল, তাহারা উহা মাচায় উঠাইয়া রাখিয়াছিল। যদি তাহাদের সূতা কেউ নেয় ও পাঁজ ঠিকমত যোগায়, তবে তাহারা সূতা কাটিতে রাজী আছে—গঙ্গা বেন এই খবর দিলেন। আমার খুব আনন্দ হইল, কিন্তু পাঁজ যোগাইবার কাজ খুব সহজ হইল না। স্বর্গগত ভাই উমর সোবানীর কাছে কথাটা বলায় তিনি নিজের মিল হইতে পাঁজ পাঠাইবার

প্রতিশ্রুতি দিলেন। পাঁজ পাইয়া আমি গঙ্গা বেনকে পাঠাইলাম। শীঘ্রই সূতা এত তৈরি হইয়া আসিতে লাগিল যে, আমরা কি করিব বুঝিতে পারিলাম না।

ভাই উমর সোবানীর উদারতার শেষ ছিল না। কিন্তু আমাদের ত তাঁহার দিকে তাকানো দরকার। এত পাঁজ লইতে আমার সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। আর মিলের পাঁজ লইয়া সূতা কাটাও আমার নিকট দূষণীয় মনে হইল। যদি মিলের পাঁজ চলে, তবে মিলের সূতায় দোষ কি? পূর্বেকার লোকেরা কি মিলের পাঁজ ব্যবহার করিতেন? তাঁহারা কেমন করিয়া পাঁজ তৈরি করিতেন? ধুনকর দ্বারা পাঁজ প্রস্তুত করিতে হইবে, আমি গঙ্গা বেনকে বলিলাম। তিনি তাহারও ভার লইলেন। ধুনকরের খোঁজ মিলিল। তাহাকে মাসিক ৩৫ টাকা হিসাবে মোট বেতনে রাখা হইল। সে সময় এ কাজে কোন টাকা খরচ করাই বেশী ছিল না। ধোনা তুলা হইতে পাঁজ করা বালকদের শেখানো হইল। আমি তুলা ভিক্ষা চাহিলাম। ভাই যশোবন্ত প্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে তুলার গাঁট যোগাইবার ভার লইলেন। গঙ্গা বেনের উদ্যম আশাতীত সাফল্য লাভ করিল। তিনি তাঁতি বসাইলেন ও বিজাপুরে চরখার সূতা বুনাইতে লাগিলেন। বিজাপুরের খাদি বিখ্যাত হইয়া উঠিল।

অন্য দিক দিয়া আবার আশ্রমে চরখা আসিতে লাগিল। মগনলাল গান্ধী নিজের শিল্পজ্ঞান প্রয়োগ করিয়া চরখার সংস্কার সাধন করিলেন এবং চরখা ও টেকো আশ্রমেই তৈরি করিতে লাগিলেন। আশ্রমের প্রথম তৈরি খাদিখানা সতের আনা গজ পড়িল। আমি এই মোটা খাদি সতের আনা গজেই বন্ধুদের কিনিতে বলিলাম। তাঁহারা ঐ দাম আনন্দের সঙ্গে দিলেন।

বোম্বাইএ আমি অসুস্থ হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তবুও চরখা সন্ধান করার মতো শক্তি আমার ছিল। সেখানে দুইজন কাটুনী ভগ্নীর খোঁজ পাইলাম। তাহাদিগকে ২৮ তোলার এক সের সূতার জন্য এক টাকা দিলাম। আমি খাদির ব্যাপারে তখন অন্ধের ন্যায় ছিলাম। হাতে সূতা পাইলেই হইল, কাটুনী দেখিতে পাইলেই হইল—এই রকম ভাব ছিল। গঙ্গা বেন যে দাম দিতেন তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলাম যে, আমি ঠকিতেছি। স্ত্রীলোকেরা কম দাম লইতে অস্বীকার করায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু তাহাদের দ্বারা অন্য দিকে কাজ হইল। শ্রীমতী অবন্তিকা বাঈ, রমীবাঈ কামদার, শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের মাতাঠাকুরাণী ও শ্রীমতী বসুমতী বেন সূতা কাটিতে শিখিলেন। আমার চোখের সামনে চরখা গুঞ্জন করিতে লাগিল। আর ঐ

শব্দেই যে আমার রোগ শীঘ্র সারিয়া উঠিল—সে কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। অবশ্য উহার প্রভাব মানসিক ছিল। কিন্তু লোককে আরোগ্য করিয়া তুলিতে মনের ক্ষমতাই কি কম? চরখা কাটিতে আমিও চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তখন উহাতে বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই।

এখানে বোম্বাইএ আবার হাতে-তৈরি পাঁজ পাওয়ার সমস্যা দেখা দিল। শ্রীযুত রেবাশঙ্কর ভাইয়ের বাংলোর কাছ দিয়া তাঁতের বাঁই বাঁই আওয়াজ করিতে করিতে একজন ধুনুরী রোজ যাইত। তাহাকে ডাকিলাম। সে গদি তৈয়ার করার জন্য তুলা ধুনিত। সে পাঁজ তৈরি করিয়া দিতে স্বীকার করিল কিন্তু দাম বেশি চাহিল। আমি তাহাই দিলাম। এই প্রকারে তৈরি সূতা আমি বৈষ্ণবদের পবিত্র "একাদশী ব্রতে" ব্যবহার করার জন্য মূল্য লইয়া বিক্রয় করিলাম। ভাই শিবজী বোম্বাইএ চরখার ক্লাস খুলিলেন। এই সকল পরীক্ষায় অনেক টাকা খরচ হইল। কিন্তু খাদিতে শ্রদ্ধাবান দেশভক্তেরা এই অর্থ যোগাইলেন ও আমি খরচ করিতে লাগিলাম। আমার বিশ্বাস এই যে, ঐ অর্থব্যয় বৃথা হয় নাই। উহা হইতে অনেক শিক্ষা পাওয়া গেল। চরখার সম্ভাবনা কতটা তাহারও পরিমাপ পাওয়া গেল।

এখন আমি কেবল খাদি পরার জন্য উৎসুক হইলাম। আমার ধুতি দেশী মিলের কাপড়ের হইত। বিজাপুরে ও আশ্রমে যে মোটা খাদি উৎপন্ন হইত তাহা মাত্র ৩০ ইঞ্চি বহরের। আমি গঙ্গা বেনকে সাবধান করিয়া দিলাম যে, যদি এক মাসের মধ্যে ৪৫ ইঞ্চি ধুতি না তৈরি করিয়া দিতে পারেন, তবে আমি ঐ কম বহরের খাদিই পরিব। ভগ্নী ইহাতে বিপদে পড়িলেন। কিন্তু তিনি হার মানিলেন না। এক মাসের মধ্যেই তিনি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বহরের ধুতি পাঠাইলেন এবং আমাকে একটা বিপদ হইতে বাঁচাইলেন।

এই সময়ে ভাই লক্ষ্মীদাস, লাঠী নামক স্থান হইতে তাঁতি ভাই রামজী ও তাহার স্ত্রী গঙ্গা বেনকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন ও তাঁহাদের দ্বারা খাদি ধুতি প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। খাদি প্রচারে এই দম্পত্তির দান অনুল্লেখ্য নয়, একথা বলা যায়। তাহারা গুজরাটে ও গুজরাটের বাহিরে তাঁতে সূতা বোনাইবার কৌশল অপরকে শিখাইয়াছিল। এই নিরক্ষর অথচ কলা-কুশল বহিন যখন তাহার তাঁত চালাইতে থাকে, তখন তাহাতে এত মগ্ন হইয়া যায় যে, এদিক সেদিক দেখিতে, কি কাহারও সহিত কথা বলার তাহার খেয়াল থাকে না।

এই সময় 'স্বদেশী' নামে পরিচিত এই খাদি আন্দোলনে, মিল-মালিকেরা আমার বিস্তর সমালোচনা করিতেছেন। ভাই উমর সোবানী মিল-মালিক হইয়াও তাঁহার অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাকে সাহায্য করিতেন এবং তিনি অপরের মন্তব্যের সংবাদ আমাকে দিতেন। ইঁহাদের একজনের যুক্তির প্রভাব তাঁহার উপরেও পড়িয়াছিল। আমাকে উঁহার কাছে লইয়া যাওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। আমি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি ও দেখা করিতে যাই।

"আপনাদের স্বদেশী আন্দোলন পূর্বেও একবার হইয়াছিল—তাহা জানেন ত?"

আমি বলিলাম—"হাঁ, জী।"

আপনি জানেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গের সময় স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার আসিয়াছিল। আর তাহাতে আমাদের মিলগুলি খুব লাভ করিয়া লইয়াছিল, কাপড়ের দাম বাড়াইয়া দিয়াছিল। আরও কতকগুলি খারাপ কাজও করা হইয়াছিল।"

"আমি একথা শুনিয়াছি, শুনিয়া দুঃখ পাইয়াছি।"

"আপনার দুঃখ আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু দুঃখিত হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। আমরা কিছু পরোপকারের জন্য ব্যবসা করি না। আমাদের লাভ চাই, শেয়ার-হোল্ডারদিগকেও জবাব দিতে হয়। পণ্যের মূল্য তাহার চাহিদার উপর নির্ভর করে; এই নিয়মের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াইতে পারে? বাঙ্গালীর একথা জানা উচিত ছিল যে, তাহাদের আন্দোলনের জন্য মিলের কাপড়ের দাম বাড়িবে।"

"বেচারা বাঙ্গালীরা আমারই মত বিশ্বাসপরায়ণ। তাহারা আমাদেরই মত ধরিয়া লইয়াছিল যে, মিল-মালিকেরা এত বড় স্বার্থপর নয় যে, তাহারা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, স্বদেশীর নামে বিদেশী কাপড় বেচিবে।"

"আপনি যে এইরূপ মনে করেন তাহা আমি জানি এবং জানি বলিয়াই আপনাকে সাবধান করার জন্য এখানে কষ্ট দিয়া আনাইয়াছি, যাহাতে আপনি সরল বাঙ্গালীর মতই ভুল না করেন।" এই বলিয়া শেঠ নিজেদের তৈরি কাপড় আনার জন্য ইশারা করিলেন। এই কাপড় ঝুটা অর্থাৎ পরিত্যক্ত তুলার

ছাঁট হইতে তৈরি হইয়াছিল। উহা দেখাইয়া তিনি বলিলেন—"দেখুন, এই মাল আমরা নূতন তৈরি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। উহা ভাল বিক্রয় হইতেছে। ইহা ঝুট হইতে তৈরি বলিয়া খুব সস্তা হয়। এই মাল আমরা দূরবর্তী উত্তর অঞ্চল পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য পৌঁছাইয়া দিতেছি। আমাদের এজেন্ট চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার মত লোকের আমাদের মিলের এজেন্ট হওয়ার আবশ্যক নাই। পরন্তু সত্য এই যে, যেখানে আপনাদের আওয়াজ পৌঁছে না, সেখানেও আমাদের এজেন্ট রহিয়াছে, আমাদের মাল পৌঁছিতেছে। আপনার ইহাও দেখা উচিত যে, ভারতবর্ষের যত মাল দরকার তাহাই আমরা তৈরি করিয়া উঠিতে পারি না। সেইজন্য স্বদেশীর প্রশ্ন প্রধানতঃ অধিক উৎপাদন করা লইয়া। যখন আমরা যথেষ্ট পরিমাণে কাপড় তৈরি করিতে পারিব ও কাপড় ভাল করিতে পারিব, সেই মুহূর্তেই বিদেশী কাপড় আসা বন্ধ হইবে। সেইজন্য আমার পরামর্শ এই যে, আপনারা যে রীতিতে আন্দোলন চালাইতেছেন সেভাবে আন্দোলন চালাইবেন না। নূতন মিল যাহাতে বসে সেদিকে মন দিন। আপনাদের স্বদেশী কাপড়ের কাটতির জন্য আন্দোলনের আবশ্যক নাই; স্বদেশী কাপড় উৎপন্ন করা আবশ্যক।"

আমি বলিলাম—"তাহা হইলে আমি যদি সেই কাজই করিতে থাকি, তবে আপনি আশীর্বাদ করিবেন ত?"

"সে কেমন? আপনি মিল খুলিবার চেষ্টা করিলে অবশ্যই ধন্যবাদভাজন হইবেন।" তিনি একটু বিস্মিতই হইলেন।

"সে কাজ ত আমি করিতেছি না, আমি চরখা চালাইবার জন্য লাগিয়া পড়িয়াছি।"

"সে কি জিনিস?"

আমি চরখার কথা বুঝাইলাম ও বলিলাম—"আপনার কথা আমি স্বীকার করি। আমার মিলের এজেন্ট হওয়া উচিত নয়। তাহাতে লাভের পরিবর্তে লোকসানই হইবে। আমাদের দরকার বস্ত্র উৎপাদন করা ও যাহা উৎপন্ন হয় তাহা বিক্রয়ের জন্য লাগিয়া পড়া। এখন আমি কি করিয়া চরখার সূতায় কাপড় উৎপন্ন হয় সেই চেষ্টাই করিতেছি। আমি স্বদেশী বলিতে এই কাজই বুঝি; কেননা এই পথেই ভারতবর্ষের ক্ষুধা মিটিবে। অর্ধেক সময় বসিয়া থাকে এমন দুঃখী স্ত্রীলোকেরা কাজ পাইবে। তাহাদিগকে দিয়া সূতা কাটাইয়া ও

খাদি বুনাইয়া লোককে পরাইতেই আমার চেষ্টা—আমার এই আন্দোলন। এই আন্দোলন যে কতদূর সফল হইবে তাহা আমি জানি না। এখন কেবলমাত্র উহা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু উহাতে আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে; আর যাহাই হোক, উহাতে লোকসান ত নাই। এই আন্দোলন হইতে যতটা কাপড় ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় ততটাই লাভ। এখন এই চেষ্টায় যে দোষ নাই, একথা ত আপনি বলিবেন?"

"যদি এইভাবে আপনি আন্দোলন চালাইতে থাকেন, তবে তাহাতে আমার বলার কিছু নাই। এ যুগে চরখা চলিবে কি না সে অন্য কথা। আমি আপনার সফলতা কামনা করি।"

৪২

অসহযোগের প্রবাহ

খাদির অগ্রগতি অতঃপর কেমন হইল সে কথা আর বলিব না। কেমন করিয়া খাদি লোক-সমক্ষে আসিল তাহা জানাইবার পর, সে সম্বন্ধে আমার বিভিন্ন কার্যাবলীর কথা বলার ক্ষেত্র ইহা নহে। সে বিষয় বলিতে গেলে উহাই একটি পুস্তক হইয়া যায়। সত্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া একের পর এক জিনিসগুলি কেমন করিয়া আমার কাছে অনায়াসে আসিয়াছে, আত্মকথা তাহাই জানাইবার জন্য লেখা।

এখন অসহযোগ সম্বন্ধে কিছু বলার সময় আসিয়াছে। খিলাফতের জন্য আলী ভাইয়েরা জোর আন্দোলন চালাইতেছিলেন। আবদুল বারি ইত্যাদি উলেমাদের সঙ্গে এই বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। মুসলমানেরা শান্তি ও অহিংসা কতদূর পালন করিতে পারে, সে বিষয়েও আলোচনা হয়। অবশেষে স্থির হয় যে, ইসলাম নীতি হিসাবে তার অনুগামীদের অহিংস পালনে বাধা দেয় না। আর, একবার অহিংসার প্রতিজ্ঞা লইলে উহা পালন করিতেও তাঁহারা বাধ্য। অবশেষে খিলাফত পরিষদে অসহযোগের প্রস্তাব দেওয়া হইল। সেখানে অনেক আলোচনার পর উহা গৃহীত হয়। আমার স্মরণ আছে যে, এলাহাবাদে এইজন্য একবার সারারাত ধরিয়া সভা চলিয়াছিল। শান্তিপূর্ণ অসহযোগের প্রয়োগ-সাফল্য সম্বন্ধে হাকিম সাহেবের সন্দেহ ছিল। তারপর তাঁহার সন্দেহ দূর হওয়ায় তিনিও উহাতে যোগ দিলেন। তিনি যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা অমূল্য।

তারপর গুজরাটে সম্মেলন বসে। সেখানে আমি অসহযোগের প্রস্তাব উপস্থিত করি। এই সম্মেলনে বিরুদ্ধদলের প্রথম যুক্তি এই ছিল যে, যে পর্যন্ত কংগ্রেস এই প্রস্তাব না লইতেছেন, সে পর্যন্ত প্রাদেশিক সম্মেলন উহা গ্রহণ করিতে পারে না। আমি বলিলাম যে, সম্মেলন কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারে না। কিন্তু অগ্রসর হইয়া যাওয়ার অধিকার নিম্নতম সংস্থার আছে। কেবল তাহাই নহে, যদি শক্তি থাকে, তবে তাহা করাই উহার ধর্ম। কেহ যদি নিজ দায়িত্বে এরূপ করে—তবে প্রধান সংস্থার গৌরব বাড়ে। অতঃপর এই প্রস্তাবের দোষগুণের উপর ভাল আলোচনা হয়, ভোট লওয়া হয় এবং অনেক বেশি ভোটে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে আব্বাস তায়াবজীর ও বল্লভভাইয়েরই অধিক কৃতিত্ব ছিল। আব্বাস সাহেব সভাপতি ছিলেন এবং তাঁহার অসহযোগের দিকেই অনুকূল অভিমত ছিল।

এই প্রস্তাব গ্রহণ করার পর, ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসিল। ইহার জন্য বেশ ভালরকম আয়োজন হইয়াছিল। লালা লাজপত রায় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে খিলাফত-স্পেশাল ও কংগ্রেস-স্পেশাল ট্রেন ছাড়িয়াছিল। কলিকাতায় খুব বেশি প্রতিনিধি ও দর্শক আসিয়াছিলেন।

মৌলানা সৌকত আলীর অনুরোধে আমি অসহযোগ প্রস্তাবের খসড়া রেলে আসিতে আসিতে তৈরি করি। তখনও পর্যন্ত আমার মুসাবিদায় "অহিংসা" শব্দ বেশি থাকিত না। আমার বক্তৃতায় আমি এই শব্দটি ব্যবহার করিতাম। কেবলমাত্র মুসলমানদের সভায় "অহিংসা" এই শব্দ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া মনে হইল। সেইজন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কাছে আমি অন্য কোনও বিকল্প শব্দ চাহিলাম। তিনি 'বা-অমন' শব্দটি দিলেন এবং অসহযোগের বদলে "তর্কে মওয়ালাৎ" শব্দ দিলেন।

এই প্রকারে যখন গুজরাটী, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় অসহযোগের প্রতিশব্দে আমার মাথা ভরিয়া উঠিতেছিল, সেই সময় উপরোক্তরূপে কংগ্রেসের জন্য অসহযোগ প্রস্তাব রচনা করার ভার আমার উপর পড়িল। তাহাতে "অহিংসা" শব্দ প্রয়োগ করিতে ভুলিয়া গেলাম। আমি প্রস্তাবের খসড়া রচনা করিয়া ট্রেনেই মৌলানা সৌকত আলীকে দিয়াছিলাম। রাত্রে আমার মনে হইল যে, "অহিংসা" এই প্রধান শব্দটিই বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আমি মহাদেবকে ছুটিয়া যাইতে বলিলাম ও "অহিংসা" শব্দটা যেন ছাপার সময় থাকে,

সে কথা বলিয়া দিলাম। আমার মনে হয়, এই সংশোধন করার পূর্বেই প্রস্তাব ছাপা হইয়া গিয়াছিল। সেই সন্ধ্যাতেই বিষয়-নির্বাচনী সমিতি বসার কথা। খসড়ার ছাপানো কাগজগুলিতে তখন আমি এই সংশোধন করিয়া লইতে বসি। আমি পরে দেখিয়াছিলাম যে আমি ঐ খসড়া লইয়া প্রস্তুত না থাকিলে বড় মুশকিল হইত।

তৎসত্ত্বেও আমার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। কে যে আমার প্রস্তাব সমর্থন করিবে, আর কে বিরোধিতা করিবে তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। লালাজী কোন্ দিকে, তাহা আমি কিছুই জানিতাম না। আমি কলিকাতার এই আহাব অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের ঘনসন্নিবেশ দেখিতে পাইলাম। বিদুষী বেসাণ্ট, পণ্ডিত মালব্যজী, বিজয়রাঘবাচারী, পণ্ডিত মতিলাল, দেশবন্ধু প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন।

আমার প্রস্তাব ছিল, খিলাফত ও পাঞ্জাবে সরকারী অত্যাচারের প্রতিকারের উপায় হিসাবে অসহযোগের পথ গ্রহণ করা হোক। ইহা শ্রীযুত বিজয়রাঘবাচারীর মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন—"যদি অসহযোগই করিতে হয়, তবে বিশেষ নির্দিষ্ট একটা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য কেন করা হইবে? স্বরাজের অভাবই সর্বাপেক্ষা বড় অন্যায়। অতএব তাহারই জন্য অসহযোগ করা যাক।" মতিলালজীও এই মতেই মত দিলেন।

আমি সাগ্রহে এই প্রস্তাব স্বীকার করিলাম এবং স্বরাজের দাবি প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করিলাম। বিস্তৃত, গম্ভীর ও তুমুল বিতর্কের পর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইল।

মতিলালজী সর্বপ্রথম এই আন্দোলনে নামিয়া পড়িলেন। আমার সঙ্গে তাঁহার যে আন্তরিকতা ছিল ও মধুর আলোচনা হইয়াছিল, তাহা এখনও মনে আছে। তিনি কিছু শব্দের পরিবর্তন করিতে বলেন এবং তাহা মানিয়া লই। দেশবন্ধুকে তিনি ইহাতে নামাইবার ভার লইলেন। দেশবন্ধুর হৃদয় অসহযোগের দিকে ছিল। কিন্তু তাঁহার সন্দেহ ছিল যে, অসহযোগ লোকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। দেশবন্ধু ও লালাজী নাগপুর অধিবেশনে পুরাপুরি অসহযোগের ভিতর আসিয়া পড়িলেন। কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে ৺লোকমান্যের অনুপস্থিতি বড়ই দুঃখদায়ক হইয়াছিল। আমার আজও বিশ্বাস যে, তিনি জীবিত থাকিলে কলিকাতার অসহযোগ প্রস্তাবকে আশীর্বাদ করিতেন। আর তাহা না করিয়া তিনি যদি বিরোধিতা করিতেন তবে তাহাও ভাল লাগিত। আমি তাহা হইতে

শিক্ষা লইতে পারিতাম। প্রায় সব সময়েই তাঁহার সহিত আমার মতভেদ হইত, কিন্তু তাহা কখনও তিক্ততায় পরিণত হয় নাই। আমাদের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল, তাহা তিনি সর্বদাই আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। আজ লিখিবার সময় তাঁহার জীবনাবসানের ঘটনাটা আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। আমার সঙ্গী পট্টবর্ধন মধ্যরাত্রে আমাকে টেলিফোনে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জানান। সঙ্গেসঙ্গেই আমি সঙ্গীদের কাছে বলিয়া উঠিয়াছিলাম—"আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন ভাঙ্গিয়া পড়িল।" এই সময় অসহযোগ আন্দোলন পুরাদমে চলিতেছিল। আমি তাঁহার কাছ হইতে উৎসাহ ও প্রেরণা পাওয়ার আশা করিতেছিলাম। অবশেষে অসহযোগ যে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা তিনি কিভাবে গ্রহণ করিতেন, তাহা অনুমানসাপেক্ষই থাকিবে। আমি কেবল এইটুকু জানি যে, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের এই কঠিন সংকট-সময়ে তাঁহার অনুপস্থিতি সকলেই গভীরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন।

৪৩

নাগপুরে

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত অসহযোগ-প্রস্তাব নাগপুরের বার্ষিক অধিবেশনে সমর্থিত হওয়ার কথা। কলিকাতার মত, নাগপুরেও অসংখ্য লোকের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনও প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। আমার স্মরণ আছে যে, ওখানে প্রায় চৌদ্দ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। লালাজীর অনুরোধে বিদ্যালয় বর্জন সম্বন্ধে একটা ছোট সংশোধন আমি স্বীকার করিয়া লই।

এই অধিবেশনেই কংগ্রেসের নিয়মাবলী সংশোধন করার কথা। আমি এই নিয়মাবলী গ্রহণের প্রস্তাব বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলাম। সেখানে উহার ভালরকম আলোচনা হইয়াছিল। এই অধিবেশনে শ্রীযুত বিজয়রাঘবাচারী সভাপতি ছিলেন। বিষয়-নির্বাচনী সভা এই নিয়মাবলীতে একটিমাত্র বড় পরিবর্তন করিয়াছিলেন। আমি প্রতিনিধি সংখ্যা ১৫০০ রাখিয়াছিলাম; বিষয়-নির্বাচনী সভা তাহার পরিবর্তে ৬০০০ করেন। আমার মতে এই পরিবর্তন করা বিবেচনা-সম্মত হয় নাই। এত বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমার এই বিশ্বাসই দৃঢ় হইয়াছে। অধিক প্রতিনিধি হইলে বেশি ভাল কাজ হয়, অথবা গণতন্ত্র অধিক পরিমাণে সত্য হয়, এই প্রকার কল্পনা আমি নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ

বলিয়া মনে করি। যদি ১৫০০ প্রতিনিধি উদারচিত্ত, জনগণের স্বার্থ-রক্ষাকারী ও বিশ্বস্ত লোক হন, তবে ছয় হাজার দায়িত্বহীন প্রতিনিধি অপেক্ষা সাধারণের স্বার্থ তাঁহাদের দ্বারাই অধিকতর সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হইতে পারে। গণতন্ত্র সত্য করিয়া তুলিতে হইলে, জনগণের স্বাধীন মনোভাব, আত্মসম্মান ও ঐক্যভাব এবং সর্বাপেক্ষা যোগ্য-প্রতিনিধি নির্বাচনের আগ্রহ উপস্থিত হওয়া চাই। কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধিতে আগ্রহী বিষয়-নির্বাচনী সভা, ছয় হাজার অপেক্ষাও অধিক প্রতিনিধির আবশ্যকতা দেখিতেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ছয় হাজার প্রতিনিধি গ্রহণে স্বীকৃত হওয়াইত, একটা মীমাংসায় আসা হইয়াছে বলা যায়।

কংগ্রেসের লক্ষ্য সম্বন্ধে খুব আলোচনা হইয়াছিল। নিয়মাবলীতে ছিল, স্বরাজ্যই লক্ষ্য—তাহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে অথবা বাহিরে—যেরূপই হোক। সাম্রাজ্যে থাকিয়াই স্বরাজ চাই—এ পক্ষও কংগ্রেসে ছিল এবং মালব্যজী ও মিঃ জিন্না সেই পক্ষের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যথেষ্ট ভোট পান নাই। শান্তিপূর্ণভাবে ও বৈধপথে স্বরাজ লাভ করিতে হইবে—ইহাও নিয়মাবলীতে ছিল। এই শর্তেরও বিরোধিতা হইয়াছিল। কংগ্রেস এই বিরোধিতা মানিয়া লয় নাই এবং ভাল করিয়া আলোচনার পর সমস্ত নিয়মাবলীই গৃহীত হয়। আমি বলিতে পারি যে, যদি লোকে বিচক্ষণভাবে, বিশ্বস্তভাবে ও উৎসাহভরে এই নিয়মাবলী রূপায়িত করিত, তবে তাহা জনসাধারণের শিক্ষার বাহন হইয়া উঠিত এবং এগুলির ঠিকমত প্রয়োগের দ্বারাই স্বরাজলাভ সম্ভব হইত। কিন্তু এ বিষয় এখানে আর আলোচনা করিব না।

এই সভাতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্পর্কে ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্পর্কেও প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবং তখন হইতেই হিন্দুসভারা অস্পৃশ্যতা দূর করার ভার লইয়াছেন। আর খাদির ভিতর দিয়া কংগ্রেস ভারতবর্ষের অসংখ্য কঙ্কালসার মানুষের সহিত নিজের জীবন্ত সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে। খিলাফত-প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে অসহযোগের সঙ্কল্পের মধ্য দিয়া কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধনেরও মহান প্রয়াস করিয়াছে।

৪৪

পূর্ণাহুতি

এখন এই অধ্যায়গুলি শেষ করার সময় আসিয়াছে। ইহার পর হইতে আমার জীবন সাধারণের কাছে এতই প্রকাশিত যে, লোকে জানে না এমন উল্লেখ-যোগ্য কিছুই নাই। আর ১৯২১ সাল হইতে আমি কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে এমন ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত যে, কোনও একটি বিষয় বলিতে গেলে, তাহার মধ্যে ঐ নেতাদের টানিয়া না আনিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যদিও শ্রদ্ধানন্দজী, দেশবন্ধু, লালাজী, হাকিম সাহেব আজ আমাদের মধ্যে নাই, তথাপি সৌভাগ্য-বশতঃ অন্য অনেক নেতা এখনও জীবিত রহিয়াছেন। কংগ্রেসের ইতিহাসের মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তনের কথা বলা হইয়াছে, সেই পরিবর্তনের স্রোত আজও প্রবহমাণ। গত সাত বৎসর ধরিয়া আমার প্রধান পরীক্ষা কংগ্রেসের ভিতর দিয়াই হইতেছে। সেইজন্য সে সকল সত্যের প্রয়োগ বর্ণনা করিতে হইলে নেতাদের কথা অনিবার্যভাবে আসে। অন্ততঃ শোভনতার দিক হইতেও এখন তাঁহাদিগকে ইহার মধ্যে আনিতে পারি না। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, বর্তমান এই সত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে আমার নির্ণয় নিশ্চয়াত্মক বা এইটিই শেষ কথা - তাহা এখনও বলা যায় না। সেইজন্য এই আত্মকথা এইখানে বন্ধ করাই আমার কর্তব্য মনে হইতেছে। আমার কলমও আর অগ্রসর হইতে চায় না।

পাঠকদের কাছ হইতে বিদায় লইতে আজ আমার দুঃখ হইতেছে। আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর আমি গভীর মূল্য দিয়া থাকি। আমি সে-সকল কথা ঠিকমত বর্ণনা করিতে পারিয়াছি কিনা জানি না। তবে যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। সত্যকে আমি যেমন জানিয়াছি, যে পথে জানিয়াছি, তাহাই দেখাইতে আমি সর্বদা চেষ্টা করিয়াছি এবং পাঠকদের কাছে সেই বর্ণনা দিয়া চিত্তে শান্তিলাভ করিয়াছি। কেন না, আমি আশা করি যে, ইহাতে পাঠকদের সত্যের ও অহিংসার প্রতি আস্থা ও অনুরাগ দৃঢ় হইবে।

সত্য ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বর আছেন, ইহা আমি অনুভব করি নাই। সত্যময় হওয়ার যাত্রাপথে অহিংসা একটি অবলম্বন ইহা যদি এই অধ্যায়গুলির পাতায় পাতায় দেখাইতে না পারিয়া থাকি, তবে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। চেষ্টা ব্যর্থ হোক, কিন্তু মূলমন্ত্র ত ব্যর্থ নয়। আমার

অহিংসার ভিতর ত্রুটি আছে, উহা অসম্পূর্ণ। সহস্র সহস্র সূর্য একত্র করিলেও যে সত্যরূপী সূর্যের তেজের পরিমাণ পাওয়া যায় না, আমার সত্যের দৃষ্টি সেই সূর্যের একটি কিরণের একটু কণামাত্র। এই সত্য-সূর্যের পূর্ণ দর্শন, পূর্ণ অহিংসা ভিন্ন হয় না—এতাবৎকালের পরীক্ষার পর একথা বলিতে পারি।

এই সর্বজনীন ও সর্বব্যাপী সত্যকে প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবমাত্রের প্রতিও ভালবাসার পরম আবশ্যকতা আছে। যাহারা উহা পাইতে ইচ্ছা করে, জীবনের কোনও ক্ষেত্রের বাহিরেই তাহারা বসিয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্য আমার সত্যের পূজা, আমাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নাই, এই কথা যিনি বলেন, তিনি ধর্ম কি তাহা জানেন না—একথা আমি সবিনয়ে অথচ নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

আত্মশুদ্ধি ব্যতীত জীবমাত্রের সঙ্গে, প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে ঐক্যবোধ হয় না। আত্মশুদ্ধি ব্যতীত অহিংসার উদ্‌যাপন সর্বথা অসম্ভব। অন্তরে যিনি অশুদ্ধ পরমাত্মা দর্শন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এইজন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুদ্ধির আবশ্যকতা আছে। এই শুদ্ধি সংক্রামকও বটে, যাহার লাভ হয় তাহার চারিপাশের আবেষ্টনীও শুদ্ধ হয়।

কিন্তু আত্মশুদ্ধির পথ অত্যন্ত দুর্গম ও দুরারোহ। নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে চিন্তায়, বাক্যে এবং কাজে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হইতে হইবে; প্রেম বা বিদ্বেষ, অনুরাগ বা বিরাগ—এইসব পরস্পরবিরোধী চিত্তবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। আমি জানি যে, এজন্য নিরন্তর চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি এই ত্রিবিধ পবিত্রতা লাভ করিতে সক্ষম হই নাই। এইজন্যই মানুষের স্তুতি আমাকে স্পর্ধিত করিতে পারে না। আমাকে অহঙ্কারী করে না। বস্তুতঃ এই সব স্তুতি আমাকে আঘাতই করে মাত্র। চঞ্চল রিপুকে জয় করা, অস্ত্রবলে পৃথিবীকে জয় করা অপেক্ষাও ঢের বেশি দুঃসাধ্য বলিয়া আমার মনে হয়। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পরেও আমার ভিতরে সুপ্ত বিকারগুলির প্রভাব আমি প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করিতেছি। ইহাদের অভিজ্ঞতা আমার দীনতাকে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু তথাপি আমি পরাভূত হই নাই। বরং এই সব প্রয়োগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এই সব অভিজ্ঞতা আমাকে রক্ষা করিয়াছে এবং উহারা আমাকে গভীর আনন্দদান করিয়াছে। আমি ইহাও জানি যে, আমার সম্মুখে এখনও দুর্গম যাত্রাপথ প্রসারিত। এই পথ আমাকে অতিক্রম করিতে হইবে। তার জন্য নিজেকে একেবারে নিঃস্ব রিক্ত করিয়া তুলিতে হইবে।'

মানুষ যে পর্যন্ত স্বেচ্ছায় নিজেকে সকলের শেষে, সকলের দীন করিয়া পেছনে না রাখে, সে পর্যন্ত তাহার মুক্তি নাই। এই নম্রতার শেষ সীমা হইতেছে অহিংসা।

পাঠকদের কাছে বিদায় গ্রহণের সময়, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য বিদায় লওয়ার বেলায়, সত্যরূপী ভগবানের কাছে আমার জন্য তাঁহাদিগকেও আমি এই প্রার্থনাই করিতে বলি—তিনি যেন আমাকে চিন্তায়, বাক্যে এবং কাজে অহিংস হইবার শক্তি দান করেন।